
বিশ্বকাপ
ফুটবল
চিরঞ্জীব

বিশ্বকাপ ফুটবল

চিরঞ্জীব

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

BISWA CUP FOOTBALL
(History of World Cup Soccer)
by
CHIRANJEEB

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশীথকুমার ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদে : উপরে—ফিফা কাপ, নিচে—জুল রিমে ট্রফি এবং ফুটবল সম্রাট পেলে। পিছনের পৃষ্ঠায়—বিশ্ব-ফুটবলের কয়েকটি স্মরণীয় মুহূর্ত।

যে ভারতীয় দল বিশ্বকাপে

প্রথম খেলবে, তাদের জন্য-

এই লেখকের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ :

জয় থেকে জয় ক্রিকেটে

খেলাধূলার আধুনিক নিয়ম-কানুন

ফুটবলের তিন রাজা

ক্লে, ক্যাসিয়াস ক্লে

সেরা সেরা খেলোয়াড়

কানোজি আংরে

খেলাধূলার নেপথ্যে

স্পোর্টস ডায়েরি

পদ্মা আমার মা, গঙ্গা আমার মা

লেখা শুরু করেছিলাম ১৯৫৩-এর গোড়ায়। আশা ছিল পশ্চিম জার্মানীতে ১৯৫৪-এর বিশ্বকাপের আগে এ বইয়ের জন্ম হবে। কিন্তু দিনের পর দিন বিশ্ব-কাপ ফুটবলের পাহাড়-প্রমাণ তথ্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমারও তৃষ্ণা বেড়ে যায়। শুরুতে পরিকল্পিত আড়াইশ' পৃষ্ঠার বই ক্রমশ আয়তনে বাড়তে লাগল। অভয় দিলেন রবীন্দ্র লাইব্রেরীর কর্ণধার রবিবাবু; তিন বছর ধরে বিশ্বকাপ ফুটবলকে তাই ভ্রূণ অবস্থাতেই কাটাতে হয়েছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আরও প্রচুর তথ্য এসে ভিড় করেছে। কিন্তু মুদ্রণের কাজ এগিয়ে যাওয়ায় সব সংযোজন সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে কত অঘটন ঘটে গেল। ব্রাজিল-ফুটবলের আধুনিক কালের অন্যতম রূপকার ভিসেন্ট ফিওলা চলে গেলেন পরলোকে। লণ্ডন থেকে নানা তথ্য পাঠাতেন সাংবাদিক-বন্ধু ডেভিড ব্রাউন। মোটর-দুর্ঘটনায় তিনিও সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে গেছেন। ডেভিডের ঋণ অপরিশোধ্য।

শেষ করার আগে বিনীতভাবে জানাচ্ছি, যথাসম্ভব নির্ভুল তথ্য পরিবেশনের দিকে লক্ষ্য রেখেছি। তবুও কারুর চোখে ভুল ধরা পড়লে, এবং তা জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত

কলকাতা, ডিসেম্বর ৯ **চিরঞ্জীব**

১৯৫৫

—: যা আছে :—

বিষয়		পৃষ্ঠা
উরুগুয়ে	...	১
ইতালি	...	১৩
ফ্রান্স	...	৩১
ব্রাজিল	...	৫০
সুইজারল্যাণ্ড	...	৮০
সুইডেন	...	১১৭
চিলি	...	১৫৬
ইংল্যাণ্ড	...	১৯৬
মেক্সিকো	...	২৪৭
পশ্চিম জার্মানী	...	৩০৯
বিশ্ব-ফুটবলে স্মরণীয়	...	৩৮৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

Fe'de'ration Internationale des Football Associations (FIFA).

উরুগুয়ে, ইতালি, ফ্রান্স, ব্রাজিল, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, চিলি, ইংল্যাণ্ড, মেক্সিকো ও পশ্চিম জার্মানীর জাতীয় ফুটবল সংস্থা।

Sir Stanley Rous, Former President, FIFA

The Guardian, London

Newsweek, U.S.A.

The Topical Times Football Book

F. A. Book, London

Scala, W. Germany

World Sports, London

World Soccer, London

Sportsworld, London

Sportsweek, Bombay

World Soccer from A to Z by Norman Barrett

History of the World Cup by Brian Glanville

World Soccer by Peter Arnold and Christopher Davis

Sport, Czechoslovakia

Sport in the U.S.S.R

German News

United States Information Service, Calcutta

British Information Service, Calcutta

U. S. S. R Information deptt., Calcutta

Press & Infromation Section, Federal Republic of Germany, Calcutta.

আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রন্থাগার

জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা

এবং

রবীন্দ্র লাইব্রেরীর কর্মীবৃন্দ।

: দ্রষ্টব্য :

পৃষ্ঠা—৭৮ ও ৭৯ : উরুগুয়ের খেলোয়াড়ের নাম হবে গঞ্জালেস—গঞ্জালভেস নয়।

পৃষ্ঠা—৩১০ : ১৯৫৪-এর বিশ্বকাপের খেলা পশ্চিম জার্মানীর নয়টি শহরের নয়টি স্টেডিয়ামে হয়েছিল। স্টেডিয়ামগুলি—হামবুর্গ, হ্যানোভার, গেলসেন-কিরখেন, বার্লিন, ডর্টমুণ্ড, ডুসেলডর্ফ, ফ্রাঙ্কফুর্ট, স্টুটগার্ট ও মিউনিখ শহরে অবস্থিত।

পৃষ্ঠা—৩১২ : ১ মার্ক=৩ টাকা ৪৬ পয়সা। ১৯৫৪-এর বিশ্বকাপ ফাইনালে সবচেয়ে কমদামী টিকিট বিক্রি হয় ৩০ মার্কে অর্থাৎ ১০৩ টাকায়। ওই টিকিট কালোবাজারে বিক্রি হয়েছিল ১,৫০০ মার্কে অর্থাৎ প্রায় ৫,১৯০ টাকায়।

পৃষ্ঠা—৩৯৮ : ওভারাথ উলফ্যাঙ্গ নয়—জার্মান উচ্চারণ হবে ওভারাথ ভোলফগাঙ্গ।

১৯৫৫-এ নিউইয়র্কের কসমস ক্লাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পেলে আমেরিকায় গিয়ে প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের আমন্ত্রণে হোয়াইট হাউস প্রাঙ্গণে দেখাচ্ছেন, কতক্ষণ তিনি বল মাথায় রাখতে পারেন। পিছনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট।





স্যার স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুসের প্রতি শ্রদ্ধা-স্বরূপ অন্যান্য ফুটবল তারকাদের সঙ্গে তার ফেয়ারওয়েল ম্যাচে খেলেন বিশ্বের সবকালের সেরা গোলরক্ষক রাশিয়ার লেভ ইয়াসিন। সেটাকে সেই ম্যাচের পরে এক ভক্ত খেলোয়াড়ের কাঁধে ইয়াসিন। তার আর এক পায়ের ভার বইছেন পুসকাস (ডাইনে)।







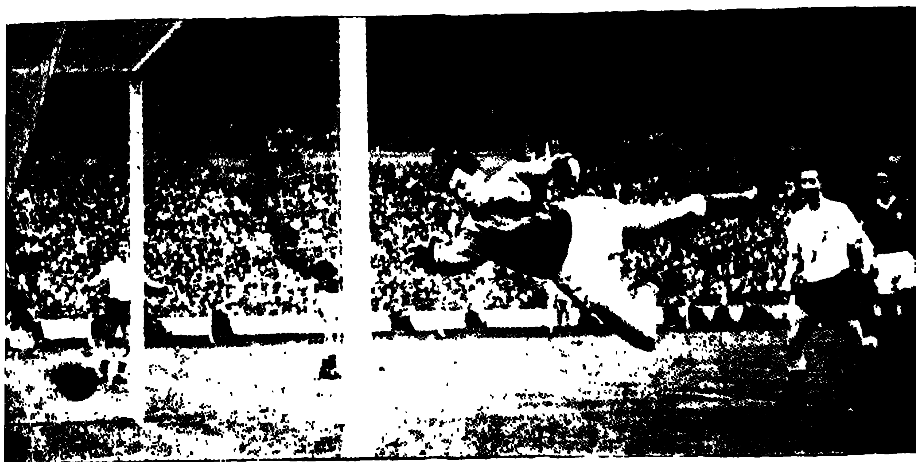
১. বাব চার্লটন (ইংল্যাণ্ড)। ২. ১৯৭৮-এর ফাইনাল। নেদারল্যাণ্ডসের বিরুদ্ধে হেড করে জয়সূচক গোলটি দিচ্ছেন পশ্চিম জার্মানার গার্ড মূলার। ৩. জিমি গ্রিভস (ইংল্যাণ্ড)।



ইংল্যাণ্ডের তিন তারকা। জর্জ বেস্ট (বাবরি চুল) গোল করতেই জড়িয়ে ধরেছেন ডোনাল্ড ল। অভিনন্দন জানাতে হাত বাড়িয়েছেন ববি চার্লটন।



১৯৩০। বিশ্বকাপের উদ্বোধনী বছরে কাপ বিজয়ী উরুগুয়ে। (দাঁড়িয়ে) বাঁদিকে দ্বিতীয় থেকে—গেষ্টিডো, নাসাজ (অধিনায়ক) বালস্টেরোস, ম্যাসেরনি, আন্দ্রাদে ও ফার্নাণ্ডেজ। (বসে) ডোরাডো, স্ক্যারোন, কাস্ত্রো, সি ও ইরিয়ার্ট।



অপূর্ব ডাইভ দিয়েছিলেন বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক গর্ডন ব্যাংকস।
কিন্তু গোল বাঁচাতে পারলেন না।



স্যার স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুস কিনিয়ায় কৃষ্ণকায়দের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।



। বিজয়ী পশ্চিম জার্মানী। পিছনে বাঁদিক থেকে—ম্যানেজার শেপ হারবার্গার, এফ ওয়াল্টার, হেলমুট রান পোসপল, একেল, লাইবাথ্রশ, ও ওয়াল্টার, শেফার ও মরলক। বসে—মে, তুরেক ও কোহলমেয়ের।


72

১৯৫০। বিজয়ী উরুগুয়ে। খেলা শুরুর আগে দলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে (পিছনে) ভারেলা (অধিনায়ক) তেজেরা, গাম্বেটা, গঞ্জালেস, মাসপোলি ও আন্দ্রাদে। (সামনে) ঘিগিয়া, পেরেজ মিগুয়েজ, শিয়াফিনো ও মোরান।



তারকা সমাবেশ। এপ্রিলে স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুস-ফেয়ারওয়েল ম্যাচে খেলতে নামার আগের মুহূর্তে ড্রেসিংরুমে (বাঁদিক থেকে) পুসকাস, স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুস, ডি স্টিফানো ও মাসোপাস্ট।



১৯৫৮। প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনালে জয়ের পর স্টকহমের মাঠ পরিক্রমারত ব্রাজিলের জিলমার, ডি স্যান্টোস, এন স্যান্টোস, জিটো, বেলিনি, অরল্যাণ্ডো, গ্যারিঞ্চা (আড়ালে), ভাভা ও জাগালো। পিছনে ডিডি ও পেলে।



১৯৫৪। বারণের যে যুদ্ধে হাঙ্গেরি ৪-২ গোলে হারিয়েছিল ব্রাজিলকে। হাত উঁচিয়ে ইশারারত হাঙ্গেরির হিদেকুটি। তাঁর পাশে ব্রাজিল-গোলরক্ষক ক্যাস্তিলো। হিদেকুটি এই খেলায় দুটি গোল করেন।



১৯৩৪। ভিট্টরিও পোজোর সঙ্গে বিজয়ী ইতালী। পিছনে—কম্বি (অধিনায়ক), মণ্টি, ফেরারিস ৪, আলেমণ্ডি, গাইতা, ফেরারি। সামনে—শিয়াভিও, মিজ্জা, মঙ্গেগলিও, বার্তোলিনি ও ওরসি।

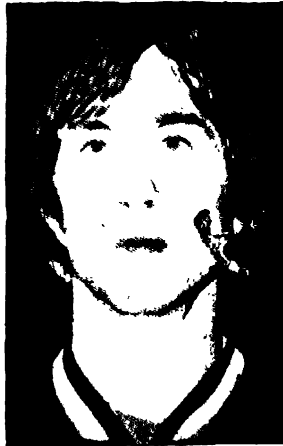


তৃতীয়বার জিতে বিশ্বকাপ—সোনার পরী চিরকালের জন্য পেলেন ব্রাজিলের এই খেলোয়াড়রা। পিছনে বাঁদিক থেকে—কার্লস আলবার্টো, ব্রিটো, ফেলিক্স, পিয়াজ্জা, ক্লোডোয়াল্ডো ও এভারাল্ডো। বসে—জেয়ারজিনো, গার্সন, টোস্টাও, পেলে ও রিভেলিনো।

। নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগে ফ্রি-কিকে পশ্চিম জার্মানীর ওয়েবের ২-২ করলেন।
গোল বাঁচাতে গিয়ে পড়ে গেছেন গর্ডন ব্যাংকস। ইংল্যাণ্ডের চিন্তা
বেড়ে গেল। অতিরিক্ত সময়ে কী হবে কে জানে!



ফ্যাচেত্তি (ইতা ল)



যোহান ক্রুয়েফ (নেদারল্যাণ্ডস)



অ্যালান বল (ইংল্যাণ্ড)



একটু পরেই অতিরিক্ত সময়ের খেলা শুরু হবে। ম্যানেজার আলফ রামসে (ট্যাক-শুট পরা, ডান দিক থেকে তৃতীয়) বলছেন—তোমরা একবার জিতেছ, আর একবার জিততে হবে। বসে উপদেশ শুনছেন ববি মূর। সর্ববামে গর্ডন ব্যাংকস। তার ডাইনে ববি চার্লটন। কোহেন (২), স্টাইলস (৪); রয়েছেন উইলসন, অ্যালান বল, জিওফ হার্স্ট, হান্ট ও পিটার্স। ছবিতে নেই কেবল জ্যাক চার্লটন।



১৯৩৮। বিজয়ী ইতালির সঙ্গে জুল রিমে ট্রফি হাতে ম্যানেজার ভিট্টরিও পোজো। কর্মকর্তারা সহ রয়েছেন ওলিভেরি, ফণি, রাভা, সেরান্তনি, আন্দ্রোলো, লোকাটেলি, বিভাটি, মিজ্জা (অধিনায়ক), পিওলা ও কলৌস।







দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ফুটবলে বিজয়ী ব্রাজিল দল।

পোর্তুগাল—হাঙ্গেরি ম্যাচে আহত ইউসেবিও।

ব্রাজিলের রক্ষণব্যূহের সামনে যুগোশ্লাভিয়ার হানাদাররা।



১৯৫৮। তখন বয়স ১৮। সেবার ফাইনালে ব্রাজিল যে ৫-২ গোলে সুইডেনকে হারাল তার দুটি পেলের দেওয়া। প্রথম কাপ-জয়ের আনন্দে ডিডি-র কাঁধে মাথা রেখে দলের কনিষ্ঠতম পেলে ক্রন্দনরত। সতীর্থরা তাকে থামাতে ব্যস্ত।



উত্তর কোরিয়া—ইতালি ম্যাচের সেই ঐতিহাসিক দৃশ্য। ফ্যাচেত্তিকে আটকাতে কোরিয়ার পাঁচজন ব্যূহ রচনা রেছেন।



১. রডনি মারশ (ইংল্যাণ্ড), ২. লুইগি রিভা (ইতালি), ৩. গিয়ানি রিভেরা (ইতালি), ৪. জেয়ারজিনো (ব্রাজিল), ৫. ভান হ্যানেজেম (নেদারল্যাণ্ডস), ৬. পিটার শিলটন (ইংল্যাণ্ড)।



বিশ্ব-ফুটবলে সবচেয়ে সক্রিয় সেণ্টার ফরওয়াড
ইংল্যাণ্ডের ডিক্সি ডিন



১৯৭৪-এর বিশ্ববিজয়ী পশ্চিম জার্মানী। ১. বেকেনবাউয়ের (অধিনায়ক), ২. শেপ মেয়ার, ৩. গার্ড মূলার, ৪. বার্টি ফোগটস, ৫. গুণটার নেৎসার, ৬. গেয়র্গ শোয়ারৎসেনবেখ. ৭. ডিটার হেরৎসগ, ৮. উলি হোনেস, ৯. রাইনার বনহোফ, ১০. ইয়ুরগেন গ্রাবোস্কি, ১১. পাউল ব্রাইটনার, ১২. ইয়োসেফ হেনকেস, ১৩. ব্যারণ্ড কালমান, ১৪ ডিটার হোটগেস, ১৫. নরবার্ট নিগপুর ও ১৬. ম্যানেজার হেলমুট শোন। ছবিতে নেই ওভারাথ ও হোলেৎসেনবাইন।






। বামে— -এর ফাইনালে জিতে ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের নিজেদের প্রথায় সম্মিলিত আনন্দ নম্বর জার্সিটি পেলের। ডাইনে—বিশ্বকাপের জনক জুল রিমে তাঁর নামাঙ্কিত 'জুল রিমে ট্রফিটি' দিচ্ছেন ১৯৩০-এর বিজয়ী উরুগুয়ের ফুটবল সভাপতিকে। নিচে, বামে—বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলের রেকর্ড আজও ফ্রান্সের ফনটাইনের। ১৯৫৮-র চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৩টি গোল দেওয়ার পর সতীর্থরা তাঁকে নিয়ে আনন্দ করছেন। ডাইনে— এ ফাইনালের পর পশ্চিম জার্মানীর ম্যানেজার তথা কোচ হেলমুট শ্যোন জড়িয়ে ধরেছেন জয়ের নায়ক সেণ্টার ফরওয়ার্ড গার্ড মূলারকে।

উরুগুয়ে ১৯৩০



বিজয়ী উরুগুয়ের ব্যাজ

১৯৩০ সালে উরুগুয়েতে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হলেও আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা তারও আটান্ন বছর আগে ১৮৭২ সালে। ওই বছর প্রথম খেলা হয় দুটি দেশের মধ্যে। গ্লাসগোয় ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল স্কটল্যাণ্ড।

তবে ফুটবলের ওয়ার্লড কাপ বা বিশ্বকাপের চিন্তা প্রথমে আসে ফ্রান্সে এবং বিশ্বকাপের জনক দু'জন ফরাসী। একজন জুল রিমে, অপরজন হেনরি ডেলনে। ওই জুল রিমের নামানুসারে এতদিন বিজয়ী দল 'সোনার পরী' জুল রিমে ট্রফি পেত। মেক্সিকোয় ১৯৭০ সালে জিতে ব্রাজিল তিনবার বিজয়ী— এই সুবাদে জুল রিমে ট্রফি চিরকালের জন্য ঘরে তোলে।

নেপথ্যে

যাই হোক, রিমে ছিলেন ১৯১৯ সালে ফুটবল ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা বছর থেকেই সভাপতি। বিশ্বকাপ ফুটবলের পরিচালক ফিফা-রও (ফেডারেশন ইণ্টারন্যাশানালে দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন) তিনি সভাপতি ছিলেন ১৯২০ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত। ডেলনের আসল কাজ ছিল ফরাসী ফুটবল পরিচালনা এবং তা ১৯০৮ থেকেই। ১৯১৯ থেকে ১৯৫৬-য় মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সম্পাদকের দায়িত্ব তার কাঁধেই থাকে। ৮৩ বছর বয়সী রিমে মারা যান ওঁর কিছু পরেই।

রিমে ও ডেলনে দুই হরিহরআত্মা। উভয়েই ফুটবল-পাগল। কর্মী হিসাবে ডেলনে অতুলনীয় ছিলেন। ফুটবলের প্রসারে মত ও পথ নিয়ে মাঝে মাঝে দুই বন্ধুতে ঝগড়া হত। কিন্তু তা সর্বদাই ক্ষণস্থায়ী ছিল। পরবর্তীকালে

হিসাব কষে দেখা যায় ফরাসী ফুটবল, ইউরোপীয় ফুটবল এবং বিশ্বকাপের পথিকৃৎ এঁরা দু'জনই।

ফিফা-র প্রথম সভা বসল প্যারীতে, ১৯০৪ সালে। কিন্তু ব্রিটেনের প্রতিনিধি এলেন না। স্থির হল কেবল ফিফা-ই ফুটবলের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারবে। কিন্তু এখন (১৯০৪) থেকে ২৬ বছর তারা ওই প্রতিযোগিতা করতে পারবে না। ১৯২০ সালে ফিফা-র এণ্টোয়ার্প কংগ্রেস বসল ওলিম্পিকসের সঙ্গেই। এতদিন যে বিশ্বকাপের কথা শুধু আলোচনার বিষয় ছিল, এবার তা বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার পথে অনেকটা এগিয়ে গেল। ১৯২৪ সালে প্যারী ওলিম্পিকসের সময় ফিফা-র সভায় বিশ্বফুটবল আরও গুরুত্ব পেল। ফুটবল নিয়ে সভা উত্তপ্ত হল এবং উরুগুয়ে বিশ্বকাপের প্রশ্নে সভাকক্ষ ত্যাগ করে। দু'বছর পরে ফিফা কংগ্রেসে ডেলনে ঘোষণা করলেন, 'আন্তর্জাতিক ফুটবল আর ওলিম্পিকসের সীমানায় আবদ্ধ থাকতে পারে না। অনেক দেশেই পেশাদারী ফুটবল চালু হয়েছে এবং তাদের সেরা খেলোয়াড়রা ওলিম্পিকসে খেলতে পারে না, যেহেতু ওলিম্পিাস অপেশাদারদের জন্যই।' আমস্টারডামে ১৯২৮ সালের ওলিম্পিকসে আর্জেণ্টিনার সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর উরুগুয়ে ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল। ডেলনে ওখানে বললেন, আর দেরী নয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্বকাপের আয়োজন করতেই হবে। কিন্তু খেলা কোথায় হবে—এই নিয়ে মহাচিন্তায় পড়লেন।

খেলা কোথায় হবে?—আমরাই করব। একে একে প্রস্তাব দিল ইতালি, হল্যাণ্ড, স্পেন ও সুইডেন এবং সবশেষে উরুগুয়ে। ছোট দেশ উরুগুয়ে বলল : আমাদের জনসংখ্যা মাত্র কুড়িলক্ষ। তবুও আমরা প্রতিটি দলের যাতায়াত ভাড়া দেব, তাদের হোটেল খরচ লাগবে না এবং বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য নতুন স্টেডিয়াম তৈরি করব। মণ্টিভিডিও-তে ওই স্টেডিয়াম হবে। নাম দেব শতবার্ষিকী স্টেডিয়াম। কেননা, ১৯৩০ সালে হবে আমাদের স্বাধীনতার শতবার্ষিকী। আটমাসের মধ্যে স্টেডিয়াম নির্মাণ শেষ হবে, যদিও তার মধ্যে তিনমাস থাকবে বৃষ্টি। উরুগুয়ের এমন উৎসাহ দেখে ইউরোপের চারটি দেশ আর রা কাড়ল না। শুধু তাই নয়, তারা পরে উরুগুয়েতে খেলতেও আসেনি।

১৯২৯ সালে বার্সিলোনা কংগ্রেসে উরুগুয়ে পাকাপাকিভাবে দায়িত্ব পেয়ে দেখল প্রতিযোগিতার দু'মাস আগেও ইউরোপের কোনো দেশ এণ্ট্রি পাঠায়নি।

ইতালি, হল্যাণ্ড, স্পেন ও সুইডেনের মত অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া আসবে না জানাল। ব্রিটেন তো ফিফা-র বাইরে ছিল। ফ্রান্সের মত বিশ্বকাপে খেলার জন্য রোমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়াও যোগ দিল। রিমে ফিফা-র সভাপতি। আর উরুগুয়ে ১৯২৪ সালে প্যারীতে গিয়েছিল; উদ্যোক্তারা মনে সাহস পেলেন। কিন্তু লাতিন আমেরিকা অপমানিত বোধ করল। তারা হুমকি দিল ফিফা ছেড়ে চলে যাবে। রোমানিয়া, বেলজিয়াম শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল। বেলজিয়ামের উপর চাপ সৃষ্টি করেন ফিফা-র সহ-সভাপতি রডলফে সিলড্রেয়ার্সে এবং রোমানিয়াকে খেলতে রাজি করান রাজা ক্যারল নিজে। ক্যারল রোমানিয়ায় জনপ্রিয় না থাকলেও ওই দেশের খেলার মাঠে তাঁর দান ছিল অপরিসীম। ক্যারল সিংহাসনে আরোহণ করেই সাসপেণ্ড হওয়া সমস্ত ফুটবলারের শাস্তি মকুব করেন এবং জাতীয় ফুটবল দলের সব দায়িত্ব নিজের হাতে নেন। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করলেও উরুগুয়ে গেল তাঁর চাপেই, রাজি যুগোশ্লাভিয়াও। অর্থাৎ ইউরোপের মোট চারটি দল বা চারটি দেশ খেলবে।

১৯২৪ ওলিম্পিকসে উরুগুয়ে ৭-০ গোলে হারায় যুগোশ্লাভিয়াকে, ৫-১ গোলে ফ্রান্সকে। ১৯২৮ সালে আর্জেন্টিনা ৬-৩ গোলে হারায় বেলজিয়ামকে। কিন্তু আর্জেন্টিনার বাস্তিন সহ সেরা তিনজন এবার দলে নেই। লিপটন কাপ ফুটবলে আর্জেন্টিনা সর্বদা উরুগুয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেও এবার তারা অনেকটা হীনবল। ১৯২৮ সালের ওলিম্পিকস্ ফাইনালে ২-১ গোলে পরাজয়ের আগে রিপ্লে পায়। তারা উজ্জ্বলতম লেফট উইঙ্গার রাইমতো ওরসি-কে হারায়। তিনি ইতালি দলে চলে গিয়েছিলেন। তবুও ছিলেন শক্তিধর অ্যাটাকিং সেণ্টার হাফ লুইসিটো মন্টি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চারটি পুলের একটিতে শীর্ষস্থান পেল। পেশাদারী ফুটবল ওই সময়ে চালু হয়েছে আমেরিকার বিভিন্নস্থানে। তবে ব্রুকলিন ওয়াণ্ডারারার্সের জ্যাক কলের ব্যবস্থাপনায় তাদের দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড় ছিল ব্রিটেন ও স্কটল্যাণ্ডের। অ্যালেক উড, জেমস গালাগার, অ্যাণ্ড্রু আউল্ড, জেমস ব্রাউন ও বার্ট ম্যাকঘি স্কটল্যাণ্ডের এবং জর্জ মুরহাউস ইংল্যাণ্ডের। প্রত্যেকে এত শক্তিশালী ছিলেন যে, ফরাসী খেলোয়াড়েরা এঁদের নাম দিয়েছিলেন 'শট পাটার'। প্রত্যেকের উরু ছিল বড় গাছের গুড়ির মত। ট্রেনিং-এর সময় দেখা যেত ওরা দূরপাল্লার দৌড়ের অ্যাথলীটদের মত ট্র্যাকগুলো ঘুরছে।

ব্রাজিল উপস্থিত হলেও তখন কালা আদমীদের জন্য সব দুয়ার তেমন উন্মুক্ত ছিল না। মোট ১৩টি দেশ বা দল খেলতে নামল। চারটি পুলের বিজয়ীরা সেমিফাইনালে যাবে স্থির হল।

উরুগুয়ে ফেভারিট

প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের বিজয়-মুকুট উরুগুয়ের গলায় যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। যদিও ১৯২৪ ও ১৯২৮ সালের ওলিম্পিক দলের সেই খেলোয়াড়রা ১৯৩০-এ তেমন দড় ছিলেন না। বিখ্যাত সেণ্টার ফরওয়ার্ড পেড্রো পেট্রোন কিছুটা ক্ষীণ। তবুও স্বদেশের মাটিতে খেলার সুযোগ-সুবিধাও অনেক ছিল। অতীত শ্রেষ্ঠত্ব আর স্বদেশের মাটি—দুই সুবিধায় তারা তখন ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী—ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়ান ওয়াণ্ডার টিমকেও হারাতে পারত।

প্রত্যেকটি দেশের মত উরুগুয়েও খেলল অ্যাটাকিং সেণ্টার হাফ দ্বারা। উইং-হাফে দেখা গেল বিখ্যাত জেমস অ্যানড্রেডকে। এই নিগ্রো তরুণটির বল কনট্রোল দেখলে মনে হত কোনো যাদুকর বোধহয় খেলা দেখাচ্ছেন। তাঁরই সতীর্থ আলভারো গেসটিডো-র মত চমৎকার পাস সেকালে কেউ দিতে পারতেন না। অধিনায়ক ও রাইট ব্যাক জেমসে নাসাজি থাকলে গোলকীপার নিশ্চিন্ত হতেন। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিলেন বিপক্ষের গোলমুখে হেক্টর স্ক্যারন।

তৎকালেও হাড়াভাঙা ট্রেনিং-ক্যাম্প হত উরুগুয়েতে। খেলোয়াড়দের রাখা হত মণ্টিভিডোর ব্যয়বহুল হোটেলে। এত কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে তারা থাকতেন যে, একবার রাত্রে তাদের সেরা গোলকীপার মাজালি ইতো লুকিয়ে হোটেল থেকে বের হতে গেলে ম্যানেজারের হাতে ধরা পড়েন। পরদিন থেকে তাঁর জায়গায় নামানো হয় রিজার্ভে থাকা এনরিক ব্যালেস্টেরসকে। এদের নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রমের তুলনা নেই।

প্রাথমিক খেলা

ইউরোপের চারটি দল এল ব্রাজিলের পথে এবং মণ্টিভিডিওতে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানানো হল।

এদিকে শতবার্ষিকী স্টেডিয়ামটির নির্মাণকার্য তখনও শেষ হয়নি। সকলে ধন্যবাদ জানালেন বৃষ্টিকে। বৃষ্টির দরুনই প্রাথমিক পর্যায়ের খেলাগুলি হল পেনারল ও ন্যাশনাল ক্লাবের মাঠে এবং পসিটো ও সেনট্রাল পার্কে।

প্রথম বিশ্বকাপের উদ্বোধনী খেলায় ১৩ জুলাই রবিবার অপরাহ্নে ফ্রান্স

৪-১ গোলে হারাল মেক্সিকোকে। অথচ সর্বকালের অন্যতম সেরা গোলকীপার ফ্রান্সের আলেক্স থেপট খেলার দশম মিনিটে চোয়ালে লাথি খেয়ে মাঠের বাইরে চলে যান লেফট হাফ চান্দ্রেল-কে দায়িত্ব দিয়ে। আসলে ফ্রান্স তখন দারুণ শক্তিশালী। রাইট ব্যাক এটিনে ম্যাটলার-এর মত কাউকে অমন প্রাণবন্ত ফুটবল খেলতে কদাচিৎ সেকালে চোখে পড়েছে। অধিনায়ক পাইলেন, রাইট হাফ আলেক্স ভিলাপ্লেন দুর্ধর্ষ খেলেন। (আলেক্স কিছুদিন পরে নাজি-র সঙ্গে যোগাযোগ আছে—এই অভিযোগে ফ্রান্সের বিদ্রোহী বাহিনীর আততায়ী কর্তৃক নিহত হন।)

দু'দিন পরে আর্জেন্টিনার মুখোমুখী হল ফ্রান্স এবং ১-০ গোলে হারল। খেলা শেষের নয় মিনিট আগে ২০ গজ দূরের ফ্রি-কিক থেকে মণ্টি জোরালো শটে গোল করলেন এবং তিন মিনিট পরে আর্জেন্টিনার মণ্টির ট্যাক্‌লে ফ্রান্সের ম্যাসিনট খোঁড়াতে থাকে। তারপর মার্সেল ল্যাঙ্গিলার মাঠের বাইরে গেলেন। মণ্টি শুরু থেকেই নৃশংস ফুটবল খেলছিলেন। মার্সেলের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় রেফারি সদয় হলে ফল ১-১ হত। কিন্তু রেফারি এই সময় সমাপ্তির বাঁশি বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডগোলও শুরু হল। সেণ্ট্রাল পার্কের মাঠে আর্জেন্টিনার সমর্থকরা নেমে পড়লেন। ফ্রান্সের খেলোয়াড়রা ব্রাজিলিয়ান রেফারি অলমিডিয়া রেগোকে ঘিরে বলতে থাকেন এখনও ছয় মিনিট খেলার বাকি। মাঠে ঘোড়া-পুলিশ এল। রেগো আবার ঘড়ি দেখে লাইন্সম্যানদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং দু'হাত তুলে চিৎকার করে বললেন, 'ভুল হয়েছে, আমার দারুণ ভুল হয়েছে।' আর্জেন্টিনার লেফট ইন সিয়েরো তাই শুনে মূর্ছা গেলেন। খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু ফল ১-০ রয়ে গেল।

খেলা শেষে উরুগুয়ের খেলোয়াড়রা (তখন দর্শক) বললেন, যোগ্য দল হিসাবেই আর্জেন্টিনা জিতেছে। থেপট ও পাইলেন তখন কাঁধে উঠে পলায়মান। আর্জেন্টেনীয়রা উদ্যোক্তাদের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানাল এবং দেশে ফেরার হুমকী দিল।

আর্জেন্টিনার পরের খেলা মেক্সিকোর সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা থাকায় ম্যানুয়েল ফেরিরা খেলতে পারলেন না। ফেরিরার বদলে দলে এলেন তরুণ গুইলার্মো স্টাবিল। এই ম্যাচে বলিভিয়ার রেফারি ইউলিসিস সসেডো পাঁচটি পেনাল্টি দেন। ভাগ্যিস মণ্টি খেলেননি। তাহলে সংখ্যা আরও বাড়ত। অবশ্য পাঁচটির মধ্যে দুটি পেনাল্টি সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ছিল না।

স্টাবিল মেক্সিকোর বিরুদ্ধে তিনটি গোল দিয়ে পরের ম্যাচের জন্য দলে থাকার ব্যবস্থা করে নিলেন।

বিরতির দু'মিনিট পরে মন্টি আগের খেলার পুনরাবৃত্তি করলেন। চিলির লেফট হাফ টোরেস্ লাফিয়ে হেড দিতে গেলে মন্টির প্রচণ্ড লাথি খেলেন। টোরেসও বদলে লাথি মারলেন। তারপর দুই দলের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য খণ্ডযুদ্ধ। বিপাকে পড়ল পুলিশ। কেবল খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে পাঠানো হল না। উদ্যোক্তারা উপলব্ধি করলেন বিশ্বকাপের শুরুতে যখন এই, আগামী দিনে নিশ্চয়ই অনেক বড় যুদ্ধ দেখতে হবে। সকলকে সাবধান করে দেওয়া হল, প্রতিযোগিতার পরিণতি যাই হোক—এর দ্বারা দেশে দেশে মৈত্রী বাড়বে না। ৩-১ গোলে জিতে আর্জেন্টিনা সেমিফাইনালের দিকে গেল। ক্লান্ত ফ্রান্স ০-১ গোলে হারল চিলির কাছে। গোলটি দিয়েছিলেন সুবিয়াব্রে।

১৮ জুলাইয়ের আগে উরুগুয়ের দেখা মেলেনি। বোধ হয় শতবার্ষিকী স্টেডিয়ামটি ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু পেরুর বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় তারা হতাশ করল। পেরুর রক্ষণভাগ দারুণ খেলল। রোমানিয়া তাদের বিরুদ্ধে ৩ গোল দিলেও উরুগুয়ে ১ গোলেই খেলা শেষ করে এক-হাতবিশিষ্ট কাস্ত্রোর দ্বারা। উরুগুয়ে পরবর্তী ম্যাচে রোমানিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে দলে রদবদল করল। নতুন তারকা স্ক্যারোন, কাস্ত্রোর বদলে নেওয়া হল পেলেগ্রিন আনসেলমোকে এবং তৃতীয় জন পেত্রোন। বদলে কাজ হল, ৮-০ গোলে জিতল তারা।

দ্বিতীয় গ্রুপে যুগোশ্লাভিয়া প্রথম খেলায় অপ্রত্যাশিতভাবে ২-১ গোলে হারাল ব্রাজিলকে। ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা এককভাবে কুশলী হলেও দলগত-ভাবে ওরা কার্যকর ছিলেন না। এদিকে যুগোশ্লাভ দলের সঙ্গে এলেন বেক ও স্টিফানোভিক। এঁরাই সেতে-কে ফ্রেঞ্চ কাপ জয়ে সাহায্য করেছিলেন।

সিকুলিক খেলছিলেন ওই প্রতিযোগিতায় মণ্টপেলিয়ার দলে (পরবর্তী কালে তিনি যুগোশ্লাভ জাতীয় দলের ম্যানেজার হন)। ১৯৭৪ বিশ্বকাপের আগে সিকুলিকের বদলে ম্যানেজার হন টিরনানিক। টিরনানিক বেক বিরতির আগে ২-০ গোলে এগিয়ে দিলেন যুগোশ্লাভিয়াকে। ব্রাজিলের অধিনায়ক নেটো ২-১ করলেন। যুগোশ্লাভিয়া ও ব্রাজিল পরে বলিভিয়াকে ৪-০, ৪-০ গোলে হারায় এবং যুগোশ্লাভিয়া সেমিফাইনাল পর্যায়ে পৌছায়।

একইভাবে চতুর্থ গ্রুপের শীর্ষে উঠল যুক্তরাষ্ট্র দল বেলজিয়ম ও প্যারাগুয়েকে

যথাক্রমে ৩-০, ৩-০ গোলে হারিয়ে। কিন্তু সেমিফাইনালে তারা আর্জেন্টিনার কাছে ৬-১ গোলে দিশেহারা হল। উরুগুয়েও হারাল ৬-১ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে।

প্রথম সেমিফাইনালে বিরতির আগে মন্টি একটি গোল দিয়েছিলেন। বিরতির পর আমেরিকানরা আর প্রতিরোধ করেনি। শেষ তিনটি গোল হয় নয় মিনিটে। এর মধ্যে দুটি রাইট উইঙ্গার পিউসেলে-র। কিন্তু খেলার অধিকাংশ সময় কেটেছে বল ছাড়াই।

বেলজিয়ামের খ্যাতনামা রেফারি জন ল্যাঙ্গেনাস যে কোনো হিটে· আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ফাউল দিয়েছেন, আর ছুটোছুটি করছেন চিকিৎসকরা মাঠের ধারে। তাঁরা মাঠের মধ্যে ওষুধের বাক্স ছুঁড়ে দিয়েছেন। বাক্স ভেঙেছে, ওষুধের শিশি চুরমার হয়েছে, ক্লোরোফরমের তেজ লেগেছে আমেরিকানদের, আর তারা কাবু হয়েছে।

উরুগুয়ে ৬-১ গোলে যেভাবে যুগোশ্লাভিয়াকে হারাল তা লক্ষ্য করলেন ৮০ হাজার দর্শক। চতুর্থ মিনিটে সিকুলিক যুগোশ্লাভিয়াকে ১-০ গোলে এগিয়ে দিলেও উরুগুয়ের সি ও অ্যানসেলমো ২-১ করেন বিরতির আগে। যুগোশ্লাভিয়া ২-২ করে, কিন্তু সেটি অফসাইড হল। বিরতির আগে উরুগুয়ে চারটি গোল দিল।

ফাইনাল

পরের দিন ফাইনাল উরুগুয়ে—আর্জেন্টিনা। অর্থাৎ ১৯২৮ ওলিম্পিক ফাইনালের পুনরাবৃত্তি। ফাইনাল ঘিরে বুয়েনস আয়ারসেও উত্তেজনা চরমে। প্লেট নদী পেরিয়ে মন্টিভিডিও যেতে ১০ খানা নৌকো ভাড়া করল উৎসাহীরা। কিন্তু তা এতই স্বল্প যে, হাজার হাজার আর্জেন্টিনীয় সমর্থক বুয়েনস আয়ারসে আরও নৌকো দেওয়ার দাবি জানাতে থাকে। অবশেষে ফাইনালের দিন সকাল দশটায় ওরা যখন যাত্রা শুরু করল, হাজার হাজার জনতা নদীতীরে এল শুভেচ্ছা জানাতে। তারা সমস্বরে গাইতে থাকে 'আর্জেন্টিনা সি, উরুগুয়ে নো'। তারা শপথবাক্য পড়িয়ে দিল 'জয় অথবা মৃত্যু'।

মন্টিভিডিও-য় পৌঁছতেই কাস্টমস ও পুলিশ আর্জেন্টিনীয়দের তল্লাশি করে দেখতে লাগল কেউ রিভলবার বা অনুরূপ আগ্নেয়াস্ত্র এনেছে কিনা। শতবার্ষিকী স্টেডিয়ামে প্রবেশের সময়েও তল্লাশি চলল আর একদফা।

খেলা শুরুর কথা বেলা দুটোয়। কিন্তু গেট খোলা হয় সকাল আটটায়। দুপুরের মধ্যে স্টেডিয়াম পূর্ণ হল। এক লক্ষ ধরলেও দর্শকদের সুবিধা ও

নিরাপত্তার জন্য ২০ হাজার লোক বসার ব্যবস্থা হল। এছাড়া স্টেডিয়ামের উদ্বোধন দিনেও পুলিশকে জনতা নিয়ন্ত্রণে হিমসিম খেতে হয়েছিল।

জন ল্যাঙ্গেনাস রেফারি মনোনীত হলেন। কিন্তু তিনি ও দুজন লাইন-রেফারিই নিরাপত্তার গ্যারান্টি চাইলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খেলা শুরুর মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে অন্যান্য রেফারি ল্যাঙ্গেনাসকেই ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব দেন সর্বসম্মতিক্রমে। এদিকে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা দিবারাত্রি পুলিশ পাহারায়। ঘোড়া-পুলিশও তাদের কাছাকাছি। তারাই পাহারা দিয়ে ওদের মাঠে নিত অনুশীলনের সময়ে। স্টেডিয়ামের চতুর্দিকে প্রহরারত সেনাবাহিনী বেয়নেট হাতে।

খেলার আগের মুহূর্তে উভয় দল নিজেদের দেশের তৈরি বলে খেলার দাবি জানাতে থাকে (তখন এ সম্পর্কে কোন আইন ছিল না)।

যাই হোক ল্যাঙ্গেনাস মাঠে নামলেন টস করতে। উভয় দেশের সমর্থকরা তখনই বাজি ফাটাতে শুরু করেছেন। এরই মাঝে টসে জিতল আর্জেন্টিনা।

স্বদেশের মাঠে, নিজেদের স্টেডিয়ামে উরুগুয়েই ফেভারিট ছিল এবং সমর্থকও তাদের বেশি। কিন্তু পেনোগ্রিন অ্যানসেলমো সুস্থ না থাকায় তাঁর স্থলে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে নামল কাস্ত্রো। আর্জেন্টিনা ওরলিকে না পেয়ে স্ট্যাবিলকে খেলায়। তাদের ফরোয়ার্ড লাইন চমৎকার। বল কণ্ট্রোল, সুইপিং এবং বুদ্ধিদীপ্ত গতি-পরিবর্তনে দর্শকদের নজর কেড়ে নিল। কিন্তু গোলরক্ষায় তাদের সফলতা প্রকাশ পেল না। সেমিফাইনাল থেকে তাদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য অ্যাঞ্জেলো বসিওকে বসান হয়। বদলি জুয়ান বোটাগো-র মধ্যে উন্নতি দেখা গেল না।

প্রথমার্ধে বিস্ময়ের পর বিস্ময়। রাইট উইঙ্গার পাবলো ডোরাডো ত্রয়োদশ মিনিটে উরুগুয়েকে ১-০ এগিয়ে দেন। কিন্তু তার বিপক্ষের পিউসেলে ১-১ করেন। বিরতির ১০ মিনিট আগে উরুগুয়ের ব্যাক নাসাজি অফসাইডে থাকা সত্ত্বেও স্ট্যাবিলের দেওয়া গোল রেফারি গোল বলেই বাঁশি বাজালেন। ২-১ গোলে এগোল আর্জেন্টিনা। অধিনায়ক নাসাজি তীব্র প্রতিবাদ জানালেন, কিন্তু ফল হল না। ধন্যবাদ দর্শকদের, তাঁরা একটুও গণ্ডগোল করলেন না। তাঁরা রেফারিকেই মেনে নিলেন।

দর্শকরা স্টেডিয়ামকে জীবন্ত করে তুললেন বিরতির দশ মিনিট পরে। এই সময় উরুগুয়ের পেড্রো সি চমৎকার ড্রিবল দ্বারা ২-২ করেন। এর দশ

মিনিট পরে তরুণ লেফট আউট সাণ্টোস ইরিয়ার্টে এগিয়ে দিলেন ৩-২-এ। শেষ মুহূর্তে ৪-২ করলেন কাস্ত্রো বলকে ক্রশবারের গায়ের নেটে জড়িয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মোটরগাড়ির হর্ন বেজে উঠল। বেজে উঠল জাহাজগুলির ভোঁ। উড়তে লাগল পতাকা, আর চতুর্দিকে নানা রকমের ব্যাপার। পরদিন উরুগুয়ের জাতীয় ছুটি ঘোষিত হল।

ফরাসী ভাস্কর আবে লাফেয়ার ডিজাইনকৃত ৫০ হাজার ফ্রাঙ্কের সোনার কাপ অর্পণ করলেন জুল রিমে উরুগুয়ের অধিনায়ক নাসাজি-কে।

ওদিকে বুয়েনস আয়ারসের মানুষ তখন বিক্ষুব্ধ। উরুগুয়ের কনস্যুলেটে গিয়ে তারা ইট-পাটকেল ছুঁড়ল। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ ফাঁকা গুলি চালাল।

পুল—১

ফ্রান্স—৪ (লরেণ্ট, ল্যাঙ্গিলার, ম্যাসিণ্ট-২) — **মেক্সিকো—১** (ক্যারেনো)

বিরতি ৩—০

আর্জেণ্টিনা—১ (মণ্টি) — **ফ্রান্স—০**

বিরতি ০—০

চিলি—৩ (ভিডাল, সুবিয়াব্রে-২) — **মেক্সিকো—০**

বিরতি ১—০

আর্জেণ্টিনা—৬ (স্ট্যাবিল-৩, ভারালো-২, জুমেলজু) — **মেক্সিকো—৩** [লোপেজ, রসাস(এফ), রসাস (এস)]

বিরতি ৩—০

আর্জেণ্টিনা—৩ [স্ট্যাবিল-২, এভারেস্টো (এম)] — **চিলি—১** (সুবিয়াব্রে)

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
আর্জেণ্টিনা	৩	৩	০	০	১০	৪	৬
চিলি	৩	২	০	১	৫	৩	৪
ফ্রান্স	৩	১	০	২	৪	৩	২
মেক্সিকো	৩	০	০	৩	৪	১৩	০

পুল—২

যুগোশ্লাভিয়া—২ (টিরনানিক, বেক) **ব্রাজিল—১** (নেটো)

বিরতি ২—০

যুগোশ্লাভিয়া—৪ (বেক-২, মেরিয়ানভিক, ভুজাডিনোভিক) **বলিভিয়া—০**

বিরতি ০—০

ব্রাজিল—৪ (ভিসিনটেনার-২, নেটো-২) **বলিভিয়া—০**

বিরতি ১—০

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
যুগোশ্লাভিয়া	২	২	০	০	৬	১	৪
ব্রাজিল	২	১	০	১	৫	২	২
বলিভিয়া	২	০	০	২	০	৮	০

পুল—৩

রোমানিয়া—৩ (স্টসিন-২, বারবু) **পেরু—১** (সোজা)

বিরতি ১—০

উরুগুয়ে—১ (কাস্ত্রো) **পেরু—০**

বিরতি ০—০

উরুগুয়ে—৪ (ডোরাডো, স্ক্যারন, অ্যানসেলমো, সী) **রোমানিয়া—০**

বিরতি ০—০

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
উরুগুয়ে	২	২	০	০	৫	০	৪
রোমানিয়া	২	১	০	১	৩	৫	২
পেরু	২	০	০	২	১	৪	০

পুল—৪

যুক্তরাষ্ট্র—৩ **বেলজিয়াম—০**

(ম্যাকঘি-২, প্যাটেন্যুডে)

বিরতি ২—০

যুক্তরাষ্ট্র—৩ **প্যারাগুয়ে—০**

(প্যাটেন্যুডে-২, ফ্লোরি)

বিরতি ২—০

প্যারাগুয়ে—১ **বেলজিয়াম—০**

(পেনা)

বিরতি ১—০

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
যুক্তরাষ্ট্র	২	২	০	০	৬	০	৪
প্যারাগুয়ে	২	১	০	১	১	৩	২
বেলজিয়াম	২	০	০	২	০	৪	০

সেমি-ফাইনাল

আর্জেন্টিনা—৬ (বিরতি ১—০) **যুক্তরাষ্ট্র—১**

(মণ্টি, স্কোপেলি, স্ট্যাবিল-২, পিউসেলে-২,) (ব্রাউন)

বোটাসো ; ডেলা টোরে, প্যাটারনোস্টার ; এভারিস্টো, মণ্টি, অরল্যাণ্ডিনি ; পিউসেলে, স্কোপেলি, স্ট্যাবিল, ফেরিরা (অধিনায়ক), ও এভারিস্টো।

ডগলাস ; উড, মুরহাউস ; গ্যালাছের, ট্রাসে, আউল্ড ; ব্রাউন, গনসালভেজ, প্যাটেন্যুডে, ফ্লোরি (অধিনায়ক) ও ম্যাকঘি।

উরুগুয়ে—৬ (বিরতি ৩—১) **যুগোশ্লাভিয়া—১**

(সি-৩, অ্যান্সেলমো-২, ইরিয়ার্ট) (সিকিউলিক)

ব্যালেসটেরোস ; নাসাজ্জি (অধিনায়ক), ম্যাসেরণি ; আন্দ্রাদে, ফার্ণাণ্ডেজ, গেষ্টিডো ; ডোরাডো, স্কারোন, অ্যান্সেলমো, সি ও ইরিয়ার্ট।

ইয়াভোকিক ; ইভকোভিচ (অধিনায়ক), মিলহাইলভিক , আর্সেনিজেভিক, ষ্টিফানোভিক, যোকিক , টির্ণানিক, মেরিয়ানেভিক, বেক, ভুজাডিনিভিক ও সিকিউলিক।

ফাইনাল (মন্টিভিডিও-তে ৩০ জুলাই, দর্শক একলক্ষ)

উরুগুয়ে—৪ (বিরতি ১—২) **আর্জেন্টিনা—২**

(ডোরাডো, সি, ইরিয়ার্ট ও কাস্ত্রো) (পিউসেলে, স্ট্যাবিল)

ব্যালেস্টেরোস ; নাসাজি (অধিনায়ক), ম্যাসেরনি ; আন্দ্রাফে, ফার্ণাণ্ডেজ, গেষ্টিডো ; ডোরাডো, স্ক্যারোন, কাস্ত্রো, সি ও ইরিয়ার্ট।

বোটাসো ; ডেলাটোরে, প্যাটারনস্টার ; এভারিস্টো, মন্টি, সুয়ারেজ ; পিউসেলে, ভারালো স্ট্যাবিল, ফেরিয়া (অধিনায়ক) ও এভারিস্টো।

ইতালি
১৯৩৪



বিজয়ী ইতালির ব্যাজ

১৯৩৪-এর বিশ্বকাপ ফুটবলের গুরুত্ব বেড়ে গেল, তাই তোড়জোড়ও তেমনি। প্রতিদ্বন্দ্বিতাও প্রথমবারের অপেক্ষা অনেক। কিন্তু সকলে বিস্মিত হলেন, গতবারের চ্যাম্পিয়ান উরুগুয়ে খেলতে না আসায়। উরুগুয়ের নাকি আশঙ্কা ছিল—ইউরোপে গেলে তার বিজয়ী আখ্যা বজায় থাকবে না। অন্য কারণও কম ছিল না। গতবারের বিশ্বকাপে না যাওয়ার জন্য ইউরোপের দেশগুলি দল বেঁধেছিল, এবার উরুগুয়ে একাকী বিশ্বকাপের বাইরে রইল। বিশ্বকাপ নিয়ে তারা রা কাড়লই না।

ইতালি বিশ্বকাপের সফল আয়োজনে উঠে-পড়ে লাগল। দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ফুটবলে বিজয়ীও হল তারা। সব কিছুর মূলে ছিলেন রেফারি জন ল্যাঙ্গেনাস।

অধিকাংশ দেশ বলল, খেলাধূলা ঘিরে এমন হুলুস্থুল ও বিপর্যয়কর ব্যাপার এতাবৎ হয়নি। তাদের অভিযোগ, খেলার পরিবেশ অনুকূল ছিল না। গোটা চ্যাম্পিয়ানশিপ ঘিরে শুধু ইতালির গন্ধ।

উদ্যোক্তারা তো সব সময়েই আশা করেন, তাঁরা সফল হবেন। কিন্তু তাঁদের সাফল্যের জন্য সকলে পথ ছেড়ে দেয় কি ?

মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট প্রশাসন পূর্ণ সমর্থন জানাল। বলা হল বিশ্বকাপ সুষ্ঠুভাবে যেন হয়, অতিথিদের যেন যথাযথ সুবিধা দেওয়া হয়। ইতালির দল 'আজুরি'কে (নীল) বলা হত মুসোলিনীর আজুরি। 'ডুচে' (মুসোলিনী) নিজেই ইয়টিং ক্যাপ পরে রোমের স্টেডিও টোরিনো-য় (তুরিনো স্টেডিয়াম) হাজির হতেন তাদের সঙ্গে। ইতালির 'কমিশারিও টেকনিকো' ভিট্টোরিও পোজো বিশ্বকাপের সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হলেন। তিনি

দেখলেন, বিশ্বকাপ ঘিরে সারা দেশে প্রচণ্ড সাড়া। বিশ্বকাপ শেষে পোজো সবার প্রিয় হলেন কাপ প্রতিযোগিতা অসম্ভব রকম সফল হওয়ায়।

পোজো নিজের স্বাধীনতা অপেক্ষা অপরের কর্তৃত্ব স্বীকারে সদাব্যস্ত ছিলেন। তাঁরই মত আর একজনকে দেখা গেল। তিনি অস্ট্রিয়ার হুগো মিজ্‌ল। মিজলও পোজোর মত ইউরোপীয় ফুটবলের অন্যতম প্রবক্তা। তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল আরসেনাল-এর অন্যতম সংগঠক ইয়র্কশায়ার-এর হার্বার্ট চাপম্যানের। ফাইনাল হওয়া উচিত ছিল মিজ্‌ল-এর ওয়াণ্ডারটিম ও ইতালির সঙ্গে। মিজ্‌লের দল আপাতত: আগের মত তুঙ্গে না থাকলেও তাদের সুনাম কমেনি। বিশ্বকাপের খেলা শুরুর কয়েকমাস আগে তারাই ইতালিকে ৪-২ গোলে হারিয়েছিল তুরিণ-এ। বিশ্বকাপে আবার এরা মিলিত হয় সেমিফাইনালে।

বিশ্বকাপে এবার খেলা হল ১৬টি দল নিয়ে নক-আউট পদ্ধতিতে প্রথম রাউণ্ডে। অর্থাৎ প্রথম রাউণ্ডে হারলে আট হাজার মাইল দূর থেকে আসা ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাকে একটি ম্যাচের পরেই চলে যেতে হবে। নক-আউট ছাড়াও কোয়ালিফাইং প্রতিযোগিতা ছিল। মিলানের সেই খেলায় ইতালি হারায় গ্রীসকে। ট্রিস্টিনিয়ার নিরিও রকো (পরবর্তীকালে মিলানের ম্যানেজার) স্বদেশের পক্ষে ওই একটি ম্যাচেই খেলেন। ফাইনালের প্রথম রাউণ্ডের খেলাগুলি হয় ট্রিয়েস্ট, ফ্লোরেন্স, তুরিণ, জেনোয়া, মিলান, বলোগনা ও নেপলসে।

স্টকহোম্‌-এ ১৯৩২ সালের কংগ্রেসেই ইতালিকে ১৯৩৪ সালের বিশ্বকাপের দায়িত্ব দেওয়ার কথা স্থির হয়। সকলেই উপলব্ধি করেন :

(ক) বিশ্বকাপের খেলাগুলি একটিমাত্র শহরে সীমিত থাকা উচিত নয়।

(খ) যাদের উপযুক্ত লোক ও অর্থবল নেই, তেমন কোনো দেশকে যেন দায়িত্ব দেওয়া না হয়।

১৯৩০ সালে উরুগুয়ে প্রত্যেককে খরচ দিয়েছিল এবং তারপরেও লাভ করে। সকলেই তাই প্রথমবারের সুযোগের কথা উত্থাপন করলেন। ইতালীয় ফেডারেশনের পক্ষ থেকে তাদের পাঠানো ডেনিগেল মাউরো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন : আমরা সব খরচ দেব। লোকসান হলেও কোনো ব্যবস্থা বা সুষ্ঠু আয়োজনের ত্রুটি হবে না। ইতালির চমৎকার স্টেডিয়াম, বিলাসবহুল শহরগুলিতে অতিথিদের আপ্যায়নের যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে।

ইতালিতে এতবড় প্রতিযোগিতার আয়োজনে অক্লান্ত কর্মী মাউরো-র সঙ্গে রইলেন উৎসাহী এঞ্জিনীয়ার বরাসী। ফ্যাসিস্ট সরকারও বললেন : ভয় নেই, সঙ্গে আমরা আছি।

ইতালি ও পোজো

বিচক্ষণ ও মনস্তত্ত্ববিদ পোজো তাঁর দলের মেজাজী খেলোয়াড়দের প্রথমে লাগো ম্যাগগয়ারে এবং সেখান থেকে রভেটা-য় গিয়ে দেখলেন প্রত্যেকেই বেশ শান্ত এবং চলাফেরায় নির্দোষ। তার আগে ইতালি ফুটবল চ্যাম্পিয়ানশিপে ইণ্টার ও জুভেণ্টাস-এর খেলোয়াড়দের মধ্যে দারুণ রেষারেষি ছিল এবং বেশ তিক্ততা দেখা দেয়। পোজো এই সেরা দুইদলের খেলোয়াড়দের (যাঁরা জাতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন) নিয়ে সেইখানে ওই মতদ্বৈধতা অপনোদনে প্রয়াসী হলেন। বিবদমান খেলোয়াড়দের তিনি একই ঘরে রাখলেন। খেলোয়াড়রা ওই নিয়ে পোজো-র কাছে অভিযোগ করলেন। তিনি জানালেন, 'ওসবই আমার জানা। কিন্তু আমি সকলের মধ্যে টিম-স্পিরিট আনতে চাইছি। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ একজন আর একজনের শত্রু নয়।'

পরদিন সকলে পোজো তাঁর খেলনা ভালুকটিকে নিয়ে খেলোয়াড়দের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে নরমাংসভোজীরা, তোমরা কী একে অপরকে খেয়ে ফেলেছ ?' খেলোয়াড়দের মধ্যে তখন ফিসফিসানি। একজন অপরজনকে দেখিয়ে বললেন : 'ও অত বাজে লোক নয়। আসলে জনসাধারণই আমাদের মধ্যে বৈরী মনোভাব সৃষ্টি করেছে।'

পোজো 'নষ্ট' খেলোয়াড়দের সম্পর্কে নানারকম চাতুরি প্রয়োগ করতেন। আবার রেফারির বাঁশি হাতে থাকলে অসম্ভব দৃঢ় হতেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন, 'আমি যদি ওদের ভুল করার সুযোগ দিই, আমি কর্তৃত্ব হারাবো।' পোজো-র ধারণা ছিল ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের সম্মিলিতভাবে উপদেশ বা নির্দেশ দিতে হবে, কিন্তু ইতালীয়দের সম্পর্কে ব্যাপারটি হবে পৃথক-ভাবে। তাদের বোঝাতে হবে আমি তাঁদের দিকেই।

খর্বকায় অ্যাথলীট চেহারার পোজো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সুইজারল্যাণ্ডে পড়াশুনা করতেন। তারপর চলে আসেন ইংল্যাণ্ডে এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকলে বাড়ি (ইতালি) থেকে সাহায্য আসা বন্ধ হয় এবং মিডল্যাণ্ডে ইংরাজি পড়িয়ে দিন কাটাতে থাকেন। ইতিমধ্যে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের খেলা তাঁকে মুগ্ধ করল (পরবর্তীকালে ইতালি দল গঠনে ম্যাঞ্চেস্টার

ইউনাইটেডই তাঁর আদর্শ ছিল)। পরিচয় হল তাদের বিখ্যাত অ্যাটাকিং সেণ্টার হাফ চার্লি রবার্টস ও দুর্ধর্ষ গোলদাতা স্টিভ ব্লুমার-এর সঙ্গে।

কিছুদিন না কাটতেই পোজো-র বাড়ি থেকে ইংল্যাণ্ডে খবর গেল রিটার্ণ টিকিট সহ, 'বাড়িতে বিয়ে আছে'। আসলে বিয়ের ব্যাপারটা মিথ্যে, তাই পোজো বাড়ি ফিরতেই আটকে রাখা হল তুরিণে। পোজো বেঁচে থাকা অর্ধেক টিকেট কাছেই রেখে দিলেন। বাড়ির চাপে ইংল্যাণ্ডে ফেরা হল না। সুযোগ পেয়ে স্বদেশে সাহায্য করলেন তুরিণো ফুটবল ক্লাব গড়ায়। তারপর সম্পাদক হলেন ইতালীয় ফুটবল ফেডারেশনের। ১৯১২ সালে শেষ মুহূর্তে স্টকহোম ওলিম্পিকসে গেলেন দল নিয়ে। অস্ট্রিয়া যখন ৫-১ গোলে ইতালিকে হারাল, পোজো চিনলেন হুগো মিজ্‌লকে।

যাই হোক, ইতালির বিশ্বকাপের বছর পাঁচেক আগেই ইংল্যাণ্ডে তিনব্যাকে খেলার প্রচলন হয়। ইউরোপের অন্যত্র এই পদ্ধতি অপরিচিত থাকলেও জার্মানরা তিনব্যাকে খেলত। পোজো ভাবলেন, উরুগুয়ে যদি না আসে, আর্জেন্টিনা যদি দুর্বল দল পাঠায়, ইতালিকে জিততে তেমন বেগ পেতে হবে না। তাঁর লক্ষ্য হল ইতালির অধীনস্থ বিদেশী খেলোয়াড়দের দিকে। আর্জেন্টিনার মণ্টি, ওরিস তখন ইতালির সেনাবাহিনীতে রয়েছেন। পোজো বললেন, যদি তারা ইতালির জন্য জীবন দিতে পারে, তবে তাদের পক্ষে খেলতে বাধা কোথায়? আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময় বিশ্বকাপের উইঙ্গার আর্জেন্টিনার গাইতা রয়েছেন আর্মি মেডিকেল কোরে। পোজো দল গঠনে উঠে-পড়ে লাগলেন। সেণ্টার হাফে মণ্টিকে সাহায্যের জন্য আট্রিলিও ফেরারিস (৪) কে রাখলেন, যদিও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন না। তিনি পোজোর ভক্ত ছিলেন, তাই বোমে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন পোজো-কে :

—আমার কী আগের মত সামর্থ্য আছে?

—নিশ্চয়ই, তুমি যদি ভাল খেলতে পার আমার তো বলার নেই কিছু!

—আমি এখন দিনে ৩০ থেকে ৪০টি সিগারেট খাই।

—আস্তে আস্তে কমাও।

—চেষ্টা করব। বললেন ফেরারিস।

—দেখা যাক। পোজোর মন্তব্য।

গোলে তখন অন্যতম সেরা কারলো সিয়েসলি-র পরিবর্তে প্রবীণ গিয়ামপিরো কম্বিকে নেওয়া হল। কারণ পর্বত ও অরণ্যময় ফিওরেলটিনার

স্টেডিয়ামে সিরেসলি একদিন ট্রেনিং-ক্যাম্প চলাকালে দারুণভাবে গোল বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বা বাঁ-হাত ভাঙেন। প্রবীণ কম্বি তাঁকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। কাছেই ছিলেন পোজো। কম্বি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, সব দায়িত্ব তা হলে আমাকেই নিতে হবে এবার ?

জাতীয় দলের ৫৯টি ম্যাচের অভিজ্ঞ লেফট ব্যাক ক্যালিগারিস বাদ পড়লেন তরুণ আলিমেণ্ডি দলভুক্ত হওয়ায়। অনুরূপ অভিজ্ঞ ভিরি রসেটার বদলে এলেন মনজেগলিও। ক্যালিগারিসের দুঃখ, অত ম্যাচে খেলার তাঁর রেকর্ড ম্লান করবে ইণ্টারের তরুণ মিজ্জা। মিজ্জার 'স্কিল' ও 'পাওয়ার' ছিল অভাবনীয়। ক্যালিগারিসের রেকর্ড অবশ্য তখনও ভাঙেনি। ১৯৩০ সালে ৫৯টি ম্যাচে খেলে তা ম্লান করেন আর একজন লেফট ব্যাক—গিয়াসিনতো ফ্যাচেত্তি।

রভেটায় একমাত্র অভিযোগ ওঠে ময়ূরের ডাক নিয়ে। ওরা বড্ড বিরক্ত করত।

অস্ট্রিয়া ও মিজ্‌ল

মিজ্‌ল ঠিক পোজোর মত না হলেও তাঁর মতই দলের উপর প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। ইতালি দলে মিজ্জা, ওরসি, ফেরারির মত শক্তিধর, দীর্ঘকায়, বলবান ও শিল্পী ফুটবলার ছিলেন। চার্লি রবার্টসকে দেখে পোজোর ইচ্ছা জাগে তাঁর দলে অনুরূপ শক্তিধর সেণ্টার হাফ থাকুক, যে বল সুইং করে উইঙ্গারদের কাছে পাঠাবে। পেলেনও। লুইসিটো মণ্টিকে রবার্টের অপেক্ষাও কার্যকর মনে হল। তবে তিনি অষ্ট্রিয়ার সেণ্টার ফরওয়ার্ড মাথিয়াস সিণ্ডেলারকে ঘৃণার চোখে দেখার সুযোগ পেলেন না। তাঁর আগমনে ইতালির জনপ্রিয় সেণ্টার হাফ ফুলভিও বার্ণার্ডিনি দল থেকে বাদ পড়ে গেলেন। মণ্টি যেমন ইতালির, তেমনি লম্বাটে সিণ্ডেলার অষ্ট্রিয়ার মধ্যমণি। সিণ্ডেলার ভিয়েনা স্কুলে পড়ার সময়েই শান্ত মেজাজের ছিলেন, আন্তর্জাতিক প্রতি-যোগিতায় এসেও তাঁর সে মেজাজ আজও শান্ত। কিন্তু তিনি মিজ্‌লের অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত, উৎসাহিত হলেন কোচ জিমি হোগান কর্তৃক। সিণ্ডেলার চমৎকার বল কণ্ট্রোল, নয়নাভিরাম মুভমেণ্টগুলি মণ্টিকে যেন কিছুটা ম্লান করছিল। তবে বয়সের ভারে নত হলেও একাগ্রতা ও কঠোর ট্রেনিং দ্বারা মণ্টির আগের খেলা ফিরে আসে। মণ্টি যখন সিণ্ডেলারকে খেলার মাঠে দেখতেন, মনে হত, লাল কিছু তাঁর সামনে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে একবার মণ্টি দারুণ আঘাত করেন সিণ্ডেলারকে।

ফুটবলে মিজ্‌লে-র আকর্ষণ ছিল দুর্বার। আর এই কারণেই তাঁর বাবা তাঁকে ট্রিয়েস্টে নির্বাসন দেন। কিন্তু তাতে মিজ্‌লে-র ফুটবলপ্রীতি কমেনি। মিজ্‌ল ভিয়েনার সেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই চললেন। তিনি হোগান-কে ভিয়েনায় এবং তাঁকে বড় কোচ হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন। পরবর্তীকালে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর বিভিন্ন জয়ে হোগানের অবদানই ছিল সর্বাধিক। ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা থেকে হোগান স্কটিশ পদ্ধতিতে প্রধানত ছোট পাসের খেলায় বিশ্বাসী ছিলেন। মিজ্‌লও তাই। কিন্তু বড় রকমের সমস্যা দেখা দেয় কয়েক বছর না কাটতেই, বিশ্বযুদ্ধের পরে। নুরেনবার্গে দক্ষিণ জার্মানির কাছে পর্যুদস্ত হল অস্ট্রিয়া। সেখান থেকে ১৫ ঘণ্টা লাগল দেশে ফিরতে। এই দীর্ঘ সময়ে মিজ্‌ল ও তাঁর দলের খেলোয়াড়রা নিজেদের স্টাইল নিয়ে আলোচনা করলেন এবং সবশেষে স্থির হয় 'আমরা নির্ভুল'। ওয়াণ্ডারটিমের (Wunderteam) পত্তন হল।

১৯৩২ সালে এই দল খেলতে গেল চেলসিতে এবং শক্তিশালী ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দারুণ লড়ল। ইংল্যাণ্ড অবশ্য ৪-৩ গোলে জেতে। সিণ্ডেলার ও স্মিমষ্টিক—অধিনায়ক ও অ্যাটাকিং সেণ্টার হাফ; জিসেক, স্যাল, সেজতা রুডি হিডেন চমৎকার খেললেন।

কিন্তু অস্ট্রিয়ার পক্ষে ১৯৩৪ সালটা ভাল গেল না। গোটা দলই যেন ক্লান্ত ছিল। তবুও মিজ্‌ল সদলে ইতালি এলেন পোজ্জো-র প্রতি শ্রদ্ধাবশত। সাংবাদিক ও প্রাক্তন অস্ট্রিয়ান গোলরক্ষক উইলিকে মিজ্‌ল বললেন: আমাদের কোনো আশা নেই। জানালেন, ইংল্যাণ্ডের অন্তত একজনকে অর্থাৎ আর্সেনালের ফরওয়ার্ড ক্লিফ বাসটিনকে যদি অস্ট্রিয়া পায় তবে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ তাদেরই হবে।

উদ্বোধনী খেলা

চূড়ান্ত পর্বের খেলার আগে হল বাছাই পর্ব। প্রথম খেলায় ১৯৩০ সালের সেমিফাইনালিস্ট যুক্তরাষ্ট্র জিতল গতবারের পুরনো দু'জনকে নিয়ে। কিন্তু পরবর্তী খেলায় একই তুরিণো স্টেডিয়ামে ৭-১ গোলে হারে ইতালির কাছে। গোল দিলেন শিয়াভিও-৩, ওরসি-২, মিজ্জা ও ফেরারি। ডনেলি নিজের আশা পূরণ করেন আমেরিকানদের পক্ষে গোলটি দিয়ে। চূড়ান্ত পর্যায়ে গেল ৩২টি দল। এর মধ্যে ইউরোপের—২২, আমেরিকার—৮; এশিয়া ও আফ্রিকার একটি করে। ব্রিটেনের কাউকে দেখা গেল না।

দক্ষিণ আমেরিকার দুটি দলই নামার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিল। জেনোয়ায়

স্পেন ব্রাজিলের বিরুদ্ধে বিরতির আগে ৩-১ এগিয়ে ছিল, শেষ পর্যন্ত ওই ফলই থাকে। ব্রাজিলের ফুলব্যাক ছিল না। তারা অবিন্যস্ত ফুটবল খেলল। সেণ্টার ফরওয়ার্ড লেওনিডাসের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় চার বছর পরে। সেকালের পেলে—সিলভা ও ডে ব্রিট্টো চমৎকার খেলেন। ব্রাজিলের একমাত্র গোলদাতা ছিলেন সিলভা। কিন্তু নার্ভাস ব্রিট্টো স্পেনের ব্যাক কুইনকোসেস-এর ফাউল থেকে প্রাপ্ত পেনাল্টিতে গোল দিতে পারলেন না।

আর্জেন্টিনা ৩-২ গোলে হারল সুইডেনের কাছে। আর্জেন্টিনা দলে তাদের ১৯৩০ সালের কাউকে দেখা গেল না। বরং গতবারের মণ্টি খেললেন ইতালির পক্ষে। অবশ্য খেলার শুরুতে ২৫ গজ দূরের ফ্রি-কিক থেকে বেলিস ১-০ এগিয়ে দেন আর্জেন্টিনাকে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে সুইডেনের খেলোয়াড়রা আহা-মরি কিছু না হলেও টিমওয়ার্কে আর্জেন্টিনাকে হারাল। তারা বেশি কাজে লাগায় উইঙ্গারদের। আর্জেন্টিনার চমৎকার বল-প্লেয়ার গালাটিও পাঁচজনকে কাটিয়ে গোলের কাছে পৌছান। বিরতির পরে ওইভাবে দৌড়ে গোলও করেন। কিন্তু তারাই হারল গোলরক্ষার দুর্বলতায়। ফ্রেসি ফস্কালেন ব্রোসেনে-র লব। সুইডেনের মুঠোয় খেলা এল এবং সমাপ্তির ১০ মিনিট আগে ক্রুন জয়সূচক গোলটি দিলেন।

তুরিণে ফ্রান্স সর্বাপেক্ষা বিস্মিত করল অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দারুণ খেলে। দেখাল উরুগুয়েতে তারা যা খেলেছিল, এখানেও তার ঘাটতি তো নেই-ই, বরং কাপ জেতার লড়াইও করতে পারে। তাদের দলের গোলে এখন আলেক্স থেপট এবং ফুলব্যাক আছেন ম্যাটলার। আর অস্ট্রিয়া জিতল শুধু কপাল জোরে। তাও অতিরিক্ত সময়ে বিতর্কিত গোলে। শ্যাল জয়সূচক গোল দিলেও তিনি অফসাইডে ছিলেন। নিজেও তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু ডাচ রেফারি ভ্যান মুর্সেল গোলের বাঁশিই বাজান। ফরাসী সমালোচকরা বললেন : সুইজারল্যাণ্ডের কাছে স্বদেশের (হল্যাণ্ডের) হারে রেফারির মন ভাল ছিল না। ফ্রান্স—অস্ট্রিয়ার খেলা পরিচালনায় তারই প্রভাব পড়ে। অতিরিক্ত সময়ে অস্ট্রিয়া ২-১ গোলে জেতে। ফ্রান্সের একমাত্র গোল করেন আহত সেণ্টার ফরওয়ার্ড জিন নিকোলাস।

জিতলেও মিজ্‌ল যা ভেবেছিলেন তাই হল। অস্ট্রিয়া ক্লান্ত, আশাহত।

জার্মানরা সবচেয়ে প্রস্তুতি নিয়ে খেলতে আসে। ৪৮ জনের সম্ভাব্য মূল দল থেকে বাছাই হয় চৌকস ফ্রানৎজ শেপানের অধিনায়কত্বে। বেলজিয়াম—

জার্মানী খেলা ফ্লোরেন্সে। শুরুতে বেলজিয়াম বিপর্যস্ত করল জার্মানীকে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর তারা বিপদ কাটাতে সক্ষম হল।

বেলজিয়ামের পক্ষে বিরতির আগে দুটি গোল দেন ভুরহুফ। বিরতির আগে ২-১ গোলে এগিয়ে তারা। বিরতির পরে জার্মানরা হঠাৎ জ্বলে উঠল যেন। সেণ্টার ফরওয়ার্ড কোলেন হ্যাটট্রিক করলেন, তাঁর দল ৫-২ গোলে বিজয়ী হল।

ট্রিয়েস্ট-এ সুগঠিত চেকোশ্লোভাকিয়া জিতল তাদের প্রাচীন গোলরক্ষক ফ্রান্টিসেক প্লানিকার নেতৃত্বে। রোমানিয়া সর্বাধিক বাধা পায় তাঁর কাছেই। প্লানিকা দুটি অবধারিত গোল বাঁচান। ডোবাই খেলা শুরুর ১১ মিনিটের মধ্যে রোমানিয়াকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার গোল-তৃষ্ণার্ত লেফট উইঙ্গার পাক ও বিপজ্জনক লেফট্ ইন নেজলি বিরতির পর সমুচিত জবাব দিলেন। অবশ্য তাঁদের জয়সূচক গোলটি হয়েছিল নেহাৎ কপাল জোরে। একটি বল বাউন্স হতেই নেজলি ধরে ফেলেন।

নেপলসে হাঙ্গেরি আশ্চর্য করে ৪-২ গোলে মিশরকে হারিয়ে। ১৯২৪-এর ওলিম্পিকসে মিশরের কাছে ৩-০ পরাজয়ের পর এই জয় দ্বারা তাদের কিছুটা ক্ষতিপূরণ হল। হাঙ্গেরি শুধু কুশলতায় নয়, আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত করেছিল, যদিও তাদের জাত-খেলোয়াড় সেণ্টার ফরওয়ার্ড ডঃ জর্জ সারোশি খেলেননি।

মিলানে সুইজারল্যাণ্ড ৩-২ গোলে হল্যাণ্ডকে হারায়। এই ম্যাচে দর্শনীয় গোল দেন সুইস দলের চশমা-পরা সেণ্টার ফরওয়ার্ড কিয়েলহোল। একটি বল মাটিতে পড়ে লাফাতেই তিনি তাকে ঘুরিয়ে জোরালো সট মারেন।

দ্বিতীয় রাউণ্ড: দ্বিতীয় রাউণ্ডে দুটি খেলা সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। ফ্লোরেন্সে ইতালি—স্পেন ও বলোগনায় দুই পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রিয়া—হাঙ্গেরি।

সমগ্র ইতালি জুড়ে প্রতিটি কাফেতে, রেস্তোরাঁয়, মদের আড্ডায় ৩৩ বছরের জামোরাকে নিয়ে নানা গল্প, কাহিনী ও আশার গুলজার। জিব্রাল্টার পাহাড়ের মত একদা অপ্রতিরোধ্য ছিলেন তিনি। ইতালিরও প্রধান বাধা। কিন্তু এবার ফ্লোরেন্সে কেমন খেলবেন? জামোরা এখন কিছুটা বুড়িয়ে গেছেন। তা না হলে দেখিয়ে দিতেন খেলা কাকে বলে। ১৯২৪ সালে প্যারিস ওলিম্পিকসের আগে জামোরা এক সাংবাদিকের কাছে বলছিলেন: আমরা তো জিতছিই! এবার সেই সাংবাদিককে বললেন জামোরা: কে জিতবে

জানি না। আমার কোনো ধারণাই নেই। কে-ই বা বলতে পারে কে জিতবে!

খেলার দিন জামোরা জীবনের সেরা ম্যাচ খেললেন। কিন্তু ইতালির ফরওয়ার্ডরা তাঁকে এমন মেরে খেললেন যে, রিপ্লে ম্যাচে তাঁরা (স্পেন) এঁটে উঠতে পারলেন না। অথচ ১২০ মিনিট নৃশংস ইতালীয় আক্রমণকে তিনি তোয়াক্কা করেননি। সবচেয়ে আশ্চর্য ছিল সুইস রেফারি মারসেট-এর পরিচালনা। সব কিছুই তিনি এড়িয়ে যাচ্ছিলেন কেন বোঝা গেল না। পরবর্তীকালে ওই পরিচালনার খেসারত হিসাবে তাঁকে সাসপেণ্ড হতে হয় নিজ দেশের ফেডারেশন কর্তৃক।

বিরতির আগে ইতালি পেয়েছিল ১৬টি কর্ণার কিক এবং স্পেন ৬টি। একটি বাদে প্রতিটি কর্ণার বাঁচান জামোরা। ওই একবার কুইনকোসেস গোল লাইনের উপর থেকে শট ফিরিয়ে দেন। যদি কেউ বলেন, সেদিন স্পেন খেলেছিল ড্রয়িংরুম ম্যাচ। তবে তা যথার্থ হবে না। নানা ঘটনার একটি উদাহরণ দিই: কুইনকোসেস ও তাঁর সতীর্থ ফুলব্যাক একবার ইতালির ওরসিকে স্যাণ্ডউইচড করতে প্রয়াসী হন। ওরসি বুঝতে পেরে লাফিয়ে ওঠেন এবং পরক্ষণেই দেখা যায় স্পেনীয় দুজন ধরাশায়ী পরস্পরের সংঘর্ষে। নিজের ভাষায় চিৎকার করে ওঠেন রাইট ব্যাক 'আই, মি মাদ্রে'!

স্পেন ১-০ গোলে এগিয়ে থাকায় ইতালি কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ল। সেণ্টার ফরওয়ার্ড ল্যাঙ্গারা ফ্রি-কিক্ নিতে প্রস্তুত। কিন্তু বক্রভাবে ছুটে গিয়ে রিগুইয়েরো ভুল কিক্ করলেন। আর এই ভুল সটের কাছে পরাস্ত হলেন ভুল-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ইতালির গোলরক্ষক কম্বি। (গোলদাতা এই রিগুইয়োর-র ছেলেকে মেক্সিকো ওলিম্পিকসে দেখা যায় ১৯৬৮ সালে)।

বিরতির এক মিনিট পরে সৌভাগ্যক্রমে ইতালি ১-১ করল। আর একটি ফ্রি-কিক্ করল স্পেন। এদিকে জামোরাকে বাধা দিয়েছেন ইতালির শিয়াভিও। জামোরা বলটি ছোঁয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারলেন না। সেটি কাজে লাগালেন ফেরারি।

অতিরিক্ত সময়ে পোজো এগিয়ে গেলেন নিজদলের খেলোয়াড়দের কাছে। নানা কথায় উজ্জীবিত করলেন শিয়াভিও ও গাইতাকে। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হল না। খেলা শেষে পোজো একে একে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে হোটেলে তাঁর কক্ষে ডেকে পাঠালেন। পরদিন রিপ্লে ম্যাচে পোজো তিনটি পবিবর্তন

করলেন এবং চাইলেন কিছু স্বেচ্ছাসেবক। পিজিওলো-র পা ভাঙায় ফেরারিকে সুযোগ দেওয়া হল। ডে মারিয়া ও বোরেল গোটা প্রতি-যোগিতার একটি ম্যাচে খেলার সুযোগ পেলেন। স্পেন আগের ম্যাচের মাত্র চারজনকে খেলাতে পারল। জামোরার বদলে তরুণ নগুয়েট এলেন। চতুর্থ মিনিটে লেফট উইঙ্গার বুশ দারুণ আঘাত পেলেন।

বল আকাশে থাকলে মিজ্জা সর্বদা বিপজ্জনক। আট মিনিট পরে হলও তাই। ওরসি-র উঁচু সটের কর্ণার কিকে হেড দ্বারা মিজ্জা বল গোলে প্রবেশ করালেন। ইতালি সেমিফাইনালে গেল। নবাগত নগুয়েট চমৎকার খেললেন। কিন্তু জামোরা শুধু মাঠে থাকলেই গোটা দল যে অদম্য শক্তি পায়, তা থেকে বঞ্চিত হল। তারা মানসিকতায় দুর্বল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে অবশ্য স্পেন সুযোগ পেয়েছিল—মণ্টি কিছুক্ষণের জন্য শক্তিহীন হওয়ায়। কিন্তু ইতালি কোনক্রমে রক্ষা পায় এবং শক্তিও ফিরে আসে।

বলোগনা-য় হুগো মিজ্‌ল ইনসাইড ফরোয়ার্ড হরওয়াথকে নিয়ে সামান্য ব্যস্ত ছিলেন। যদিও হরওয়াথ দ্বিতীয় সিণ্ডেলার নন, তবুও অষ্ট্রিয়াকে নতুন শক্তি দিলেন। মিজ্‌ল স্বয়ং এই খেলাকে ফুটবল ম্যাচ বলতে রাজি হননি। তাঁর মন্তব্য : এটি ফুটবল নিয়ে ঝগড়া।

সাত মিনিটের মধ্যে হরওয়াথ জিসেকের ক্রশ পাস গোলে প্রবেশ করালেন। হাঙ্গেরি চেষ্টা করল তা শোধের। বিরতির ছয় মিনিট পরে জিসেক বিকানের পাস থেকে ২-০ করলেন। তারপর থেকে খেলা লাথালাথি। সারোসি পেনাল্টি থেকে ২-১ করলেন। গোলের ব্যবধান কমল বটে, কিন্তু বাড়ল ফাউল। হাঙ্গেরি যখন ড্র করার মুহূর্তে, তখন তাদের রাইট উইঙ্গার মার্কস বোকামি করায় রেফারি দ্বারা মাঠের বাইরে প্রেরিত হলেন। তারপর বেশ খেলা হতে থাকে। সিণ্ডেলার বিপজ্জনক সট সারো দর্শনীয়ভাবে ঠেকালেন। শান্ত মেজাজে খেলে অষ্ট্রিয়া নিজেদের যোগ্য প্রতিপন্ন করে জিতল এবং নবজীবন পেল।

মিলানে প্রচণ্ড বৃষ্টি সত্ত্বেও দর্শকদের দাবিয়ে রাখা গেল না। স্বস্তিকা পতাকা আর হাজার হাজার ছাতা নিয়ে তাঁরা এলেন জার্মানী—সুইডেনের খেলা দেখতে।

কুশলী খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া সুইডেন প্রথমার্ধে কিছুটা ভাল খেলল। বিরতির ১২ মিনিট পরে সুইডিশ সেণ্টার ফরওয়ার্ড রজেন দেখলেন লেফট

উইঙ্গার ক্রুন গোলের দশ গজ দূরে বিনা প্রহরায় দাঁড়িয়ে। তাঁর পাস থেকে ক্রুন ফাঁকা গোলে উঁচু সট করলেন এবং সুইডেনের সব আশা নির্মূল হল। সুইডেনের গোলরক্ষক রিডবার্জ দুটি চমৎকার বল প্রতিহত করেছিলেন। প্রথমার্ধে। ক্রুনের সুযোগ নষ্টের তিন মিনিট পরে রিডবার্জ কোনোক্রমে একটি বল বাইরে পাঠালেন। তারপর পরাস্ত হলেন জার্মানীর রাইট ইন হোম্যানের কাছে (১-০)। আবার তিন মিনিট না কাটতেই হোম্যান সুইডেনের দুই ব্যাককে কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন ও ঠাণ্ডা মাথায় রিডবার্জকে অতিক্রম করলেন। ২-০ গোলে পিছিয়ে সুইডেন এবার হারাল লেফট হাফ ই অ্যাণ্ডারসনকে। অ্যাণ্ডারসন আহত হয়ে মাঠের বাইরে গেলেন। কিন্তু তাদের খেলায় ঘাটতি চোখে পড়ল না। বরং ডানকার একটি সান্ত্বনা গোল দিয়ে ২-১ করলেন।

তুরিণে চেকোশ্লোভাকিয়া দারুণ খেলায় জিতল সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে। গোটা খেলাটাই চলে যেন আঁকাবাঁকা পথে। কেউ বুঝতে পারছিলেন না জয়লক্ষ্মী কার দিকে। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল স্কিল, স্ট্যামিনা ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর চেকরাই এবং এইসব তাদের ৩-২ গোলে জিতিয়ে দেয়।

চশমাপরা কিয়েলহোল অষ্টম মিনিটে সুইজারল্যাণ্ডকে ১-০ গোলে এগিয়ে দিয়ে অসংখ্য সমর্থক জোগাড় করে নেন। এর ছয় মিনিট পরেই চেকোশ্লোভাকিয়ার চতুর ফরওয়ার্ড স্ববোদা ও স্ববোটকা সুইস রক্ষণভাগ ভেদ করেন ও স্ববোদা ১-১ করেন। বিরতির পরে চেকরা ঘনঘন সুইসদের গোলের সামনে হানা দিতে থাকেন। চার মিনিটের মধ্যে স্ববোদা ও অ্যাটাকিং সেণ্টার হাফ ক্যাম্বাল বল নিয়ে স্ববোটকা-কে দিতেই তিনি ২-১ করলেন।

এবার সুইজারল্যাণ্ডের পালা বিপক্ষ গোলে বোমা বর্ষণের। কিন্তু গোলরক্ষক প্লানিকা ও তাঁর রক্ষণভাগ ঘনঘন সুইসদের হতাশ করতে থাকেন। তবুও অবশেষে সুইস লেফট ইন ট্রেলো আবেগ্লেন ২-২ করেন। চেকোশ্লোভাকিয়া আবার একবার জ্বলে উঠল এবং সমাপ্তির সাত মিনিট আগে নেজলি ৩-২ গোলে জিতিয়ে দিলেন।

সেমিফাইনাল

দুটি সেমিফাইনালের একটি অর্থাৎ ইতালি—অষ্ট্রিয়ার খেলা পড়ল মিলানে, বাকিটি জার্মানী—চেকোশ্লোভাকিয়ার রোমে।

ইতালি : অস্ট্রিয়া—নিরপেক্ষভাবে দেখতে গেলে ইতালি ছিল ক্লান্ত ও শ্রান্ত। আর ম্যাচ ছিল অস্ট্রিয়ার অনুকূলে। কিন্তু হুগো মিজ্‌ল-এর ভাবনায় বৈকল্য দেখা দিল। তিনি বললেন, অস্ট্রিয়ার চাইতে ইতালির মারণাস্ত্র বেশি. তারা অনেক প্রস্তুতি নিয়ে খেলতে এসেছে, তাদের সমর্থকও অনেক ইত্যাদি। হরওয়াথ আহত থাকায় বোধ হয় তিনি হতাশ ছিলেন খেলার ফল সম্পর্কে। হরওয়াথের বদলে শ্যালকে নামানো হয়। (ভিয়েনার স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত মিজ্‌ল দৈব-অভিশাপেও বিশ্বাসী ছিলেন)।

ভারি মাঠে অনভ্যস্ত জিসেক ও সিণ্ডেলারকে কঠোর প্রহরায় রাখলেন মন্টি। কিন্তু সেণ্টার হাফে স্মিসটিক চমৎকার খেললেন। ১৮ মিনিট পরে একমাত্র গোলটি দেন ইতালির পক্ষে আর্জেন্টিনার গাইতা কর্ণার কিক থেকে বল পেয়ে। তারপর তিনি আরও একটি সুযোগ নষ্ট করেন। আর অস্ট্রিয়ার খেলোয়াড়রা ? তাঁরা যেন বেশি ক্লান্ত ছিলেন। ৪২ মিনিটের আগে তাঁরা ইতালির গোলে একটিও বল মারতে পারেননি। ইতালির ফেরারিস তো সারামাঠে বিচরণ করছিলেন। বিরতির পরে ১৫ মিনিট যাবৎ যখন অস্ট্রিয়া চাপ সৃষ্টি করে তখনও তাঁকে দমিয়ে রাখা যায়নি। শেষ মিনিটেও ইতালি জিতল সৌভাগ্যের জোরে। এই সময় জিসেক গোলরক্ষক লিটার প্লাজার-এর কাছ থেকে বল পেয়ে ইতালির রক্ষণভাগ ভেদ করেন। দর্শকরা তখন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে, ইতালির সমর্থকদের রক্ত হিম। জিসকের সট গোলের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। ইতালি উঠল ফাইনালে।

চেকোশ্লোভাকিয়া : জার্মানী—রোমে জার্মানীকে হারিয়ে চেকোশ্লো-ভাকিয়া ফাইনালে উঠল। চেকোশ্লোভাকিয়া দেখাল জার্মানীর ইংরাজি অক্ষর ডবলু পদ্ধতিতে খেলাটা শুধু স্বদেশ প্রেমের জন্যই নয়। জয়ের জন্য আরও কিছু প্রয়োজন। পেশীবহুল দেহ নিয়ে জার্মান খেলোয়াড়রা খুশি ছিলেন, ছিলেন সুগঠিত, কিন্তু প্রেরণা দেওয়ার কেউ ছিলেন না। তাঁদের আসল ঘাটতি ছিল গোলমুখে গিয়ে। গোল করার কেউ তেমন ছিলেন না। কেননা রান, জিলার, মূল্যারদের তো তখন আসতে অনেক বাকি। তবুও জার্মানরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খেলা শুরু করল। রাইট ইন হোম্যান গুরুতর আহত থাকায় খেললেন না।

এদিকে দর্শকদের মধ্যে ইয়টিং ক্যাপ পরে মুসোলিনী উপস্থিত। চেকরা এগিয়ে যেতে থাকলেও তিনি নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করেননি। বরং আনন্দে খেলা

দেখছিলেন। ২১ মিনিট পরে চেক রাইট উইঙ্গার জুসেক একাকী বল নিয়ে এগোলেন। বাকি ছিল শুধু জার্মান গোলরক্ষক ক্রেসকে ভেদ করা। কিন্তু ১-০ করলেন নেজলি। চেক খেলোয়াড়রা এবার যেন সামান্য ঢিলে দিলেন।

দ্বিতীয়ার্ধে আবার তাঁরা স্বমূর্তিতে ফিরলেন এবং জয় যখন অবধারিত মনে হচ্ছিল—ঠিক সেই মুহূর্তে অধিনায়ক ও গোলরক্ষক প্লানিকা দারুণ ভুল করলেন। জার্মানির লেফট ইন নোয়াক-এর দূরের সট লক্ষ্য করছিলেন তিনি, আর তা তাঁর (চেক) গোলে ঢুকে ১-১ হল

এবার জার্মানি যেন শক্তি ফিরে পেল। তীব্র আক্রমণ করল এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার টিরকি তো একবার আত্মঘাতী গোলের উপক্রম করেন গোলরক্ষককে পাস দিতে গিয়ে। ১-১ হওয়ার ১০ মিনিট পরে পাক পেনাল্টি সীমানার ধার থেকে ফ্রি-কিক করতেই তা বার-এ লাগে। লেফট হাফ ক্রিসিল সঙ্গে সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়াকে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন। জার্মানী এবার যেন ধসের মুখে পড়ল। ক্যাম্বালের পাস থেকে নেজলি ড্রিবলিং করে এগিয়ে ৩-১ করলেন।

ফাইনালের তিনদিন আগে নেপলসে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ৩-২ জিতে জার্মানী তৃতীয় স্থান পেয়ে নিজেদের সান্ত্বনা দিল। এই খেলায় উভয় দলেই বহু পরিবর্তন হয়। ২৪ সেকেণ্ডের সময় প্রথম গোলটি করেন জার্মানীর লেহনার, দ্বিতীয়টি কোনেন। হরওয়াথ ১-২ করতেই জার্মানী সামান্য ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু লেহনার আবার গোল দিলেন (৩-১)। দ্বিতীয়ার্ধের একমাত্র গোল দেন সেজতা ৩০ গজ দূর থেকে ফ্রি-কিক দ্বারা (৩-২)। আবার খেলা ফাউলময় হল। কিন্তু জার্মানী এগিয়েই রইল।

ফাইনাল

ইতালি : চেকোশ্লোভাকিয়া—রোমে গোটা বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা নিয়েই কেমন যেন অনীহা ছিল। ফাইনালকে কেন্দ্র করেও কোনরকম উত্তেজনা দেখা গেল না। রাস্তাঘাটেও কোন কানাঘুষা নেই। বাড়িগুলিও আগের মতই শূন্য। এদিকে চেক দল বহাল তবিয়তে চমৎকার বাড়িতে রয়েছে। নানারকম উপহার সামগ্রীতে তাদের ভরিয়ে দেওয়া হল। সসেজ, শূকর পেলেন খেলোয়াড়রা। রূপার কবচ পেয়ে একজন খেলোয়াড় সেটি জামায় সেলাই করে নিতে চাইলেন। ১,৭০০ শুভেচ্ছা টেলিগ্রাম এল।

প্রাগ থেকে দুটি বিশেষ ট্রেনে ও তিনখানি মোটর কোচ ভরে সমর্থকরা রোমের পথে রওনা হলেন। দুঃখের কথা খেলা ইতালির উত্তরাঞ্চলে হল না। কেননা, তুরিণো স্টেডিয়ামটি অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল, দর্শক সংকুলান হবে না। উপরন্তু বিশ্বকাপ ফাইনালের পক্ষে উপযুক্ত স্থান নয়। তাই খেলা রোমে।

সকলেরই জানা আছে ইতালির 'স্ট্যামিনা' ও 'পাওয়ার'। এছাড়া স্বদেশে অসংখ্য সমর্থক। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার অদ্ভুত কলাকৌশল।

শুরুতে চেকরা ডান্যুবিয়ান ঘরানায় ছোট ছোট পাসে খেলতে আরম্ভ করলেন চমৎকার ভঙ্গিতে। সেণ্টার হাফ ক্যাম্বালকে সারা মাঠে দেখা গেল, ইতালীয় রাইট ফ্ল্যাঙ্কের কাছে ভয়াবহ হলেন পাক। রাইট ইন স্বোদাও অপ্রতিরোধ্য। ভাগ্যদেবতা প্লানিকার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করলেও গোলে তাঁকে বেশ দৃঢ় মনে হল। তাঁকে সাহায্য করতে থাকেন রাইট ব্যাক জেনিসেক।

পোজো বুঝলেন দুটি দলই অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে খেলায় এবং সেজন্য স্নায়ুর চাপও কম নয়। আর একই রোগে আক্রান্ত তাঁর গোলরক্ষক ও অধিনায়ক কম্বি। তাই গোটা খেলাটাই কেমন যেন তালকাটা।

সমাপ্তির ২০ মিনিট আগে কোন দলই গোল দিতে পারল না। পেশীতে টান ধরায় পাক এতক্ষণ মাঠের বাইরে ছিলেন। একটু কমায় মাঠে ঢুকেই কর্ণার কিক নিলেন। জটলার পর আবার বল ফিরে এল তাঁর কাছে। তিনি জোরালো সট করলেন কম্বির ডান দিকে। কম্বি দেরিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বল তাঁর আগেই গোলে প্রবেশ করেছে। চেক ১-০ গোলে এগিয়ে। জয় সুনিশ্চিত ভেবে তারা খেলতে লাগল। স্বোটকা একটি অবধারিত সুযোগ নষ্ট করলেন। স্বোদায় জোরালো সট পোস্টে লেগে ফিরে এল।

ওদিকে ইতালীয় আক্রমণ যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। শিয়াভিওকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। গাইতা মাঝমাঠে গিয়ে সব যেন জট পাকিয়ে ফেলছেন। ইতালির কাছে সব কিছু তমসাচ্ছন্ন মনে হল। খেলা শেষ হতে তখন আট মিনিট বাকি। আর এই সময়ে ইতালি একটি সুযোগ পেয়ে গেল। লেফট উইঙ্গার ওরসি গাইতার কাছ থেকে পাস পেয়ে দ্রুত ছুটে চেক-রক্ষণব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে গেলেন এবং বাঁ পায়ে বল তুলে ডান পায়ে জোরালো সট করলেন। বল সোয়ারভ করে প্লানিকার দুর্দান্ত আঙুলগুলি ভেদ করে জালের ভিতরে ঢুকে গেল। ফটোগ্রাফারদের সুবিধার্থে পরদিন গোলরক্ষকহীন গোলে ওরসি ২০ বার চেষ্টা করলেন অনুরূপ সটের। কিন্তু একবারও তিনি সফল হননি।

নির্দিষ্ট সময়ে ১-১ রইল। সুতরাং অতিরিক্ত সময়ে খেলার সিদ্ধান্ত হল। পোজো স্থির করলেন শিয়াভিও ও গাইতাকে নানা কথায় তাঁতিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সে কাজ তো ইতালির সমর্থকরা চীৎকার দ্বারা করছেন। মাঠে এমন অবস্থা যে, নিজেই নিজের কথা শোনা যাচ্ছে না। একবার জনৈক ব্যক্তি চেক সাংবাদিককে ডেকে না পেয়ে তার চুল ধরে টেনে তবে সাড়া পান। ওই সাংবাদিকের কেশগুচ্ছ ছিঁড়েও গেল জোরে টানার ফলে। পোজো অতঃপর টাচ-লাইনের কাছে ছুটে গিয়ে গাইতাকে কিছু বলার সুযোগ পেলেন। কথায় কাজ হল। গাইতা দ্বিতীয়বার পোজোর সঞ্জীবনীমন্ত্র শুনে গোল দিতে সমর্থ হলেন।

৯৭ মিনিট খেলার পর মিজ্জা খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাইট উইং-এ বল পেলেন। চেক খেলোয়াড়রা ওই স্থানটি অরক্ষিত রেখেছিলেন। মিজ্জা ক্রশ পাস করলেন গাইতাকে। বল ধরেই দেখেন কাছেই শিয়াভিও। শিয়াভিও সামান্য চেষ্টায় টিয়রকি-কে কাটিয়ে গোলে মারতেই প্লানিকা পরাস্ত হলেন। গোলের পর শিয়াভিওকে জিজ্ঞাসা করা হয়—প্লানিকাকে পরাস্ত করতে তুমি কী শক্তি প্রয়োগ করেছিলে? তাঁর জবাব, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলাম ওই সটে। তা না হলে প্লানিকাকে ভেদ করা যেত না।

ইতালি শুধু বিশ্বকাপ জিতল না। খেলা শেষে দেখা গেল তাদের ১০ লক্ষ লিরা লাভ হয়েছে। কিন্তু অনেকে সন্দেহ করলেন, অন্যত্র খেলা হলে ইতালি বিশ্বকাপ জিততে পারত না। এর উত্তর তাঁরা পেলেন চার বছর পরে ফ্রান্সে।

প্রথম রাউণ্ড

ইতালি—৭ : **যুক্তরাষ্ট্র—১**
(শিয়াভিও-৩, ওরশি-২ মিজ্জা, ফেরারি) (ডনেলি)

বিরতি ৩—১

চেকোশ্লোভাকিয়া—২ : **রোমানিয়া—১**
(পাক, নেজলি) (ডোবাই)

বিরতি ০—১

জার্মানী—৫ : **বেলজিয়ম—২**
(কনেন-৩, কোবিয়ারস্কি-২) (ভুরহুপ)

বিরতি ১—২

ফাইনাল (রোমে ১০ জুন, ৫৫ হাজার)

ইতালি—২ (ওরসি, সিয়াভিও)

অতিরিক্ত সময়ের পরে

চেকোস্লোভাকিয়া—১ (পাক)

বিরতি ০—০

কম্বি (অধিনায়ক); মঞ্জেগলিও, আলেমণ্ডি ; ফেরারিস ৪, মণ্টি, বার্তো-লিনি ; গাইতা, মিজ্জা, শিয়াভিও, ফেরারি ও ওরসি।

প্লানিকা (অধিনায়ক); জেনিসেক, টিরকি ; কস্টালেক, ক্যাম্বাল, ক্রিসিল ; জুনেক, স্ববোদা, স্ববোটকা, নেজলি ও পাক।

ফ্রান্স
১৯৩৮



বিজয়ী ইতালির ব্যাজ

তৃতীয় বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ইউরোপময় যুদ্ধের দুন্দুভি বেজে উঠেছে। হিটলারের বাহিনী 'অ্যান্‌চলাস' দখল করেছে অস্ট্রিয়াকে। জার্মানীর জাতীয় ফুটবলের কর্মকর্তারা তাড়াতাড়ি অস্ট্রিয়ার সেরা খেলোয়াড়দের বেছে ধরে নিয়ে গেলেন। ওদিকে স্পেনে শুরু হয়েছে গৃহযুদ্ধ। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে তেমন সাড়া পাওয়া গেল না; পেশাদারী ফুটবল নিয়ে সেখানে গোলমাল অব্যাহত। উরুগুয়ে আগের গোঁ-তে অটল, ইউরোপে আসবে না। তার দোসর রইল আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা চাপা রাগে ফুঁসছিল, কেননা, ১৯৩৬ সালে বার্লিনের অপেরা ক্রল-এ ফিফা কংগ্রেসে তৃতীয় বিশ্বকাপের দায়িত্বভার আর্জেন্টিনার উপর ন্যস্ত হওয়ার কথা ওঠে, কিন্তু ফরাসী কর্তারা উদ্যোগীদের সঙ্গে দহরম-মহরমের দৌলতে নিজেদের দেশে বিশ্বকাপ আয়োজনের ব্যবস্থা করেন। এই সিদ্ধান্তের পর বুয়েনস আয়ারসে ওই দেশের ফুটবল ফেডারেশন অফিসের বাইরে দাঙ্গা বেধে যায়। পুলিশের হস্তক্ষেপে হাঙ্গামা থামে।

মাঝের বছরগুলিতে ইতালীয় দলে প্রায় পুরোপুরি রদবদল হয়ে গিয়েছে। নরওয়ের সঙ্গে প্রথম খেলার পর মঙ্গেগলিও দল থেকে বাদ পড়লেন। পুরনোদের মধ্যে দলে রইলেন শুধু ১৯৩৪-এর দুই ইনসাইড ফরওয়ার্ড মিজ্জা ও ফেরারি। দলে অনেক নতুন ও তরুণ মুখের আবির্ভাব দেখা গেল! তাঁদের মধ্যে সেরা সেণ্টার ফরওয়ার্ড সিলভিও পিওলা। প্রো ভার্সেলি ক্লাবের পিওলা যেমন লম্বা, তেমনি সুঠামদেহী। 'পাওয়ার', 'স্পিড' ও 'স্কিল' মিলিয়ে তাঁর জুড়ি কেউ ছিলেন না। ইতালি জাতীয় দলে নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৩৫

সালে তাঁর খেলা শুরু হয় কয়েক জোড়া গোল দিয়ে। এর দু'বছর আগে খ্যাতনামা উলভস দলের ম্যানেজার মেজর ফ্রাঙ্ক বাকলে নাইসে পিওলা-কে খেলতে দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'পিওলা অনতিবিলম্বে ইউরোপের সেরা সেণ্টার ফরওয়ার্ড হবে।'

তাঁদের দলে দেখা গেল অপ্রতিরোধ্য গোলরক্ষক আল্দো ওলিভেরি এবং দুই ব্যাক ফনি ও রাভা-কে। জুভেণ্টাস এঁদের কিনেছিল এবং উভয়েই ১৯৩৬ সালের বিজয়ী ওলিম্পিক দলে ছিলেন। ফনির মাজা চেহারা আর রাভা মোটাসোটা। ওলিম্পিয়াডের সময় তাঁকে ফেরত পাঠানো হয়। ওলিম্পিক দলের আর এক সদস্য লেফট হাফ লোকাটেলিও বিশ্বকাপ দলে রইলেন। চমৎকার দুই দ্রুতগামী উইঙ্গারও এলেন ইতালি দলে। একজন বলোগনার আমাদেও বিয়াভাতি, অপরজন ট্রিয়েস্টিনার জিনো কলোসি।

১৯৩৫ সালের পর 'আজুরি' প্রাগে একবার মাত্র হেরেছে। এখনও তারা তিনব্যাক পদ্ধতি পরিহার করে চলেছে, ওদের অটুট বিশ্বাস ফুটবলাররা দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করবে, থাকবে মাঠময় বিচরণকারী সেণ্টার হাফ। মণ্টি নেই বটে, তবে উরুগুয়ের গতিবেগসম্পন্ন বিশালদেহী আন্দ্রোলো আছেন ; পোজো পেয়েছেন চার্লি রবার্টসের উত্তরাধিকারী। পরবর্তীকালে এটি পরাক্রমশালী দলে পরিণত হয়। ১৯৩৪ সালের দলের সঙ্গে তুলনা করে পোজো লেখেন : 'রোমের দলটি সম্ভবত শক্তিশালী ও সংগ্রামশীল ছিল, ছিল প্রত্যেকের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, কিন্তু দারুণ দলগত সংহতি ছিল প্যারিসের দলে। নিজেদের মধ্যে সমঝোতা এবং নমনীয়তায় তারা সেরা।' ১৯৩৮ সালের দল সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল—এরা ইংল্যাণ্ডকে হারাতে পারত। ১৯৩৪ সালের ইতালি এদিক থেকে ছিল সবচেয়ে ব্যর্থ। তবে খেলাটি নিরপেক্ষ মাঠে (লণ্ডন বা ম্যাঞ্চেস্টারের কাদায় নয়) হওয়া দরকার।

অস্ট্রিয়া তো নেই। ইংল্যাণ্ড ওদের বদলে বা ওদের স্থান নিতে গররাজি। হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে দুরন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হল। প্যারিসের পর্যবেক্ষকরা নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করলেন : 'ইতালি এবারও ট্রফি জিতবে, ভাল দল নিয়ে এসেছে হাঙ্গেরি, ব্রাজিল অপরিচিত হলেও ভাল খেলবে।'

ব্রাজিল ছিল সকলের পছন্দসই। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশ বা দলগুলির তুলনায় তারা অনেক উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে হাজির হল। তারা এল যেমন সকলের আগে, তেমনি গেল সকলের শেষে। ব্রাজিল এল একদল

টগবগে প্রতিভাবান খেলোয়াড় নিয়ে, তারা তেমন যোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার আগেই দুঃখজনক ফুটবল লড়াইয়ে পরাস্ত হল, তবে আভাস দিল দেড় বা দুই দশকের মধ্যে তারা বিশ্ব-ফুটবলে থরহরি আনবে।

হাঙ্গেরির জর্জ সারোশি দারুণ খেলছেন। তাঁর খেলা তখন তুঙ্গে। জাতীয় দলের আক্রমণের পুরোধা তিনি ; অবশ্য মাঝে-মধ্যে তিনি সেণ্টার হাফেও খেলছিলেন। একবার ভিয়েনায় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ গোল দিলেন। গত নয় মাসে হাঙ্গেরি ৮-৩ গোলে হারাল চেকদের। এর সাত গোলই সারোশির। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তারা জিতল ৫-৩ গোলে এবং গ্রীসের বিরুদ্ধে ১১ গোলে। ২২ বছরের এক জাত ইনসাইড ফরওয়ার্ড সেঞ্জেলার স্থান পেলেন সারোশির ধারে। এই সেঞ্জেলারের বাজার দর তখন চার লক্ষ লিরারও বেশি। ইণ্টারের হাঙ্গেরীয় কোচ ফেল্ডম্যান মিলানে খেলার জন্য চার লক্ষ লিরা দিতে চাইলে সেঞ্জেলার তখনই প্রত্যাখ্যান করেন।

গত মে-তে সফররত ইংল্যাণ্ডের কাছে বার্লিনে জার্মানী শোচনীয়ভাবে ৬-৩ গোলে হারল। ওই সময় জার্মানী হেরেছিল সুইজারল্যাণ্ডের কাছেও, তবে তারা ফ্রান্সকে হারায়। কিন্তু ইতিমধ্যে জার্মানী ম্যানেজার-নির্বাচক অটো নার্জকে বদলে এনেছে খর্বকায় শেপ হারবার্জারকে। হারবার্জার ম্যানহিয়েম-এর প্রাক্তন ইনসাইড ফরওয়ার্ড। ১৯৬২ পর্যন্ত তিনি সর্বসম্মতভাবে ম্যানেজার পদে রইলেন জার্মানীর ফুটবলের অসম্ভব উন্নতির সুবাদে। হারবার্জার বিচক্ষণ, প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, মনোবিজ্ঞানী এবং সকলের মন বোঝার মত দারুণ ক্ষমতাশালী। দায়িত্ব পেয়েই হারবার্জার আর কিছু না করে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া দলকে একই সূত্রে বাঁধার চেষ্টায় রত হলেন। নিয়ে এলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান চার অস্ট্রিয়ানকে।

প্রতিযোগিতায় এই প্রথম এল কিউবা, পোল্যাণ্ড ও ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ এবং আবার হাজির হল সুইডেন, রোমানিয়া ও সুইজারল্যাণ্ড। ১৯৩৪ সালের রানার্স চেকোশ্লোভাকিয়া দলে এখনও সেই বিখ্যাত গোলরক্ষক প্লানিকা, লেফট ইন-এ অপ্রতিরোধ্য নেজালি এবং রাইট হাফে কোস্টালেক। এসব সত্ত্বেও ইতালিই ফেভারিট, তারা সেইভাবে প্রস্তুতও। নক-আউট পদ্ধতিতেই শেষ পর্যায়ের খেলাগুলি হল, তবে তার আগে প্রাথমিক বাছাই পর্ব শেষ হয় এবং খেলা হয় বিভিন্ন শহরে দূরে দূরেই।

প্রথম রাউণ্ড ঃ মার্সাইয়ে ইতালি আবার প্রায় তোপের মুখে পড়েছিল। এবার বিপদে ফেলেছিল নরওয়ে। সম্ভবত খেলোয়াড়রা খেলা শুরুর আগে পাহাড়প্রমাণ বিদ্রূপের সম্মুখীন হয়। দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ফ্যাসী-বিরোধী উদ্বাস্তুরা ফ্যাসিস্ত স্যালুট দিলেন। নিজে হাত নামিয়ে নিলেও পোজো খেলোয়াড়দের বললেন, যতক্ষণ চিৎকার না থামে, ততক্ষণ তোমরা কপালে হাত লাগিয়ে থাকবে (স্যালুট থেকে বিরত না হওয়া)। তারপর তিনি চিৎকার করে বলেন, 'টিম অ্যাটেনশন, স্যালুট'। এবার নিজে স্যালুট দেওয়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন চিৎকার ক্ষীণ হয়ে আসা পর্যন্ত। ইতিমধ্যে ফরাসী দর্শকরা ঝিমিয়ে পড়েছেন বিরক্ত হয়ে। চিৎকার থামতেই পোজো হাত নামালেন। দর্শকরা বাধ্য হয়ে বিদ্রূপ বন্ধ করলেন।

খেলার পর পোজো স্টেডিয়ামের বাইরে যেতেই এক ইতালীয় জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের দলে ভেনিসের কেউ আছেন কিনা। পোজো জানালেন, একজন আছে, তার নাম সেরান্তমি। 'বেশ ভাল'—ওই ব্যক্তির মন্তব্য। পোজো এবার একটু উঁচু গলায় বললেন, নির্বাসিতরা সত্যি সত্যি ক্ষুব্ধ নয়। তাহলে তারা আমাদের দেখে গুলি করত।

কিন্তু নরওয়ের খেলোয়াড়দের দেখে মনে হল, তারা যেকোনো সময় কামান দাগতে পারে। বিশেষত তাদের দুর্ধর্ষ সেণ্টার ফরওয়ার্ড ব্রুনিল্‌ডসেন। পোজো পরে ওর সম্পর্কে বলেন, 'ও আমার গোলাপের মুকুটে একটি কণ্টক'। ব্রুনিল্‌ডসেন একাই খেলাটিতে জিততে পারতেন যদি ওলিভেরি একহাতে অত্যাশ্চর্যভাবে অবধারিত গোলটি না ঠেকাতেন। গোলের পিছনে পোজোর রক্ত তখন হিম হওয়ার উপক্রম।

নিউ মার্সাই স্টেডিয়ামে নরওয়ের শুরুটা তেমন আহামরি ছিল না। অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আদাজল খেয়ে পাল্টা-আক্রমণের প্রচেষ্টাও দেখা গেল না। ওলিম্পিক সেমি-ফাইনালে যে ইতালির কাছে তারা ১-২ গোলে হেরেছিল, সেই দলেরই ছ'জনকে নিয়ে নরওয়ে দ্বিতীয় মিনিটে ১-৩ গোলে পিছিয়ে পড়ে। পিওলা দেখলেন নরওয়ের গোলরক্ষক ফেরারির সট ধরে রাখতে পারেননি। ফেরারি এবার বল মারলেন নিজগৃহ অভিমুখে। নরওয়ের রাইট ব্যাক আর জোহানসেন সেণ্টার হাফ এরিকসেনকে ইশারা করলেন, পিওলা আছে। বল চলে গেল তাদের সেণ্টার ফরওয়ার্ডের কাছে। মাঝমাঠে ছিলেন তাঁদের রাইটহাফ হেনরিকসেন। বল তখন ইতালির দিকে।

ক্রনিল্‌ডসেন এবার সর্বগ্রাসী হয়ে আক্রমণ শুরু করলেন, ইতালীয় রক্ষণ-ভাগকে তুললেন কাঁপিয়ে। তাঁকে সমর্থন করতে লাগলেন দ্রুততম লেফট উইঙ্গার ব্রাস্টাড। পোজ্জো পরে এই ব্রাস্টাডকে যদিও ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ইউরোপীয় দলে নির্বাচিত করেছিলেন; তবুও তার বিরুদ্ধে পোজ্জোর কেমন যেন আক্রোশ ছিল। একইভাবে তিনি দেখতেন চমৎকার রাইট ইন কোয়ামেন-কেও। তিনবার নরওয়ের আক্রমণ ইতালির বার ও পোস্টে লেগে ফিরে এল। কিন্তু বিরতির পরে ব্রাস্টাড ক্রনিল্‌ডসেনের কাছ থেকে বল পেয়ে ১-১ করেন। এর পরেই ব্রাস্টাডের মার আবার জালের মধ্যে ঢুকল। এটি অফসাইড হল। সমাপ্তির পূর্ব মুহূর্তে ওলিভেরি এক হাতে ব্রুনিল্‌ডসেনের মারাত্মক সটটি আশ্চর্যভাবে ঠেকালেন। নির্দিষ্ট সময়ে ১-১ থাকায় অতিরিক্ত সময় খেলার নির্দেশ দিলেন রেফারি। পিওলা এবার পঞ্চম মিনিটে নরওয়ের রক্ষণ-ভাগ ভেদ করলেন। এইচ জোহানসেন ব্যতীত আর কেউ তাকে রোখার চেষ্টা করলেন না। পিওলা ২-১ গোলে এগিয়ে দিলেন ইতালিকে। সমগ্র প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড় বাধা পার হল ইতালি অতি কষ্টে।

ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা নিভৃতে আলসেস্ অরণ্যের মধ্যে বাস নিলেন। রাত আটটা থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত অনুশীলনের জন্য ওই ব্যবস্থা। তারা ড্র করল পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে স্ট্রসবরো-য়। খেলাটি তুঙ্গে ওঠে এর পরেই অতিরিক্ত সময়ে। দুই দলের মোট এগারটি গোল। মাঠে তখন উভয় দলের সমর্থকরা তো বটেই, নিরপেক্ষ দর্শকরাও বলের গতির সঙ্গে দোদুল্যমান। ব্রাজিলের রক্ষণভাগে রয়েছেন চাইনিজ ওয়াল এবং বর্ণময় ফুলব্যাক ডমিঙ্গোস ডা গুইয়া, সেণ্টার ফরওয়ার্ডে রবারের মত নমনীয় ও আবলুসের মত কালো লিওনিডাস। এই লিওনিডাসই চারটি গোল করেন। ওদিকে পোল্যাণ্ডের লেফট ইন উইলিমোস্কিও চারটি গোল দিলেন।

দ্রুত গতিবেগসম্পন্ন, অক্লান্ত, অকুতোভয় ও মরণপণ সংগ্রামী উঁচু ও বাই-সাইকেল কিকের পথিকৃৎ লিওনিডাস ও ডা গুইয়া এবং অপর ফুলব্যাক ডাঃ নারিজ (ব্রাজিলের সবচেয়ে দামী খেলোয়াড়)-কে নিয়ে ব্রাজিল খুব গর্ব করছে। তবে নারিজ অতুলনীয়। যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে তিনি জোরালো সট করতে পারেন এবং এবারের বিশ্বকাপে তাঁর একটিও সট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। কিন্তু কেন কে জানে সেমি-ফাইনালে ইতালির বিরুদ্ধে তাঁকে দলে নেওয়া হল না। সত্যিই নারিজকে না নিয়ে তারা গুরুতর ভুল করেছিল।

স্টসবরোর মাঠ ভিজে ও কর্দমাক্ত থাকলেও লিওনিডাস যেন সর্বক্ষণই ভয়ঙ্কর। দ্বিতীয়ার্ধে একবার তিনি বুটজোড়া খুলে নাটকীয়ভাবে ছুঁড়ে দিলেন ট্রেনারের দিকে। সুইডেনের রেফারি একলিও তা দেখে তাঁকে বললেন, বুট পরেই খেলতে হবে। তাঁকে আবার বুট পরতে হল।

আশ্চর্যের কথা, ব্রাজিল দলে ছ' জনেরও বেশি ছিলেন, যাঁরা এই প্রথম জাতীয় দলের হয়ে খেললেন। তবুও বিরতির আগেই লিওনিডাস হ্যাটট্রিক করলেন এবং তখন ব্রাজিল ৩-১ গোলে এগিয়ে। এর পরেই পোলিশ হাফ-ব্যাকরা খেলা ধরে রাখলেন এবং খেলার মোড় ঘোরাবার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব উইলিমোস্কির। তিনিই অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত ম্যাচ টেনে নিয়ে গেলেন। অতিরিক্ত সময়ে উইলিমোস্কি আর একটি গোল দিলেন। কিন্তু লিওনিডাস ও সপ্রতিভ রাইট ইন রোমিওর গোল ব্রাজিলকে এগিয়ে দিল। খ্যাতনামা শিল্পী মিস্তিঙ্গুয়েট দারুণ খুশি হয়ে লেফট ব্যাক ম্যাচাডোসকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম করলেন। সম্ভবত মিস্তিঙ্গুয়েটের নাচের যে ব্রাজিলীয় পার্টনার ছিলেন তাঁরও নাম ম্যাচাডোস, তাই।

প্যারিসের পারক দ্য প্রিন্সেস-এ দুঃসাহসী দু'জন খেলোয়াড় জার্মানদের সব আশা নির্মূল করে দিলেন। প্রথম খেলায় (ম্যানেজার-জীবনের শুরু) শেপ হারবার্জার দল গড়লেন সাতজন জার্মান ও চারজন অস্ট্রিয়ানকে নিয়ে। এই অস্ট্রিয়ানদের একজন নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং সিণ্ডেলারকে নাৎসীদের কাছে দিয়ে 'আত্মহত্যার' পথে পাঠায়। জার্মান দলের খেলা ভাল হয়নি। প্রথমার্ধে গাওছেল জার্মানীকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের জনপ্রিয় সুইস খেলোয়াড় ট্রেলা আবেগ্নেন পাস পেলেন ওয়ালামেকের কাছ থেকে। আবেগ্নেন-এর হেড ১-১ করল। দ্বিতীয়ার্ধে বা বিরতির পর কোন গোল হল না।

পাঁচদিন পরে বিশ্বকাপের খেলা যেন ঝিমিয়ে পড়ল। রিপ্লেতে সুইজারল্যাণ্ড দলে একটুও পরিবর্তন হল না। জার্মান দলে তিনজন অস্ট্রিয়ানকে দেখা গেল। কেননা আর এক অস্ট্রিয়—লেফট উইঙ্গার পেসার প্রথম ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে রেফারি জন ল্যাঙ্গেনাস কর্তৃক বহিষ্কৃত হলেন। এইদিন মিনেলির হাঁটুতে তিনি প্রচণ্ড লাথি মেরেছিলেন। জার্মান দলই তাকে পরবর্তী দুটি খেলা থেকে সাসপেণ্ড করে।

এবার ছয় গোল হল। বিরতির আগে জার্মানী ২-০ গোলে এগিয়ে রইল।

গোলদাতা অস্ট্রীয় সেণ্টার ফরওয়ার্ড হানিম্যান। আর একটি আত্মঘাতী লোয়েরশারের সটে। ওয়ালাশেক ২-১ করলেন। এই সময় আয়েবি আহত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেলেও সুইসদের আক্রমণ হ্রাস না হয়ে বাড়লই। আয়েরি ফিরতেই বিকেল ২-২ করলেন। পরের দুটি গোলই আবেগ্নেন-এর। সুইজারল্যাণ্ড ৪-২ গোলে জিতল।

তুলো-য় কেবল কিউবাকে দেখা গেল মেক্সিকোর গরহাজিরে। তাঁদের খেলা পড়ল রোমানিয়ার সঙ্গে। রোমানিয়া দলে ১৯৩০ সালের তিনজন ছিলেন। তবুও কিউবা দারুণ বেগ দিল। ফল ৩-৩। কিউবার কর্তারা গোলরক্ষক কারাভাজালেস এর উপর বিরক্ত হয়ে রিপ্লেতে নামালো না। অথচ তাঁর দারুণ সুনাম ছিল। কারাভাজালেস এতে মন খারাপ না করে নিজেই প্রেস কনফারেন্স ডেকে বললেন, 'রিপ্লেতে কিউবা যে জিতবে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। রোমানিয়ার খেলা আমাদের কাছে আর অপরিচিত নয়। আমরা দু'বার গোল দেব, ওরা একবার।' তাঁর কথা সত্যি হল। যদিও লাইনসম্যান ও ফাইনালের রেফারি জর্জেস ক্যাপডেভিলের ধারণা ছিল কিউবার জয় অফসাইড গোলে।

বিশ্বকাপের ঢিমেতাল তখনও কমেনি। লে হাভরেতে খেলা চেক-এর বিরুদ্ধে ডাচদের। এ খেলাটির নিষ্পত্তি অতিরিক্ত সময়েই হয়ে গেল। হল্যাণ্ড হারল যখন তাদের সবশক্তিমান ভান দের ভিন আহত হন। তাদের দলে ৪০ বছর বয়সী লেফট ব্যাক কালডেনহোভ ছিলেন, তেমনি ১৮ বছরের লেফট উইঙ্গার বার্থাস ডে হার্ডার-ও। বার্থাস যুদ্ধের পরে বোরোডিক্সের সঙ্গে 'তারকা' হয়ে ওঠেন। চেকোশ্লোভাকিয়া অতিরিক্ত সময়ে তিনটি গোল দেয়। তৃতীয় গোলটি নেজলি-র। হল্যাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্যতম প্রধান স্কোরার বাখুইজকে না পেয়ে।

উদ্যোক্তা ফ্রান্সের বিশ্বকাপের অভিজ্ঞ একগাদা খেলোয়াড় রয়েছেন। থেপট, ডেলফোর ও অস্টন ১৯৩৪-এর বিশ্বকাপ থেকে ফিরলে গেয়ার দ্য লিঁয়তে জনতা তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। থেপট অবশ্য এবার নেই। কিন্তু লরেণ্ট ডি লোতোয় এক নতুন প্রতিভাময় গোলরক্ষক। পার্ক দ্য প্রিন্সেস-এ তিনি দারুণ খেলেছিলেন ওই মরশুমের আগে। ডেলফর ও অস্টন তো আছেনই। আছেন এটিনে ম্যাটলার। অসুস্থতার জন্য রজার কোর্টোই বাদ পড়লে রাইট উইং অস্টনের ডাক পড়ে এবং কলম্বাসে বেলজিয়ামের

বিরুদ্ধে দারুণ খেলেন। মার্সাইয়ের জিল ব্যাস্টনও তাই। বোরবোতে আহত হওয়ায় তরুণ ব্যাস্টন রাইট হাফে এলেন।

চল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই ফ্রান্স তার পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে গোল দিল। জিন নিকোলাসের ওই সট বেলজিয়ামের ১৯৩০-এর বিশ্বকাপের গোলরক্ষক বাদজ্জ অবশ্য ঠেকাতে পারতেন। ১৯৩০-এর আর এক প্রবীণ ভিনান্ত আত্মঘাতী গোল দিলেন। ১০ মিনিট পরে নিকোলাস পড়ে গেলে আইসেমবর বেলজিয়ামের পক্ষে গোল দিলেন (২-১)। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের ২৫ মিনিটের সময় ফ্রান্স খেলার জয়ের পথ সুগম করে নিল। দুই ডিফেণ্ডারকে কাটিয়ে অস্টন বল বাড়ালেন নিকোলাসকে এবং ৩-১ হল।

রাইমে হাঙ্গেরি ৬-০ গোলে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজকে ধরাশায়ী করল। দুই অর্ধেই সারোশি ও সেঙ্কেলার দুটি করে গোল দিলেন।

দ্বিতীয় রাউণ্ড

প্যারিসে এবার উদ্যোক্তা ফ্রান্সের মুখোমুখী হল ইতালি। পোজো দলে রদবদল করলেন। মঞ্জেগলিও-র জায়গায় এলেন ফনি। দুই উইঙ্গে এলেন আমেদিও বিভাটি ও গিনো কলৌসি। মার্সাইয়ে সেরাণ্টনি ভয়ঙ্কর খেলেছিলেন, তাই পোজো তাঁকে রেখে দিলেন। পোজোর বিশ্বাসকে মর্যাদা দিলেন তিনি। বিশ্বকাপের বাকি খেলাগুলিতে সেরাণ্টনির 'রোবাস্ট' খেলা ইতালির খেলোয়াড়দের দারুণ অনুপ্রেরণা দিল।

বর্ধিত কলম্বাস স্টেডিয়ামে ৮৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে খেলা আরম্ভ হল। শুরুতে দুটি দলই খাপছাড়া খেলছিল। সম্ভবত ওদের গত ডিসেম্বরের ০-০ ফল স্মরণ করিয়ে দিল। পিওলা-ই খেলার গতি পরিবর্তন করলেন নিজের ক্রীড়াক্ষমতা দ্বারা। সাংবাদিক ও ফ্রান্সের খেলোয়াড় গ্যাব্রিয়েল হ্যানট তখন শুধু স্মৃতিচারণ করে বললেন, ইউরোপের সব সেণ্টার ফরওয়ার্ড তাঁর সতীর্থ ছিলেন, বিশ্বযুদ্ধে তাঁরা মারা গেছেন। পিওলা শুধু ফ্রান্সের গোলমুখে আশঙ্কার কারণ হলেন না, পা ও মাথা দিয়ে বল দেওয়া-নেওয়া করতে লাগলেন। এগোতে লাগলেন ফ্লাঙ্কে, ঘটাতে লাগলেন বিস্ফোরণ। ফ্রান্সের সেণ্টার ফরওয়ার্ড অস্ট্রীয় গুষ্টি জর্ডান দ্বিতীয়ার্ধে যখন সহজে হার মেনে নিচ্ছিলেন, বোঝা গেল তাদের বিপর্যয় দুয়ারে হানা দিচ্ছে।

ছয় মিনিট পরে কলৌসি ইতালিকে ১-০ এগিয়ে দিলেন। তাঁর ক্রশ সট

সোয়ার্ভ করে ব্যাস্টনের পাশ কাটিয়ে গোলরক্ষক ডি লোর্টোর হাত ছুঁয়ে জালের মধ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু এক মিনিট কাটার আগেই ডেলফোর চমৎকার পাস দিলেন ভিনাস্তকে। পোজো পরে বলেন, এই প্রতিযোগিতায় এমন সুন্দর পাস আর দেখা যায়নি। অস্টন দ্রুত ছুটে গেলেন মাঝখানে এবং বল পেয়ে অ্যালসেশিয়ানের মত বেগবান রাইট ইন অসকার হাইসেরের ১-১ করলেন।

দ্বিতীয়ার্ধে পিওলা সব নিষ্পত্তি করলেন। জর্ডান ও ডিয়াগ্নে একসঙ্গে বোকার মত এগোতে থাকলে বিয়াভাতি ডিয়াগ্নের কাছ থেকে বল ছিনিয়ে নিয়ে মাঝ মাঠে লম্বা পাস দিলেন। পিওলা প্রাণপণ দৌড়ে ২-১ করলেন। এরপরে পিওলা বাঁদিকে বল পাঠালেন কলোসির কাছে। ক্রশফিল্ড বলটি পেলেন বিয়াভাতি। ফ্রান্সের রাইট উইঙ্গার ম্যাটলের বাধা পাওয়ার আগেই বিয়া-ভাতি বল খোঁচা মেরে পাঠালেন পিওলাকে। পিওলার হেডে বল গোলে প্রবেশ করল (৩-১)।

'আমি যাদুকর নই'। খেলা শেষে সানন্দে সাংবাদিকদের কাছে পোজোর মন্তব্য, 'আমি শুধু পিছন থেকে তাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তাদের শুভবুদ্ধি সেইভাবে চলেছে। তাদের প্রজ্ঞা এবং শৃংখলা বাকি কাজটুকু করেছে।' ফেডারেশনের সভাপতি জেনারেল ভাকারো দলের কাছাকাছিই ছিলেন, তিনি চীৎকার করে জয়ধ্বনি দিলেন।

হ্যাট ও জ্যাকেট এবং মেরিন ব্লু শার্ট ও ট্রাউজার্স পরা হাঙ্গেরীয় ম্যানেজার জোসেফ নাগি এলেন সুইডেন-কে নিয়ে সাত হাজার মাইল বিমানে এবং চিন্তিত ও অক্ষম কিউবাকে ৮-০ হারিয়ে দিলেন। রাইট ইন এবং ৩৫ বছর বয়সী অধিনায়ক টোর কেলার ১৯২৪-এর ওলিম্পিক দলে ছিলেন। ফ্রান্সে এসেও একটি গোল করলেন। 'বোম্বোরডিয়ার অফ নরকোপিং' নামে খ্যাত গুস্তাভ চার গোল দিলেন যখন, তখন তার লম্বা চুলগুলি উড়ছিল।

৫-০ হওয়ার পর ফরাসী সাংবাদিক এমানুয়েল গাম্বারডেলা টাইপরাইটার বন্ধ করে রাখলেন! তিনি ঘোষণা করলেন, 'পাঁচগোলের পর সাংবাদিকতাটা পরিসংখ্যানে পরিণত হয়।'

বোরদেও-তে ব্রাজিল—চেকোশ্লোভাকিয়ার ম্যাচটি নিছক খুনোখুনীর ব্যাপার বৈ নয়। একমাত্র সুখদায়ক ঘটনা ছিল খেলার আগের একটি

অভিনব টেলিগ্রাম। ব্রাজিল দলের কাছেই ওটি আসে—'অল উইথ ইউ সিনসিয়ারলি, পোলিশ ফ্রেণ্ডস অফ স্ট্রসবরো'।

খেলনা, অরাজকতা! আর এই ঘটনাবলীর জন্য ব্রাজিলকে ১৯৫৮-র বিশ্বকাপ পর্যন্ত মূল্য দিতে হল। জন্মসূত্রে পাওয়া ফুটবলের প্রতিভাগুলির অপচয় ঘটল। শৃংখলা বা নিয়মকানুন বলে কিছুই ছিল না খেলায়। খেলার পর হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেল একজনের পা চিরতরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত। তিনি নেজলি। প্লানিকার ডান হাত ভাঙা। দারুণ আঘাত লেগেছে কোস্টালেকের পেটে। আহত হয়েছেন, পেরাসিও ও লিওনিডাস। বহিষ্কৃত তিনজন—ব্রাজিলের মাচাডোস ও জেজে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাইট আউট রিহা।

খেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাজিলের রাইট হাফ জেজে অকারণে নৃশংস আঘাত হানলেন নেজলিকে। এমন লাথি মারলেন যে, নেজলি ভূপতিত। হাঙ্গেরীয় রেফারি হার্টকা জেজেকে মাঠের বাইরে পাঠালেন। তৎসত্ত্বেও আধঘণ্টা পরে লিওনিডাসের গোলে ব্রাজিল ১-০ এগিয়ে গেল। বিরতির এক মিনিট পরে রিহা ও মাচাডোসের মধ্যে ঘুষোঘুষি হল।

বিরতির ১৫ মিনিট পরে ডোমিঙ্গোস ডা গুইয়া এমনভাবে চেকো-শ্লোভাকিয়াকে বাধা দিলেন যা কল্পনাতীত। তার প্রতিরোধের সামনে চেকদের দেখে সারা স্টেডিয়াম থমকে গেল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁর হ্যাণ্ডবল হল। নেজলির পেনাল্টি কিকে ১-১ হল। ব্রাজিলের 'কমপ্লিট' গোলরক্ষক ওয়াল্টার বেশ রেগে গিয়ে বললেন, চেকদের একগোলে পিছিয়ে ফেলতে না পারলে তিনি ৩০ হাজার ফ্রাঙ্ক দেবেন। তবে বাজি থেকে পেনাল্টি বাদ পড়বে। অতিরিক্ত সময়েও গোল হল না। ব্রাজিল আপীল করল খেলার ফল নিয়ে। কিন্তু অনুতাপহীন আবেদন বাতিল হয়ে গেল।

এরপর আবার খেলা অর্থাৎ রিপ্লে। এবার দুই দলের মানসিকতা লক্ষণীয়। স্বাভাবিকভাবেই শান্ত, সুস্থ পরিবেশে দারুণ শৃংখলার মধ্যে খেলা আরম্ভ হল। হার্টকার বদলে রেফারি ফ্রান্সের জর্জেস ক্যাপডেভিল। প্রথম খেলার সঙ্গে রিপ্লের বিপরীত পরিবেশ দেখা দেওয়ার প্রধান কারণ বোধ হয় ব্যাপক খেলোয়াড় বদলে। প্রথম ম্যাচে উভয় দলের বহিষ্কার এবং আহত হওয়ার দরুন এই খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়া ছয়জনকে বদল করল, ব্রাজিলের বদলী নয়জন।

ব্রাজিলের নতুন লেফট ব্যাক শল্য-চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডাঃ নারিজ। নারিজ একযোগে তাঁর ক্লাব বোটাফোগো ও রিও পুরসভার চাকুরে। এক বছর ধরে তিনি ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরেছেন এবং গভীরভাবে সব কিছু লক্ষ্য করেছেন। বুদাপেস্টের হাঙ্গারিয়াকে তাঁর খুব পছন্দ ছিল। রিপ্লেতে তিনি নিজের হাতের উপর এমনভাবে পড়লেন যে, তাঁর কব্জির দুটি হাড় ভেঙে গেল এবং বিশ্বকাপ থেকেও বিদায় নিতে হল। ডাঃ নারিজের গোড়ালিও অনুরূপ ক্ষতিগ্রস্ত এবং তিনিও · ···।

আর একটি নতুন মুখের সন্ধান মিলল। ইনসাইড ফরওয়ার্ড এই তিম পরবর্তীকালে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার দারুণ সফল ম্যানেজার হন। বল পায়ে নিয়ে তাঁর যাদু ও টগবগানিতে মনে হল তিনি আর একজন লিওনিডাস। তাঁর ড্রিবলিংও নয়নাভিরাম।

সেমি-ফাইনালে উন্নীত হওয়া নিয়ে ব্রাজিল এত নিশ্চিত ছিল যে, দলের একটা বড় অংশ ফল জানা তো দূরের কথা, খেলা আরম্ভের আগেই মার্সাইয়ে চলে গেল ইতালির বিরুদ্ধে সেমি-ফাইনালের প্রস্তুতির জন্য। কিন্তু ওরা ফিরে এল, যখন শুনল অপরিবর্তনীয় নেজলির বদলে চমৎকার অ্যাটাকিং লেফট হাফ কোপেকি নেমেছেন ও গোল দিয়ে ১-০ এগিয়েছেন। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিল ম্যাচ মুঠোর মধ্যে আনল এবং উজ্জ্বল ফুটবল খেলল। তারা অনায়াসে দুটির বেশি গোল দিতে পারত। লিওনিডাস আবার তুঙ্গে। খেলা শুরুর একঘণ্টা পরে তিনি হার মানালেন প্লানিকার ডেপুটি বার্কার্টকে। দ্বিতীয় গোল আরও দর্শনীয়। ওয়ান্টারকে কেউ বাজির টাকা (ফ্রাঙ্ক) দেননি বটে, তবে এই গোলের জন্য তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। ওয়ান্টার নিজের গোল লাইন থেকে সজোরে বল ছুঁড়ে দিলেন, রবার্টো তাতে ভলি মারতেই বল জালে প্রবেশ করে। ম্যাচের পরে লিওনিডাস সপ্রশংস ছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার লেফট ব্যাক ডাউকিক সম্পর্কে। তাঁর মতে গোটা প্রতিযোগিতায় ডাউকিকের খেলা সেরা মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি স্পেনের ম্যানেজার হয়ে খ্যাতি অর্জন করেন।

সেমি-ফাইনাল

এবার ব্রাজিলের আত্মবিশ্বাস ফলপ্রসূ হল না। পেজো তাঁর 'আজুরি'-কে প্রস্তে রেখে ব্রাজিলিয়ানদের সদর দফতরে গেলেন এবং জানালেন, সেমি-

ফাইনালের পরের দিনে প্যারিসে যাওয়ার বিমানে কোনো আসন পাওয়া যাবে না। ওর সবই ইতালি রিজার্ভ করে নিয়েছে। অবশ্য বিশ্বকাপ খেলতে এসেও ব্রাজিলের আশেপাশে তেমন বেশি ঘনিষ্ঠ লোকজন ছিলেন না। তবে তারা স্বল্প হলেও প্রাণপ্রাচুর্য ভরা। পোজোর কথা শুনে ব্রাজিলিয়ানরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ওইসব কথা তুলছেন কেন ?'

—'কেন জানেন ?' পোজোর প্রশ্ন এবং উত্তর, "আপনারা হারলে বোরদেওয়ে ফিরতে হবে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলার জন্য। আর আমরা যাবো প্যারিসে ফাইনাল খেলতে।'

—'কিন্তু আমরা তো হারছি না।' বড় বড় চোখে ব্রাজিলিয়ানরা জানালেন, 'মার্সাইয়ে আমরাই জিতছি'।

—'আপনারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ?' পোজোর জিজ্ঞাসা।

—'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ নিশ্চিত।' ব্রাজিলিয়ানরা পুনরুক্তি করলেন। দেখা যাক এবার কারা সফল হয়। তবে ব্রাজিল দলে লিওনিডাস ও তিম নেই। তাদের ম্যানেজার পিমেণ্টা বললেন, তিনি দলকে ফাইনালের জন্য প্রস্তুত রাখছেন। পোজো ফিরে এলেন এক্সে। ব্রাজিলিয়ানদের সঙ্গে তাঁর সব আলোচনার কথা নিজের খেলোয়াড়দের জানালেন। খেলোয়াড়রা শুনে বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা মাঠে দেখাব কি করতে পারি।'

ইতালি-ব্রাজিল : রিও থেকে টেলিগ্রাম পাঠালেন ব্রাজিলের ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি লুই আরনাহা তাঁর খেলোয়াড়দের কাছে, 'তোমরা ফাইনালে জিতলে প্রত্যেকে একখানা করে বাড়ি পাবে। ফাইনালে প্রাপ্ত অর্থের অংশও দেওয়া হবে।' ব্রাজিল দলে আটজন বদল হল। রইলেন জেজে ও ম্যাচাডোস। কিন্তু বোরদেও-এ ফেরা থেকে নিবৃত্ত হতে পারল না তারা।

ওলিম্পিয়ান ডোমিঙ্গোস ডা গুইয়ার পক্ষে দিনটি অপয়া ছিল (ডোমিঙ্গোসের ছেলে আদেমির ডা গুইয়া ৩০ বছর পরে ব্রাজিলের পক্ষে খেলেন)। দীর্ঘদেহী পিওলার কাজ হল সকলকে বিরক্ত করা ও রাগিয়ে দেওয়া এবং এদিন তা চরমে ওঠার আগেই কলৌসি বিদ্যুৎগতিতে বল নিয়ে ১-০ করলেন। ডোমিঙ্গোস-এর সঙ্গে পিওলার কিছুক্ষণ দ্বৈত সমর হল, ১৪ মিনিটের পরে পিওলা আবার তাঁকে অতিক্রম করতেই ডোমিঙ্গোস তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিলেন এবং পেনাল্টি থেকে অধিনায়ক মিজ্জা ২-০ এগিয়ে দিলেন ইতালিকে। এর আগের মুহূর্তে মিজ্জার প্যাণ্টটি খুলে পড়ে।

ব্রাজিলের আশা নির্মূল হল এখানেই। তাদের দুটি সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করলেন লিওনিডাসের বদলে আসা পেরাসিও। বিনা আয়াসেই তাদের একটি গোল এল ৮৭ মিনিটে, যখন 'আজুরি' গা ছেড়ে দিয়ে খেলছিল। ইতালি তাই বিমানের বদলে ট্রেন ধরল প্যারিসে যেতে। পোজো স্থির করলেন, খেলোয়াড়দের যারা বেশি ক্লান্ত, তারাই বাঙ্কে শোবে।

হাঙ্গেরি-সুইডেন : 'ইস্পাতে প্রস্তুত' দল নিয়ে সুইডেন কলম্বাসে গেল হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে খেলতে। সেদিন তাদের রাজা গুস্তাভের ৮০তম জন্মদিবস। তা অবশ্য কোনো উপকারে আসেনি। মাত্র পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ডের সময় সুইডেনের নিবার্গ ১-০ এগিয়ে গেলেন। হাঙ্গেরির এতে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তারা রাজসিকভাবে সুইডেনকে পদদলিত করল। বিরতির আগেই সেঙ্গেলার দুটি গোল দিলেন। টিটকোম ৩-১ করলেন। হাঙ্গেরি এমনভাবে খেলতে লাগল যে, দ্বিতীয়ার্ধে খেলাটা চালাতে হয় তাই খেলছে যেন। সারোশি ৪-১ ও সেঙ্গেলার ৫-১ করলেন। ১০টি গোলও হতে পারত। খেলা যে এক-তরফা ছিল তার প্রমাণ একটি পাখি। একটি বড় কালো পাখি মাঠে হাঙ্গেরির দিকে উড়ে এসে বসল এবং দ্বিতীয়ার্ধে বেশিক্ষণ ওইভাবে রইল কোনোরকম বাধা না পেয়ে। একটি আলতো সুইডিশ আক্রমণে সে উড়ে যায়। 'দারুণ ট্রেনিং পেয়ে হাঙ্গেরি এই ম্যাচ খেলেছে'—বললেন প্যারিসের রেসিং ক্লাবের গোলরক্ষক রুডি হাইডেন।

ফাইনালের তিনদিন আগে তাদের বিপদতারক প্রবীণ কেলারকে বাদ দিয়ে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের ম্যাচ খেলতে গেল বোরদেও-য় এবং বিরতির আগেই ২-১ এগিয়ে রইল ব্রাজিলের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়ার্ধে লিওনিডাসের নেতৃত্ব ব্রাজিলকে এগিয়ে নিল। তিনি নিজেই দুটি গোল দিলেন। প্রতিযোগিতায় তার মোট গোল হল আট, অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্কোরার। পাটেসকো পেনালটিতে গোল দিতে অপারগ হলেন। ব্রাজিল ৪-২ গোলে জিতল। ব্রাজিলের সেণ্টার হাফ ব্রান্দাও লক্ষ্য করলেন, 'সুইডেন ভদ্রলোকদের নিয়ে গড়া। তারা বলই খেলেছে। মানুষের দিকে লক্ষ্য ছিল না।'

পোজো ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের সম্পর্কে বললেন, ফুটবল কাকে বলে ব্রাজিল তা দেখিয়েছে, প্রত্যেকের খেলায় নতুন কিছু আছে। তাদের মধ্যে আর একটু সমন্বয় থাকলে অজেয় হত তারাই। মার্সাই-প্যারিসের বিমান কর্মীরা কী-ভাবে তাদের উৎসাহিত করেছিল পোজোর কাছে তা অবিস্মরণীয় হয়ে রইল।

ফাইনাল

ইতালি-হাঙ্গেরি : উদ্বোধন দিবসের ১৫ দিন পরে ১৯ জুন কলম্বাসে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে খেলে বিশ্বকাপে নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখল ইতালি। সেণ্ট জার্মেল-এন-লে তে পোজো আত্মপ্রসাদ নিয়ে বসে রইলেন তাঁর সব প্রস্তাব বিনা বাধায় গৃহীত হওয়ায়। ফাইনালের দল নির্বাচন হল। দলের প্রত্যেকেই জয় সম্পর্কে নিশ্চিত। পোজোর পকেটে তখন একটি টেলিগ্রাম। এসেছে ১৯৩৬-এর ওলিম্পিক দলের এক খেলোয়াড়ের জন্য। এসেছে তার বাবার মৃত্যুর খবর। খেলা শেষে পোজো তার হাতে টেলিগ্রামটি দেন। ফাইনালের আগে দুনম্বর গোলরক্ষক রোমার ম্যাসেটি তার দলকে হাস্য-পরিহাস দ্বারা আনন্দ দিলেন। অপরের চলাফেরা কথাবলা ইত্যাদি অনুকরণের অদ্ভুত কৌশল তাঁর আয়ত্তে ছিল। তাও তিনি পরিবেশন করলেন। ডিনার টেবলে তখন ১ থেকে ১১ পর্যন্ত খেলোয়াড়রা দারুণ সাবধানতা অবলম্বনে বসে নিজ নিজ সংস্কার নিয়ে।

হাঙ্গেরির খেলোয়াড়রা রইলেন ভেসিন্স্ট-এ। তবে দলের একজন নিশ্চয়ই চিন্তামুক্ত হয়ে আছেন। তিনি তাদের নির্বাচক ডাঃ ডিয়েজ। লিলিতে সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালের (দ্বিতীয় রাউণ্ড) আগে তিনি বলেছিলেন, 'জিততে না পারলে আমি হাঙ্গেরিতে ফিরে যাব।'

ওই শুনে জর্জ সারোশি বলেন, 'আপনার বক্তব্য আমরা লিখিত চাই।' তিনি লিখে দিলেন, সইও করলেন। কিন্তু মিনেলি ও আয়েবি বিহীন সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সেঙ্গেলারের সহজ দুই গোল হাঙ্গেরিকে জিতিয়ে দিল। মিনেলি ও আয়েবি জার্মানির সঙ্গে প্রথম রাউণ্ডে খেলার পর ক্লান্ত ছিলেন।

একথা সকলেই স্বীকার করবেন, সারোশি ফাইনালের আগে পর্যন্ত তাঁর সেরা খেলা দেখাতে পারেননি। তিনি ফাইনালে আসল খেলা দেখাতে পারলেই যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর ব্যর্থতার একটি দিক হল খেলার সময় তার মধ্যে 'শয়তানের' আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয় না। বিপক্ষ খেলোয়াড়ের সঙ্গে দৈহিক সংঘর্ষকে তিনি সর্বদা এড়িয়ে চলেন। ইতালীয়দের রোবাস্ট-ফুটবলের বিরুদ্ধে জিততে গেলে ওই ধরনের খেলা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। যাই হোক, হাঙ্গেরির আধ ডজন খেলোয়াড়ের ১৯৩৪-এর বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতা আছে। সেঙ্গেলার বেশ সহজেই এ পর্যন্ত গোলগুলি দিয়েছেন এবং ব্যক্তিগত নৈপুণ্য আশাতীত-

তাবে এখন তুঙ্গে। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে তাদের আসল খেলায় যেন ঈষৎ ঘাটতি রয়েছে। পরবর্তীকালে পঞ্চাশের দশকে তাদের যেমন গোল করার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা দেখা যায়, ১৯৩৮-এ ফ্রান্সে তা ছিল না। তাই আপাততঃ ইতালির একাধিপত্য বজায় রইল।

পোজোর আতঙ্কে ইতালির কোচ নির্দিষ্ট সময়ের পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে কলম্বাস স্টেডিয়ামে পৌঁছলেন। বাসে উঠেই তিনি বেশ বুঝলেন, মুরুব্বি গোছের কেউ বসে আছেন, যাঁদের কণ্ঠে শুধু একটি চীৎকার ইতালীয় ভাষায়—'প্রেস্টো! প্রেস্টো!' তাঁর সমাধানও ছিল সহজ ও দ্রুত। স্টেডিয়ামে খেলোয়াড়দের ড্রেসিং-রুমে ঢুকে তাদের সঙ্গে বদমেজাজ না দেখিয়ে বা অস্থির না করে হাসিখুশি চিত্তে বলতে লাগলেন, আমি তোমাদের পেয়ে অত্যন্ত ভাগ্যবান। তিনি বাসচালককে তক্ষুণি বাস হোটেলে ফেরত নিতে বললেন, জানালেন, খেলতে নামার আগে সভাপতি ভোকারোর আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা চাই যে!

কোচের জন্য আরও একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। মাঠ পরীক্ষা করে যখন তিনি বেরিয়ে আসছিলেন, অমনি তাঁর দুধারে দুজন 'বিশিষ্ট' দেহরক্ষীর আবির্ভাব ঘটল। ওদের একজন বেলজিয়ামের সিলড্রেয়ার্স, আর একজন উরুগুয়ের ফিফা ডেলিগেট। 'আমাদের সঙ্গে আসুন', বললেন তাঁরা। 'আপনি বেশ থাকবেন।' তাঁরা তাঁকে টাচ লাইন থেকে বেশ দূরে বসালেন। ওরা বারংবার জোর করে বলতে লাগলেন, 'আপনি অবশ্যই এখানে বসবেন এবং ম্যাচ চলার সময় খেলোয়াড়দের কোনরকম নির্দেশ দিতে পারবেন না।' তাঁর কাছে এটি দারুণ সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। পোজোরও তাই। বিরতির সময় পোজো খেলোয়াড়দের কাছে গিয়ে বললেন, কী সমস্যায় পড়েছেন তিনি। তবে ওই সমস্যা থেকে কিছুটা মুক্ত হলেন কোচ লুইসিন বারল্যাণ্ডোকে কাছে পেয়ে। এবার খেলা সুরু হতেই পোজো ছটফট করতে লাগলেন কোচের পায়ের কাছে বসে এবং নিজেদের ভাষায় কী সব বলতে লাগলেন। বারল্যাণ্ডো তখন সংক্ষেপে খেলোয়াড়দের নির্দেশ দিতে থাকলেন মাঝে-মধ্যে পোজোর সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে। এজন্য একবার ফরাসী রক্ষী 'গ্যাণ্ডারমে' কর্তৃক গ্রেফতার হতে যাচ্ছিলেন, তা না হলে তাঁদের এই চালাকি মোটামুটি সফল ছিল।

খেলা সুরুর ছয় মিনিট পরে হাঙ্গেরির কর্ণারের পর ইতালি জলে উঠল।

সেরান্তনি বল ক্লিয়ার করে পাঠালেন দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বিভাটি-র কাছে। বিভাটি প্রায় সারা মাঠ ছুটে এগিয়ে মিজ্জাকে পাওয়ার আগে তাঁর বিখ্যাত 'ফুট ওভার দ্য বল'-এর ভড়কি দিলেন। এরপর মিজ্জাকে বল দিলেন। তার কাছ থেকে দ্রুত বল গেল কলৌসির কাছে। একটু ছোঁয়ায় কলৌসি ১-০ করলেন।

এক মিনিটের মধ্যে সারোশি একটু পা বাড়িয়ে দিলেন সাস-এর শক্রপাসে এবং অরক্ষিত টিটকস ১-১ করলেন।

কিন্তু ইতালির ইনসাইড ফরওয়ার্ড মিজ্জা ও ফেরারি অনুকূল পরিবেশে খেলতে লাগলেন। ১৫ মিনিট পরে মিজ্জা বিনা বাধায় পিওলাকে সুযোগ করে দিলেন ২-১ করতে। এখন থেকে ইতালির যেন বলবৃদ্ধি হল। ইতালিকে আর কাবু করা গেল না। বিরতির দশ মিনিট আগে, কেশহীন ফেরারি রাজকীয় ভঙ্গীতে এগিয়ে অরক্ষিত কলৌসিকে বল দিলেন, তারপর তাঁর কাছ থেকে মিজ্জাকে। এবার সোজা কলৌসির কাছে। তিনি দ্রুত পেলেজারকে কাটিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি দেন।

দ্বিতীয়ার্ধের ২০ মিনিটে ইতালির গোলমুখে জটলা হলে সারোশি অভাবনীয় সটে গোলের ব্যবধান হ্রাস করলেন। কিন্তু ভিনজে, লোকাটেলি ও সারোশি নিজে ইতালির রক্ষণব্যূহের কাছে উপর্যুপরি পরাহত হতে থাকেন। কেবলমাত্র লেফট উইঙ্গার টিটকসই কিছু কম বাধা পান। মাঝমাঠে মিজ্জা ও ফেরারি দ্রুত আবার স্বমহিমায় ফিরে এলেন। কলৌসি তো পোলজারকে বারংবার পরাস্ত করতে থাকেন। হাঙ্গেরির রাইট ফ্লাঙ্ক তাঁর সামনে যেন তছনছ হয়ে গেল।

শেষ গোল এল ইতালির দিক থেকে সমাপ্তির দশ মিনিট আগে। বিভাটি ও পিওলা বল দেওয়া-নেওয়া করে এগোলেন এবং সবশেষে বিভাটি গোঁড়ালির দ্বারা বল পাঠালেন সেণ্টার ফরওয়ার্ড পিওলাকে। হাঙ্গেরির গোলরক্ষক সাবো আবার পরাস্ত হলেন (৪-২)।

যোগ্যতম দল হিসাবেই ইতালির জয় হল। তাদের কাপ তাদের কাছেই রইল। খেলা শেষে মিজ্জা ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। উদাসীন রিজার্ভ মঞ্জেগলিও কাঁদছেন। বিভাটি তাঁর মাথা নিজের হাতে রাখলেন। আন্দ্রোলো ঘুরে ঘুরে সকলকে চুমু খেলেন, আলিঙ্গন করলেন। পোজো হতবাক, ট্রেনারের বালতি ভরা জল তাঁর জুতোর মধ্যে ঢালা হচ্ছে।

এরপর যুদ্ধের জন্য একটি যুগ কেটে যায় বিশ্বকাপের খেলা হতে। অপেক্ষা করতে হল ১৯৫০ পর্যন্ত।

প্রথম রাউণ্ড

সুইজারল্যাণ্ড ১ : **জার্মানী ১**
(আবেগ্লেন) (গাউছেল)

বিরতি ১-১

রিপ্লে—**সুইজারল্যাণ্ড ৪** : **জার্মানী ২**
(ওয়ালাশেক, চিকেল, আবেগ্লেন ২) : (হানিম্যান, লোয়েশার আত্মঘাতী)

বিরতি ০-২

কিউবা ৩ : **রোমানিয়া ৩**
(টিউনাস, ম্যাকুইনা, সোসা) (কোভাকি, বারাতকি, ডোবাই)

বিরতি ০-১

রিপ্লে—**কিউবা ২** : **রোমানিয়া ১**
(সোকোরো, ম্যাকুইনা) (ডোবাই)

বিরতি ০-১

হাঙ্গেরি ৬ : **ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ ০**
(কোহাত, তোলডি, সারোশি-২, সেঞ্জেলার-২)

বিরতি ৪-০

ফ্রান্স ৩ : **বেলজিয়াম ১**
(ভিনাস্ত, নিকোলাস ২) (ইসেমবরো)

বিরতি ২-১

চেকোস্লোভাকিয়া ৩ : **নেদারল্যাণ্ডস ০**
(কোস্টালেক, বাউসেক, নেজলি)

বিরতি ০-০

ব্রাজিল ৬ : **পোল্যাণ্ড ৫**
(লিওনিডাস ৪, পেরাসিও, রোমিও) (উইলমোস্কি ৪, পিওনটেক)

বিরতি ৩-১, নির্দিষ্ট সময় ৪-৪

ইতালি ২ : **নরওয়ে ১**
(ফেরারি, পিওলা) (ব্রাস্টাড)
বিরতি ১-০, নির্দিষ্ট সময় ১-১

দ্বিতীয় রাউণ্ড

সুইডেন ৮ : **কিউবা ০**
(অ্যাণ্ডারসন, জোনাসন, ওয়েটারস্ট্রোম ৪,
নিবার্গ ও কেলার)
বিরতি ৪-০

হাঙ্গেরি ২ : **সুইজারল্যাণ্ড ০**
(সেঙ্গেলার)
বিরতি ১-০

ইতালি ৩ : **ফ্রান্স ১**
(কলৌসি, পিওলা ২) (হিসেরের)
বিরতি ১-১

ব্রাজিল ১ : **চেকোস্লোভাকিয়া ১**
(লিওনিডাস) (নেজুলি-পেনাল্টি)
বিরতি ১-১

রিপ্লে—**ব্রাজিল—২** : **চেকোস্লোভাকিয়া—১**
(লিওনিডাস, রবার্টো) (কোপেকি)
বিরতি ০-১

সেমি-ফাইনাল

মার্সাইয়ে
ইতালি ২ **ব্রাজিল ১**
(কলৌসি, মিজ্জা—পেনাল্টি) (রোমিও)
বিরতি ২-০

ওলিভেরি, ফনিওরাভা; সেরাণ্টনি, আন্দ্রোলো ও লোকাটেলি : বিভাটি, মিজ্জা (অধিনায়ক), পিওলা, ফেরারি ও কলৌসি।

ওয়াল্টার : ডোমিঙ্গাস ডা গুইয়া ও ম্যাচাডোস : জেজে, মার্টিন (অধিনায়ক) ও অলফোনসিনহো, লোপেজ, লুইসিনহো, পেরাসিও, রোমিও ও পাটেসকো।

প্যারিসে

হাঙ্গেরি—৫ (সেঙ্গেলার ৩, টিটকস, সারোশি)

সুইডেন—১ (নিবার্গ)

বিরতি ৩-১

সাবো ; কোরাণি ও বিরো ; সালয়,-তুরাই ও লাজার ; সাস, সেঙ্গেলার, সারোশি (অধিনায়ক), তোলডি ও টিটকস।

আব্রাহামসন ; এরিকসন ও কেলগ্রেন ; আমগ্রেন, জ্যাকবসন ও স্ট্যানসট্রোম ; ওয়েটারস্ট্রোম, কেলার (অধিনায়ক), অ্যাণ্ডারসন এইচ, জোনাসন ও নিবার্গ।

তৃতীয় স্থান

বোরদেও-এ

ব্রাজিল—৪ (রোমিও, লিওনিডাস ২, পেরাসিও)

সুইডেন—২ (জোনাসন, নিবার্গ)

বিরতি ১-২

বাটাটো ; ডোমিঙ্গাস ড গুইয়া ও মাচাডোস ; জেনে, ব্রাণ্ডাও ও অলাফানসিনহো ; রবার্টো, রোমিও, লিওনিডাস (অধিনায়ক), পেরাসিও ও পাটেসকো।

আব্রাহামসন ; এরিকসন ও নিলসেন ; আমগ্রেন, লিণ্ডারহোম ও সানস্ট্রোম (অধিনায়ক) ; বারসেন, অ্যাণ্ডারসন এইচ, জোনাসন, অ্যাণ্ডারসন ও নিবার্গ।

ফাইনাল

প্যারিসে

ইতালি—৪ (কলৌসি ২, পিওলা ২)

হাঙ্গেরি—২ (টিটকস, সারোশি)

বিরতি ৩-১

ওলিভেরি ; ফণি ও রাভা ; সেরান্তনি, আন্দ্রোলো ও লোকাটেলি ; বিভাটি, মিজ্জা (অধিনায়ক), পিওলা, ফেরারি ও কলৌসি।

সাবো ; পোনজার ও বিরো ; সালয়, স্থকস ও লাজার ; সাস, ভিনজে, সারোশি (অধিনায়ক), সেঙ্গেলার ও টিটকস।

ফুটবল—৪

ব্রাজিল
১৯৫০



বিজয়ী উরুগুয়ের ব্যাজ

যুদ্ধের জন্য চার বছর পরে পরে নির্দিষ্ট অর্থাৎ ১৯৪২ ও ১৯৪৬-এর বিশ্বকাপ ফুটবল বন্ধ রইল। ১৯৩৮-এ ফ্রান্সের পর আবার দেখা হল ১৯৫০-এ ব্রাজিলে। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ফুটবলের অঙ্গনে নানা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। ১৯৫০-এ বিশ্বকাপকে অনেকেই বলতে লাগলেন জুল রিমে ট্রফির খেলা, ঠিক যেমন ভারতের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতাকে আমরা বলি সন্তোষ ট্রফির খেলা। ১৯৫০-এর বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজনে একটু দ্বিধা দেখা গেল, তবে ফুটবল নিয়ে এমন উত্তেজনা বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম। চরম উত্তেজনা দেশে দেশে, আর তেমনি ধুমধাম।

দক্ষিণ আমেরিকায় বিশ্বকাপের খেলা হয়েছিল শুরুতে ১৯৩০ সালে, যুদ্ধের পরে এবার আবার, তবে ব্রাজিলে। শুধু তাই নয়, এবার আবার মন কষা-কষি, দলাদলি এবং নাম প্রত্যাহারের নানা ঘটনা। স্কটল্যাণ্ডের পরে তুরস্ক নাম প্রত্যাহার করে। তবে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড খেলল।

প্রতিযোগিতার আয়োজন ঘিরে ব্রাজিলের দিকে দিকে দারুণ উৎসাহ। সকলেই উঠে-পড়ে লাগলেন এর সাফল্যের জন্য। সারা দেশে এমন কর্মচাঞ্চল্য যে, এককথায় তা অভূতপূর্ব। আর এই উৎসাহ-উদ্দীপনাই তাদেরকে ছোট্ট মারাকানা নদীর তীরে তিনতলা অতবড় মারাকানা স্টেডিয়াম নির্মাণের সহায়ক ছিল। অতিকায় অট্টালিকাসদৃশ এই স্টেডিয়ামে অনায়াসে দুই লক্ষ দর্শক বসতে পারে। বিশ্বের বৃহত্তম এই স্টেডিয়ামটি তখনও নির্মীয়মাণ, যখন নানা দল ব্রাজিলে একে একে উপনীত হচ্ছে। ঠিক কুড়ি বছর আগে

মন্টিভিডিও-র সেন্টেনারিও (শতবার্ষিকী) স্টেডিয়ামের ঘটনা আর কী ! যে 'সৈনিকরা' স্টেডিয়াম নির্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁদের ডাকা হল এবং বলা হল, 'তোমরা সর্বশক্তি নিয়োগ কর। স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ যেন যথাসময়ে সমাপ্ত হয়।' ফিফা পাঠাল ইতালির ওট্টোরিনো বারাসিকে কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে তাগাদা দেওয়ার জন্য। কিন্তু ফাইনালের দিন দেখা গেল দুই লক্ষ দর্শকের আসন প্রস্তুত। মাঠে ও মারাকানা স্টেডিয়ামের প্রবেশ-পথের আশেপাশে রাজমিস্ত্রীর মালমশলা তখনও কিছু-কিছু পড়ে। গুদামগুলিও ভাঙা হয়নি।

যুদ্ধের আগে ১৯৫০-এর বিশ্বকাপ সম্পর্কে শুধু বুড়িছোঁয়া গোছের আভাস দেওয়া হয়েছিল। তখনই ব্রাজিলে উৎসাহ দেখা দেয়। আর ১৯৫০ যত এগিয়ে এসেছে, ততই সেখানকার জনসাধারণ যেন ফুটবল-পাগল হয়ে পড়েছিল। ব্রাজিলে বিশ্বকাপ গরীবদের কাছে আনন্দবার্তা বয়ে আনল। রিও-র পাহাড়ী এলাকার পাদদেশে যে বিরাট বস্তি এলাকা ছিল, বৃহদায়তন মিনাসজিরিয়াস রাজ্যে যে ঘনবসতিপূর্ণ ছোট ছোট খুপরি ছিল, বিশ্বকাপ তার চেহারা পাল্টে দিল। ব্রাজিলের ফুটবলের শিরোনামে ছিল দীর্ঘকাল ওখানকার কালা আদমীরা। ফুটবল বলতে সর্বাগ্রে তাদেরই বোঝাত। এই কালো খেলোয়াড়দের দেহ ছিল অদ্ভুত নমনীয়। প্রত্যেককে দেখে মনে হত ওরা জিমন্যাস্ট বা ব্যালে নাচিয়ে। ফুটবল সম্পর্কে তাদের ধারণা এতই উন্নত এবং খেলার ধরন এমনই আধুনিক ও কার্যকর যে, প্রতিযোগিতার মাঝে রোমান সংবাদপত্রগুলি ব্রাজিলের খেলা সম্পর্কে চিৎকার করে উঠল তাদের ভাষায়—'কাম রেসিসটার ?' অর্থাৎ কে এদের আটকাবে ? নিগ্রো বর্ণসঙ্কর ও শ্বেতকায় বর্ণসঙ্করা তখন ব্রাজিল ফুটবলকে ঝলমলে করে তুলেছেন। তাঁদের আগে ফুটবলের টেকনিক যেন শেষ পর্যায়ে এসে ধাক্কা খেয়েছিল। কোপাকাবানা সমুদ্র সৈকতের শক্ত বালির চরে গ্রীষ্মের মাঝরাতেও ফুটবল অনুশীলন চলত এবং তখন খেলোয়াড়রা বিস্ময়কর খেলা দেখাতেন। রিও-র যে হোটেলে ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা থাকতেন তার সামনে নিউক্যাসল তথা ইংল্যাণ্ডের ফরওয়ার্ড জ্যাকি মিলবার্ণকে একদিন একটি ছেলে গতিরোধ করে দাঁড়াতেই জ্যাকি বললেন, 'বাছাধন, যা করছ, কর। খোসা ছাড়িয়ে কমলালেবু খাও তো।' বালকটি ওই শুনে ওই খোসা নিয়ে ম্যাজিক দেখাতে লাগল। ক্লান্ত হয়ে তবে সে পথ ছাড়ে। আসলে মিলবার্ণ ঘনঘন হোটেল থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তাই গতিরোধ।

১৯৪৬ সালে ব্রিটেনের চারটি অ্যাসোসিয়েশন ফিফা-য় ফিরে এল। বিশ্বকাপ কমিটি জানালেন, ব্রিটিশ চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে দুটি দলকে বিশ্বকাপের 'কোয়ালিফাইং জোন'-এ রাখা হবে। ফিফা-র প্রস্তাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্কটল্যাণ্ড বলল, আমরা ব্রিটিশ চ্যাম্পিনিয়ানশিপের মালা না নিয়ে প্রতিযোগিতায় আসছি না। এপ্রিলে ইংল্যাণ্ডের হ্যামডেন পার্কে চিরাচরিত প্রতিযোগিতা শুরু হল। চেলসি-র রয় বেনেটি-র গোলে ইংল্যাণ্ড বিজয়ী হল। স্কটল্যাণ্ড বেশ লড়েছিল, একবার তাদের বল্ড-এর শট ইংল্যাণ্ডের বারে লেগে ফিরে যায়। স্কটল্যাণ্ড জিততে পারল না, কথার খেলাপও করল না। বলল, জিততে যখন পারিনি. যাবই না বিশ্বকাপে। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক বিলি রাইট স্কটল্যাণ্ডের অধিনায়ক জর্জ ইয়ং-এর কাছে গিয়ে বোঝালেন, ব্রাজিলের বিশ্বকাপে স্কটল্যাণ্ডের উপস্থিতির খুব প্রয়োজন আছে। একা ইংল্যাণ্ড গেলে গুরুত্ব হ্রাস পাবে। কিন্তু ইয়ং কোনো কথাই শুনলেন না।

ব্রাজিলে কেবল স্কটল্যাণ্ডই অনুপস্থিত রইল না। আর্জেন্টিনা ব্রাজিলিয়ান ফেডারেশনের সঙ্গে বড় রকমের ঝগড়ায় মাতল এবং ১৯৩৮-এর আচরণের পুনরাবৃত্তি দেখা গেল, বিশ্বকাপ থেকে আবার তারা নিজেদের বহুদূরে সরিয়ে রাখল। যুদ্ধের পরে যে চেকোশ্লোভাকিয়ার পুরনো শক্তিতে ফিরতে দীর্ঘকাল কাটে, তারাও বিশ্বকাপ নিয়ে ন্যক্কারজনক সমালোচনায় অবতীর্ণ হল।

ফ্রান্সের ব্যাপারটা অন্য ধরনের এবং বেশ মজার। তাদের গ্রুপে যুগোশ্লাভিয়া বিজয়ী হয়। কিন্তু তুরস্ক ৭-০ গোলে সিরিয়াকে হারিয়েও যখন এল না, তখন ফ্রান্সকে আমন্ত্রণ করা হল। কেননা. প্যারিসেই বিশ্বকাপের জন্ম ও তার শৈশব কেটেছিল যে! ট্রফিটিও গোটা যুদ্ধের সময় প্যারিসে নিজের বিছানার নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন ফিফা সভাপতি জুল রিমে। তাঁরই পরম সুহৃদ হেনরি ডেলনে বিশ্বকাপ কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন। তিনি চেয়েছিলেন আগের মত নক-আউট পদ্ধতিতে খেলা। তার বদলে এবার হল পুল ভাগ করে।

ফ্রান্স বিশ্বকাপে খেলতে রাজি হয়ে পরীক্ষামূলক দল পাঠাল বেলজিয়ামে এবং ১-৪ গোলে হেরে গেল। হারল স্বদেশের মাঠে স্কটল্যাণ্ডের কাছেও এবং অন্য চিন্তা শুরু করল। তাদের পরবর্তী খেলা কোথায় এবং কার সঙ্গে সে সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা চলল নানা মহলে। আর তা নিয়ে ওরা বেশ বিরক্ত হল। নিজ গ্রুপে উরুগুয়ে ও বলিভিয়ার মতই তাদের হাল। আর তাই তাদের

পরবর্তী খেলা পড়ল রিসাইফ থেকে দু-হাজার মাইল দূরে পোর্টো আলেক্রে-তে। ফ্রান্সও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানাল, অসম্ভব। খেলার স্থান বদল না হলে আমরা বাড়িতেই বসে থাকব। ব্রাজিলিয়ান ফেডারেশন মত পরিবর্তন করলেন না নানা জ্বালাতন সত্ত্বেও। ফ্রান্স নাম প্রত্যাহার করে নিল। ব্রাজিল জানাল, ১৯৩৮-এ তারা স্বেচ্ছায় ফ্রান্সের চারটি শহরে খেলেছিল স্বল্প সময়ের ব্যবধানে। ব্রাজিলের এ যুক্তিটা অবশ্য এখানে প্রযোজ্য হতে পারে না।

কোনো সন্দেহ নেই প্রতিযোগিতার আয়োজন, খেলার স্থান নির্বাচন, তালিকা তৈরি ইত্যাদির দ্বারা ব্রাজিলের অনেক সুবিধা হয়েছিল। তাদের ছয়টি খেলার মধ্যে একটির পর একটি রিওতে হয়েছে। অথচ অন্য দলগুলিকে এত বড় দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে হয়েছে একটি ম্যাচ শেষে আর একটি খেলতে। বরং প্রতিটি গ্রুপকে একই জায়গায় বা কাছাকাছি কোথাও খেলার ব্যবস্থা করাই উচিত ছিল। অবশ্য রিও-র কুয়াশাচ্ছন্ন, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া বিদেশী দলগুলির পক্ষে অনুকূল ছিল না।

পোর্তুগাল রাজি হয়নি স্কটল্যাণ্ডের বদলে খেলতে। তাই ১৯৩০-এর মত 'অশুভ' ১৩টি দল নিয়ে বিশ্বকাপের খেলা শুরু হল এবারও। উরুগুয়ে তাচ্ছিল্যভরে খেলে হারিয়ে দিল বলিভিয়াকে। আশ্চর্যের কথা, তাদের গ্রুপে ওরা দুটি দল মাত্র। চারটি দলের গ্রুপ থেকে কাউকে ওদের মধ্যে পাঠান হল না। আরও বিস্ময়ের কথা, ভৌগোলিক অবস্থান দেখেও গ্রুপ তালিকা তৈরি হয়নি।

এবার অনুপস্থিতদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জার্মানী। যুদ্ধের ক্ষত তারা পুরো সেরে উঠতে পারেনি এবং ফিফা থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে রাখল। ১৯৪৮-এর ওলিম্পিকসে সুইডেনের কাছে ০-৩ গোলে হারে অস্ট্রিয়া। তাই তারা মনে করল আন্তর্জাতিক ফুটবলে তারা এখনও নবীন। কিন্তু বিশ্বকাপ থেকে সরে থাকার এটা বোধ হয় ছেঁদো যুক্তি। কারণ প্রতিযোগিতার কিছু আগে তারা ইতালিকে হারিয়েছিল। ১৯৫৪-র মধ্যে নিশ্চয়ই তারা আরও পোক্ত হয়ে ওঠে।

লৌহ-যবনিকার অন্তরাল থেকে রাশিয়ার মত হাঙ্গেরিও বেরিয়ে এল না।

দু'বারের বিজয়ী ইতালি: ১৯৩৪ ও ১৯৩৮-এর বিজয়ী ইতালি এল নানা সংশয় নিয়ে। ১৯৪৯ এর মে মাসে ভয়াবহ সুপারগা বিমান দুর্ঘটনায় তাদের সব আশা ও ভরসা নির্মূল হয়েছে। ওই বিমানে তাদের সেরা

খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া তোরিনো দল ফিরছিল লিসবন থেকে প্রীতি ম্যাচ খেলে। বিমানটি পাহাড়ের গায়ের একটি মঠের সঙ্গে ধাক্কা খায়। সব খেলোয়াড়ই নিহত হল। ওদের মধ্যে ছিলেন ইতালির জাতীয় দলের আটজন। ছিলেন বিচক্ষণ অধিনায়ক ও লেফট ইন ভ্যালেন্তিনো মাজোলা (এঁর ছেলে ১৯৭০-এর বিশ্বকাপের ফাইনালে দারুণ খেলেন), দুর্ধর্ষ লেফট ব্যাক মারোসো এবং তাদের সেরা গোলরক্ষক।

পোজো এই বছরই হতাশ হয়ে ইতালীয় ফুটবলের কর্তৃত্ব ছাড়লেন। তিনি সবচেয়ে বিরক্ত হন ইতালীয় ফুটবল ব্যবসায়িক হয়ে পড়ায়। তাছাড়া তাঁর 'সিস্টেমো' তিন ব্যাকের খেলা বদলে গেছে, নেই তাঁর অতিপ্রিয় ট্যাকটিকস্ 'মেটেডো'। পোজোর জায়গায় এলেন তোরিনো-র সভাপতি ফেরাসিও নোভো এবং তাসক্যানের সাংবাদিক আলদো বারদেলি। বারদেলির চোখের সামনে সেই ভয়াবহ বিমান-দুর্ঘটনার কথা ভাসছে। তিনি ব্রাজিলে বিমানে যেতে রাজি হলেন না। সঙ্গে কয়েকজন ইতালীয় খেলোয়াড় রইলেন। কিন্তু দীর্ঘ সমুদ্রপথ খেলোয়াড়দের একঘেঁয়েমী এনে দিল, তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং খেলার আগে তাদের সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার সময় রইল না। আরও উল্লেখ্য ঘটনা বারদেলি এবং নোভোর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঠিক কুকুর-বিড়ালের মত কলহ হত। প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই বারদেলিকে তাঁর ক্ষমতা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হল। 'নবীন' দল হলেও কয়েকজন খেলোয়াড় ছিলেন প্রতিভাবান। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীই কাল হল।

সুইডেন : প্যারাগুয়ে ও সুইডেনের গ্রুপে ইতালি খেলল। ১৯৪৮-এর অলিম্পিকসে সুইডেনের জয়ের পর ইতালির ক্লাবগুলি পুষ্ট হয়েছিল সুইডেন থেকে 'ছিনতাই' করে আনা খেলোয়াড়দ্বারা। চারজন ফরওয়ার্ডকেও নিয়ে যাওয়া হয়। সুইডেনের ম্যানেজার ছিলেন খর্বকায় কর্মযোগী ইয়র্কশায়ারী জর্জ রেণর। তিনি সব খেলোয়াড়কে এক জায়গায় রেখে অবাক হওয়ার মত গতিসম্পন্ন করে গড়লেন এবং এমনভাবে প্রস্তুত করলেন যাতে তারা ব্রাজিলে কোয়ালিফাই হতে পারে। গেরিলা জেনারেলের প্রতিভাসম্পন্ন রেণরের সুইডিশ দলকে ১৯৫৩-য় পুনরায় অনুরূপভাবে শক্তিহীন করা হলেও, সুখের কথা, তারা হাঙ্গেরির সঙ্গে ২-২ করল বুদাপেস্টে, এবং এরই কয়েক সপ্তাহ আগে ওয়েমব্লিতে সুইডেন হারায় ইংল্যাণ্ডকে। রেণরকে দলের সকলেই ভাল-বাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। রদারহাম ও অ্যাল্ডারশট ক্লাবে তিনি রাইট আউট

ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ তাঁর জীবনে নাটকীয় পরিবর্তন আনে। বাগদাদের স্টাফ কলেজে গেলেন শারীর-শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে। ওখানেই একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল দল গড়লেন। তিনি এত দ্রুত ওই কাজে সফল হলেন যে, ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশানের (এফ. এ.) সম্পাদক আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান স্ট্যানলি রাউসেরও দৃষ্টি পড়ল। এফ. এ.-ই ১৯৪৬ সালে তাঁকে অ্যাল্ডারশটের রিজার্ভ টিম ট্রেনার থেকে ঝটিকাবেগে সুইডেনের জাতীয় দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব পাইয়ে দিল।

রেণর তাঁর কোচিং-এর রীতি অনুসারে সর্বপ্রতিভার সমাহার করলেন, আগামী দিনের খেলোয়াড়দের নিলেন এবং প্রত্যেককে নিয়ে পৃথকভাবে ঘষা-মাজা শুরু করলেন। আর অবশেষে সুইডেন সত্যিই শক্তিমান হল। হ্যান্স জেপসন নামে একটি চাবুক ছেলেকে পেলেন, রেণরের আশ্রিত হয়ে রইল জেপসন। রেণর একলহমায় বুঝলেন পরবর্তীকালে সে উঁচুদরের সেণ্টার ফরওয়ার্ড হবে এবং তাকে সেইভাবে গড়াপেটার কাজে লাগলেন প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। শুরুতে তার ট্রেনিং সীমিত রইল শুধু নিখুঁত শটে।

রিও-তে পৌঁছে সুইডেন একটি শীর্ষস্থানীয় ক্লাবকে হারাল। বিদেশে এসে এই প্রথম খেললেন তাঁর দুই ইনসাইড ফরওয়ার্ড পামার ও স্কোগ্লাণ্ড। খেলা শেষে তাঁরা বাহবা পাওয়ার জন্য রেণরের কাছে গিয়ে পেলেন ভর্ৎসনা। তিনি বললেন, তাঁরা দুজন ধীরগতিতে খেলেছে এবং পুরো খেলা ঝুলিয়ে দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য ওঁরা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

স্টকহম-এর 'নাকা' স্কোগ্লাণ্ডের বয়স মাত্র কুড়ি। বিশ্বকাপের খেলায় যথাসময়ে অনুকূল পরিবেশে আবির্ভূত হলেন। তিনি 'আইক' স্টকহমে যোগ দেন একটি তৃতীয় ডিভিশনের ক্লাব থেকে এবং ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়ে দারুণ খেলেন। খর্বকায় হলে কি হবে, বাঁ পায়ের চমৎকার বল-প্লেয়ার। ডাবলিনে যে পামারের শুটিংই পরাস্ত করেছিল আয়ারল্যাণ্ডকে, সেই পামারও স্কোগ্লাণ্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ইংল্যাণ্ড: ইংল্যাণ্ড এই প্রথম পুরো সময়ের জন্য চুক্তি করে দলের ম্যানেজার নিয়োগ করল। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ ল্যাংকাশায়ারের ওয়ালটার উইনটার বটম এই দায়িত্ব নেন ১৯৪৬-এ ওলডহামের কাছ থেকে। লম্বা, সুন্দর চেহারার উইনটার বটম ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সেণ্টার হাফ ছিলেন। তারপর যান কার্নেগী কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশনে শিক্ষা

নিতে। যুদ্ধের সময় তিনি রয়্যাল এয়ার ফোর্সে চাকরি করে প্রমোশন পেয়ে অনেক উঁচু:তে ওঠেন।

প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার এই মানুষটি ছিলেন অসম্ভব নিষ্ঠাবান, কোচিং-এর প্রধানের দায়িত্ব ও ম্যানেজারশিপের সমন্বয় ঘটালেন এবং কাজ শুরু করলেন নিত্যপূজার মতই। অন্যরা উপলব্ধি করলেন উইনটার বটম কখনও এমন গুরু দায়িত্ব এত যত্নসহকারে পালন করেননি। সম্ভবত তিনি এবং তাঁর সমর্থকরা ব্রিটিশ ফুটবলের প্রতিক্রিয়াশীলতার মুখোস বদলে দিলেন। তবে বিশ্বকাপ জয়ের জন্য এটাই প্রকৃত পন্থা ছিল না। ইংল্যাণ্ডের পেশাদার ফুটবলাররা শুরুতে উইনটার বটম সম্পর্কে বেশ সন্দিহান ছিলেন, তাঁরা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন—স্ট্যানলি ম্যাথিউস-এর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়কে নিজের খেলা খেলতে দেওয়া হয় যেন। তাঁরা এই প্রতিশ্রুতি লিখিতও চাইলেন। তবে উইনটার বটম সম্পর্কে প্রকৃত প্রধান অভিযোগ ছিল—তিনি কখনও কঠিনতম ট্যাকটিক্সগুলি প্রয়োগ করতেন না বা খেলোয়াড়দের ওপর চাপাতেন না। আর তাঁর যত গুণই থাক, তিনি কখনও খেলোয়াড়দের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারেননি। ক্লাব পরিচালনায় তার যে অনভিজ্ঞতা ছিল তা শোধরাবার চেষ্টাও করেননি। উপরন্তু ক্লাব পরিচালকদের ধামাধরা নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তিনি দায়িত্ববদ্ধ ছিলেন এবং তাঁকে অন্যদিকে একজন সরকারী অফিসারের মত মনে হত ; অর্থাৎ সরকারের পতন হলেও অফিসাররা যথারীতি যেমন নিজ নিজ পদে বহাল থাকেন। স্যার স্ট্যানলি রাউস তাঁর অবিসংবাদী পরামর্শদাতা ছিলেন এবং তিনি মাঝে মাঝে সামান্য পুরোহিতের ভূমিকাও নিতেন, তবুও ম্যানেজারের সঙ্গে খেলোয়াড়দের সম্পর্কটা ছিল অফিসারের সঙ্গে সাধারণ কর্মীর বা জনসাধারণের সঙ্গে খেলোয়াড়দের ব্যবহারের মত। পরে আলফ রামসে ম্যানেজার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়।

প্রতিভাবান খেলোয়াড-পুষ্ট হয়ে ইংল্যাণ্ড দল ব্রাজিলে এল অন্যতম ফেভারিট হিসাবে। কিন্তু গত পাঁচ বছরের সেণ্টার হাফ স্টোক সিটির নিল ফ্রাঙ্কলিন দল বদল করায় বেশ ক্ষতি হল। একটু বাঁকা পথে যাওয়াতেই তিনি বিশ্বকাপের খেলা থেকে বঞ্চিত হন। প্রথমত তিনি তখন সবেমাত্র বাবা হয়েছেন এবং হঠাৎ চলে গেলেন বগোটায় আর সেখানকার সান্তা ফে ক্লাবে সই করলেন। কলম্বিয়া তখন ফিফা-র বাইরে এবং বুয়েনস আয়ার্স থেকে বড়

বড় খেলোয়াড়রা বেরিয়ে এসেছেন। এঁদের মধ্যে সবার উপরে রসি ও ডি. ষ্টিফানো। আসলে বোধ হয় এই জন্যই আর্জেন্টিনা ব্রাজিলে আসেনি। ফ্রাঙ্কলিন ইংল্যাণ্ডে নিজের স্থান হারালেন, ওদিকে বগোটাও তার কৃতী খেলোয়াড়দের দ্বারা পুষ্ট হল না। অর্থাৎ ফ্রাঙ্কলিনের খেলোয়াড়-জীবনে দুঃখময় অধ্যায় শুরু হল। দ্রুত তিনি স্বদেশে ফিরে এলেন, হাল সিটি দলে যোগ দিলেন, কিন্তু তাঁকে সাসপেণ্ড করল ইংল্যাণ্ডের জাতীয় ফুটবল সংস্থা। ফ্রাঙ্কলিন যবনিকার অন্তরালে চলে গেলেন।

তবুও তো রইলেন রাইট, রামসে, ফিনি এবং মর্টেনসেন, মানিয়ান ও ম্যাথিয়ুস। এই ম্যাথিয়ুস সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের নির্বাচকমণ্ডলীর অগাধ বিশ্বাস। চমৎকার খেলোয়াড় ম্যাথিয়ুস ; এবং এই অর্থে সকলে তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। অতি সহজে মাঠময় ছোটাছুটি করেন, তিনি অপ্রতিরোধ্য এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রাইট আউট, ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ১৯৩৪ থেকে খেলছেন, এখন এই ১৯৫০-এ বয়স ৩৫ বছর ; কিন্তু ফুটবল মাঠে এখনও সেই ১৮ বা ২০ বছরের তরুণ। একটুও ভাঁটা পড়েনি তাঁর আসল খেলায়। তাঁর চমৎকার সোয়ার্ভ মার আজও অব্যাহত। ম্যাথিয়ুসের কথাতেই বলি, 'বিপক্ষের চাপে ওগুলো বেরিয়ে আসে আগের মতই।' ম্যাথিয়ুসের জন্য টম ফিনির দলে প্রবেশ নেতিবাচক হয়ে উঠেছিল। তাঁর দুই পা সমান শক্তিমান হলেও ম্যাথিয়ুস যেখানে রয়েছেন (রাইট আউট), সেখানে ফিনির কথা আসে কেমন করে! কিন্তু ফিনি লেফট আউট ও ম্যাথিয়ুস রাইট হলে তো আপত্তি নেই! ইংল্যাণ্ড তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতই শক্তিশালী যেন। ওঁরা দুজন ওই দুই পজিশনে খেলায় লিসবনে ইংল্যাণ্ড দশ গোল করেছিল, তুরিণে চার গোল। তবে ঈর্ষান্বিত হয়েই, ম্যাথিয়ুস আগের মত নেই ভেবে বেকায়দায় ফেলতে এফ. এ. একাদশের উত্তর আমেরিকা সফরে তাঁকে ডাকা হল। দীর্ঘপথের ট্রেন-ভ্রমণের ক্লান্তি সত্ত্বেও এফ. এ. দল হারাল যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ দলকে।

উলভারহ্যামটনের গোলরক্ষক সোনালী চুলের, রবারের মত স্থিতিস্থাপক ও দীপ্তিশীল অ্যাথলীট বার্ট উইলিয়মস বিখ্যাত ফ্রাঙ্ক সুইফটের উত্তরাধিকারী। এর আগের নভেম্বরে টটেনহামে তিনি ইতালির প্রচণ্ড আক্রমণকে দারুণভাবে রুখে দেন। তা না হলে একাধিক গোল খাওয়া অবধারিত ছিল। পরাজয়ের বদলে ইংল্যাণ্ড জিতেছিল ২-০ গোলে। পরিশ্রমী এবং সৃজনশীল রাইটব্যাক আলফ রামসে সেদিন খেলেন এবং মাঝে মাঝে যেন আগুন ছড়াচ্ছিলেন। এই

'জেনারেল'ই পরবর্তীকালে উইনটার বটমের উত্তরাধিকারী হন। আর বিলি রাইট? সুন্দর কেশের এই উইং হাফ ও অধিনায়ক সব সময় হাসিখুশি, 'ছেলেমানুষ' এবং সকলের কাছে মাথানতকারী বিনয়ী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। রাউস ও উইনটার বটমের মাঝে ইংল্যাণ্ডের ফুটবলে আর এক অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি ইংল্যাণ্ডের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন। ১০৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেললেও তিনি 'বড় খেলোয়াড়' হননি, কিন্তু 'ভাল খেলোয়াড়ের' তালিকাভুক্ত হন। রক্ষণভাগে তাঁর জুড়ি ছিল না। সকলের তুলনায় বেঁটে হলেও সেণ্টার হাফে বিলি রাইট থাকলে নিশ্চিন্ত। তবে তাঁর ভাগ্য কিছুটা মন্দ ছিল, কেমন যেন নিজের খুশিতে পাস দিতেন। তাছাড়া তিনি যা মারাত্মক ট্যাকল করতে পারতেন, তার দ্বারা চার ব্যাক পদ্ধতির আগের ওই যুগে একজন আদর্শ দ্বিতীয় স্টপার হতে পারতেন।

ইনসাইড ফরওয়ার্ড স্ট্যানলি মর্টেনসেন ও উইলফ ম্যানিয়ন সম্ভবত আগের মত আর তুঙ্গে না থাকলেও এখনও তাঁদের ধারে-কাছে আসার মত খেলোয়াড় কদাচিৎ দেখা যায়। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মর্টেনসেন আদতে শ্লথ গতির থাকলেও কয়েক বছরের মধ্যে অসম্ভব গতিসম্পন্ন হন। যুদ্ধকালে বিমান-দুর্ঘটনায় পড়ে বেঁচে যাওয়া বোধহয় তাঁকে দুঃসাহসী করেছিল এবং খেলার মধ্যেও দেখা যায় তিনি অসমসাহসী গোলদাতা; ব্ল্যাকপুলে তিনি ম্যাথিয়ুসের সতীর্থ ছিলেন। মিডলবরোর ম্যানিয়নেরও যুদ্ধের অভিজ্ঞতা প্রচুর। তিনি সবকিছু দ্রুত করেন এবং সৃজনধর্মী খেলোয়াড়। তিন বছর আগে গ্লাসগোয় ব্রিটেন যখন অবশিষ্ট ইউরোপকে ৬-১ গোলে হারিয়েছিল, ম্যানিয়ন ছিলেন সেদিনের সেরা। ব্রিটেন তখনই ফিরে এল ফিফা-য়। সেণ্টার হাফে ফ্রাঙ্কলিনের জায়গায় এলেন লিভারপুলের তরুণ লরী হুগেস।

ইংল্যাণ্ডের গ্রুপে এল দুই চমৎকার উইঙ্গার বাসোরা ও গেইঞ্জা-কে নিয়ে স্পেন; চিলির অধিনায়ক তখন নিউক্যাসলের জর্জ রোবলেডো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই গ্রুপে।

ব্রাজিল: ব্রাজিলের কোচ তখন রোমানদের মত গোঁফওয়ালা ফ্লেভিও কস্টা। মাসে তখন তাঁর এক হাজার পাউণ্ড আয়। সাফ বলে দিলেন, বিশ্বকাপের অনেক আগে—এবার ১৯৩৮-এর পুনরাবৃত্তি হবে না। রিও-র বাইরে চার মাস একটি বাড়িতে আটকে রেখে কঠোর প্রশিক্ষণ দিলেন খেলোয়াড়দের। সেই বাড়িতে কী না ছিল—সুইমিং পুলও। সারা বাড়ি আধুনিক সাজে

সাজিয়ে দিয়েছিলেন ফুটবলারদের জন্য রিও-র একটি সংস্থার পরিচালক-মণ্ডলী। বিবাহিত খেলোয়াড়দের ওই ক'মাস স্ত্রীর মুখ দেখাও নিষিদ্ধ ছিল। দশটা বাজলেই রাত্রে শুয়ে পড়তে হত। ঠিক তার আগে ভাল ঘুমের জন্য ভিটামিনযুক্ত পানীয় দেওয়া হত প্রত্যেককে।

প্রাথমিক পর্যায় : মারাকানা স্টেডিয়ামে বর্ণাঢ্য পরিবেশে প্রতিযোগিতা শুরু হল। কিন্তু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমন ভিড় হল যে, ট্রাফিক জ্যামের চোটে শত শত মোটর গাড়ি বহুদূরে রেখে দর্শকদের হেঁটে হেঁটে মারাকানা স্টেডিয়ামে যেতে হল। স্টেডিয়ামের অনেক প্রবেশপথ তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। বাকিগুলির মুখ বন্ধ হয়ে গেল জনতার ভিড়ে। শ'য়ে শ'য়ে লোক উঠল রাজমিস্ত্রীদের ভারার উপরে। আর তার কিছু পড়ল ভেঙে। যখন ব্রাজিল দল সাদা-নীল শার্ট পরে স্টেডিয়ামে ঢুকল, তখন ২৯ বার তোপধ্বনি করে তাদের স্বাগত জানানো হল। আর জনসাধারণ রঙ-বেরঙ-এর বাজি পোড়াল। আকাশ ভরে গেল খেলনা বেলুনে, ব্রাজিলিয়ান সেনাবাহিনী পাঁচ হাজার শ্বেত পায়রা উড়িয়ে দিল, আর বিমান থেকে হাজার হাজার পুস্তিকা, হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করা হল। কেন জানি না, তবে সম্ভবত অহং ভাব বজায় রাখতে মেক্সিকানরা স্টেডিয়ামে প্রবেশ করলেন হৈ-চৈ-এর পনের মিনিট বাদে। তাছাড়া তাঁরা বোধ হয় ভেবেছিলেন ব্রাজিলের স্বাগত অনুষ্ঠানের মধ্যে স্টেডিয়ামে যাওয়া উচিত নয়।

খেলাটা ছিল একেবারে বিরক্তিকর। কোনরকম শক্তি প্রয়োগ না করে ব্রাজিল চার গোলে জিতল। শক্তিমান কৃষ্ণকায় বালটাজার সাময়িকের জন্য সেণ্টার ফরওয়ার্ডে খেললেন, পাশেই সেই বর্ণময় ব্যূহভেদকারী আদেমীর এবং জেয়ার। এঁরা তিনজনই গোলগুলি দেন, আদেমীর একা দুটো। অদ্ভুত বল-প্লেয়ার জেয়ারই শুধু বিপক্ষকে হারাতে কেমন যেন নিষ্ঠুরভাবে উঠে-পড়ে লাগেন। ব্রাজিল তিনব্যাক প্রথায় খেলল না। তার বদলে দেখা গেল তারা আত্মরক্ষার পদ্ধতি নিয়েছে, খেলছে 'ডায়াগোনাল ফুটবল এবং তার দ্বারা সুন্দর সেণ্টার হাফ ডানিলো মাঝমাঠের রাজা হয়ে অনেক বেশি কার্যকর তাঁর খেলায়। লেফট হাফ বিগোড এই পদ্ধতিতে অনেক এগিয়ে খেলেন। যতক্ষণ সেই দলের খেলা তুঙ্গে থাকে, ততক্ষণ এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর হয়, কিন্তু উরুগুয়ের মত শক্তিশালীদের সামনে পড়লে তো আত্মরক্ষা করতে হবে, তখন এই পদ্ধতির দুর্বলতা ধরা দেবে, মাঝে মাঝেই 'গ্যাপ' দেখা দেবে।

সাওপাওলো-য় সুইডেন হারিয়ে দিল ইতালিকে। ইতালীয়রা পরাজয়ের জন্য নিজেদেরই দায়ী করল। নোভো দুর্বল দল নিয়েই ব্রাজিলে এসেছিলেন। সত্যি বলতে কি তিনি পাননি 'বিষবৎ' বেনিটো লোরেন্‌জিকে। এই সেরা ইনসাইড ফরওয়ার্ড আহত থাকায় তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করতে হল প্রবীণ লেফট হাফ আলডো কাম্‌পটেলিকে দিয়ে: যুদ্ধের আগের সময়ের এই খেলোয়াড়ের 'খেলা' বলে কিছুই ছিল না ১৯৫০-এ। সব মিলিয়ে তাঁকে মাঠে হাস্যকর মনে হল।

সম্প্রতি ইতালির যে দ্বিতীয় দল মিলানে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় দলকে ৫-০ গোলে হারায় তাদের কয়েকজনকে নিয়ে দল গড়া হলেও তাদের খেলায় কোনো সঙ্গতি ছিল না। সবচেয়ে বোকামি হয়েছিল প্রতিভাধর ও চৌখশ ইণ্টারের আমাদেও আমাদিকে বাদ দিয়ে। সেই জন্মসূত্রের সেণ্টার ফরওয়ার্ড, লম্বাটে, পাখির মত বিচরণকারী জিনো কাপেলো—মিলানে যিনি ইতালির জয়রথের চাকা ঘূর্ণায়মান রেখেছিলেন সম্প্রতি, তাঁকে এখানে নিষ্প্রভ করে দিলেন গানার ও বার্তিল-এর ভাই নুড নরডহাল। ইতালির বেশ লম্বা, চতুর সেণ্টার হাফ কার্লো পারোলার খেলাকে সুন্দর কেশের জেপসন পিছু ধাওয়া করে ঝিমিয়ে দিলেন। গোলে সেণ্টিমেণ্টি-ও এই প্রথম এত বাজে খেললেন। সুইডেনের তিনটি গোলের দুটি তাঁর ঠেকান উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তা পারেননি। তাদের সমগ্র রক্ষণভাগের দুর্বলতাও কম দায়ী নয়।

ইতালীয় ব্রাজিলীয় দর্শকদের সামনে ইতালির শুরুটা বেশ ভাল হল, আর এই দর্শকরা বেশ সোচ্চার ছিলেন ইতালির পিছনে। ইতালির অধিনায়ক প্রতিভাধর লেফট আউট রিকার্ডো কারাপিলিস সাত মিনিটের মধ্যেই গোল দিলেন, কিন্তু বিরতির আগেই জেপসন ও সুনে অ্যাণ্ডারসন দুটি গোল করলেন। বিরতির পরে জেপসন আর একটি গোল দেন। বেঁটে ইতালীয় রাইট উইঙ্গার মুসিনেলি এবার একটি গোল শোধ করলেন। কারাপিলিস-এর শট বারে লেগে আটকে গেল। শেষ অবধি ইতালি পরাজিত। প্রাথমিক পর্যায়েই বিদায় নিল ১৯৩৪ ও ১৯৩৮-এর বিজয়ীরা। পরে তারা এর বদলা নিল বাঁকা পথে, পুষিয়ে নিল অন্যভাবে। বিজয়ী সুইডেনের আটজন খেলোয়াড় যোগ দিলেন ইতালির বিভিন্ন ক্লাবে।

একটি ড্র করলেই সুইডেনের যথেষ্ট। তারা তা করল প্যারাগুয়ের সঙ্গে কিউরিটিবা-য়। সাওপাওলো-য় ইতালি ২-০ গোলে হারাল প্যারাগুয়েকে। কিন্তু তা বিফলে গেল, তিন নম্বর পুলের শীর্ষে উঠল সুইডেন।

দুই নম্বর পুলে আরম্ভেই ইংল্যাণ্ড ও স্পেন দারুণভাবে জিতল। মারাকানায় ইংল্যাণ্ডকে দম ফেলতে দেয়নি চিলি। তবুও তারা চিলিকে ২-০ গোলে হারায়। মরটেনসেন প্রথমার্ধে ও দ্বিতীয়ার্ধে গোল দিলেন ম্যানিয়ন। এর পরেই চিলির হাফ (আগে ছিলেন ইয়র্কশায়ারের সেণ্টার ফরওয়ার্ড) রব্‌লেডোকে নামান হল। তাঁর ফ্রি-কিক পোস্টে লেগে ফিরল। এক ইংরাজ দর্শক চীৎকার করলেন ওই দেখে—'জর্জ, ঠিকভাবে খেল। তুমি কি জান না যে, এখন তুমি নিউক্যাস্‌ল দলের কেউ নও!'

ইংল্যাণ্ড ম্যাথিয়ুসকে বাদ দিয়ে ফিনিকে রাইট আউটে খেলাল এবং লম্বা, বেগবান, যুদ্ধের আগে আবির্ভূত প্রতিভাবান উল্‌ভ উইঙ্গার জিমি মুলেন-কে নামান হল লেফট আউটে। ব্রিস্টলের রয় বেণ্টলি আক্রমণের পুরোধা সেদিন। তাঁর অতি দ্রুততা দলের পক্ষে বোধ হয় ভাল ছিল না। চেলসি-তে খেলার সময় এইভাবে 'ভ্রমণে'র উৎসাহ পান এবং তাই-ই তাঁকে আরও দ্রুত করে। ইংল্যাণ্ড দলে খেললেন ডিন ও লটন—উভয়েই আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন কয়েকবছর আগে। এই ম্যাচে তাই অতীতের প্রখরতা দেখা গেল না।

কিউরিটিবা-য় স্পেন ৩-১ গোলে জিতল যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। বিজিত দলের অধিনায়ক রাইট হাফ এডি ম্যাকল্‌ভেনি মাত্র আঠার মাস আগে তৃতীয় ডিভিশন লীগের রেক্সহাম দল থেকে বিনামূল্যে ট্রান্সফার নিয়ে আমেরিকায় চলে যান। লেফট ব্যাক মাকা আদতে বেলজিয়ান; সেণ্টার ফরওয়ার্ড লারি গাজেন্‌স হাইতি-র নাগরিক ছিলেন। তিনি ওই 'অশুভ' দ্বীপ থেকে কুড়ি বছর আগে রহস্যজনকভাবে উধাও হন।

যুক্তরাষ্ট্র দলে ছিলেন তাদের ১৯৪৮ ওলিম্পিকের চারজন। ওলিম্পিকসে তারা ০-৯ গোলে হেরেছিল ইতালির কাছে। তবে সেই পরাজিত দলের রোভিং সেণ্টার ফরওয়ার্ড ব্রাজিলে এলেন। কলোম্বোর মত এক অপ্রতিরোধ্য স্টপারও দলে। আর তারা সম্মিলিতভাবে খেলে ইনসাইড ফরওয়ার্ড জন সুজা-র দ্বারা সতের মিনিটের মধ্যে ১-১ করল এবং এইভাবে যুক্তরাষ্ট্র পদচারণা করল সমাপ্তির দশ মিনিট আগে পর্যন্ত। কিন্তু এর পরে দুই মিনিটের মধ্যে বাসোরার তীব্র আক্রমণ ২-১ ও পরক্ষণেই 'রোবাস্ট' সেণ্টার ফরওয়ার্ড জারা-র উঁচু শটে ৩-১ হল।

আমেরিকান দলের ম্যানেজার স্কটল্যাণ্ডের বিল জেফি-র এই ফলের জন্য

গর্ব করার কারণ ছিল। ত্রিশ বছর আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং খেলতেন রেলকর্মীদের দলে। একবার খেললেন পেন স্টেট কলেজের বিরুদ্ধে এবং তারপরই ওই কলেজের কোচ নিযুক্ত হন। এই চাকরি একেবারে অস্থায়ী থাকলেও আর তাঁকে ওই পদ থেকে সরানো যায়নি। মেসিন-শপে শিক্ষকতা এবং ফুটবলের কোচিং দেওয়া দুইয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে চমৎকার দল গড়লেন এবং তারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল হতে থাকে। কিন্তু বিশ্ব-কাপের মত এমন প্রচণ্ড লড়াই কখনও তারা করেনি।

চার নম্বর পুলে বলিভিয়াকে হারাবার জন্য উরুগুয়েকে মোটেই মেহনত করতে হল না। এর আগে ওদের সঙ্গে রিসাই-এ ৯-০ গোলে জিতেছিল। অদ্ভুতভাবে বল লুকোচুরির দ্বারা এবং চমৎকার স্কিলে পাণ্ডুর, পাতলা গড়নের লেফট ইন জুয়ান শিয়াফিনো চারটি গোল দিলেন। শিয়াফিনো এবং রাইট উইং জুড়ি এলসাইড (চিকো) ঘিগিয়া ও জুলিও পেরেজ গতবারের অপেশাদার দলে ছিলেন ; এবং দক্ষিণ আমেরিকা চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেন, যদিও তখন উরুগুয়ে আর একটি স্থানীয় ধর্মঘটে বিব্রত। সন্দেহ নেই ওই পরিবেশ ফুটবলের পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। 'অপেশাদার' উরুগুয়ে ১-৫ গোলে হেরে গেল ব্রাজিলের কাছে। তবে তারা তিনটি নতুন প্রতিভার সন্ধান পেল। চমৎকারিত্বে শিয়াফিনোর সামান্য পিছনে ছিলেন পেরেজ ; আর কুঁজো মোচওয়ালা ঝকঝকে কপোলের ঘিগিয়ার চেহারা একেবারে খেলোয়াড়-বিরোধী, কিন্তু দ্রুততায়, বল নিয়ন্ত্রণে এবং ডান পায়ের জোরালো শটে তাঁকে বড় ফুটবলার প্রমাণিত করেছিল।

১৯৫০-এর মরশুমের শুরুতে রিও ব্রাঙ্কো কাপ-এ উরুগুয়ে ও ব্রাজিল তিন-তিনটি ম্যাচ খেলে ফেলেছিল। তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওরা বেশ কাছাকাছি থাকায় বিশ্বকাপেও ওদের খেলায় যে তেমন বড় রকমের হেরফের হবে না তা বোঝা যায়। উরুগুয়ে তখন জিতছিল সাওপাওলো-য় ৪-৩ গোলে, আর রিও-তে হারে ৩-২ ও ১-০ গোলে। মাঠে উরুগুয়ের মধ্যমণি ছিলেন অ্যাটাকিং সেণ্টার হাফ ওবদুলিও ভারেলা। এই ভারেলা ১৯৪০-এ ব্রাজিলের বিপক্ষে তিন গোল দেন। তখন তিনি লেফট ইন। তখনকার উরুগুয়ের সেই দলগত খেলা ১৯৫০-এও নড়চড় হয়নি। তাঁদের উইং-হাফরা এখনও ফ্লাঙ্কে আক্রমণ অব্যাহত রেখেছেন। লেফট হাফ খুদে নিগ্রো বলবান প্রতিদ্বন্দ্বী রড্রিগাস আন্দ্রাদে খুল্লতাত জোস-এর ঐতিহ্য বজায় রাখলেন। জোস ১৯৩০-এর

জাতীয় দলে ছিলেন। বাকিদের মধ্যে উল্লেখ্য 'ড্যাশিং' সেণ্টার ফরওয়ার্ড অসকার মিগুয়েজ (বলিভিয়র বিরুদ্ধে দুটি গোল দেন) ও 'ইলাষ্টিক'-দেহী গোলরক্ষক ব্রুক মাসপোলি।

ইংল্যাণ্ড-যুক্তরাষ্ট্র: দ্বিতীয় খেলায় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড দল তারকাপুষ্ট ছিল না। ইংল্যাণ্ডকে বেলো হরিজণ্টে পর্যন্ত যেতে হল এবং গোটা ব্যাপারটা গুলিয়ে গেল। ছোট্ট স্টেডিয়ামে না ছিল খেলোয়াড়দের পোশাক বদলের ব্যবস্থা, না ছিল সমান মাঠ। বলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এখনকার এক লক্ষ লোক বসার স্টেডিয়ামটি তখন ছিল স্বপ্ন। সেকেলে স্টেডিয়ামটি দেখলে মনে হত গোয়ালঘর বৈ নয়। তবে রিও-র তুলনায় এখানকার পাহাড়ী হাওয়া খেলোয়াড়দের বেশ সজীব করে তুলছিল। খেলোয়াড়রা রইলেন অতিথিরূপে মরো ভেলো স্বর্ণখনিতে দারুণ আরামে। এই খনিটির মালিকানা ইংরাজদের এবং সেখানে দু-হাজার ব্রিটিশ-কর্মীও ছিলেন। আর্থার ড্রুরি যুক্তরাষ্ট্রদলের প্রধান ও একমাত্র নির্বাচকের ভূমিকায় তখন। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ওই খেলাটিকে ঘিরে তিনি দু-রকম সম্ভাবনার কথা ভেবে রাখেন। যে খেলোয়াড়রা ইতিপূর্বে চিলিকে হারিয়েছে তাদেরই প্র্যাকটিস অব্যাহত রাখতে আবার নামানো হোক, কিংবা ওদের বিশ্রাম দিয়ে রিজার্ভ যারা আছে, তারা খেলুক। আর্থার প্রথম ভাবনাই কার্যকর করলেন। সুতরাং তাঁকে তো দোষ দেওয়ার কারণ নেই। খেলা শেষে অন্য সমালোচনাও হয়। যেমন নির্বাচক মশাইয়ের উচিত ছিল ম্যাথিয়ুসকে দলে নেওয়া। এমন কি বিল জেফ্রি স্বীকার করলেন, এই খেলায় যুক্তরাষ্ট্রের জেতার কোনো আশাই ছিল না। আগের রাত্রে তাঁদের কয়েকজন খেলোয়াড় অধিকাংশ সময় না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন।

ইংল্যাণ্ড এই খেলাকে যুক্তরাষ্ট্রের উৎকণ্ঠিত স্বপ্নে রূপান্তরিত করলেও পারত। তবে সেজন্য তাদের একমাত্র অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য ছিল অতি সহজে গোল করা।

সারাদিন আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। এমন মেঘ যে, তা ফুঁড়ে সামান্য রোদ বেরোচ্ছিল মাঝে মাঝে। আমেরিকান খেলোয়াড়রা এক ইংরাজ সাংবাদিককে সানন্দে বললেন, গোলের হিসাব রাখতে ক্রিবেজবোর্ড এনেছেন তো! খেলা শুরু হতেই ইংল্যাণ্ডের আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্রের হাফ-এ এসে বারংবার ধাক্কা দিতে লাগল। পোস্টে লেগে বল ফিরল, চলে গেল বার-এর উপর

দিয়ে এবং সব মিলিয়ে তারা সহজভাবেই খেলতে থাকে, দেখতে পায় জয়ের ছবি। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের গোলরক্ষক বোরঘিও দারুণ দারুণ শট ঠেকিয়েছেন, চীনের প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়েছেন তিন হাফব্যাক ম্যাকলভেনি, কলোম্বো ও বাহার।

বিরতির আট মিনিট আগে অঘটন ঘটে গেল। বাহার বাঁ পায়ে শট করলেন, বল পরক্ষণেই গাইটজেন্স-এর মাথায় লেগে গোলের দিকে এগিয়েছে। মনে হল গোলরক্ষক উইলিয়মস কভার করে ফেলেছেন, কিন্তু বল তাঁর নাগালের বাইরে চলে গেছে। গাইটজেন্স হেড করেছিলেন ? না, তাঁর গায়ে লেগে বল গোলে ঢুকেছিল ? সমর্থকরা দু-রকম মন্তব্য করলেন। কিন্তু তা অবান্তর, কেননা গোল সম্পর্কে দ্বিমত ছিল না। ইংল্যাণ্ড আবার কোণঠাসা করতে লাগল যুক্তরাষ্ট্রকে। এবার তারা উঁচু শটে খেলতে থাকে, কিছু শট বারের উপর দিয়েও গেল। জন সুজার লক্ষ্য রইল যাতে তাঁর রক্ষণভাগে কোনোরকম শিথিলতা না আসে এবং সেইভাবে তিনি বল সরবরাহে ব্যস্ত রইলেন। একবার রামসে-র জোরালো নিখুঁত ফ্রি-কিক থেকে মুলেন-এর হেড গোলে ঢুকেছিল প্রায়, কিন্তু লাইন অতিক্রমের আগে বল ফেরত এল। ইংল্যাণ্ড পেল শুধু একটি কর্ণার। মর্টেনসেন, ফিনি থাকা সত্ত্বেও তাদের আর কোনো লাভ হল না।

শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারিতে খবরের কাগজে আগুন লাগানো হল। ওরা ইংল্যাণ্ডের সমর্থক, তাই মনে হল ইংল্যাণ্ডের চিতায় ওরা আগুন দিচ্ছে। ওদিকে শ'য়ে শ'য়ে দর্শক মাঠে নেমে পড়েছেন। তাঁদের কাঁধে তখন বিজয়ী আমেরিকান (যুক্তরাষ্ট্র) খেলোয়াড়রা।

কোন্ পুলে কে জিতল : ইংল্যাণ্ড ফিরে গেল রিওতে। তাদের শেষ সংগ্রাম স্পেনের বিরুদ্ধে। তারা শুনল, স্পেনের ব্যাক্‌রা 'স্কোয়ার' খেলে, থ্রু পাসে খেলাই তাদের বৈশিষ্ট্য। নিখুঁত সেণ্টার ফরওয়ার্ড মিলবার্ণ ওই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন, স্প্রিণ্টারের মত তাঁর দৌড় বেণ্টলির খুব পছন্দ। ম্যাথিয়ুসকে রাইটে এবং ফিনিকে লেফটে রাখা হল। ১৪ মিনিট পরে ফিনির সেণ্টারে মাথা ছুঁইয়ে দিলেন মিলবার্ণ। বল দুর্ভেদ্য স্পেনীয় রিজার্ভ গোল-রক্ষক রামালেটস-কে অতিক্রম করল। কিন্তু ইতালীয় রেফারি সিগনার গ্যালিটি গোল বাতিল করে দিলেন অফ-সাইডের জন্য। নিউজ রিলের ছবিতে দেখা যায় স্পেনীয় ডিফেণ্ডার মিলবার্ণকে অন-সাইডে রেখেছেন। তবে

বিরতির পাঁচমিনিট পরে বাসোয়া-র সেণ্টারে জারা হেড করলে জয়সূচক গোলটি হল। স্পেন তিন নম্বর পুলের শীর্ষে উঠল।

এক নম্বর পুলে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। ব্রাজিলকে বারে বারে ঠেকিয়ে রাখছিল যুগোশ্লাভিয়া, তারা ১৯৩০-এর চাইতে উন্নত হয়েই বিশ্বকাপে এসেছিল। ছিল সেই 'ডবলিউ' পদ্ধতির খেলা। উইং হাফ ও ইনসাইড ফরওয়ার্ডদের মধ্যে চমৎকার দেওয়া-নেওয়ার খেলা দেখালেন জাটকো জাইকোয়াস্কি-১ ও জাইজিক এবং রাকো মিটিক ও ষ্টিফান ববেক। ১৯৪৮-এর ওলিম্পিকসে তারা ফাইনালে উঠে সুইডেনের কাছে ৩-১ গোলে হেরেছিল।

তারা এবার বেলো হরিজেণ্টেতে সুইজারল্যাণ্ডকে সহজে ৩-০ গোলে কোণঠাসা করে দিল। এর মধ্যে তোমাসেভিক-এর দুটি। পোর্টো আলেগ্রেতে ওরা মেক্সিকোকে ৪-১ গোলে হারায়। জাইকোয়াস্কির কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজকোয়াস্কি লেফট উইং থেকে দেন দুটি গোল। লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে এসব জয় সোপান স্বরূপ হলেও রিও-তে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আসল খেলাটি বাকি। তার আগেই কড়িতে লেগে মিটিক-এর মাথা ফাটল।

পুলের শীর্ষে কাদের স্থান হবে—ব্রাজিলের, না যুগোশ্লাভিয়ার? এই ম্যাচের ফলাফলের উপরই তা নির্ভর করছে। কেননা সাওপাওলোয় ব্রাজিল-সুইজ্যারল্যাণ্ডের খেলা ২-২ হওয়ায় ব্রাজিল একটি পয়েণ্ট নষ্ট করেছে। তবে যুগোশ্লাভিয়া-ব্রাজিলের খেলা ড্র হলে যুগোশ্লাভিয়া পুলের শীর্ষে উঠবে।

যে সুইজারল্যাণ্ড 'ভেরু' পদ্ধতিতে সম্প্রতি খেলেছে, তারা যুগোশ্লাভিয়ার কাছে হেরে দলে তিনটি বদল করল। অবশ্য এর দরকার ছিল না। আগের দল নিয়েই তারা বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারত। পরবর্তীকালের অন্যতম সেরা রাইট আউট আস্তেনেন রাইট ইন থেকে সেণ্টারে গেলেন, প্রবীণ অধিনায়ক বিকেল রাইট উইং-এ এবং কুশলী জ্যাকি ফেটন লেফট উইং-এ। ' ব্রাজিল দলে ১৯৩৮-এর সেমিফাইনালের ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি দেখা গেল, সাওপাওলোকে খুশি করার জন্য তাদের দল গড়া হল অনেকটা রাজনৈতিক দিকে লক্ষ্য রেখেই।

হাফব্যাক লাইন পুরো বদল হল। এলেন সাওপাওলোর খেলোয়াড়রা। রাইট হাফ দুর্ভেদ্য কারলস বাউয়ের নিজের জায়গায় রইলেন। জেয়ার আহত ছিলেন। উইং হাফ আলফ্রেডো রাইট আউটে ও মানেকা এলেন ইনসাইডে।

শক্ত সমর্থ সুইস 'ভেরু' এবং মধ্যস্থলে সোনালী চুলের মারাত্মক নিউরি থাকলেও কেমন যেন দুর্বল ছিল। ব্রাজিলকে ১-০ গোলে এগিয়ে দিলেন

আলফ্রেডো, কিন্তু বিকেল-এর ক্রশ পাস থেকে ফেটন ১-১* করলেন। বিরতির আগে বালটাজার দর্শনীয় গোল দ্বারা ব্রাজিলকে আবার এগিয়ে (২-১) দেন। কিন্তু সমাপ্তির দু মিনিট আগে 'ভেরু' ব্রাজিলের আক্রমণ প্রতিরোধের পর এগিয়ে গেল এবং তামিনি ২-২ করেন।

যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে ফ্লেভিও কস্টা ইনসাইড ফরওয়ার্ড ত্রয়ী জিজিনো-আদেমীর-জেয়ার-কে বেছে নিলেন। লেফট উইং-এ পাঠালেন চিকো-কে। ব্রাজিল খেলতে নামল। মিটিক-কে দেখা গেল না যুগোশ্লাভিয়া দলে। রিও-র মেয়র আশীর্বাদ করলেন খেলোয়াড়দের। তাঁরা সারা মাঠ প্রদক্ষিণ করলেন এবং ফিরলেন ড্রেসিংরুমের দিকে। ওয়েলসের রেফারী মারভিন গ্রিফিথসও পিছু ধাওয়া করলেন এবং নির্দেশ দিলেন কিক অফ্ এখনই হবে, দেরী করা চলবে না। মিটিকের তখন চিকিৎসা অব্যাহত। সুতরাং যুগোশ্লাভিয়া বেশ চিন্তা নিয়ে দশজনেই মাঠে নামল এবং তিন মিনিটের মধ্যে শোচনীয়ভাবে ০-১ গোলে পিছিয়ে পড়ল। বাউয়ের-এর কাছ থেকে বল পেয়ে আদেমীর গোল দিলেন। কিন্তু রাজকো মিটিক (১৯৩০-র যুগোশ্লাভ ম্যানেজার) যখন সাদা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে মাঠে নামলেন, যুগোশ্লাভিয়ার খেলার গতি বদলে গেল তাঁর (মিটিক) অসম্ভব স্কিলে এবং চতুর পাসে, তাছাড়া ববেক-এর সঙ্গে অদ্ভুত বোঝাপড়া করে তিনি খেলছিলেন। বিরতির আগেই ব্রাজিল বেশ বিব্রত হয়ে পড়ল। জাইকোয়াস্কি যদি অমন স্বর্ণ সুযোগটি হেলায় না হারাতেন তা হলে হয়ত ভিন্ন চিত্র দেখা যেত। কিন্তু তাঁর ব্যর্থতা ব্রাজিলকে সুযোগ করে দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাউয়ের দেখলেন জিজিনো ড্রিবল করে এগোচ্ছেন, তিনি বল না চেয়ে ইঙ্গিত দিলেন একইভাবে যেতে। যুগোশ্লাভ রক্ষণভাগ ততক্ষণে প্রায় তছনছ। বাকি একজন, তাঁকে ভেদ করে জোরালো সট করতেই গোলরক্ষক পরাস্ত। ব্রাজিল ২-০ গোলে জিতল।

পরদিন উরুগুয়ে ও স্পেন দুই গ্রুপের শীর্ষে স্থান পেল। ফাইনাল পুলে আর এল সুইডেন।

ফাইনাল পুল কেন? কার মাথায় এর পরিকল্পনা এসেছিল কে জানে! এর আগে কখনও এইভাবে খেলা হয়নি। এতবড় প্রতিযোগিতায় সমস্যাও কত! ম্যাচগুলির মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম, খেলোয়াড়রা তাই দ্রুত আঘাত থেকেও সেরে উঠতে পারছিলেন না। প্রত্যেকের ভাগ্যও যেন প্রতিহত হচ্ছিল এই বিশ্রাম না থাকা ম্যাচগুলোয়। তবুও কারুর না খেলে উপায় ছিল

না। যুদ্ধের আগের তিনটি বিশ্বকাপে ব্রাজিল বিজয়ীর সম্মান না পেলেও তারপর সে তিনবার জিতে জুল রিমে কাপ চিরতরের জন্য ঘরে তোলে। কিন্তু ১৯৩০-র বিশ্বকাপ-জয়ী ইংল্যাণ্ডই ছিল সম্ভবত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল। তবে ১৯৫০ ও ১৯৫৪-র বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার মত নাটকীয় মুহূর্ত বোধ হয় আর কখনও হয়নি।

ফাইনাল পুলের দলগুলিতে গুণগত পার্থক্য আকাশ-পাতাল নয়, বরং তুল্য মূল্যই ছিল তারা। দক্ষিণ আমেরিকার দুই দল খেলল অ্যাটাকিং সেণ্টার হাফ নিয়ে, সুবিধাও ছিল তাদের ; দীর্ঘপথ পরিক্রমা করতে হয়নি। আর ইউরোপীয় দল দুটি বেমরসুমে খেলল স্টপার সেণ্টার হাফ নিয়ে। এল কয়েক হাজার মাইল ঘুরে। ব্রাজিলেরই বিজয়ী হওয়া উচিত ছিল স্বদেশের মাটিতে. কিন্তু সুইস ও যুগোশ্লাভরা ভয় ঢুকিয়ে দেয় আগেই। আর সুইডিশ ও স্পানিয়ার্ডরা দুর্ধর্ষ এবং এসবের সুযোগ নিল উরুগুয়েনরা।

প্রথম দুটি খেলায় ব্রাজিল সহজেই সুইডিশ ও স্পানিয়ার্ডদের কোণঠাসা করে দিল আধুনিক ও তিনব্যাক প্রথায় খেলে। বিপক্ষরা যেন ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত গুটিয়ে গেল। দর্শকরা বললেন, এ তো ফুটবল নয়, যেন স্বপ্ন। সুইডেন হারল ১-৭ গোলে, স্পেন বিধ্বস্ত হল ১-৬ গোলে। কিন্তু উরুগুয়ে দেখল উভয়কে হারান খুব সহজ ব্যাপার নয়।

ফাইনাল পুল

ব্রাজিল-সুইডেন ও ব্রাজিল-স্পেন: ব্রাজিলের কাছে প্রথম হারল সুইডেন। জর্জ রেনর খুব ভাল করেই জানতেন ব্রাজিল কেমন শক্তিশালী দল। বুঝেছিলেন তাঁর তরুণ ইনসাইড ফরওয়ার্ডরা কত পল্কা। তাছাড়া কানে পামার ও লেনার্ট (নাকা) স্কোগ্লাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে তাই তেমন দৌড়াদৌড়ি করা সম্ভব ছিল না। অথচ এই দুই শক্তিমান ইনসাইডকে নিয়ে তিনি গর্ব করতেন। তুলনা করতেন মিলানের গ্রেন ও লিয়েডহোম এবং ম্যাড্রিদ আটলেটিকোর গারভিস কার্লসনের সঙ্গে। এঁরা ক'জন রেনরের ওলিম্পিক দলেও ছিলেন। বলতেন, 'আমার পামার ও স্কোগ্লাও অনেক অ-নেক কুশলী। পামারকে বল দাও, সে যে কোনো রক্ষণব্যূহ ভেদ করবে। কিন্তু দুঃখ সে ও স্কোগ্লাও উভয়েই দুর্বল হয়ে পড়েছে।'

এইসবের জন্য রেনরের পরিকল্পনা ছিল নেমেই তাঁর দলকে প্রবলভাবে

খেলতে হবে, করতে হবে গোল। কিন্তু তাঁর সে আশা পূরণের জন্য ১৯৫৮-র বিশ্বকাপ ফাইনাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। যাই হোক, ১৯৫০-এর এই ম্যাচে ব্রাজিলের আক্রমণের আগে সুইডেন দু-দুটি সুযোগ পেল। কিন্তু দুটিতেই তারা ব্যর্থ হল এবং উনিশ মিনিটের সময় দারুণ শটে আদেমীর পরাস্ত করলেন ভেনসনকে। তখনই সুইডেনের বিপর্যয় শুরু।

ব্রাজিল আজ দেখাল আগামী দিনে ফুটবল কোন্ পথে ধাবিত হবে। তারা সুররিয়ালিস্ট ফুটবল খেলল। ট্যাকটিকসে অভূতপূর্ব, টেকনিক্যালি চমৎকার। এমন প্রতিভাধর বল প্লেয়ারও ইতিপূর্বে কেউ দেখেননি। সবচেয়ে বড় কথা খেলার সময় কেউ কারুর গুণ দেখাতে পিছপা ছিল না, একে অপরের বাধা হননি। দারুণ উল্লাসে গোটা ম্যাচটি খেললেন।

বিরতির আগে আদেমীর নিজের দ্বিতীয় গোলটি দিলেন। তৃতীয় গোলটি চিকোর। দ্বিতীয়ার্ধ তো ছিল গোলের বা ব্রাজিলের খেলার একপেশে প্রদর্শনী। আদেমীরের নামের গায়ে আরও দুটি গোল যোগ হল, চিকো দুই এবং মানেকার গোল নিয়ে ব্রাজিলের মোট সাত। সুইডেন খুশি রইল স্নে অ্যাণ্ডারসনের পেনাল্টি থেকে দেওয়া একমাত্র গোল নিয়ে।

ব্রাজিলের পরবর্তী ম্যাচ স্পেনের সঙ্গে। উরুগুয়ের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দারুণ খেলে স্পেন ক্লান্ত ও শ্রান্ত। তাদের এই অবস্থায় পেয়ে ব্রাজিল কচুকাটা করে ছাড়ল। স্পেনের অপ্রতিরোধ্য রামালেটসের বদলে গোলে খেললেন আইজাগুরে। কিন্তু বিরতির আগে তিনি ৩-০ ও তারপর ৬-১ গোলে পিছিয়ে রইলেন প্রতিরোধ না করতে পেরে। জেয়ার ও চিকো একজোড়া করে দিলেন, একটি জিজিনো ও পারার আত্মঘাতীতে ছয় হল। নিরাশ করলেন আদেমীর। আজ তিনি একটিও গোল করেননি।

অর্থাৎ ব্রাজিলের চার পয়েণ্ট দুটি খেলে এবং উরুগুয়ের তিন। সুতরাং উরুগুয়ের সঙ্গে কোনোক্রমে ড্র হলেই কাপ পাবে ব্রাজিল।

উরুগুয়ে-স্পেন ; উরুগুয়ে-সুইডেন ও স্পেন-সুইডেন : ৯ জুলাই ব্রাজিল যখন সুইডেনকে কোণঠাসা করছিল, উরুগুয়ে তখন অতিকষ্টে নাটকীয় খেলায় সাওপাওলোয় স্পেনের সঙ্গে লড়ছিল। রীতিমত রাফ ফুটবল এবং তাতে স্পানিয়ার্ডদের আধিক্যই ছিল। তবে সুখের কথা মেরভিন গ্রিফিথসের সুপরিচালনায় গোলমাল বেশিদূর এগোয়নি। বরং তিনিই খেলাটিকে উপভোগ্য করে তুললেন।

উরুগুয়ের দ্রুত ও কুশলী ফরওয়ার্ডরা বারংবার সমস্যার সৃষ্টি করলেন এবং ভেঙে ফেললেন স্প্যানিশ ডিফেন্সকে, আর ঘিগিয়া ১-০ গোলে এগিয়ে নিলেন। কিন্তু ডবলিউ পদ্ধতিতে দারুণ খেললেন জোড়া ব্যাক ইগোয়া ও মলোনি। বাসোরা মুশকিলে ফেললেন বিপক্ষের আন্দ্রাদেকে, স্পেন বিরতির আগেই ২-১ গোলে এগিয়ে রইল। দুটি গোলই দিলেন বাসোরা। উরুগুয়ের আক্রমণকে প্রতিহত করতে ব্যাপৃত রইলেন দুই গনজালভো এবং জিমন্যাস্টের মত নমনীয় দেহ নিয়ে রামালেটস।

দ্বিতীয়ার্ধে অধিনায়ক ভারেলা দ্বিগুণ শক্তিতে এগিয়ে গেলেন বল নিয়ে, ঠিক যেমনটি করেছিলেন ব্রাজিলের বিরুদ্ধে। সমাপ্তির আঠার মিনিট আগে সমগ্র স্প্যানিশ ডিফেন্সকে বোকা বানিয়ে পেনাল্টি সীমানায় ঢুকলেন ও ২-২ করলেন।

সাওপাওলোয় দ্বিতীয় খেলায় উরুগুয়ে সৌভাগ্যক্রমে সুইডেনের বিপক্ষে অনেক ভাল খেলল। বিরতির আগেই তারা ২-১ গোলে এগিয়ে গেল। স্কোগ্লাণ্ড সম্পর্কে ভয় এবং তাদের বজ্রকঠিন শপথই এই খেলায় উরুগুয়েকে জিতিয়ে দেয়। তাছাড়া স্কোগ্লাণ্ডের একটু চিন্তিত থাকাটাও উরুগুয়েকে সুবিধা করে দেয়। এছাড়াও সুইডেন তাদের সাহায্য করে জিততে। ম্যাথিয়াস গনজালেস মারাত্মক ফাউল করলে রাইট উইঙ্গার জনসন আহত হয়ে মাঠের বাইরে যান।

উরুগুয়েনদের অসম্ভব তাজা মনে হচ্ছিল, টেকনিকের দিক থেকেও তারা সুইডিশদের চেয়েও অনেক উন্নত—তবুও তারা শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে পারছিলেন না। বরং কানে পামার সুইডেনকে এগিয়ে দিলেন ১-০ গোলে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘিগিয়া ১-১ করেন। এরপর সুইডিশ লেফট উইঙ্গার সাণ্ডভিস্ট দ্রুতবেগে এগিয়ে ২-১ করলেন। সুইডেন দারুণ খেলতে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সেণ্টার ফরওয়ার্ড মিগুয়েজ-এর দুটি গোল উরুগুয়েকে ৩-২ গোলে জিতিয়ে দেয়।

শেষ খেলায় স্পেনের বিরুদ্ধে রেনর কিছু রদবদল করলেন। স্কোগ্লাণ্ডের বদলে নামালেন রিডেল-কে ; বর মেলবার্জকে তো ইতিমধ্যেই জেপসনের বদলে রাইট-ইনে আনা হয়েছিল। সাওপাওলোয় ফল হল বেশ সন্তোষজনক—৩-১। স্পেনও চারটি রদলবদল করেছিল। প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় আক্রমণ ভাগ থেকে মলোনি, গাইঞ্জা ও ইগোয়াকে।

শুরুতে সুইডেনকে একটু বিব্রত মনে হলেও কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা

সামলে ওঠে। রেনরের পরিকল্পনা 'সুইপিং উইং টু উইং পাসেস' দারুণ কার্যকর হল। জনসনের প্রথম গোলের পরে দুই স্প্যানিশ ডিফেণ্ডার মাঝমাঠে বাকযুদ্ধ শুরু করেন এবং সেণ্টার স্পটে কিক্ অফের জন্য বল বসানো পর্যন্ত তর্ক অব্যাহত রইল। বিরতির মধ্যে মেলবার্জ দ্বিতীয় গোলটি করলেন। খুদে পামার তারপর ৩-০। সমাপ্তির সাত মিনিট আগে জারা স্পেনের একমাত্র গোলটি দিয়ে ৩-১ করলেন।

ব্রাজিল-উরুগুয়েঃ বিশ্বকাপ জিততে হলে, ফাইনালে অবশ্যই কাপ প্রত্যাশাকারীদের সেরা খেলা খেলতে হবে। কিন্তু ১৯৫০-এ ফাইনাল নামে তো কোনো খেলাই ছিল না, যদিও দর্শকরা না বুঝে বা ইচ্ছাকৃতভাবেই বলতে থাকেন ব্রাজিল-উরুগুয়ে ম্যাচটিই ফাইনাল। তবে একথা সত্যি, এটিই কাপ জয়-পরাজয়ের খেলা; এবং এদিনই সিদ্ধান্ত হবে কারা ১৯৫০-এর বিশ্বকাপ পাবে। সুতরাং উত্তেজনা চরমে, বিশ্বকাপ নিয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত। দুই শিবিরে তেমনি স্নায়ুর চাপও।

ফ্লেভিও কস্টা-র কথায় ও চলাফেরায় ম্যাচ জয় সম্পর্কে অতি আত্মবিশ্বাসী মনে হল। ব্রাজিলের সমর্থক বা তাদের দলের প্রত্যেকেও উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলার আগেই জিতে গিয়ে মহানন্দে মধুর গুঞ্জন তুলেছেন। তারা কি হারতে পারে? জয় ছাড়া তাদের ভাগ্যে তো আর কিছুই লেখা নেই! বিদ্যুৎ-গতিসম্পন্ন তিন ইনসাইড ফরওয়ার্ড জিজিনো, আদেমীর ও জেয়ার যে জটিল অবস্থা করে তোলেন, যেভাবে বিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করেন, তাতে ব্রাজিল কেন বলবে না—এস তো, আমাদের প্রতিরোধ কর দেখি! রেনরও ব্রাজিলের বিরলতম অথচ কার্যকর মুভমেণ্টগুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তাদের সাধারণ আক্রমণেও বৈচিত্র্য, ছোট ছোট পাসেও পরিবর্তন এবং উইঙ্গারদের কাছে কোণাকুণি মার এবং সেই পাসের ব্যবধান মাঝে মাঝে কুড়ি গজও। বাউয়েরকে আদেমীরের ব্যাক-পাসগুলিও দর্শনীয়। বাউয়ের বলের উপর পা রেখে দেখেন জিজিনো কোথায়, জিজিনো বল পেয়ে তারপর দ্রুত এগোন।

উরুগুয়ে দল সংক্ষেপে সতর্ক করল কস্টাকে, আমরা তো সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে লড়ে এসেছি। তোমাদের নড়বড়ে ভীতু খেলোয়াড়রা কিছুতেই আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারে না। আমি ভয় পাচ্ছি যে, রবিবারে আবার আমাদের মাঠে নামতে হবে যদিও খেলোয়াড়রা ইতিমধ্যে তাদের জার্সিতে চ্যাম্পিয়ানশিপ শীল্ডকে সেলাই করে নিয়েছে। তবুও বলব এটা প্রদর্শনী ম্যাচ নয়। এটাও

অন্যান্য ম্যাচের মতই, পার্থক্য শুধু অন্য ম্যাচের তুলনায় এটি বেশ শক্ত খেলা।

উরুগুয়ে ডেলিগেশনের কর্নেল ভোলপো জয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত রইলেন এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, এই বছরই ব্রাজিল তাদের কাছে একবার হেরেছে।

ভিট্টরি পোজো এবার আর কোন দলের সঙ্গে বা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আসেননি, তিনি এখন সাংবাদিক। মারাকানা স্টেডিয়ামে রিও-র রাজ্যপালের স্বাগত ভাষণ তাঁকে বিচলিত করল। তিনি স্মরণ করলেন—বারো বছর আগে মার্সাই থেকে বিমানে প্যারিসে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে ব্রাজিলিয়ানদের আকাঙ্ক্ষার কথা। ব্রাজিল বিজয়ী এমনটি ধরে নিয়েই বক্তৃতা দিলেন তিনি, দমিয়ে দিলেন বিপক্ষকে। তিনি বললেন,

"হে ব্রাজিলের খেলোয়াড়গণ, এই প্রতিযোগিতায় আমি তোমাদের বিজয়ী বলেই মনে করি ··আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তোমরা লক্ষ লক্ষ সমর্থক দ্বারা অভিনন্দিত হবে। এই গোলার্ধে এমন কেউ নেই, যারা তোমাদের ফুটবল-যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারে। ···তোমরা যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দল অপেক্ষা উন্নত·· আমি এখনই তোমাদেরকে বিজয়ী দল বলে সেলাম জানাচ্ছি।" এই ভাষণ শেষের বহু আগেই উরুগুয়েনরা বেশ অস্থির হয়ে পড়ে।

হাল্‌কা নীল শার্ট, কালো শর্ট ও সাদা ফিতের উরুগুয়েনরা ইতিমধ্যে সাদা শার্ট ও শর্ট-এর ব্রাজিলিয়ানদের কাছে ভয়ে কুঁকড়ে গেল (ব্রাজিল এই খেলার পরে সংস্কারবশত হলুদ ও সবুজ জার্সি পরা শুরু করে)। সাদাম্পটনের স্কুল-শিক্ষক জর্জ রিডার ফুটবল লীগ পরিচালনার পক্ষে বেশ বুড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি নিখুঁতভাবে পরিচালনা করলেন। দুই অধিনায়ক অগাস্টো ও ভারেলা-কে সেণ্টারে ডাকলেন টসের জন্য। দুই দল প্রস্তুত হল, কিক্‌-অফের পরে ব্রাজিলই আক্রমণ শুরু করে।

ব্রাজিলের বল নিয়ে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাজার হাজার সমর্থক গর্জন দ্বারা আকাশ বিদীর্ণ করে দিলেন। ব্রাজিল উরুগুয়ের একজন রক্ষককে ভেদ করল। কিন্তু একা ভারেলাই ওই আক্রমণ বিধ্বস্ত করেন। অবশ্য তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হলেও কালো আন্দ্রাদেও কোন অংশে কম ছিলেন না। আর গোলে মাসপোলির অ্যাক্রোবেটিক দেহ তো ছিলই। আবার ব্রাজিলের সেই পরাক্রম ত্রয়ী জিজিনো, আদেমীর ও জেয়ার উরুগুয়ের নীল পাচিল ভেদ

করলেন। কিন্তু আন্দ্রাদে ও ভারেলার জীবনপণ ট্যাক্‌ল ও মাসপোলির ঝাঁপ এ বিপদ থেকে রক্ষা করল উরুগুয়েকে। ষোল মিনিটের সময় উরুগুয়ের এলাকায় জটলা দেখা দিল। আন্দ্রাদে ছুটে গিয়ে দ্রুত বল ক্লিয়ার করলেন। সাত মিনিট পরে জেয়ার সামান্য উঁচু করে যে জোরালো শটটি মারলেন সেটির সামনে শুধু মাসপোলি। তিনি 'ডিফ্লেক্ট' করে সেটিকে কর্ণারে পাঠালেন। উরুগুয়ের গোলে আবার কামানের গোলা এসে পড়তে লাগল। এবার বিপদ তারণের ভূমিকা নিলেন অধিনায়ক ভারেলা।

কিন্তু সে স্বস্তি আর কতক্ষণের ! ব্রাজিল আবার আক্রমণে উদ্যত, ব্রাজিলের তৃতীয় কর্ণার-কিক্ করলেন ফ্রিয়াকা। কিকের পরে বল তাঁর কাছে আসতেই তাতে তীব্র শট করলেন। ঝাঁপিয়ে পড়ে মাসপোলি ক্লিয়ার করতেই আবার কর্ণার হল। পরের মিনিটে এই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে মারাত্মক শট করলেন আদেমীর। সামনে তখন শুধু গোলরক্ষক। শটে যেমন নিশানা, তেমনি শক্তি মেশানো ; কিন্তু মাসপোলি বলের কাছে পৌঁছে গেলেন অত্যাশ্চর্যভাবে।

প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে যিনি খেলেছিলেন, ইতালির সেই গোলরক্ষক গুসেপ্পে মোরো ওই দেখে বললেন, "বড় বড় গোলরক্ষকরা দুইভাবে খেলার মোড় ফেরাতে পারেন। প্রথমতঃ নিজ দলকে প্রেরণা জুগিয়ে, দ্বিতীয়তঃ বিপক্ষের মনোবল ভেঙে দিয়ে।" বড় বড় কুকুরগুলো যেমন হাঁপিয়ে পড়ে, উরুগুয়েকে দেখে তেমনি মনে হচ্ছিল। তাদের খেলা শুরু হল যেন শেষের দিকে। ব্রাজিলের টগবগে গোলরক্ষক বারবোসা এতক্ষণ শুধু খেলা দেখছিলেন, এবার হঠাৎ বিপদের মুখে পড়লেন। মরণপণ আক্রমণ করে ঘিগিয়া ও মিগুয়েজ সুযোগ করে দিলেন শিয়াফিনোকে। তাঁর নীচু শট ধরতে বারবোসা সামান্য লাফিয়ে উঠলেন।

ব্রাজিলও প্রত্যুত্তর দিতে উদ্যত। তারা আর একটি কর্ণার পেল এবং জেয়ারের শট পোস্টে লেগে ফিরে এল। এবার মাসপোলি আরও বীরত্ব দেখালেন আদেমীরকে প্রতিহত করে এবং জিজিনোর নিচু শট আটকাতে ডাইভ দিয়ে।

প্রথমার্ধের শেষ সাত মিনিট ব্রাজিলের আক্রমণে একটু ভাঁটা দেখা গেল। তারা এগোল, কিন্তু উরুগুয়ের রক্ষণভাগ পর্যন্ত পৌঁছেই যেন সন্তুষ্ট। বরং উরুগুয়ে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠতে থাকে। তবে বারবোসা সহজেই মিগুয়েজ ও শিয়াফিনোর শট আটকে দেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল গভীর ঘুমে নিমজ্জিত

কেউ হঠাৎ জেগে প্রবল আক্রমণ রুখছে। উরুগুয়ে চমৎকার ড্রিবলিং করে ব্রাজিলের রক্ষণভাগকে কাটিয়ে গেলেও শেষ শটে কোনরকম তীব্রতা ছিল না। বারবোসার পক্ষে এইসব ঠেকানো তাই কোন সমস্যাই ছিল না। এবার অধিনায়ক ভারেলা নিজের স্থান ত্যাগ করে এগিয়ে গেলেন, রচনা করলেন নতুন আক্রমণ, এবং এমন শট করলেন যে, বারবোসা কোনোক্রমে ডাইভ দ্বারা বল পাঠালেন কর্ণার-কিকের জন্য। বিরতির পর্যন্ত ০—০ রইল।

কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের দু-মিনিটের মধ্যেই এই ফলের কথা ভুলে যেতে হল। উরুগুয়ের রক্ষণ-ব্যূহ ভেঙে তছনছ হল। আদেমীর ও জিজিনো বল দেওয়া-নেওয়া করে এগোলেন। উরুগুয়ের বাঁ ডিফেন্সের সম্মুখে পড়া বল পাঠালেন ডানদিকে। ফ্রিয়াকা ছুটে গিয়ে জোরালো শট করতেই ১—০ গোলে এগোল ব্রাজিল।

এই গোলে উরুগুয়ে ভেঙে পড়েনি। কেননা, গোল শোধের জন্য অনেক সময় তাদের হাতে। ব্রাজিলিয়ানরা যে মৃত্যুঞ্জয়ী বা অজেয় সেকথা মনে করার তেমন কারণ ছিল না। উরুগুয়ের পাল্টা-আক্রমণে তালিজুলি নয়, বরং আরও শক্তির প্রমাণ দেখা গেল। ব্রাজিলের সমর্থকরা যখন আনন্দে বিহ্বল, সামনে তাদের বিশ্বকাপ জয়ের উদ্বেল দৃশ্য, তখনই উরুগুয়ের ফরওয়ার্ডরা ব্রাজিলের রক্ষণভাগ ভেদ করতে লাগল এবং দুবার হানা দিতেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। শিয়াফিনোর মাপা থ্রু পাস পেরেজের কাছে পৌছল। তাঁর রকেট-গতির শট বারবোসার আঙুলগুলিতে স্পর্শ করল। ভারেলা এবার দ্বিগুণ আক্রমণ শুরু করলেন। ব্রাজিলের উইঙ্গাররা ছড়িয়ে গেল। কিন্তু তাতে কাজ হল সামান্যই। আহ্লাদে লাফিয়ে চলা ফ্রিয়াকার ট্যাকল অতিক্রম করলেন এবং দুহাত তুলে এমনভাবে ইশারা করলেন ও সতীর্থদের উৎসাহিত করতে লাগলেন যেন তিনি দারুণ কিছু করেছেন।

কুড়ি মিনিট পরে উরুগুয়ে আবার আক্রমণ করতে থাকে এবং গোল দেয়। অবশ্য অনেক আগেই এটি হওয়া উচিত ছিল। ভারেলা বল নিয়ে এগিয়ে গেলেন ব্রাজিলের হাফদের কাটিয়ে। ডান দিয়ে তখন ঘিগিয়া ছুটে চলেছেন। ভারেলা তাঁকেই বল দিলেন। বিগোড তাঁকে ঠিকমত পাহারা দিতে পারছিলেন না। উইঙ্গারের সেণ্টার চলে গেল সম্পূর্ণ মুক্ত শিয়াফিনোর কাছে। মাত্র চার কদম এগিয়ে তিনি সামান্য উঁচু শট করলেন। বারবোসা এটি ধরার চেষ্টাই করেননি। ফল ১—১।

ব্রাজিল কিক্-অফ্ করল, কিন্তু বল ধরে রাখতে পারল না। চলে গেল উরুগুয়ের পায়ে। ভারেলাই যেন সারা মাঠে একমাত্র খেলোয়াড়। বিপক্ষের কেউ তাঁকে প্রতিরোধ করতে পারছেন না, বরং বলা যায় তিনি আজ বাধামুক্ত। অপ্রতিরোধ্য ভারেলা বিপক্ষের সব কিছু তছনছ করে আক্রমণ রচনা ও দলকে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে লাগলেন।

দ্বিতীয়ার্ধে চৌত্রিশ মিনিট পরে ঘিগিয়া পাস পেয়ে দেখলেন সামনেই পেরেজ। কিন্তু পেরেজের কাছেই জেয়ার আক্রমণ প্রতিরোধে দণ্ডায়মান। পেরেজ বল ফেরত দিলেন ঘিগিয়াকে। ব্রাজিলের লেফট ফ্লাঙ্ক ততক্ষণে অবিন্যস্ত। বল নিয়ে ঘিগিয়া ছুটলেন এবং বল আবার গোলে প্রবেশ করল। উরুগুয়ে ২—১ গোলে এগিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরে অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। মাঠে হঠাৎ সূর্যকিরণ এবং রোদটা সবচেয়ে বেশি ব্রাজিলের গোলে। মাসপোর্লির গোল রোদে স্নান করছে। অর্থাৎ জয়ের প্রতিবিম্ব যেন। শেষ মিনিটে ব্রাজিলের অধিনায়ক ও রাইট ব্যাক অগাস্টোও উরুগুয়ের পেনাল্টি-সীমানার মধ্যে ঢুকে গেলেন। কিন্তু তাঁদের ডিফেন্সকে অতিক্রম করা সম্ভব হল না। বিশ্ব কাপ 'ফাইনালের' পুরোহিত রিডার শেষ বাঁশি বাজিয়ে দিলেন। কুড়ি বছর পরে বিশ্বকাপ মণ্টিভিডিওতে ফিরে গেল।

ম্যাচের রিলে শুনতে শুনতে তিনজন মারা গেলেন, আরও তিনজন ইহলোক ত্যাগ করেন জয়ের পর আনন্দ করতে করতে।

দিনের অবিসংবাদী বীর ভারেলা বললেন, "আমরা জানতাম টেকনিকে হোক, আর ব্যক্তিগত নৈপুণ্যেই হোক, আমরা ব্রাজিল অপেক্ষা দুর্বল বা নাচুমানের। কিন্তু সুইডেন ও স্পেনের বিরুদ্ধে ওদের অন্যরকম সাফল্যের পর আমরা তিনব্যাক পদ্ধতিতে রক্ষণাত্মক খেলার ছক বদলে পুরনো ট্যাকটিক্সে ফিরে যাই, তবে তিন ব্যাকের খেলা একেবারে শিকেয় তুলে দিই নি। বরং তার কিছু সংস্কার করি এবং খেলতে খেলতে ফাঁদ তৈরি করে ফেলি। ব্রাজিলের ফরওয়ার্ডরা ওই ফাঁদে অধিকাংশ সময় আটকে যায়। ওদের সেণ্টার ফরওয়ার্ড আদেমীর ক'বার আমাকে কাটিয়েছিল। আর যখনই বা আমাকে অতিক্রম করে, অমনি বাধা পেয়েছে আন্দ্রাদে অথবা তেজেরার কাছে। আমাদের কথা ছিল, কোনো ব্রাজিলিয়ান ফরওয়ার্ড আমাদের গোলে বল মারতে গেলে অন্ততঃ দুজন ডিফেণ্ডারকে কাটিয়ে যেন যায়। আমাদের স্পিড

এবং কথামত কাজ ও আমাদের সময় জ্ঞান ও সর্বত্র পদচারণা দ্বারা উরুগুয়ের পতন থেকে অভ্যুত্থান হয়। তা ছাড়া আমাদের পাল্টা-আক্রমণ একেবারেই অসম্ভব ছিল এবং আমাদের পরাজয়ই ছিল অবধারিত।"

আন্দ্রাদের স্বীকারোক্তি, "আমাদের দলটা অদ্ভুত, তারা যেন সব কিছু করার মত ক্ষমতাবান। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিতে প্রস্তুত ছিলাম এবং তাই-ই দিয়েছি। তাছাড়া কোন উপায় ছিল কি?"

পুল—১

ব্রাজিল ৪ : মেক্সিকো ০
(আদেমীর ২, জেয়ার ও বালটাজার)
বিরতি ১—০

যুগোশ্লাভিয়া ৩ : সুইজারল্যাণ্ড ০
(তোমাসেভিক ২, ওগনানভ)
বিরতি ৩—০

যুগোশ্লাভিয়া ৪ : মেক্সিকো ১
(বোবেক কাজকোয়াস্কি ২, তোমাসেভিক) (কাসারিন)
বিরতি ২—০

ব্রাজিল ২ : সুইজারল্যাণ্ড ২
(আলফ্রেডো, বালটাজার) (ফেটন, তামিনি)
বিরতি ২—১

ব্রাজিল ২ : যুগোশ্লাভিয়া ০
(আদেমীর, জিজিনো)
বিরতি ১—০

সুইজারল্যাণ্ড ২ : মেক্সিকো ১
(বাদের, ফেটন) (ভেলাসকুয়েজ)
বিরতি ২—০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
ব্রাজিল	৩	২	১	০	৮	২	৫
যুগোশ্লাভিয়া	৩	২	০	১	৭	৩	৪
সুইজারল্যাণ্ড	৩	১	১	১	৪	৬	৩
মেক্সিকো	৩	০	০	৩	২	১০	০

পুল—২

স্পেন ৩ : যুক্তরাষ্ট্র ১

(বাসোরা ২, জারা) (জে সুজা)

বিরতি ০—১

ইংল্যাণ্ড ২ : চিলি

(মর্টেনসেন, মানিয়ন)

বিরতি ১--০

যুক্তরাষ্ট্র ১ : ইংল্যাণ্ড ০

(গিজেন্স)

বিরতি ১—০

স্পেন ২ : চিলি ০

(বাসোরা, জারা)

বিরতি ২—০

স্পেন ১ : ইংল্যাণ্ড ০

(জারা)

বিরতি ০—০

চিলি ৫ : যুক্তরাষ্ট্র ২

রোব্লেডো, ক্রেমাশি ৩, প্রিটো) (পারিয়ানি, জে সুজা)

বিরতি ২-০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
স্পেন	৩	৩	০	০	৬	১	৬
ইংল্যাণ্ড	৩	১	০	২	২	২	২
চিলি	৩	১	০	২	৫	৬	২
যুক্তরাষ্ট্র	৩	১	০	২	৪	৮	২

পুল—৩

সুইডেন ৩ : **ইতালি** ২
(জেপসন ২, অ্যাণ্ডারসন্) (কারাপিলিস, মুসিনেলি)

বিরতি ২—১

সুইডেন ২ : **প্যারাগুয়ে** ২
(সাণ্ডভিস্ট, পামার) (এ লোপেজ, এফ লোপেজ)

বিরতি ২—১

ইতালি ২ : **প্যারাগুয়ে** ০
(কারাপিলিস, প্যাণ্ডেফিনি)

বিরতি ১—০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
সুইডেন	২	১	১	০	৫	৪	৩
ইতালি	২	১	০	১	৪	৩	২
প্যারাগুয়ে	২	০	১	১	২	৪	১

পুল—৪

উরুগুয়ে ৮ : **বলিভিয়া** ০
(শিয়াফিনো ৪, মিগুয়েজ ২,
ভিডাল, ঘিগিয়া)

বিরতি ৪—০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
উরুগুয়ে	১	১	০	০	৮	০	২
বলিভিয়া	১	০	০	১	০	৮	০

ফাইনাল পুল

সাওপোলোয়

উরুগুয়ে ২ : **স্পেন** ২
(ঘিগিয়া, ভারেলা) (বাসোরা)

বিরতি ১—২

মাসপোলি ; এম গঞ্জালেস ও তেজেরা ; ডবলিউ গঞ্জালেস, ভারেলা (অধিনায়ক) ও আন্দ্রাদে ; ঘিগিয়া, পোরেজ, মিগুয়েজ, শিয়াফিনো ও ভিডাল।

রামালেটস ; আলোঞ্জে, গঞ্জালভো (২) ও গঞ্জালেভো (৩) ; পারা ও পুশেডস ; বাসোরা ; ইগোয়া, জারা, মলোনি ও ও গেইঞ্জা।

রিও-তে

ব্রাজিল ৭ : সুইডেন ১

(আদেমীর ৪, চিকো ২, মানেকা) (অ্যাণ্ডারসন)

বিরতি ৩—০

বারবোসা ; অগাস্টো (অধিনায়ক) ও জুভেনাল ; বাউয়ের, ডানিলো ও বিগোড ; মানেকা, জিজিনো, আদেমীর, জেয়ার ও চিকো।

ভেনসন ; স্যামুয়েলসন ও ই নিলসন; অ্যাণ্ডারসন, কে নরডাল ও গার্ড ; সাণ্ডভিস্ট, পামার, জেপসন, স্কোগ্লাণ্ড ও এস নিলসন।

সাওপাওলোয়

উরুগুয়ে ৩ : সুইডেন ২

(ঘিগিয়া, মিগুয়েজ ২) (পামার, সাণ্ডভিস্ট)

বিরতি ১—২

পাজ ; এম গঞ্জালভেস ও তেজেরা ; গাম্বেটা, ভারেলা (অধিনায়ক) ও আন্দ্রাদে ; ঘিগিয়া, পোরেজ, মিগুয়েজ, শিয়াফনো ও ভিডাল।

ভেনসন ; স্যামুয়েলসন ও ই নিলসন , অ্যাণ্ডারসন, জোহানসন ও গার্ড ; জনসন, পামার মেলবার্জ, স্কোগ্লাণ্ড ও সাণ্ডভিস্ট।

রিও-তে

ব্রাজিল ৬ : স্পেন ১

(জেয়ার ২, চিকো ২, জিজিনো, পারা—আত্মঘাতী) (ইগোয়া)

বিরতি ৩—০

বারবোসা ; অগাস্টো (অধিনায়ক) ও জুভেনাল , বাউয়ের, ডানিলো ও বিগোড ; ফ্রিয়াকা, জিজিনো, আদেমীর, জেয়ার ও চিকো।

আইজাগুরে ; অলোঞ্জো ও গঞ্জালভো (২) ; গঞ্জালভো (৩), পারা ও পুশেডস ; বাসোরা, ইগোয়া, জারা, পানিজো ও গেইঞ্জা।

সাওপাওলোয়

সুইডেন ৩ : **স্পেন** ১
(জোহানসন, মেলবার্জ, পামার) (জারা)

বিরতি ২—০

সুইডেন : স্‌ভেনসন ; স্যামুয়েলসন ও ই নিলসন ; অ্যাণ্ডারসন, জোহানসন ও গার্ড ; সাণ্ডভিস্ট, মেলবার্জ, রিডোল, পামার ও জনসন।

স্পেন : আইজাগুরে ; আসেনসি ও অলোন্সা ; সিলভা, পারা ও পুশ্চেস ; বাসোরা, ফার্ণাণ্ডেজ, জারা, পানিজো ও জানকোসা।

রিও-তে

উরুগুয়ে ২ : **ব্রাজিল** ১
(শিয়াফিনো ও ঘিগিয়া) (ফ্রিয়াকা)

বিরতি ০—০

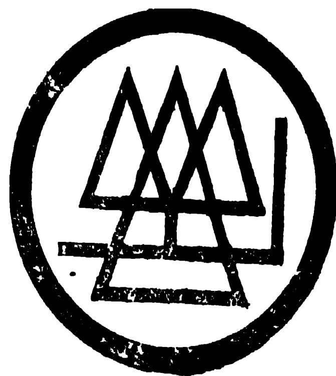
উরুগুয়ে : মাসপোলি ; এম গঞ্জালভেস ও তেজেরা ; গাম্বোটা, ভারেলা (অধিনায়ক) ও আন্দ্রাদে ; ঘিগিয়া, পেরেজ, মিগুয়েজ, শিয়াফিনো ও মোরান।

ব্রাজিল : বারবোসা ; অগাস্টো (অধিনায়ক) ও জুভেনাল ; বাউয়ের, ডানিলো ও বিগোড ; ফ্রিয়াকা, জিজিনো, আদেমীর, জেয়ার ও চিকো।

ফাইনালে কে কোথায়

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
উরুগুয়ে	৩	২	১	০	৭	৫	৫
ব্রাজিল	৩	২	০	১	১৪	৪	৪
সুইডেন	৩	১	০	২	৬	১১	২
স্পেন	৩	০	১	২	৪	১১	১

সুইজারল্যাণ্ড ১৯৫৪



বিজয়ী পশ্চিম জার্মানীর ব্যাজ

১৯৫০-এর বিশ্বকাপের ফল যদি কারুর কাছে বিস্ময়কর মনে হয়ে থাকে, তবে ১৯৫৪-র বিশ্বকাপ তাদের নিশ্চয়ই মহা বিস্ময়ের। হাঙ্গেরির বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাদের ঘিরে যেমন উত্তেজনা চরমে, তেমনি সকলেই নিশ্চিত—কাপ যাবে ওই দেশেই; ইউরোপের ফুটবলে হাঙ্গেরির এই দল নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিল এবং এর আগের নভেম্বরে তারা ওয়েমব্লিতে ইংল্যাণ্ডকে হারায় ৬-৩ গোলে। তারাই প্রথম বিদেশী দল, যারা ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়েছে এবং পর পর মে মাসে বুদাপেস্টে আবার ওদের হারায় ৭-১ গোলে।

লৌহ-যবনিকার অন্তরালের বাস সমাপ্ত করে তারা সম্প্রতি আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ১৯৫২-র হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকসে এসে বেশ সহজেই অজেয় থেকে যায়। হাঙ্গেরি আন্তর্জাতিক ফুটবলে আবির্ভাবেই অঘটন ঘটাল। গতানুগতিক স্কিমের উর্ধ্বে তারা, টেকনিকে সবার সেরা। ইউরোপের সেরা খেলা তো তাদের আয়াসে, এমনকি ব্রিটিশ ফুটবলের জোরালো শটও তাদের আয়ত্তে।

পোল্যাণ্ড স্ক্রাচড্ হয়ে গেলেও হাঙ্গেরিকে ওয়াকওভার নিয়ে ম্যাচ জয়ের সুযোগ দেওয়া হল না। বিশ্বকাপে পুনঃপ্রবেশকারী পশ্চিম জার্মানী রইল তাদের গ্রুপে। তারা এখনও খেলছে বিচক্ষণ ও খর্বকায় ফুটবল পণ্ডিত শেপ হার্বার্জরের পরিচালনায়। একই গ্রুপে স্থান পেল তুরস্ক।

বিশ্বকাপ কমিটির সিদ্ধান্তে প্রায় সকলেই অবাক হল এবার। ছাঁটাই-

এমনভাবে হল যে, কেউ যুক্তি দিয়ে এই ব্যবস্থার কারণ খুঁজে পেলেন না। প্রতিটি গ্রুপে বারোটি করে দল থাকলেও সেই গ্রুপে চারটি দলের একে অপরের অর্থাৎ চারটি দলের মধ্যে খেলা হল না। প্রতি গ্রুপে দুটি দলকে 'বাছাই' রাখা হল। ওরাই খেলল বাকি দুটি দলের সঙ্গে। অর্থাৎ খেলা দুটি করে। ফলে, দুটি বা ততোধিক দলের মধ্যে সমান সমান পয়েণ্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রইল। খেলা পরিচালনায়ও জটিলতা দেখা দেয়। যথা: নির্দিষ্ট সময়ে খেলা অমীমাংসিত থাকলে অতিরিক্ত সময় খেলতে হবে। তাছাড়া গ্রুপের খেলা শেষে দুই দলের সমান পয়েণ্ট হলে প্লে-অফ্ ম্যাচ খেলা হবে। এই ক্রীড়া ব্যবস্থাকে কেউ কেউ সংগঠকদের 'বোকামি' এবং 'কুটিলতা' আখ্যা দিলেন আর এর দ্বারাই জার্মানী ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল। আশ্চর্য! গ্রুপের ম্যাচে যে হাঙ্গেরি ৮-৩ গোলে জার্মানীকে হারায়, হাঙ্গেরিকে ফাইনাল খেলতে হল সেই জার্মানীর সঙ্গেই। এই ব্যবস্থা জার্মানীকে বিশ্বকাপ পাইয়ে দেওয়ার ফন্দী বললে অত্যুক্তি হয় না।

প্রকৃতপক্ষে সুইজারল্যাণ্ডের বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার মত এত বড় দায়িত্ব নেওয়াটাই হাস্যকর ছিল। অবশ্য এখানকার প্রতিটি ম্যাচেই অধিকসংখ্যক দর্শক এসেছেন এবং স্থান সংকুলানও হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য সাংগঠনিক কাজে সমন্বয় ছিল না, সবটাই কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে সারা হয়েছে। সবচেয়ে বিরক্তিকর ছিল সুইশ পুলিশবাহিনীর বিনা কারণে মাঝে মাঝে মাঠে প্রবেশ।

প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানী: শুরুতে জার্মানদের ঘিরে তেমন হৈ চৈ ছিল না। তাদের দিকে তেমন নজরও রাখছিলেন না সাধারণে। তারা 'যোগ্যতা অর্জন' করল নরওয়ে ও সার-এর বিরুদ্ধে মোটামুটি সহজেই। তারা তৈরী হল কাইজারস্লটার্ণের কয়েকজনকে পেয়ে। কিন্তু সবার উপরে ছিলেন তেত্রিশ বছরের অধিনায়ক ও ইনসাইড ফরওয়ার্ড ফ্রিজ ওয়াল্টার। প্রাক্তন এই প্যারাট্রুপার বিমানে সুইজারল্যাণ্ড আসতে অস্বীকার করেন। ফ্রিজ মূলত: অষ্ট্রিয়ার আন্তর্জাতিক দলের খেলোয়াড়। এই সতীর্থদের তিনি দেখেছিলেন কাছাকাছি একটি বিমান দুর্ঘটনায় কীভাবে তাঁরা শেষ হয়ে গিয়েছিলেন।

ওয়াল্টারের খেলা সকলের বেশ পছন্দ ছিল। তাই বলে তাঁর সম্পর্কে আগে দারুণ কোনোরকম ভবিষ্যদ্বাণী করা যেত না নেজারের মত। তবে কুশলী বল প্লেয়ারের খ্যাতি তাঁর ছিল। বাজে বল মারেন না, অকারণে বল

কাছে রেখে সময় নষ্ট করেন না। তাঁর ভাই ওটমার ওয়াল্টার ছিলেন সেণ্টার ফরওয়ার্ডে। কাইজারস্লটার্ণের আর একজন হলেন হর্স একেল। তিনি দুর্দান্ত রাইট হাফ।

উরুগুয়ে ঃ গতবারের বিজয়ী উরুগুয়ে এবারও শক্তিশালী দল নিয়েই এল। তাদের সঙ্গে এবার একজোড়া নতুন উইঙ্গার। দক্ষ জুলিও আবাদী এলেন ঘিগিয়ার বদলে। জুলিও পেরেজের জায়গায় রাইট ইনে দেখা গেল জেভিয়ার অ্যামব্রয়-কে। '৯৫০-এর রক্ষণভাগের মিথিযাস গঞ্জালেস এর আগেই বিদায় নিয়েছেন, তবে অন্য কারণে। স্বদেশে প্যারাগুয়ে-উরুগুয়ে খেলায় উরুগুয়ে হারলে তাদের সমর্থকরা মিথিয়াস গঞ্জালেসকে ছুরিকাঘাত করে। কিন্তু দুর্ভেদ্য ভারেলাকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি। অথচ ১৪ বছর আগে তাঁর জাতীয় দলে খেলা শুরু হয়। আন্দ্রাদে, মাসপোলি, মিগুয়েজ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিয়াফিনোও রইলেন।

উরুগুয়ে তিন নম্বর পুলে বাছাই ছিল অস্ট্রিয়া, স্কটল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে। চেকরা বালগেরিয়া ও রোমানিয়ার বিরুদ্ধে জিতে 'যোগ্যতা' অর্জন করলেও নিজেদের প্রাক-যুদ্ধকালীন শক্তির ধারে কাছে আসতে পারেনি।

অস্ট্রিয়া ঃ অস্ট্রিয়ার বিশ্বকাপ জয়ের বাসনা সামান্যের জন্য কার্যে পরিণত হল না। তিন বছর আগে ইউরোপে সম্ভবত তারাই ছিল সেরা দল। খেলত প্রাচীন 'মেটোডো' পদ্ধতিতে। অ্যাটাকিং সেণ্টার-হাফ আর্নস্ট ওকরিক এখনও অধিনায়ক। লম্বা, পেশীবহুল ময়লা ওকরিকের বাঁ পায়ে যেমন নিখুঁত শট, তেমনি তাঁর টেকনিক। তিন ব্যাকের খেলার তিনি গোঁড়া সমর্থক। এখন তাঁর ইচ্ছাপূরণ হল। হুগো মিজ্‌লের তো এতদিনে কবর হওয়ার কথা, কিন্তু এতদিনে তারা এই পদ্ধতি মেনে নিল। উরুগুয়েতেও এই পদ্ধতি এখনও অচল, কিন্তু ব্রাজিল একে অনেকদিনই রপ্ত করেছে।

অস্ট্রিয়া দলে দারুণ স্টাইলিশ গোলরক্ষ ওয়াল্টার জেমান থাকলেও সেমিফাইনালে ভীষণ আঘাত পান। লেফট ইনে রয়েছেন আর্নস্ট সোজাসপল, উইংসে কোয়ের্ণার ভ্রাতৃদ্বয়। এছাড়া চৌখস গেরহার্ড হেনাপ্পি। রাইট ব্যাক থেকে সেণ্টার ফরওয়ার্ড যেকোনো পজিশনে তিনি চমৎকার। পাশে ওকরিক থাকলে তিনি সমসাময়িক কালে যুগন্ধর হয়ে ওঠেন।

স্কটল্যাণ্ড ঃ ব্রিটিশ চ্যাম্পিয়নশিপে ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ন এবং স্কটল্যাণ্ড হল রানার্স। দুটি দলই বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং গ্রুপে এল। স্কটল্যাণ্ড

চ্যাম্পিয়ন না হলেও আগের মত বিশ্বকাপে খেলতে গররাজি হয়নি। চিরাচরিত প্রথাও তারা ভেঙে ফেলল ম্যানেজার নিয়োগ দ্বারা। আন্দ্রু বিটি প্রাক্তন লেফট ব্যাক, এখন হাভারফিল্ড টাউনের ম্যানেজার। তিনি ম্যানেজার হলেন স্কটল্যাণ্ডের। তবে খেলোয়াড় নির্বাচন যথাযথ হয়নি, এবং তারই খেসারত দিতে হল হ্যামডেনে। ইংল্যাণ্ডের কাছে ২-৪ গোলে হারায় দলের মধ্যে ভীতি দেখা দিল। রেঞ্জার্সের অভিজ্ঞ ব্যাকদ্বয় জর্জ ইয়ং ও স্যামি কক্স হঠাৎ বিতাড়িত হলেন এই পরাজয়ের পর, ঠিক যেমনটি হয়েছিল হাঙ্গেরির কাছে ইংল্যাণ্ডের পরাজয়ের পরে। রামসে ও একার্সলেকে বাদ দেওয়া হয়। ফরওয়ার্ডে লারি রেলি ছিলেন বেশ 'জীবন্ত', কিন্তু তিনি অসুস্থ। সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেয় গোলরক্ষক না থাকায়। আবার্ডিনের ফ্রেড মার্টিনকে ওই দায়িত্ব দেওয়া হল। সেলটিকের রাইট ইন উইলি ফার্নির ভগবৎদত্ত টেকনিক সম্পর্কে সকলে একমত হলেও তার 'কনসিসটেন্সি' সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। তার ক্লাব সতীর্থ সেণ্টার ফরওয়ার্ড নিয়েল মোচান ও ইংলিশ ফুটবলে ব্যর্থ হয়ে স্কটল্যাণ্ডে ফিরে আসেন। তবে বেঁটে ম্যাকেঞ্জির ক্রীড়াশৈলী ওর বিপরীত। তাঁকে বোর্ণমাউথে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। ইংলিশ ফুটবলের তৃতীয় ডিভিশনে খেলে তিনি প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছিলেন।

সুন্দর কেশের টমি ডোশারটি প্রেস্টন নর্থ এণ্ড-এর উইং হাফের বড় গুণ ফুটবলের জন্য তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত। তা তাঁর ছিল; তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন বিদেশী ফুটবল সম্পর্কে। টমি প্রতিযোগিতা শেষে বলেন, তিনি শিয়াফিনোর মত চমৎকার ইনসাইড ফরোয়ার্ড ইতিপূর্বে দেখেননি। কিন্তু শত প্রশংসা সত্বেও খেলা তুঙ্গে থাকা কালেও সৎ ও মাঝারি পর্যায়ের খেলোয়াড় বলেই তাঁকে পরিগণিত করা হত।

ইংল্যাণ্ডঃ বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড ও অপর বাছাই ইতালির সঙ্গে ইংল্যাণ্ড একই গ্রুপে রইল। এই গ্রুপিং নিয়ে সকলে খুশি হতে পারেননি। বাছাই হিসাবে ইংল্যাণ্ডকে মনোনীত করা নিয়েই বেশি বিরক্তি। কেননা, এর আগে তারা বুদাপেস্টে হাঙ্গেরির কাছে দারুণভাবে হেরেছিল। অবশ্য এজন্য ইংল্যাণ্ড দলের অযোগ্যদের স্থান ও ভুল ট্যাকটিক্‌সও কম দায়ী ছিল না।

বেলগ্রেডে প্রথমে ৬-৩ ও পরে ১-০ হওয়ায় ইংল্যাণ্ড মর্মপীড়ায় ভুগছিল, আর ওই দুশ্চিন্তা নিয়ে এগোল বুদাপেস্টের পথে। নির্বাচকমণ্ডলী হাস্যকর দল গড়লেন। জাতীয় দলে সর্বপ্রথম স্থান পেলেন রাইট আউটে পিটার হ্যারিস ও

সেন্টার ফরওয়ার্ডে বেডফোর্ড জেজার্ড। ওয়াল্টার উইন্টারবটমই এঁদের দলভুক্ত করেন। যদিও কারুর মধ্যে তেমন কোনো গুণ ছিল না এবং পরে এই মনোনয়ন যথার্থ হয়নি।

ম্যাথিয়ুসের বয়স তখন উনচল্লিশ হলে কি হবে, তখনও তাঁর মারে যাদু। নির্বাচকরা তাঁকে কিছুতেই বয়সের অজুহাতে বাদ দিতে পারেন না। শেষ মুহূর্তে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ডাকা হল। চার বছর তেমন ভাল না খেললেও সেন্টার হাফ নিয়েল ফ্রাঙ্কলিনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মত কেউ ছিলেন না। ব্যাকরা যত ভালই খেলুন না, হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে দুটি মারাত্মক খেলাতেই গোলরক্ষক জিল মেরিকের খেলা অতুলনীয় ছিল। ১৩ গোল খেলেও মেরিক ফাইটার বিমানের পাইলটের মত লড়েছিলেন। দু'বার তিনি আহত হয়ে বাইরে যান এবং দু'বারই ফিরে আসেন।

রয়েছেন টম ফিনি। বল্টনের সেন্টার ফরওয়ার্ড ন্যাট লফটহাউসের হৃৎকম্প সৃষ্টিকারী উঁচু শট এবং বিপক্ষের ডিফেন্সে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত সাহস কমেনি। লণ্ডনের আইভর ব্রোডিস, যিনি সাণ্ডারল্যাণ্ড ও অন্যান্য বড় ক্লাবে যোগ দেন ম্যানেজাররূপে, তিনি রয়েছেন ইনসাইডে নিখুঁত ও দ্রুত শট নিয়ে। তদুপরি আবার অধিনায়ক বিলি রাইট, নতুন পজিশনে আবার তাঁর প্রশংসায় প্রায় সকলেই মুখর।

ব্রাজিল, যুগোশ্লাভিয়া ও ফ্রান্স: পিনহেরোর-এর নেতৃত্বে ব্রাজিল এল। জেজে মোরেরা-র ম্যানেজারশিপে ওরা এল, কিন্তু ১৯৫০-এর সেই থ্রী মাস্কেটিয়াস' জিজিনো, আদেমীর ও জেয়ারকে দেখা গেল না। এই তিন জনের মধ্যে শুধু জিজিনো-কে কেউ কেউ আবার দলভুক্ত করতে বলেন। কিন্তু তাঁর ধার অনেক কমেছে, এই আপত্তিতে তিনি বাদ পড়েন। এলেন সোয়াভিং ফ্রি-কিকের রাজা ডিডি, আর এক নিগ্রো বাল্টাজার সেন্টার ফরওয়ার্ডে ফিরলেন। রাইট আউটে নির্বাচিত হল দুর্ধর্ষ জুলিনো। যেমন সুঠাম দেহ, তেমনি গোঁফ। বল কন্ট্রোল, ফিনিশিংও চমৎকার।

ফুলব্যাকের দুজনই স্যান্টোসের—কালো ডালমা এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী ও স্টাইলিশ নিলটন। এছাড়া উইং হাফে ১৯৫০-এর বিশ্বকাপের সেরা তারকা বাউয়ের। যুগোশ্লাভিয়া ও দুর্বল মেক্সিকোর গ্রুপে রইল ফ্রান্স।

গতবার রিওতে ব্রাজিলের কাছে যুগোশ্লাভিয়া হারলেও এবার কোয়ালি-ফাইং গ্রুপে মাত্র চার গোল দিয়ে ইজরায়েল ও গ্রীসকে হারিয়ে তারা পুরো

পয়েণ্ট সংগ্রহ করল। আবিষ্কার করল এক নতুন গোলরক্ষক। ভ্লাদিমির ফেয়্যারা একদা ব্যালে নাচ শিখেছিলেন, গোলরক্ষক হয়ে খেলার মাঠে তাও কাজে লাগালেন অদ্ভুত নমনীয় শরীর দ্বারা। আবার অধিনায়ক জাকো কাইকোস্কি। মিটিক ও ববেক ইনসাইড ফরওয়ার্ডে যথারীতি। কিন্তু নতুন তুটি মুখ দেখা গেল। লেফট হাফে বসকভ যেমন, তেমনি লেফট উইঙ্গার অপ্রতিরোধ্য ব্রাঙ্কো জেবেক।

ফ্রান্সের হাফ লাইনে প্রতিভাধর পেনভার্ন, জঁকোয়েত ও মার্সেল; রাইট আউটে রেমণ্ড কোপা, লেফট উইং-এ জাঁ ভিন্সেণ্ট। এঁরাই লুক্সেমবার্গে আয়ারের বিরুদ্ধে কোয়ালিফাইং পয়েণ্ট এনে দেন।

ইতালি: ইতালি দলে পোজো এখন কেউ না হলেও পোজো-যুগ শেষ হয়নি মনে হল; কেননা স্টেডিয়ামে নানা গুঞ্জন ও চিৎকারের মধ্যেও তাঁর নাম শোনা যাচ্ছিল। এই সব খেলা ঠিক ঠিক হচ্ছে, আবার খেলার মোড় ঘুরতেই 'সব পদ্ধতি ভুল' অভিহিত হচ্ছে। আহ্, আজ যদি পোজো থাকতেন---এমনি সব কথা।

লেজর কেজলার নামে এক প্রবীণ হাঙ্গেরিয়ান অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা ফিয়োরেনটিনায় দলটিকে প্রস্তুত করেন। মিলানের ফুটবল সমর্থকরা এতে খুশি হননি। কারণ সান সিরো-য় মিশরের বিরুদ্ধে ইতালি ১—১ থাকার পর তাদের চিৎকার ও সমর্থনেই নাকি ইতালি ৫—১ গোলে জিতেছিল। কেজলার ইতিমধ্যে আগের আক্রমণাত্মক খেলা পরিহার করেছেন। আবার ডাকলেন প্রবীণ কাপেলো ও রোমার সেণ্টার ফরওয়ার্ড কার্লো গালিকে। হ্যাঁ, তখনও কিন্তু 'কাটেনাকিও'র হাতে ইতালীয় ফুটবলের ভয়ঙ্কর পরিণতির কিছুটা বাকি।

এখনও আছেন ইণ্টারের দুর্ধর্ষ আক্রমণ রচনাকারী বল-নিয়ন্ত্রক বেনিটো লোরেঞ্জি। রয়েছেন জুভেণ্টাসের গিয়ামপিরো বোনাপার্টি। গোলে জরজিও ঘেজ্জি ওরফে 'কামিখেজ'। তাঁকে সুইজারল্যাণ্ড বা বেলজিয়ম বিপদে ফেলতে পারেনি।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের কথা, কেজলার সুইজারল্যাণ্ডে অতি সহজে হারলেন হাস্যকর দল গঠন দ্বারা। শৃঙ্খলা বলতে কিছুই ছিল না দলে। প্লে-অফ্ ম্যাচে সুইজারল্যাণ্ডের কাছে শোচনীয় পরাজয় ঘটল। খেলার মাঠে তাদের দিকে যেন অরাজকতা!

ইতালির এক ফুটবল সমালোচক ওই দেখে লিখলেন : লোভো, বারদেলি প্রমুখ ব্যর্থ ম্যানেজারদের মৃত আত্মা বোধহয় কেজলার-এর কনুইয়ে আস্তানা নিয়েছিল, তারা কেজলারের কানে কু-মন্ত্রণা দিয়েছে ছেলেরা কিভাবে খেলবে এই নিয়ে। ইতালির পতনের কারণও ওদের কু-পরামর্শ অনুযায়ী খেলায়।

হাঙ্গেরি ঃ পুসকাস, কোসিস, হিদেকুটি, বোজসিক—'বিস্ময়কর' হাঙ্গেরি দলে এই চারজনই ছিলেন প্রাণ-পুরুষ। সেনাবাহিনীর পদ অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডে ফেরেঙ্ক পুসকাসের ছদ্মনাম দেওয়া হয়েছিল 'গ্যালপিং মেজর'। পুসকাস শুধু দলের অধিনায়ক নন, তাঁকে বলা হত 'স্টার অফ স্টারস'। বুদাপেস্টের বেঁটে-খাটো মানুষ। ব্যাকব্রাশ করে চুল আঁচড়ান। মাঝখান থেকে সিঁথি কাটেন। বল কণ্ট্রোলে চমৎকারিত্ব শুধু নয়, স্ট্র্যাটেজিতে সবার উপরে এবং বাঁ পায়ের শটে বিশ্বে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর ওই শট ৩৫ গজ দূর থেকেও বিপক্ষের বিপদ ডেকে আনে। স্যাণ্ডর কজিস অধিনায়ক অপেক্ষা সামান্য বেঁটে, কিন্তু তার চাইতে আরও বিপজ্জনক, 'গোল্ডেন হেড' বলে খ্যাত। বল শূন্যে থাকলে তিনি অপ্রতিরোধ্য। এই দল সম্পর্কে বড় কথা তারা লটনস, ভিনস ও লফটহাউসকে নিয়ে গড়া ইংল্যাণ্ডের সঙ্গেও লড়তে সক্ষম হয়েছিল। হাঙ্গেরির আগে আর কোন দল নাকি অমনভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারত না।

সেণ্টার ফরওয়ার্ডে ন্যাণ্ডর হিদেকুটি নতুন দিক খুলে দিলেন। ডন রিভি ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটি পরে হিদেকুটির কৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করেন। রিভি-প্ল্যান অবশ্য হিদেকুটির সামান্যই অনুকরণ করতে পেরেছিল। হিদেকুটির গোপন কৌশল হল তিনি বল নিয়ে বেশিক্ষণ নিজের পায়ে রাখতেন না। বরং কোজিস ও পুসকাসের দ্বারা দ্বিমুখী আক্রমণ চালাতেন বল দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে। তিনি নিজেও অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়তেন. বিপক্ষের গোলের কাছে যতই এগোতেন,আর তখন ডান পায়ে জোরালো শট করাই তাঁর বিশেষত্ব। এ বছর নভেম্বরেই ওয়েমব্লিতে হাঙ্গেরি নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে ইংল্যাণ্ডকে এবং হিদেকুটিই ছিলেন ধ্বংসের মূলে। ৯০ সেকেণ্ডের মধ্যে হঠাৎ প্রচণ্ড আক্রমণে হ্যারি জনস্টনকে বিপথে চালিত করে ইংল্যাণ্ডের প্রতিরোধ প্রাচীর ভেঙে ফেলেন। এরপর তিনি আরও দুটি গোল দেন।

মাঝমাঠে হিদেকুটি সবচেয়ে সাহায্য পান রাইট হাফ জোসেফ বোজসিক-এর কাছ থেকে। যেমন তাঁর শক্তি, তেমনি আক্রমণে ক্ষুরধার আর অদ্ভুত বল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। হাঙ্গেরির শক্তির প্রধান উৎস এই বোজসিক। উইং-এ

চমৎকার খেলোয়াড়ে পুষ্ট, তবে তারা এদের অপেক্ষা সামান্য দুর্বল। রাইটে বুদাই-২ ও লেফটে দ্রুতগতির জোলটান জিবর। গোলরক্ষক গুয়ালা গ্রসিকস শুধু বার-এর নিচে ভাল খেলেন তাই নয়, বিপক্ষে ভড়কি দিয়ে ক্রস পাস দেন এবং পেনাল্টি সীমানার মধ্যে অতিরিক্ত ব্যাক-এরও কাজ করেন।

এই সময় কোনো দল হাঙ্গেরির পদ্ধতিতে খেলেনি। কিন্তু হাঙ্গেরির দূরদর্শিতা বিশ্বভুবনে নতুন পথের সন্ধান দেয়। বলা বাহুল্য এবারের বিশ্বকাপে তাদের খেলা ৪-২-৪ এরই শুভ সূচনা বৈ নয়। লেফট হাফ জাকারিয়া সব সময়েই সেণ্টার হাফ লোরাণ্টের কাছাকাছি যেন সেঁটে থাকেন। আর বোজসিক মাঝমাঠে বিচরণ করেন। হিদেকুটি যেমন এগোন, তেমনি পিছিয়ে আসেন। তবে তা কখনও গতানুগতিকভাবে নয়।

হাঙ্গেরির ব্যাক বুজানস্কি ও ল্যানটোস শুধু পেশীসমৃদ্ধ নন এবং রক্ষণভাগের শোভাবর্ধনকারীও নন, প্রকৃতপক্ষে হাঙ্গেরির আক্রমণ শুরু হত ব্যাক থেকেই এবং অনুসন্ধান করলেও স্পষ্ট বোঝা যাবে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ হয়েছে তুলনামূলকভাবে খুবই কম।

লৌহ-যবনিকার অন্তরালে থেকে তাঁরা দারুণ ঐক্য গড়ে তোলেন দলের মধ্যে সেরা প্রতিভা খুঁজে খুঁজে। সব খেলোয়াড়ের গায়ে ইউনিফর্ম চাপিয়ে সৈন্য বলে অভিহিত করা হল। তারা 'সেনাদল' হিসাবে খেলল। হাঙ্গেরির এই 'সেনাদলে'র নাম হল হ্যানোভড'। এই মেজর-দের মধ্যে হিদেকুটি ছিলেন না। তাঁর দল 'ভোরোস লোগোবে' (রেড ব্যানার)। ১৯৫৬-র বিপ্লবের পর এই দলের নাম হয় এম টি কে।

হাঙ্গেরির এই বিস্ময়কর দলের সভাপতি সহকারী ক্রীড়ামন্ত্রী গুস্তাভ সেবেস। তাঁর অধীনে সর্বক্ষণের জন্য একজন কোচ—গুলা মণ্ডি। ট্রেনিং গতানুগতিক নয়—বরং বৈচিত্র্যে পূর্ণ এবং নব নব পদ্ধতি অবলম্বিত। এককথায় অভিনব। হাঙ্গেরির সাফল্যে ইংল্যাণ্ডে বই বের হল—'লার্ন টু প্লে দ্য হাঙ্গেরিয়ান ওয়ে'। তাদের খেলোয়াড়দের অ্যাথলেটিকসের ইভেণ্ট প্র্যাকটিস করানো হত। পর্বতারোহণেও ট্রেনিং দেওয়া হত ফুটবলের স্বার্থেই। সর্বোপরি বল নিয়ে অনুশীলন তো ছিলই। এতসব জেনেশুনেও ব্রিটেন অদ্ভুতভাবে রক্ষণশীল রয়ে গেল। তারা শুধু ম্যাচ প্রাকটিস করত।

হাঙ্গেরির শক্তি দেখে মনে হল তাদের মধ্যে একাধিক সারোশি, একাধিক ওরথ ও একাধিক কনরাডের আবির্ভাব ঘটেছে। হাঙ্গেরি সুপার ফুটবলার তৈরি করেছে নব পদ্ধতিতে আদর্শ ট্রেনিং-এর মাধ্যমে। তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা কঠোর মনে হলেও দারুণ কার্যকর। গ্রসিকসকে একবার একবছরের জন্য সাসপেণ্ড করা হয় চুরির দায়ে, 'হ্বানোভড' থেকেও বহিষ্কৃত করা হয়। কোক্সিসের অসদাচরণের খেসারতস্বরূপ বিশ্বকাপের মাত্র কিছুদিন আগে খেলার অনুমতি দেওয়া হল জনসমক্ষে ক্ষমা চাওয়ায়। অথচ তাঁকে সতর্ক করে দিলেই যথেষ্ট হত।

হাঙ্গেরি সম্পর্কে ধোঁয়াটে ভাবটা কাটল তখনই, যখন পুসকাস ও কোক্সিস দলে নেই—কয়েক বছর পরে তাঁরা যখন পড়তির দিকে। ওয়াল্টার উইনটার-বটমের কথাই বর্ণে বর্ণে খাঁটি হল—প্রত্যেক বড় দল 'বড়' হয়ে ওঠে একদল 'বড়' খেলোয়াড়কে ঘিরেই। কোক্সিস ও তাঁর সতীর্থরা যতদিন ছিলেন, হাঙ্গেরির প্রত্যেককে তখন দারুণ দারুণ খেলোয়াড় মনে হত। সেবেস ছিলেন 'যাদুকর', মণ্ডির মত ম্যানেজার দুর্লভ ছিলেন। আর ওই দল যখন ভেঙে গেল হাঙ্গেরিও তখন কত দুর্বল ; এবং ওর পরেই তাদের দুঃসময়ের শুরু।

শুরুতে : হাঙ্গেরি প্রথম দুটি খেলায় ১৭টি গোল দিয়ে খেলার শুভ সূচনা করল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচটি। এই খেলাতেই জার্মান সেণ্টার ফরোয়ার্ড দীর্ঘদেহী ওয়ার্নার লেব্রিশ-এর লাথি খেয়ে পুসকাস বসে গেলেন, গোটা প্রতিযোগিতা থেকে নিলেন বিদায়। আর পশ্চিম জার্মানীর এই লাথিই তাদেরকে বিশ্বকাপ এনে দেয়। পুসকাস পরে বলেন, ইচ্ছে করেই তাঁকে লাথি মারা হয়েছিল। পর্যবেক্ষকরাও স্বীকার করেন, লাথিটা বড্ড জোরালো ছিল।

জুরিখে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে নয় গোল দিতে হাঙ্গেরির একটুও বেগ পেতে হয়নি। কোরিয়ায় তখন দারুণ গৃহযুদ্ধ চলছে। তাই বিশ্বকাপে তাদের উপস্থিতি অনেককে বিস্মিত করে। তারা জাপানকে হারায়। কোরিয়ার ট্রেনার কিম্ ইয়ং শিক ১৯৩৬-এ বার্লিন ওলিম্পিয়াডে জাপানী দলে ছিলেন। বলা বাহুল্য এই দলে অধিকাংশই ছিলেন কোরীয়। তখন তারা হারায় সুইডেনকে।

গুস্তাভ সেবেস ড্রেসিং-রুমে গিয়ে কোরীয় দলকে অভিনন্দন দ্বারা রাজনৈতিক মতপার্থক্যে কিছুটা শান্তিবারি ছিটিয়ে দিলেন। পরাজিত

কোরীয় খেলোয়াড়রা হেরেও খুশি হলেন। কোজিস ও পুসকাস পাঁচটি গোল দেন এবং লেফট ব্যাক লানটস ফ্রি-কিকে একটি।

বার্ণ-এ পশ্চিম জার্মানী সহজেই ৪-১ গোলে তুরস্ককে হারাল এবং তারাই কার্যত হাঙ্গেরির সঙ্গের খেলাটি বাসেল-এ সরিয়ে দিল। আর শেপ হারবার্জার-এর দ্বারাই তুরুপের তাসটি ফেলেছিলেন। তুরস্ককে ওরা জানতই এবং প্লে-অফ্ ম্যাচে আবার হারাল। রোমে কোয়ালিফাইং গ্রুপে প্লে-অফ্ ম্যাচে স্প্যানিয়ার্ডরা খেলল তাদের ফরওয়ার্ডের প্রধান স্তম্ভ লাডিস্লাভ কুবালা ছাড়াই। হাঙ্গেরীয় কুবালা নিজের দেশ ছাড়াও চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে খেলেছেন। রোমে ওই ম্যাচের আগে ফিফা থেকে পাঠানো একটি জাল টেলিগ্রাম পৌঁছয়। তাতে কুবালা-কে খেলতে নিষেধ করা হয়। ফিফা পরে ঐ টেলিগ্রামের কথা অস্বীকার করে। খেলাটি ড্র হয়েছিল। তারপর লটারি হলে এক অন্ধ ইতালীয় বালক তুরস্কের পক্ষেই নাম তোলে।

ফ্রিজ্ ওয়াল্টার ছাড়া জার্মানীর বাকি ফরওয়ার্ডরা গোল দিলেন। প্রথম গোলটি অস্থায়ী রাইট উইঙ্গার বার্ণি-ক্লদের। আসলে উইঙ্গার বলতে বোঝাত হেলমট রান-কেই। মণ্টিভিডিও থেকে তিনি ডাকনামেই পরিচিত ছিলেন। মণ্টিভিডিওতে তিনি নিজের ক্লাব রট উইস এসেন-এ খেলার সময় পেনারোল-কে হারালে তারা মোটা টাকার বিনিময়ে ওই ক্লাবে নিয়ে যেতে চায়।

হাঙ্গেরি ৮-৩ গোলে বাসেল-এ জার্মানীকে হারাল। তাই বলে জার্মান দল নেহাৎ জোড়াতালি দেওয়া ছিল না। তৃতীয় গোলদাতা হেলমুট রানও খেলেছেন। এই হেলমুটের চাতুরী বাধা দেওয়ার মত তখন কেউ ছিলেন না। সেণ্টার হাফে লিবেরিশ-কে সুযোগ দেওয়া হল এবং তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে চমৎকার খেললেন। কিন্তু এসবও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারল না যে, জার্মানীই বিশ্বকাপ জিতবে। এমনকি পুসকাসও গোড়ালির আঘাতের জন্য ঘণ্টাখানেক মাঠের বাইরে থাকা সত্ত্বেও হাঙ্গেরীয়রা জার্মানদের নিয়ে যেন পিকনিক করছিল। কোজিস দিলেন চারটি গোল। এরপরে জার্মান দলে সাতটি রদবদল করে জুরিখে তুরস্ককে ৭-১ গোলে হারায়। রাইট-ইন সুদেহী মরলক দেন তিন গোল। তবে হাঙ্গেরির কাছে পরাজয়ের পর জার্মানীর খেলায় তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি।

বাসেল-এ ইংল্যাণ্ড-ব্রাজিলের খেলায় গোলের ছড়াছড়ি। কেউ কারুর অপেক্ষা কমতি নয়। এর আগে বেলজিয়ানরা সুইডেনকে ছাঁটাই করে

দিয়েছিল ইতালির ক্লাবগুলি নামী-দামীদের নিয়ে যাওয়ায়। জাগরেব-এ যুগোশ্লাভিয়াও পরাস্ত হয় বেলজিয়মের কাছে। তাদের দুই সেণ্টার ফরওয়ার্ড রাইট উইঙ্গার জেফ মারমানস ও রিক কোপেনসই ছিলেন প্রাণস্বরূপ। কোপেনস তাঁর স্কিলের জন্য দেশ-বিদেশের দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

অন্যান্য খেলার মত এই খেলাটিও টেলিভিশনে দেখান হয়। বিশ্বকাপ ঘিরে টেলিভিশন যেন অপরিহার্য হয়ে পড়ল। ১৯৫৪-য় টেলিভিশনে এই ফুটবল দর্শক ছিল মোটামুটি। ১৯৭০-এ টেলিভিশনে বিশ্বকাপ দেখলেন ৮০ কোটি লোক।

ইংল্যাণ্ডের টেলিভিশন দর্শকদের একমাত্র ম্যাথিয়ুসের খেলা ছাড়া এই খেলা আশাহত করল। ম্যাথিয়ুস দেশের জন্য আর একবার গৌরবময় ফুটবল খেললেন। অতিরিক্ত সময়ে তাঁর পেশীতে টান ধরে! বলাবাহুল্য এর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের আক্রমণভাগের পুরোধা। ম্যাথিয়ুস চিরাচরিত প্রথায় রাইট উইং-এ আক্রমণ সীমিত রাখেননি বা, অন্যরা তাঁকে আক্রমণ করলে তবে খেলে তিনি এগিয়ে যাবেন এমন চিন্তাও করলেন না। বরং আর এক ম্যাথিয়ুসকে দেখা গেল। তিনি যেমন সারা মাঠে বিচরণ করেছেন, তেমনি বিপক্ষকে কাটাচ্ছেন, ওপেনিং তৈরি করেছেন। তিনি আজ শুধু সম্পূর্ণ ফরওয়ার্ড নন, উঁচুদরের একজন ফুটবলার—যাঁর পরামর্শ সর্বদা শিরোধার্য।

ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে লণ্ডনের 'দ্য টাইমস' লিখল: "লাইক দোজ রেয়ার চিল্ড্রেন অফ লাইট হু ক্যান্ পাস থ্রু এনি এক্সপিরিয়েন্স প্রটেক্টেড বাই এ সিথ্ অফ ইম্পেনেট্রেবল ইনোসেন্স।" দুর্ধর্ষ পোল আনোল বেলজিয়মকে ১-০ গোলে এগিয়ে দিলেন অভূতপূর্ব ক্রীড়াকৌশলে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে। প্রত্যুত্তরে ইংল্যাণ্ড উপর্যুপরি তিনটি গোল দেয়। ২৫ মিনিট পরে বিলি রাইটের পাস ব্রোডিসকে ১-১ করতে সাহায্য করল! নাট লফটহাউস ডাইভিং হেড দ্বারা ২-১ গোলে এগিয়ে দিলেন। বিরতির পরে ৩-১ করেন ব্রোডিস।

তারপর খেলা ঝুলে গেল। কোন দলের খেলাতেই আক্রমণ রচনার দিকে ঝোঁক দেখা গেল না। বল মাঝমাঠে ঘোরাফেরা করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে স্পষ্ট বোঝা গেল ইংল্যাণ্ডের ডিফেন্সে সিড আওয়েন কত নড়বড়ে। গোলে মেরিকও কেমন যেন দুর্বল। আনোল ও কোপেনসের আক্রমণ তিনি রুখতে পারলেন না। ম্যাথিয়ুস দেখলেন বেলজিয়ম যেভাবে খেলছে, তাতে ইংল্যাণ্ডের হার অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এবার তিনি অনেকটা একাকী বল

নিয়ে এগোলেন। চমৎকার শটে ইংল্যাণ্ডকে এগিয়ে দিয়েছিলেন প্রায়, কিন্তু জার্ণি বলটি ধরলেন ক্রশবারে ধাক্কা খেয়ে বলটির গতি থেমে যাওয়ায়।

রেফারি অতিরিক্ত সময়ের খেলার নির্দেশ দিলেন এবং ইংল্যাণ্ড দ্রুত একটি গোল দিল। ডামির বল ব্রোডিস পেতেই স্কোয়ার পাস করলেন লফটহাউসকে, তিনি তাতে জোরালো শট নিতেই গোল হয়ে গেল। সারা সিরিজে দর্শক ব্রিটিশের সমর্থক ছিলেন, তাই এতক্ষণ তাদের রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত কাটছিল। এই গোল তাদের স্বস্তি এনে দিল। কিন্তু পোর্টসমাউথের বুদ্ধিমান লেফট হাফ জিমি ডিকসন সব আশা নির্মূল করলেন ড্রাইসের লং ফ্রি-কিকে হেড দিয়ে। বল ঢুকে গেল নিজ গোলে। ইংল্যাণ্ড এতক্ষণ ৩-৩ গোলে এগিয়ে ছিল, এবার ৪-৪ হল! শেষ মুহূর্তে আওয়েনের পেশীতে টান ধরায় তিনি যখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে উইং-এ গেলেন, বিলি রাইট তখন সেণ্টার হাফে। রাইট ওই পজিশনে আরও পাঁচ বছর সগৌরবে খেলেছিলেন।

আগের দিন জুরিখে স্কটিশ দল অস্ট্রিয়ার সঙ্গে দারুণ লড়ে ০-১ গোলে হেরে গেল। তাদের রক্ষণভাগের শক্তিতেই অস্ট্রিয়া বারংবার বাধা পাচ্ছিল এবং ফরওয়ার্ডরা অন্তত দুটি গোল দিতে পারত। প্রথম গোলের সুযোগ আসে যখন হ্যাপেল পেনাল্টি সীমানার মধ্যে মোচানকে ফেলে দেন—কিন্তু এমন শট করলেন যে, তা বাইরে চলে গেল এবং দ্বিতীয়টি শেষ বাঁশি বাজার একটু আগে। চতুর লেফট উইঙ্গার উইলি অরমণ্ড ক্রশপাস করলেন অ্যালান ব্রাউনকে, তিনি কোনোরকমে গোড়ালিতে ছুঁয়ে দিলেন আর নিয়েল মোচান বিপক্ষের জটলার ফাঁক দিয়ে শট করলেন। বল হ্যাপেলের গায়ে লাগল। অস্ট্রিয়ার গোলরক্ষক শিমড ঝাঁপ দিলেন ধরতে, কিন্তু হাত ছুঁয়ে বল হাতেই জড়িয়ে গেল। তিনি ডানদিকে ঘুরে কোনরকমে গোল আটকে দিলেন।

ত্রিশ মিনিট পরে আলফ্রেড কোয়েরনারের রিটার্ণ পাস থেকে বল পেলেন প্রোবস্ট। ঠাণ্ডা মাথায় এগিয়ে গিয়ে মার্টিনকে সহজে পরাস্ত করলেন। অস্ট্রিয়ার জয় হল।

স্কটল্যাণ্ডের খেলায় চমৎকারিত্বের ছাপ না থাকলেও তাদের স্পিরিট সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। তাই অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ০-১ গোলের হারে গ্লানি ছিল না। কিন্তু এরপর তাদের বিপর্যয় ঘটল। অ্যাণ্ডি বিটি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বললেন, বাসেল-এ চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের সঙ্গে খেলার পরেই তিনি চলে যাবেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, স্কটিশ কর্মকর্তারা তাঁকে ম্যানেজারের

পদে রাখতে রাজী ছিলেন না। এর প্রতিক্রিয়ায় ভুগতে হল স্কটল্যাণ্ড দলকে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে নেমেই।

এবার উরুগুয়ের সূচনা তেমন ভাল ছিল না। বার্ণ-এ চেকোশ্লোভাকিয়াকে ২-০ গোলে হারায় অনভ্যস্ত কাদামাঠে। আক্রমণভাগে রাখা হয় আবাদি, বোরজেস ও অ্যামব্রয়-কে; আর স্টপার রইলেন জোস স্যাণ্টামেরিয়া। জোস মাঝে মাঝে তাঁদের ডিফেন্সের পিছনে চলে যাচ্ছিলেন এবং কার্যত সুইপারের কাজ করছিলেন। ওদের সম্পর্কে এক ব্রিটিশ সাংবাদিক লিখলেন, ওদের ডিফেন্স এই রকম থাকলে ইংল্যাণ্ড ওদের ছত্রখান করে ছাড়বে। তিনি উরুগুয়ের শুটিং-এরও কড়া সমালোচনা করলেন।

ওই রকম সমালোচনা প্রাপ্যও ছিল। কেননা, ২০ মিনিটের আগে তারা গোল দিতে পারেনি। অ্যামব্রয়েস-এর সেণ্টারে মিগুয়েজ হেড করে ১-০ এগোয়। ২-০ হয় শিয়াফিনোর ভূকম্পন সদৃশ ফ্রি-কিকে।

চেক খেলোয়াড়রা প্রচার চালাতে থাকে—বিশ্বকাপ যে পায় পাক, নিশ্চয়ই উরুগুয়ে নয়।

ইয়র্কশায়ারের আর্থার এলিস অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলা পরিচালনা করলেন। উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের বুট তাঁর দৃষ্টি কেড়ে নিল এবং বুঝলেন ব্রিটিশ খেলোয়াড়রা কত পিছিয়ে। অবশ্য ব্রিটিশদের প্যাণ্ট (শর্ট) ক্রমশই ছোট হয়েছে। ওজন কমাবার জন্য এলিস লিখলেন—"ব্রিটিশদের পোশাক খুব হাল্‌কা, কারণ তা ক্রমশ বিকিনিতে রূপ নিয়েছে। তবে তাদের সরঞ্জামের ওজন ওভারকোটের মত। উরুগুয়ের ফুটবল বুট অনেকটা পাখির পালকের ন্যায়। বুটের গোড়ালি ছোট করে কাটা এবং তৈরি নরম চামড়ায়, সোলের স্টাড ও হালকা। পাতার দিকটা লোহার দ্বারা শক্ত করা হয় না। বরং পায়ের পাতাকে রক্ষা করতে ভিতরে নরম রবার দেওয়া থাকে।"

বাসেল-এ উরুগুয়ে দল স্কটল্যাণ্ডকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। তারা যেন খেল্‌না নিয়ে খেলছিল। স্কটল্যাণ্ডকে ঘিরে দর্শকরা হাসাহাসি করলেন। তাদের রক্ষণভাগ তছনছ হয়ে গেল উরুগুয়ের ফরওয়ার্ডদের সামান্য আক্রমণেই। ইংল্যাণ্ডের সমালোচকরা বললেন স্কটল্যাণ্ডের রক্ষণভাগ সম্পর্কে, "স্টুড অ্যারাউণ্ড লাইক হাইল্যাণ্ড ক্যাট্‌ল।"

"ওরা রোদে পুড়ে মরে যাবে"—ভবিষ্যদ্বাণী করলেন ভিট্টোরিও পোজো খেলার আগে। ব্যঙ্গাত্মক হলেও তাঁর কথাই খেটে গেল। শিয়াফিনো

সহজেই সারা মাঠে বিচরণ করে বেড়িয়েছেন। তাঁর সোয়ার্ভ ও ফুটওয়ার্ক স্কটল্যাণ্ডের ডিফেন্সকে ছত্রখান করে ফেলে। তাঁর পাসে ছিল বিদ্যুৎগতি। আর তাঁকে সাহায্য করতে থাকেন আবাডি ও বোরজেস তৎপরতার সঙ্গে। স্কটিশ ব্যাকলাইন তখন যেন মুখ থুবড়ে পড়ছে। স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুসের চাইতে বড় ৩৯ বছর বয়সী ওবদুলিও ভারেলা বড় বড় উরু নিয়ে যথেচ্ছাচার করছিলেন। রাইট ফ্লাঙ্কে বডবিগুয়েজ আন্দ্রাদে যেমন বল সরবরাহ করছিলেন, তেমনি ছিল তাঁর অদ্ভুত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। কেউ কেউ বললেন, ওরা বাঁদিকে খালি রেখে রক্ষণাত্মক খেলছে ; কিন্তু আসলে তা ছিল না, যখন যেমন, তখন তেমনি খেলার স্ট্র্যাটেজি ওদের। খালি জমি ওরা মুহূর্তে বুজিয়ে ফেলছিল।

উরুগুয়ের সাত গোলের একটিও হেড দ্বারা নয়। বোরজেস ও মিগুয়েজ প্রথমার্ধে গোল দিলেন। দ্বিতীয়ার্ধে বোরজেস ও আবাদি এক জোড়া করে গোল দেন এবং মিগুয়েজ একটি। শেষ গোলটি হয় সমাপ্তির দশ মিনিট আগে। আবাদি ড্রিবল করতে করতে দুই স্কটিশ ব্যাককে অতিক্রম করেন। তারপর ছিলেন শুধু গোলরক্ষক মার্টিন। উরুগুয়ে তার দারুণ টেকনিক এবং মাঝে খেলার গতি পরিবর্তন করছিল একেবারে হাঙ্গেরির খেলোয়াড়দের মতই। উরুগুয়ের সামনে পড়ে স্কটিশদের মনে হচ্ছিল তারা যেন স্কুল-ছাত্র। বেচারা স্কটল্যাণ্ড! তারা যা শিখেছিল তাই তো খেলবে!

ইতালির খেলায় ইতিমধ্যে উত্থান পতন দেখা দিয়েছে। লুসান-এ প্রথম খেলায় সামান্যের জন্য তারা হেরেছে সুইজারল্যাণ্ডের কাছে। অথচ ওই ম্যাচে তাদের জেতাই উচিত ছিল। সুতরাং কেজলার নিশ্চয়ই মর্মাহত হয়েছেন। তাঁর ভাবনা ছিল আর্জেন্টিনার প্রাক্তন এডওয়ার্ডো রিকাগনি-কে নিয়েই। রিকাগনি-র স্পিড ও শট ছিল অপ্রতিরোধ্য। তাই বলে ইতালির তাঁকে ছাড়া চলত না—এমন নয়। এর আগের মরশুমে রিকাগনি আর্জেন্টিনা থেকে আসেন জুভেন্টাস-এ খেলার জন্য, তারপর তিনি ইতালি দলের জন্য নির্বাচিত হন। ফুটবলের মধুচন্দ্রিমা শেষ হল, জুভেন্টাসের অন্যান্য খেলোয়াড়রা বলতে লাগলেন, ওই বাবুর দ্বারা গোল ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। এসব অভিযোগের পর বাধ্য হয়ে কেজলার তাঁকে তখন বাদ দিয়েছিলেন।

বিশ্বকাপের খেলার মাসখানেক আগে যে সুইজারল্যাণ্ড ৩-৩ করেছিল উরুগুয়ের সঙ্গে, এখন তাদের সেই খেলা দেখা গেল না, তারা জিতল যেন শুধু ওই জয়ের রেশে এবং বিপুল উদ্দীপনায়। তবে ব্রাজিলের রেফারি ভিয়ানার

ক্রটিপূর্ণ পরিচালনায় মাঠে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফরাসী সমালোচক গ্যাব্রিয়েল হ্যানট বললেন : ইংলিশ বা স্কটিশ রেফারি হলে প্রথমার্ধে সুইসদের বিরুদ্ধে গোটা তিনেক পেনাল্টি দিতেন এবং দ্বিতীয়ার্ধে ইতালির দুই ব্যাক ভিনসেনজি ও গিয়াকোমাজিকে মাঠ থেকে বহিষ্কার করতেন। গালি ও বোনিপার্টিকে বারংবার বাধা দেওয়া হতে থাকে বল ছাড়াই। ইতালীয়রা যেন প্রহারেণ ধনঞ্জয় পদ্ধতি নিয়েছিলেন। ফেটনের পেটে লাথি মারা হল। পিঠে লাথি খেল ফ্লুকিজার।

দ্বিতীয়ার্ধের ২৪ মিনিটের সময় সকলেই ধরে নিয়েছিলেন বেনিটো লোরেঞ্জির গোলে ইতালি ২-১ গোলে এগিয়েছে। কিন্তু ভিয়ানা অফ্ সাইডের ফুঁ দিলেন বাঁশিতে। চারিদিকে হৈ-হট্টগোলের মধ্যে শোনা গেল—"গোল বাতিল? তবে রে!" সরকারীভাবে জানান হল—গোল বাতিল। ইতালির সব খেলোয়াড় একযোগে রেফারিকে আক্রমণ করতেই তিনি ছুটে পালালেন। পরে অবশ্য খেলা শুরু হয়।

নির্ভুল গোল সম্পর্কে অধিকাংশই একমত ছিলেন। কেউ কেউ ধরে নিলেন ভিয়েনার সিদ্ধান্তকে প্রভাবান্বিত করেছে লোরেঞ্জির অপকর্ম। কেননা, খেলার শুরু থেকেই তিনি রেফারিকে ব্যঙ্গ করছিলেন। হঠাৎ ইতালির দিকে বল আসতেই প্যাণ্ডোলফিনি-র পাসে গালি শট করতেই সেটি পোস্টে ধাক্কা খায়, লোরেঞ্জি ফিরে আসা বল মারতেই গোলে প্রবেশ করল।

তারপর মাঠে নানা দৃশ্য। ইতালির খেলোয়াড়রা মৌমাছির মত ঘিরে ধরলেন রেফারিকে। কেউ কেউ নিজেই নিজের চুল ছিঁড়লেন। কেউ ঘাস ছিঁড়ে চিবিয়ে নিলেন। রাগে সকলে গর গর করছেন। বোনিপার্টি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিলেন রেফারির কাছে। কিন্তু তিনি তেমন আচরণ না করে ঠিক উল্টো ব্যবহার করলেন। 'আজুরি'দের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন রেফারির কাছ থেকে এবং যতক্ষণ অবস্থা আয়ত্তে না এল, ততক্ষণ ওই কাজে ব্যস্ত রইলেন।

খেলা শেষ হতে বাকি তখন ১২ মিনিট। জ্যাকি ফেটনের পাস গিয়াকোমাজি ধরতে পারলেন না। কিন্তু হুগি ইতালীয় গোলরক্ষককে পরাস্ত করে সুইজ্যারল্যাণ্ডকে জিতিয়ে দিলেন।

ইতালীয় দলে এবার তিনটি পরিবর্তন হল এবং বেলজিয়মকে ৪-১ গোলে হারিয়ে সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে প্লে-অফ্ ম্যাচ খেলার পথ করে নিল। নতুন

তিনজনের অন্যতম জিনো কাপেলো আগের মত খেলতে পারলেও ক্রশবারে দারুণ শট করলেন এবং আক্রমণ রচনায় পথিকৃৎ হলেন। স্ট্যামিনা ও বয়সের প্রসঙ্গ বাদ রেখেও তিনি কেমন করে খেলতে এলেন সেটাই আশ্চর্যের। বছর দুয়েক আগে একটি প্রীতিম্যাচে রেফারিকে প্রহারের জন্য তাঁকে সারাজীবন ফুটবল থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে তখন রেফারিকে চাপ দিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে বলা হতে থাকে, আপনি ওর দোষ একটু লঘু করে দেখুন, তদনুযায়ী রিপোর্ট দিন। তখন ওর সাসপেনসন কমিয়ে একবছর করা হয় এবং কাপেলো মরশুমের শুরু থেকেই বলোগনার খেলোয়াড় হয়ে অনুশীলন করতে থাকেন।

ইতালীয় আক্রমণের মূলে ছিলেন লোরেঞ্জি। ৩৫ মিনিট পরে তিনি রাইট উইং থেকে সেণ্টারে চলে যান। এবার দ্বিতীয়ার্ধে তিনি গোল দিলে সেটি বাতিল হয়নি। যেভাবে উজ্জ্বল ফুটবল খেলছিল, তাতে আরও গোল হওয়া উচিত ছিল।

সুইজারল্যাণ্ড ইতিমধ্যে ০-২ গোলে হেরেছে অতি সহজেই বার্ন-এ প্রচণ্ড গরমে খেলে। ইংল্যাণ্ড দলেও কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিলি রাইটকে পাঠান হল সেণ্টার হাফে এবং তিনি ওখানেও দুর্ভেদ্য ও অপ্রতিরোধ্য হলেন। ম্যাথিয়ুস ও লফটহাউস সুস্থ ছিলেন না, তাই ডেনিস উইলশ ও জিমি মুলেন খেললেন। পেশাদার ফুটবলে জিমির এটি পঞ্চদশ বর্ষ খেলা। আক্রমণ রচনায় নেতৃত্ব দিতে থাকেন টমি টেলর (ইনি চারবছর পর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মারা যান)। রাইট হাফে বেশ খেললেন হাডার্সফিল্ডের বিল ম্যাকগ্রে। মেরিক গোলে চমৎকার ঠেকালেন এদিন।

খেলায় দর্শনীয় ছিল উলভসের লেফট উইঙ্গারের দেওয়া গোলগুলি। বিরতির তিন মিনিট আগে টেলরের সামান্য উঁচু শট মুলেন ধরে সুইস গোলরক্ষক পার্লার-এর কাছে গিয়ে ১-০ করলেন। দ্বিতীয়ার্ধে মাঝামাঝি সময়ে ডেনিস উইলশ চতুরতার সঙ্গে কাটালেন এগিম্যান, বকোয়েট ও নিউরিকে। তারপর পরাস্ত হলেন পার্লার। সুইস 'ক্যাটানাকিও' ধসে গেল। ইতালি বাসেল-এ প্লে-অফ্ ম্যাচে জিতবে ধরে নিল।

কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বললেন : তোমাদের দলে গণ্ডগোল ও অরাজকতা চলবে। কর্মকর্তারা জানালেন, দলে এখন দারুণ বিশৃঙ্খলা চলছে। কেজলার খেলোয়াড়দের নামের তালিকা প্রকাশ করলেন। কাপেলো ও গালি বাদ

পড়েছেন ; রক্ষণভাগের (লেফট হাফ) ফাওরেন্টিনাকে নেওয়া হল লেফট ইনে। অর্থাৎ দলের ঐক্য ভেঙে গেল। খেলা শুরুর দেড় মিনিটের মধ্যেই ইতালির এমনই নড়বড়ে অবস্থা দেখা গেল, তারা যেন হাঁটতেই পারে না। আর যাও-বা ছুটছিল তা দৌড় নয়, হাঁটার একটু সংশোধিত সংস্করণ মাত্র। বেতার কথক জানালেন, 'এটা পরাজয় নয়, বিপর্যয়। আমরা স্টেডিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে এলাম, সুইসদের উজ্জ্বল মুখগুলির দিকে চোখ রাখতে পারছিলাম না।'

ইতালি ০-১ গোলে পিছিয়ে পড়ল ১৩ মিনিটের সময় জোসেফ হুগির গোলে। বিরতির পরে খেলা শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যে টগবগে বালামান কর্ণার-কিকে সজোরে হেড দিতেই ইতালি আর এক গোলে পিছিয়ে গেল (২-০)। ২০ মিনিট পরে নেস্টি হেড দিয়ে ২-১ করলেও সুইসদের ঠেকাতে পারলেন না কিছুতেই। শেষ পাঁচ মিনিটে হুগি ও ব্যাকি ফেটন দুটি গোল দিয়ে দুরন্ত গতিতে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছল অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে খেলার জন্য।

স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার গোলের ব্যবধান ন্যূনতম হলেও চেকোস্লোভাকিয়াকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল জুরিখে ৫-০ গোলে। গোল দিলেন সোজসপল ও প্রোবস্ট এবং চারটিই প্রথমার্ধে।

গ্রুপের খেলাগুলির মধ্যে সেরা ম্যাচ হল লুসান-এর ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে ব্রাজিল বনাম যুগোশ্লোভিয়া চমৎকার পরিবেশে। স্টেডিয়ামের নিচে লেক জেনিভা, উপরে কুয়াশাচ্ছন্ন স্যাভয় আল্পস। দুটি দলই নিষ্কলঙ্ক ফুটবল খেলল। কিন্তু সমস্ত খেলার মাধুর্য নষ্ট করে দেয় অদ্ভুত 'আইন'। ড্র হলেও যদি পয়েন্টের ব্যবধান থাকে, তবুও অতিরিক্ত সময় খেলা কেন ?

যুগোশ্লোভিয়া দল আসে তরুণ অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ে পুষ্ট হয়ে। ১৯৫০-এর তারকাদের কয়েকজন এই দলে ছিলেন। যথা—সোনালা চুলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড বার্নার্ড ভুকাস, কুশলী রাইট আউট মিলোস মিলুটিনাভিক। জেজে মরিয়া ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে নতুন চিন্তাধারা আনলেন। তাঁর বক্তব্য ১৯৫০ আর ১৯৫৪ এক নয়। ভিন্ন পরিবেশ ও আবহাওয়ায় খেলতে হবে। এবার তারা বিপক্ষের কাছে রইল 'ছলনাময়'।

শুরুতে যুগোশ্লোভিয়ার গোলরক্ষক ভ্লাদামির বিয়ারাকে কিছু বল আটকাতে হয়। তারপর তারা 'চতুর্ভুজ' পদ্ধতির খেলায় ম্যাচ ধরে নিল। অধিকাংশ সময় বল রইল মাঝমাঠে, গোলের সুযোগ পেল একাধিক। কিন্তু গোলমুখে ব্যর্থ হতে থাকে। ব্রাজিলের আক্রমণ রচনায় ডিডি-র যাদু ও

জুলিনোর ড্রিবলিং অতুলনীয়। অ্যাজেটেক দেবতার মুখমণ্ডল সদৃশ জুলিনোর ডান পায়ের মার তো মানুষের পায়ের নয়, যেন বড় কোনো শক্তিশালী হাতুড়ির ঘা।

বিরতির তিন মিনিট আগে ভুকাস ও মিটিক সুযোগ করে দিলেন লেফট উইঙ্গার ব্রাঙ্কো জেবেক-এর জন্য। জেবেক সে সুযোগ ব্যর্থ হতে দেননি। ০-১ গোলে পিছিয়ে পড়েও ব্রাজিল সারা মাঠ নিয়ন্ত্রণে আনে। ডিডি-র জোরালো শট পোস্টে লেগে ফিরল। তিনটি মারাত্মক শট করলেন জুলিনো। অবশেষে ডিডি-র কামানের গোলার মত বল যুগোশ্লাভিয়ার গোলে ঢুকে ১-১ হল। তবে কোন দল অতিরিক্ত সময় খেলার জন্য পীড়াপীড়ি করেনি।

এই ড্র-র অর্থ ফ্রান্সের ছাঁটাই হওয়া। প্রথম খেলায় তারা যুগোশ্লাভিয়ার কাছে ০-১ গোলে হেরেছিল। কিন্তু মেক্সিকোর সঙ্গে ৩-২ গোলে জেতে। চূড়ান্ত গোলটি দেন পেনাল্টিতে রেমণ্ড কোপা। মেক্সিকানরা এইজন্য রেফারিকে আক্রমণ করেছিল।

কোয়ার্টার ফাইনাল

কোয়ার্টার ফাইনালে বারণ-এ মিলিত হল ব্রাজিল : হাঙ্গেরি ; ব্যাসেল-এ ইংল্যাণ্ড : উরুগুয়ে ; জেনিভায় জার্মানী : যুগোশ্লাভিয়া ও লুসান-এ অস্ট্রিয়া : সুইজারল্যাণ্ড।

ব্রাজিল : হাঙ্গেরি—এই খেলা 'বারণ-এর যুদ্ধ' নামেই বিশ্বকাপ ফুটবলে চিহ্নিত হয়ে আছে। আর এই যুদ্ধের জন্য ব্রাজিলকেই বেশি দায়ী করা হয়েছে। মাঠের মধ্যে তারাই মাত্রাতিরিক্ত অশোভন আচরণ করে। লজ্জাজনক সে ঘটনা। কিন্তু নৃশংসতার নিদর্শন দেখা দেয় হাঙ্গেরির ড্রেসিং-রুমে ওদের অনুপ্রবেশের সময়। অবশ্য ওই কাজে প্ররোচনাও ছিল যথেষ্ট। বিশ্বকাপ শৃংখলা রক্ষা কমিটিও এই প্রলয়ঙ্কর ব্যাপারে হাত গুটিয়ে বসে রইল। ব্রাজিল ও হাঙ্গেরিও বলেছিল, তারা কোন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে না। প্রতিযোগিতার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি আর্থার এলিস যখন বহিষ্কৃত জোসেফ বোজসিককে (অধিনায়ক) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কী সাসপেণ্ড হয়েছ? বোজসিক বেশ চড়া গলায় উত্তর দিল, হাঙ্গেরিতে আমরা ডেপুটিদের সাসপেণ্ড করি না। হৈ-হট্টগোলের মধ্যে আহত ফেরেঙ্ক পুসকাস কী করেছিলেন? অথচ তিনি তো টাচ্‌লাইনের কাছে বসে খেলা দেখছিলেন।

'করিয়ের ডেলা সেরা'-র বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায় ব্রাজিলের সেণ্টার হাফ পিনহিরো যখন তাদের ড্রেসিং-রুমে ঢুকছিলেন, পুসকাস তখন ওর মুখে বোতল ছুঁড়ে মারেন এবং আট সেন্টিমিটার ক্ষত হয়। বিশ্বকাপ কমিটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট আর্নস্ট থমেনও পুসকাসকে ওই কাজ করতে দেখেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট ড্রেসিং-রুমের যুদ্ধেরও প্রত্যক্ষদর্শী। আসলে পুসকাসের ওই ইতরামির পরেই ড্রেসিং-রুমের যুদ্ধ শুরু হয়। কেউ কেউ অবশ্য পুসকাস সম্পর্কে অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু পিনহিরো যে বড় ব্যাণ্ডেজ বেঁধেই স্টেডিয়াম থেকে বের হলেন সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। পুসকাসের পক্ষ-সমর্থনকারীরা বলেন, সে তো লাইনের ধারে দর্শকমাত্র ছিল।

শুরুতে খেলাটি দেখে মনে হচ্ছিল এটিই বুঝি ফাইনাল। এইভাবে আঘাত করার কারণও ছিল। ব্রাজিলই তো ১৯৫০-এর 'প্রকৃত' কাপ বিজয়ী। হাঙ্গেরি 'প্রকৃত' বিজয়ী ১৯৫৪-র। রেফারি আর্থার এলিসের মত চমৎকার পরিচালনাই ম্যাচটিকে শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছিল। তবুও তিনি তিনজন খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে তাঁর পরিচালনা প্রশংসা পেয়েছে, ব্রাজিলেও বেশ সুনাম কিনেছে। নিরপেক্ষ সমালোচকরা বলেন, তাঁর পরিচালনা অতুলনীয়। ইতালির এক সাংবাদিক লিখলেন, মাঠের মধ্যে তিনি যেন ম্যাজিস্ট্রেট। আরও বললেন, যদি তিনি মাঠের মধ্যে কঠোর হয়ে থাকেন, তবে সেই কঠোরতার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

মাঠে পুসকাস না থাকায় হাঙ্গেরি লেফট ইনে পাঠায় জিবর-কে এবং উইংয়ে তুই টথকে। ব্রাজিলের আক্রমণভাগে তিনটি বদল হল। রইলেন রাইট উইং জুড়ি ডিডি ও জুলিনো। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আট মিনিটেই ব্রাজিল ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়ল। হাঙ্গেরিয়ানরা তখন লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে যেন।

তিন মিনিটের মধ্যে হাদিকুটি প্রথম গোলটি দেন। জিবর ও কোজিস-এর শট ব্রাজিল গোলরক্ষক ক্যাস্টিলো আটকালে হাদিকুটির কাছে বল চলে যায়, তিনি নিজের দিকে বল পাঠান। ওই মুহূর্তে তাঁর পরোয়ার যো ছিল না প্যাণ্ট ছিঁড়ে যাওয়ায়। এরপর দ্বিতীয় গোলটি দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন। টথ (২) এর পাস চলে যায় কোজিস-এর কাছে, তারপর হাদিকুটি ব্রাজিল ডিফেন্সকে বোকা বানান। এই সময় গোটা হাঙ্গেরি দল অসম্ভব দ্রুত খেলছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের কিছু গুণ হ্রাস পেয়েছিল। ওদিকে ব্রাজিল নতোদ্যমে

খেলছে তখন এক অদৃশ্য শক্তির জোরে। তারা আক্রমণ করছে ক্ষণে ক্ষণে। মাঠের মধ্যে ও গ্যালারিতে সমান উত্তেজনা। হাঙ্গেরির রক্ষণভাগ ব্রাজিলিয়ানদের ঠেকানোর বদলে কয়েকটি ফাউল দ্বারা রাগিয়ে তুললেন। হাঙ্গেরির সেরারা দুর্বল জমিগুলোও আগলাতে লাগলেন। তখন প্রতি মুহূর্তে পুসকাসের অভাব অনুভূত হচ্ছে। তাদের রক্ষণভাগ তছনছ হওয়ার উপক্রম।

সতের মিনিট পরে ডিডি ও ইণ্ডিয়ো বল নিয়ে এগোতেই হাঙ্গেরির ব্যাক বুজানস্কি ফেলে দিলেন ইণ্ডিয়োকে। ডালমা স্যাণ্টোস পেনাল্টিতে ২-১ করলেন। বিরতির আগে পর্যন্ত ব্রাজিল যথাসাধ্য খেলল। রাইট উইং-এ জুলিনো কিন্তু শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন; বিপক্ষের টথ (১) তাঁরই মত ভ্রমণকারী বৈ ছিলেন না।

দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই ফাউলও দেখা দিল। ইচ্ছাকৃত অবরোধে আবার একটি পেনাল্টি হল। জিবর যখন কোজিসকে পাস দিচ্ছিলেন, তখন পিনহিরো দ্রুত সেটি হাত দিয়ে ধরে ফেলেন। ল্যাণ্টোসের জোরালো শটে হাঙ্গেরি ৩-১ এগোল।

এবার ব্রাজিল আক্রমণ করল: জুলিনোর দারুণ শট গ্রসিকস ধরতে পারলেন না (২-৩)। এর আগে তাঁর অদ্ভুত ড্রিবলিং হাঙ্গেরিকে নাস্তানাবুদ করে। খেলার বাকি তখন ২৪ মিনিট। উভয় দল দারুণ স্নায়ুর চাপে ভুগছে। আরও কিছুক্ষণ কাটল। বাকি ছয় মিনিট। দুই বড় খেলোয়াড় বোজসিক ও নিলটন স্যাণ্টোস হঠাৎ ঘুষোঘুষি শুরু করলেন। রেফারিও তাঁদের পাঠালেন মাঠের বাইরে। বোজসিক আগে ঘুষি দেন স্যাণ্টোসের মারাত্মক ট্যাকলে তেতে গিয়ে। জুলিনো দুবার বল নিয়ে এগোলেন এবং একবার বল বেরিয়ে গেল গোলের উপর দিয়ে, আর একবার পাস দিলেন ডিডিকে। ডিডি-র মার বারে লেগে ফিরে আসে।

ব্রাজিল এখন দারুণ খেলছে। কিন্তু বাঁদিকটায় একটু ফাঁক রেখেই খেলছিল। হাঙ্গেরি ওদের ভেদ করল ৪৪তম মিনিটে। জিবর তেড়ে-ফুঁড়ে ডাইনে গিয়ে ক্রশপাস দিলেন, এই বলে কোজিস মাথা লাগিয়ে পরাস্ত করলেন ক্যাস্টিলোকে (৪-২)। এ গোলের বেশির ভাগ কৃতিত্ব জিবর-এর। বল নিয়ে এগোবার সময় ডালমা স্যাণ্টোস তাঁর কাছ থেকে বল ছিনিয়ে নিয়েছিলেন প্রায়।

এখনও সামান্য সময় রয়েছে। ব্রাজিলের তরুণ লেফট ইন হাম্বার্টো [illegible] হাঙ্গেরির [illegible] মারার দরুণ বহিষ্কৃত হলেন। টোজি

রেফারির কাছে গিয়ে হাঁটুতে মাথা রেখে কাঁদলেন—'আমায় বের করে দেবেন না' বলে। কিন্তু ফল হয়নি। মাঠে নৃশংস ফুটবল খেলার সমাপ্তি ঘটল। ড্রেসিং-রুমের হিংস্রতা তখন চরমে। খেলা সেখানে বোতল ও বুট দিয়ে খণ্ডযুদ্ধের। গুস্তাভ সেবেস-এর কপাল ফেটে গেল। তবে এরই মাঝে ব্রাজিলের গোলরক্ষক ক্যাস্টিলো যুদ্ধ থামাবার চেষ্টা করে যান। কোজিস ও হাদিকুটি এ ব্যাপারে নিজেদের সরিয়ে রাখেন। এমন ভাব যে, কিছুই তাঁরা জানেন না; ইতিপূর্বে আমরা বোরদেও-র যুদ্ধ দেখেছি, বিশ্বকাপের ইতিহাসে যুক্ত হল 'বারণ'-এর যুদ্ধ।

উরুগুয়ে : ইংল্যাণ্ড—উরুগুয়ে ও ইংল্যাণ্ডের খেলাতে ফল হাঙ্গেরি ও ব্রাজিলের মতই, তবে ওই রকম নৃশংসতা বা হিংস্রতা কিংবা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়নি। অবশ্য একাধিক খেলোয়াড় আহত হলেন এবং তার অধি-কাংশই উরুগুয়ের। খেলাটি বেশ পরিচ্ছন্ন ও মনে রাখার মতন হল। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ম্যাথিয়ুস ও উরুগুয়ে দলে শিয়াফিনো চমৎকার খেললেন।

গতবারের কাপ বিজয়ী উরুগুয়ে নিঃসন্দেহে ভাল খেলল, তাদের দলও তেমনি শক্তিশালী। খেলার সময় ভারেলা, আবাদি ও আন্দ্রাদের পেশীতে টান ধরে, তবুও খেলায় তেমন ঘাটতি চোখে পড়েনি। এঁদের সাফল্য এনে দেয় ইংল্যাণ্ডের নড়বড়ে গোলরক্ষক মেরিক। মেরিকের দুটি গোল বাঁচানো উচিত ছিল, তিনটি গোলই রক্ষা করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না। রক্ষণভাগে বিলি রাইট না থাকলে আরও কত কী হত কে জানে!

আক্রমণভাগে প্রধান হাতিয়ারের কাজ করছিলেন ম্যাথিয়ুস, আর তাঁর খেলা কেবলমাত্র উইং-এ সীমিত ছিল না--যেমন সেন্টারে, তেমনি রাইট ইন লেফট ইনেও তাঁর অবাধ গতি। আহত হয়ে বাইরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বিপক্ষ উরুগুয়ের পক্ষে ভারেলাও অপ্রতিরোধ্য ও দুর্ভেদ্য ছিলেন। ৩৯ বছর বয়সী ম্যাথিয়ুস এই ভারেলার সঙ্গে সমানে যুঝেছিলেন ব্যাসেলের প্রচণ্ড গরমে।

শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে উরুগুয়ে চমৎকার গোল দিয়ে শুভ সূচনা করল। শিয়াফিনোর খেলার কাছে ম্যাকগ্রে-র পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকা বৈ উপায় ছিল না এবং শিয়াফিনোর কাছ থেকে বল পেয়ে বোরজেস শেষ কাজটুকু করেন। লেফট আউট আবার সুযোগ পেলেন, বল গেল আবাদির কাছে। ইংল্যাণ্ডের ডিফেন্সও নড়ে গিয়েছে, এবার অবশ্য তারা আটকেও দিল এবং বল চলে এল উরুগুয়ের দিকে। এগার মিনিটের সময় ম্যাথিয়ুস ঝড়ের বেগে

ভারেলার কাছ থেকে বল কাটিয়ে দিলেন উইলশ-কে, তাঁর কাছ থেকে লফটহাউস বল পেয়ে আর দেরি করলেন না। ১-১ হল। এরপর দীর্ঘ কুড়ি মিনিট ইংল্যাণ্ড কোণঠাসা করে রাখে উরুগুয়ের মত শক্তিমান দলকে। উরুগুয়েও ওদের স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী ঢিল দিয়েছে খেলায়। মাঝে মাঝে সাত বা আটজনে মিলে উরুগুয়ের আক্রমণ ঠেকাচ্ছে। একবার লফটাহাউসের জোরালো শট উরুগুয়ের গোলরক্ষক মাসপোলি আটকে দিলেন। উইলশ-এর অবধারিত লক্ষ্যভেদ সামান্য উঁচু দিয়ে চলে গেল। আর একটু আস্তে মারলে মাসপোলির পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল আটকানো।

বিরতির দুই মিনিট আগে উরুগুয়ে পাল্টা-আক্রমণ স্থরু করে। তাদের এখন লক্ষ্য শুধু বিপক্ষের জালের দিকে। ভারেলা পেনাল্টি সীমানার ধার থেকে শট করলেন। বিস্ময়ের কথা মেরিক ওই বল ধরার চেষ্টাই করলেন না। উরুগুয়ে ২-১ গোলে এগিয়ে গেল। বিরতির আগে ইংল্যাণ্ডের যেখানে এগিয়ে থাকার কথা, ঠিক সেই মুহূর্তে তারা পিছিয়ে পড়ল। বিরতির পর খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইংল্যাণ্ডের আবার বিপর্যয় ঘনিয়ে এল। আবার গোল—যদিও এটি গোলমেলে ছিল। ফ্রি-কিকের জন্য ভারেলা বল বসালেন এবং কেন বোঝা গেল না— ড্রপ কিক করলেন। শিয়াফিনো ছুটে ইংল্যাণ্ডের ডিফেন্স ভেদ করে গোলটি দেন।

উরুগুয়ের তিনজন তখন খোঁড়াচ্ছেন। স্থতরাং দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে তাঁদের বেশ সঙ্কটে পড়ার কথা। কিন্তু ভারেলার পজিশনে শিয়াফিনো দারুণ খেলতে থাকেন। গোলের ব্যবধানেও উরুগুয়ে এগিয়ে থাকে। ৬৭ মিনিটের পরে মাসপোলি লাফিয়ে উঠে টম ফিনি-র জোরালো শটে হাত বাড়ালেন, তবে হাত ছুঁয়ে বল লাফিয়ে জালের মধ্যে প্রবেশ করে। ইংল্যাণ্ডের ২ হল, উরুগুয়ে তো ৩ ছিল। এবার ম্যাথিয়ুসের একটি জোরালো শট পোস্টে লেগে ফিরল, আর একটি মাসপোলি ঘুষি মেরে কোনরকমে কর্ণারে পাঠালেন, শেষ রক্ষা হয়ে গেল উরুগুয়ের। খেলার বাকি আর তের মিনিট। মিগুয়েজ দেখলেন অ্যামব্রয় একাকী, অমনি পাস দিলেন তাঁকে। অ্যামব্রয়ের শট মেরিকের ধরা উচিত ছিল, ঠিক যেমনটি ছিল শিয়াফিনোর ক্ষেত্রেও। কিন্তু মেরিক তা পারেননি। ইংল্যাণ্ড বিদায় নিল। স্কটল্যাণ্ডের তুলনায় তারা ভাল খেলেই হেরে যায়—এটুকু যা সান্ত্বনার।

অস্ট্রিয়া : স্থইজারল্যাণ্ড—একই শনিবারে লুসান-এ অস্ট্রিয়া : স্থইজার-

ল্যাণ্ডের খেলায় বিশ্বকাপ ফুটবলে গোলের ছড়াছড়ি দেখা গেল। মোট বারো গোল।

বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা খেলা এবং সুইশ দর্শকরা তাঁদের দলকে গলা ফাটিয়ে সমর্থন জানাল। এদিন তারা প্রথম কুড়ি মিনিটেই তিনটি গোল দেয়। কিন্তু অস্ট্রিয়াও কিছু কমতি ছিল না। সুইজারল্যাণ্ডের গোলের উত্তরে তারা তিন মিনিটে তিনটি গোল দিল, সাত মিনিটে পাঁচটি। বিরতির আগে ৫-৪ গোলে এগিয়ে রইল এবং একটি পেনাল্টি থেকে বঞ্চিতও হয়।

সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এত গোল হত না, যদি অধিনায়ক বকোয়েট এমন নিষ্প্রভ ফুটবল না খেলতেন। অবশ্য তাঁর এদিনের খারাপ খেলার পিছনে দুঃখবহ ঘটনাও কম নয়।

বকোয়েটের কিছুদিন আগেই টিউমার হয়। তাঁর চিকিৎসক সনির্বন্ধ উপদেশ দিলেন, তোমার পক্ষে খেলা ভীষণ বিপজ্জনক। কিন্তু বকোয়েট তখন সমগ্র জাতির সেরা খেলোয়াড়। চিকিৎসকের উপদেশের উত্তরে বললেন: খেলতে আমাকে হবেই। তবে তারপরে হয়ত অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালে যেতে হবে, কিংবা তারপরে হয়ত আমি এই পৃথিবীতেই থাকব না।

সুতরাং বকোয়েট মাঠে নামলেন। লুসানের মাঠে প্রচণ্ড রোদ, এমনিতে গরম আবহাওয়া তো আছেই। টিউমারের পক্ষে এই গরম আরও বিপজ্জনক। বকোয়েটের অবস্থাও সঙ্গীন হল। সুইস দলের ম্যানেজার কার্ল র‍্যাপান বারংবার চেষ্টা করলেন তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ ওই সেণ্টার হাফ থেকে অন্যত্র সরাবার। কিন্তু প্রতিবারই বকোয়েট বলতে থাকেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' বকোয়েটের খেলা সম্পর্কে পরে সুইস কর্মকর্তারা বলেন, 'ও সেদিন মোহের ঘোরে খেলে, বুঝতেই পারছিল না—প্রকৃতপক্ষে মাঠে কী ঘটছিল।'

যথাসময়ে বকোয়েটের অস্ত্রোপচার হয়, সুখবর—এজন্য তাঁর জীবনের আশংকা দেখা দেয়নি। কিন্তু পরিণতিটা সুখকর ছিল না। অস্ত্রোপচারের পরে তাঁকে চিরকালের জন্য কালো চশমা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

সুইজারল্যাণ্ডের যে 'কাটানা'কও' ইতালীয়দের পর্যুদস্ত করেছিল, অস্ট্রিয়া তাদের নাস্তানাবুদ করে, তবে তা যেন ভিয়েনীয় পদ্ধতিতে নয়। কোয়ের্ণার গোল দিলেন উইঙ্গারদের পিছনে রেখে দ্রুত ধেয়ে লম্বা শটে। অস্ট্রিয়া ৫-৩ গোলে এগোলে সুইজারল্যাণ্ডের বালামান একটি গোল দেন। বিরতির সময় কর্মকর্তারা প্রেস-বক্সে গিয়ে সাংবাদিকদের জানালেন, সুইজারল্যাণ্ড গোল খাচ্ছে

রোদের জন্য। সাংবাদিকরা এই কথায় অবাক হলেন বটে, তবে একথাও অসত্য নয়—সুইস গোলরক্ষক পার্লার একবার সান স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরে রোদ সুইসদের পিছন দিকে গেলেও তারা আর সামলে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে থিও ওয়াগনার নিজের তৃতীয় ও দলের ষষ্ঠ গোলটি দিলেন। হুগির মারাত্মক শট ঠেকাতে গিয়ে যদিও হানাপ্পি আত্মঘাতী গোল দ্বারা সুইসদের সুবিধা করে দিলেন (৬-৫), তবুও প্রোবস্টের ড্রিবলিং ও শেষ গোল (৭-৫) অবিস্মরণীয়। আর্নস্ট অকির্কের এটি স্মরণীয় খেলা, মনে থাকবে অষ্ট্রিয়ার ফরোয়ার্ড সোক্সপল ও সুইজারল্যাণ্ডের রজার ভনলানথেন—বারো গোলের মধ্যে একটি করেও তাঁরা দিতে পারেননি।

পশ্চিম জার্মানী ঃ যুগোশ্লাভিয়া—জেনিভায় পরের দিন পশ্চিম জার্মানী এই প্রতিযোগিতার বিস্ময়কর খেলা দেখায়। তারা হারাল যুগোশ্লাভিয়াকে। এই জয়ের দ্বারা জার্মানী বেশ কিছু সমর্থক যোগাড় করে নেয়।

সবাপেক্ষা প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন ঠাণ্ডা মাথার কোহলমেয়ের ও তুরেক। গোললাইনের উপর থেকেই এঁরা দুজন জেবেক, কাইকোস্কি ও ববেক-এর তিন তিনটি শট ফিরিয়ে দেন। দুই দলেরই গোলের অবস্থা সমান হয়ে পড়েছিল। যুগোশ্লাভিয়ার ভুকাস ও বিয়ারা আহত ছিলেন; ভুকাস দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ও বিয়ারা শেষ দিকে। যুগোশ্লাভিয়ার খেলায় চাতুর্য থাকলেও পরিসমাপ্তিতে বেশ ঘাটতি ছিল। আর জার্মানদের যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তেমনি স্ট্যামিনা ও একাগ্রতা। উপরন্তু দশম মিনিটে তারা একটি গোল উপহার পায় (হোর্ভাট-আত্মঘাতী)।

যুগোশ্লাভিয়ার সেন্টার হাফ ইভান হোর্ভাট সম্ভবত এই প্রতিযোগিতার সেরা ছিলেন। এই ম্যাচে তো রীতিমত ভয়ঙ্কর। কিন্তু জার্মানীর মরলকের হেড থেকে পাওয়া বলের পিছনে শেফার ধাওয়া করতেই হোর্ভাটও পিছু নিলেন এবং হেড দিলেন. হোর্ভাট খেয়ালই করেননি যে, সতীর্থ বিয়ারা গোল-লাইন থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সমাপ্তির চার মিনিট আগে জার্মানীর শেষ গোলটি আসে শেফার যখন পাস দিলেন রান-কে। কোনো কোনো সমালোচক বললেন—এটি অফ্ সাইড। ভ্লাদিমির বিয়ারাকে পরাস্ত করার আগে রান দৌড় শেষ করেননি। বিয়ারা তখনই আহত হন। 'জার্মানী ফাইনালে?' লিখলেন ইতালীয় সমালোচক। 'অসম্ভব, ব্রাজিলের মত দল সেমিফাইনালে

উঠতে পারে না, আর ইতালি উঠল ; এ হতেই পারে না।' কিন্তু তার যুক্তি কত অসার ছিল। প্রমাণ হল সেমিফাইনাল ও ফাইনালে।

সেমিফাইনাল

হাঙ্গেরি : উরুগুয়ে—লুসানে বিশ্বকাপ ইতিহাসের অন্যতম সেরা ম্যাচ হল হাঙ্গেরি ও উরুগুয়ের মধ্যে। সম্ভবত বারণ-এর হোমের ছাই চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়ে সকলকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল—নৈব নৈব চ, আর অমন ফুটবল কখনও নয়। এমন খেলা হল যে, যে-কেউ জিততে পারত। খেলার নিষ্পত্তি হল অতিরিক্ত সময়ে। প্রত্যেক দলই খেলল তাদের সেরা খেলোয়াড়কে বাদ রেখেই। পুসকাস খেললেন না হাঙ্গেরিতে, উরুগুয়েতে দেখা গেল না ভারেলাকে। উভয় দলেরই রাইট আউটে পরিবর্তন করতে হয়। সান্তো-র জন্য আবাদিকে জায়গা ছেড়ে দিতে হল, আর আহত টথ (১)-এর জায়গায় বুয়াদি। টথ (২)-এর জায়গায় পালোটাস। জিবর গেলেন লেফট উইং-এ। অপর অনুপস্থিত মিগুয়েজের স্থানে হোবার্জ, অবশ্য শিয়াফিনোই সাধারণত ওখানে খেলেন। হাঙ্গেরি ফেভারিট হলেও উরুগুয়ে কিন্তু ইতিপূর্বে কখনও বিশ্বকাপে পরাস্ত হয়নি। ম্যাচের সারাক্ষণ বৃষ্টি হলেও খেলার উৎকর্ষ কমেনি। প্রাক্তন ইনসাইড ফরওয়ার্ড ও ইংল্যাণ্ডের সাংবাদিক চার্লি বুচান খেলা শেষে লিখলেন : আমি জীবনে এমন সুন্দর খেলা দেখিনি। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক বিলি রাইট বললেন : দুটি দলই ফুটবলের চমৎকারিত্ব দেখাল।

উরুগুয়েকে পূর্বাপেক্ষা কিছুটা দ্রুত ও উদ্দীপনাময় মনে হল। কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যেই হাঙ্গেরি ওদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। হিদেকুটির পাস জিবর-এর কাছে গেল, কোজিস তাতে হেড দিলেন এবং জিবর ভলি মারতেই মাসপোলি পরাস্ত হলেন। বিরতির পরেই হাঙ্গেরির গোল দ্বিগুণ হল। উরুগুয়ের কারবালোর দুর্বল ক্লিয়ারেন্স বুজানস্কি ধরে পাঠালেন বুজাইকে এবং বোজসিক বল নিয়ে যেন উড়ে চললেন। কিন্তু বুদাইকে ক্রশপাস দেওয়ার সময় হিদেকুটি তাতে মাথা ঠেকাতেই গোল হয়ে গেল।

উরুগুয়েকে দেখে মনে হল তারা পরাজিত ও আশাহত। তাদের স্কিলও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, কিন্তু উৎসাহে একটুও ভাঁটা পড়েনি। শিয়াফিনো তেতে উঠলেন, আর তাঁকে সহযোগিতা করতে থাকেন জুয়ান হোবার্জ। আর্জেন্টিনার নাগরিক হোবার্জ ১৯৩০-এ তাঁদের জাতীয় দলের পক্ষে বিশ্বকাপে যান। যাই

হোক, শিয়াফিনো কয়েকটি চমৎকার মারে ব্যর্থ হলেন, কিন্তু সমাপ্তির পনের মিনিট আগে শিয়াফিনো পাস দিলেন হোবার্জকে, হাঙ্গেরির গোলরক্ষক গ্রসিকসকে পরাস্ত করতে। খেলা শেষের তিন মিনিট আগে শিয়াফিনো ও হোবার্জ একত্রে আবার গোল দিলেন। গোলের পর হোবার্জকে নিয়ে তাঁর সতীর্থরা এমন হুল্লোড় করলেন যে, আহত হয়ে আর তাঁর খেলার সামর্থ্য রইল না।

২ ২ থাকায় অতিরিক্ত সময়ে খেলা হল। এই সময় হোবার্জের প্রয়োজন ছিল গোল করার জন্য · শিয়াফিনো একইভাবে বল নিয়ে এগোলেন, মারলেনও, কিন্তু তা পোস্টে লেগে ফিরল।

বেচারা উরুগুয়ে! দিনটা তাদের পক্ষে পয়মন্ত ছিল না। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে ট্যাকল করতে গিয়ে আন্দ্রাদে আহত হলেন, কিন্তু মাঠে নামতে বদ্ধপরিকর, গোললাইনের পিছনে তাঁর চিকিৎসা চলতে লাগল। তাঁর সামনেই বুদাই সেণ্টার করলেন কোজিসের কাছে কোজিসের হেড মাসপোলিকে পরাস্ত করল।

সমাপ্তির সাত মিনিট আগে কোজিসের হেড আর একটি স্মরণীয় গোল করায় হাঙ্গেরি ৪-২ গোলে জিতল। ম্যানেজার গুয়ালা মাগুি বললেন, 'আমরা এ পর্যন্ত যত দলের সঙ্গে খেলেছি, তাদের মধ্যে সেরা এই উরুগুয়ে, আজ তাদেরই হারালাম।'

পশ্চিম জার্মানী : অস্ট্রিয়া—ব্যাসেল-এ ৫৮ হাজার মানুষ সাক্ষী রইলেন কেমন করে অস্ট্রিয়রা পোড়া দালানের মত ভেঙে-চুরে পড়েছিল। অথচ সকলের আশা ছিল তারা সহজেই জিতবে, টেকনিকেও তারা পশ্চিম জার্মানীর দল অপেক্ষা কুশলী, সুইসদের বিরুদ্ধে এই অস্ট্রিয়া গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে শেপ হারবার্জার কঠোর ট্রেনিং দিয়ে তুরেককে দড় করে তুলেছেন। হারবার্জার যথার্থই ভেবেছিলেন কোহলমেয়ের যদি কখনও ব্যর্থ হয়ে তবে তুরেককে তা ঠেকাতেই হবে। অস্ট্রিয়রা ভুল করল স্মিডকে বসিয়ে ও তাঁর বদলে ওয়ালটার জেমানকে গোলে এনে। অথচ ইতিপূর্বে 'ফর্ম' না থাকায় তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

একদা যে জেমান সত্যিই ভাল খেলতেন এবং তাঁকে নির্ভর করা যেত, সেই গোলরক্ষককে সেমিফাইনালে নামানো যে কত বড় ভুল হয়েছিল খেলার শুরু থেকেই তা প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করা গেল। কাটা পাঁঠাগুলো যেমন

ছটফট করে, গোল-সীমানার মধ্যে তেমনই মনে হচ্ছিল জেমানকেও বিপক্ষের বল কাছাকাছি আসতেই দুটি গোল হল সেণ্টার থেকে, দুটি কর্ণার থেকে, বাকি দুটি পেনাল্টি কিক্ থেকে। জার্মানরা দেখালেন, তাঁরা বিপক্ষকে শুধু ধ্বংস নয় আরও বেশি কিছু করেন। মনে হচ্ছিল বিপক্ষের ফুটবল কৌশল ও প্রতিভাকে তারা ছিন্নভিন্ন করে দিতেও সক্ষম। তাঁদের স্বইপিং ফুটবল দারুণ মর্মভেদী—ফ্রিজ ওয়াল্টারের অদ্ভুত স্ট্র্যাটেজিতে। তিনি পেনাল্টিতেই দুটি গোল দেন। এছাড়া ছিলেন স্বাস্থ্যবান ও ক্ষমতাশালী রাইট-উইঙ্গার হেলমুট রান।

প্রথমার্ধে অস্ট্রিয়ার দুর্বলতার সামান্য চিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে হল শোচনীয় অবস্থা। প্রথম কুড়ি মিনিট দুটি দল যেন গা লাগাচ্ছিল না। আধ ঘণ্টার সময় ম্যাক্স মরলক পাস দিলেন ফ্রিজ ওয়াল্টারকে, তাঁর নিখুঁত সেণ্টারে হান্স শেফার পা ছোঁয়াতেই গোল হয়ে গেল (১-০)। বিরাত পর্যন্ত এই ফল রইল।

দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে ফ্রিজ ওয়াল্টারের কর্ণার-কিকে মরলক হেড দিতেই ২-০ হল। চার মিনিট পরে জার্মানী সুযোগ দিল অস্ট্রিয়াকে। তুরেক বলে ড্রপ খেতে দিলেন, তবুও প্রোবস্ট গোল করতে পারলেন না। পাশার দান উল্টে গেল। জার্মানীর আক্রমণ ভাগ তেড়ে-ফুঁড়ে এগিয়ে চলল, শুধু রান নিজের জমিটুকু দখল করে রইলেন। বাকিরা অস্ট্রিয়দের পিছনে ফেললেন। ফ্রিজ ওয়াল্টার পেনাল্টি স্পট থেকে তৃতীয় ও পঞ্চম গোলটি দিলেন। দুবারই 'দুর্ভাগা' জেমানকে ভুল পথে চালিত করলেন তিনি। ফ্রিজের সহোদর বাকি দুই গোল করেন ওেডে—একটি ফ্রিজের কর্ণার থেকে, বাকিটি শেফারের ক্রশপাসে। অস্ট্রিয়া এদিন ব্রাজিলের মত তিনব্যাক পদ্ধতিতে খেললেও জার্মানীকে ঘায়েল করতে পারেনি।

অস্ট্রিয়া নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েছিল জুরিখে তৃতীয় স্থান নির্বাচনের খেলায় উরুগুয়েকে ৩-১ গোলে হারিয়ে। এই খেলায় ওকির্ক সারাক্ষণ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখেন।

ফাইনাল

পশ্চিম জার্মানী : হাঙ্গেরি—ফাইনালের আগে দুই শিবির ছাড়াও উভয় দলের কট্টর সমর্থকদের মধ্যে একটি প্রশ্ন ভীষণ আলোড়ন তুলল—

প্রত্যেকের প্রশ্ন—পুসকাস কী খেলবেন? সংবাদপত্রে নানা দিনে নানা সংবাদ। তিনি খেলবেন—আজ বের হল; পরদিন—না, পুসকাস খেলবেন না। তবে চেষ্টা করছেন যাতে খেলা যায়। দুদিন পরে এক বিশেষজ্ঞ বললেন: তাঁর খেলার সম্ভাবনা শতকরা ৫০ ভাগ। কেননা, গোড়ালির অবস্থা অনেকটা ভাল। আর এক রিপোর্ট বলল: নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর সুস্থ হওয়ার কোনো আশাই নেই। জার্মানরা তাঁর চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে রাজি হলেন, কিন্তু হাঙ্গেরি তা গ্রহণ করল না। শুক্রবার ফাইনালের আগে 'ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকা লিখল: এখন এটা নিশ্চিত পুসকাস খেলবেন না। সোলোদার্ণ-এ সংক্ষেপে সব রকম পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা বলেছেন, তাঁর সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ইলেকট্রিক চিকিৎসা, ম্যাসাজ সবই ব্যর্থ। পুসকাস যেভাবে আহত, তা নিয়ে হাঙ্গেরীয় মহলে বিষাদের ছায়া। তাঁরা বলে বেড়াচ্ছেন, জার্মানীর নতুন স্টপার সেণ্টার হাফ ওয়ার্ণার লাইব্রশের বাজে ফাউলেই আজ পুসকাসের এই দশা।

খেলা আরম্ভের আগে কিন্তু পুসকাসকে জার্সি পরেই মাঠে নামতে দেখা যায়। জানা গেল অধিনায়কের অসত্য বিবৃতি ইত্যাদির জন্যই গত ক'দিন পুসকাস সম্পর্কে নানা সংবাদ ও গুজব রটেছিল।

ইতালীয় সাংবাদিক কিরো ভেরাট্টি বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বললেন জার্মান ম্যানেজার শেপ হারবার্জারের সঙ্গে, তারপর তাঁর কাগজে লিখলেন: হারবার্জারের দারুণ কর্তৃত্ব তাঁর দলের উপরে, নিজের অসাধারণ ক্ষমতায় তিনি যে খেলোয়াড় যা নয়, তাকে তদপেক্ষা অনেক নিপুণ করে তুলেছেন। দড় করেছেন স্ট্যামিনায়, ওরা এমনভাবে প্রস্তুত যে, বিপক্ষকে 'মুভমেণ্ট' রচনা করতেই দেবে না। আর বল তাদের কাছে থাকলে মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করবে না। জার্মানদের শারীরিক সক্ষমতাই এসবের মূলে।

ব্যাসেল-এ ওরা যখন অস্ট্রিয়াকে পরাস্ত করে, তখন ৩০ হাজার জার্মান তাদের সমর্থন করেছিল; ফাইনালের দিনে বারণ-এও অনুরূপ সংখ্যক জার্মান উপস্থিত থাকবে। সুতরাং কার্যত স্বদেশের মাঠে খেলারই মত। অর্থাৎ সব দিক থেকে বিচার করলে—তারা এখন দারুণ অনুকূল পরিবেশে রয়েছে। নানা রটনা ও অসত্য বিবৃতি মারফৎ জার্মানরা চাইছিল বিপক্ষ শিবিরে এবং নিরপেক্ষ দর্শক বা হাঙ্গেরীয় সমর্থকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হোক এবং তা যদি হয়, তবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অঘটন ঘটে যাবে। কেউ কেউ

অবশ্য জার্মানদের প্রচারে গা না ভাসিয়ে আশা করলেন, 'আমরা কাল দেখতে চাই। হাঙ্গেরি যেন ফাইনালে আগের মতই গোলের বন্যা বইয়ে দেয়, আমরা তাদের চ্যাম্পিয়ন দলের মর্যাদায় দেখতে চাই।'

রবিবার প্রচণ্ড বৃষ্টি হল। আর তা যেমন উভয় দলের খেলোয়াড়দের ভিজিয়ে দিল, তেমনি ওয়াঙ্কডর্ফ স্টেডিয়ামের ৫৫ হাজার দর্শকও খেলার সময় সারাক্ষণ ধরে ভিজল। হাঙ্গেরি 'ফেভারিট' মনে করেও গুস্তাভ সেবেস সতর্ক করে দিলেন নিজের খেলোয়াড়দের—'তোমাদের বড় শত্রু শারীরিক ক্লান্তি নয়, তোমাদের বিপদ ডেকে আনতে পারে কেবলমাত্র স্নায়ুর চাপ। আমি কখনও দেখিনি বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচে এমন স্নায়ুর চাপ হতে পারে।' জার্মানী এর আগে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অনুকূল পরিবেশে খেলেছে। কিন্তু হাঙ্গেরি বেশি গোল দিলেও ব্রাজিল ও উরুগুয়ের বিরুদ্ধে সব কিছু নিঃশেষ করে ফেলেছিল। ব্যাসেলে ইতিপূর্বে জার্মানীর বিরুদ্ধে হাঙ্গেরির ৮-৩ জয়ও ভবিষ্যৎ সাফল্যের মাপকাঠি ছিল--এমন মনে করারও কারণ ছিল না।

উরুগুয়ের বিরুদ্ধে বুদাই চমৎকার খেললেও ফাইনালে তাঁকে বাদ দেওয়া হল পুসকাসকে সুযোগ দিয়ে। কেননা, বুদাই ভাল খেললেও পুসকাসের মত নামডাক তো তাঁর ছিল না। জার্মান দলে তারাই রইলেন, যাঁরা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জিতেছিলেন। রইলেন পসিপাল—অবশিষ্ট ইউরোপীয় দলের সেণ্টার হাফ এবং রাইট ব্যাক লাইব্রিশ স্টপারের জায়গায়।

হাঙ্গেরি আবার একটি ম্যাচের শুরুতেই থরহরি আনল প্রতিভাধরদের দ্বারা। আট মিনিটের মধ্যে তারা ২-০ গোলে এগিয়ে গেল এবং সকলের ধারণা হল, আজ তারা আবার ব্যাসেলের অনুরূপ ফল দেখাবে। ষষ্ঠ মিনিটে জার্মানী তিনবার হাঙ্গেরির গোলমুখে হানা দেয়, তারপর তার প্রতি-আক্রমণ শুরু করে। বোজসিক থ্রু দিলেন কোজিসকে, কোজিসের প্রচণ্ড মার জার্মান ডিফেণ্ডারের পিঠে লেগে ফিরে এল পুসকাসের কাছে, তাঁর বাঁ পায়ের বিদ্যুৎগতির শট তুরেক-কে পরাস্ত করে।

দু মিনিটের মধ্যে জার্মানী ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়ে নিজেদের ভুলে। যে কোহলমেয়ের যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর বিপদতারণের ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে তুরেকের ভুল-বোঝাবুঝিতে গোলটি হয়। তাঁর ব্যাকপাস সুবিচারসম্মত ছিল না। তুরেক বুঝতেই পারেননি। তাই বল হাতে লেগে ফিরে যায় হাঙ্গেরির জিবরের কাছে, তিনি ২-০ করেন।

এমন গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ০-২ গোলে পিছিয়ে থাকা যে কোনো দলের মানসিকতাকে তছনছ করে দেয়, কিন্তু জার্মানীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটল। তিন মিনিটের মধ্যে তারা নিজেদের উজ্জীবিত করে পাল্টা-আক্রমণ শুরু করে। হান্স শেফার-এর ক্রশপাস চলে গেল রানের কাছে, রান সেটি ফেরত পাঠালেন সেণ্টার হাফে। বোজসিক-এর ভুলে বল চলে যায় মরলকের পায়ে। তিনি 'টেলিস্কোপিক' পায়ে গ্রসিকসকে পরাস্ত করেন (২-১)।

আগে দু-দুটি গোল দিলেও হাঙ্গেরির মধ্যে যেন তাল-লয় ছিল না। পুসকাসকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, গোড়ালির আঘাতে তিনি রীতিমত কাবু। তারা খেলছে ঢিমে তালে, মন্থর গতিতে। সামনে বাধা নেই তবুও পুসকাস বল ঠেলতে পারছেন না। অথচ একাকী দাঁড়িয়ে থাকা জিবরকে দিলেই তিনি গোল করতে পারেন। জিবর চলে যান ডানদিকে, যদিও ওই জায়গাটায় তিনি তেমন সুবিধা করতে পারছিলেন না। বিরতির পরে তিনি অবশ্য বাঁদিকেই খেলেন।

১৬ মিনিট পরে জার্মানরা ২-২ করল। উপর্যুপরি তিনটি কর্ণার-কিকের তৃতীয়টিতে সফল হল। ফ্রিজ ওয়াল্টারের একটি বাঁকা শটে না হেড দিতে পারলেন তাঁর ভাই, এমন কি গ্রসিকসের হাতও আটকাতে পারল না। বল ফস্‌কে চলে যায় হেলমুট রানের কাছে, তিনি প্রচণ্ড শটে ২-২ করলেন।

গোল খেয়ে হাঙ্গেরীয়রা দারুণ আক্রমণ শুরু করে। তুরেককে এই প্রথম প্রচণ্ডভাবে আত্মরক্ষা করতে হল। প্রথমে কোজিসের হেড, পরের অবধারিত গোলটি হয়নি হিদেকুটির মার পোস্টে লেগে ফিরে যাওয়ায়। জার্মানরা এবার তেতে উঠলেন এবং তিন মিনিট ধরে হাঙ্গেরির গোলমুখে বোমাবর্ষণ করে চললেন। বিরতির সময়ে মনে হচ্ছিল খেলা যে-কোনো দলের দখলে চলে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ার্ধে হাঙ্গেরি নতুন কায়দায় প্রচণ্ড আক্রমণ রচনা করে জার্মানীর গোলমুখে পৌছতে লাগল। আর তখন তুরেক একা কুম্ভের মত লড়ছিলেন। দুবার ঠেকালেন পুসকাসকে। একবার তো পুসকাসের সামনে শুধু তুরেক একবার কোহলমেয়ের লাইনের উপর দাঁড়িয়ে টথ-এর শট ক্লিয়ার করেন, আর একবার টথ-এর ক্রশপাসে কোজিস হেড দিতেই বারে লেগে বল অল্পের জন্য বাইরে যায়।

এবার জার্মানী ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলল। আর হাঙ্গেরি বাহিনীতে তখন ক্লান্তির ছাপ। খেলা শেষ হতে তখন ১২ মিনিট বাকি। এই সময়ে রেফারি বিল লিং-এর সুপরিচালনা মনে রাখার মত। হঠাৎ হাঙ্গেরির জিবর বল ছিনিয়ে নিয়ে সোজা গোলে মারলেন। তুরেক অবশ্য অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে জার্মানীকে রক্ষা করলেন। কিন্তু বল পৌঁছে গেল হিদেকুটির কাছে। কিন্তু তিনি বল ধরতে পারলেন না। পাঁচ মিনিট পরে জার্মানী বিশ্বকাপ জয়ের গোলটি দেয়।

বোজসিককে পিছনে রেখে হান্স শেফার বাঁদিক বরাবর এগিয়ে চললেন ও ক্রশপাস দিলেন। বল পড়ল গোলমুখের কাছে জটলার মধ্যে এবং তা সম্ভবত অটমার ওয়াল্টারের মাথায় লাগে। ল্যান্টোস মুহূর্তের জন্য ভেবেছিলেন বল তাঁর কাছেই পৌঁছেছে। কিন্তু বল যায় রানের কাছে। রান বল ধরলেন, সামান্য এগোলেন এবং সজোরে বাঁ পায়ে মারতেই গ্রসিকস সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হলেন (৩-২)।

হাঙ্গেরি গোলটি শোধ করতে উঠে-পড়ে লাগল। দু মিনিট পরে সুযোগও পেয়ে গেল। ডানদিক থেকে টথ অতিক্রম করলেন পসিপালকে এবং থ্রু দিলেন পুসকাসকে। পুসকাস স্বভাবসিদ্ধভাবে অপ্রতিরোধ্য ও নিখুঁত শট করলেন আর তুরেক পরাস্ত হলেন। হাঙ্গেরীয়রা হৈ-হুল্লোড় শুরু করলেন, একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন আনন্দে। কিন্তু তখন ওয়েলসের লাইন্সম্যান মারভিন গ্রিফিথের ফ্ল্যাগ তাঁর মাথার উপর তোলা। পুসকাস অফ্ সাইড। ওই সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯৫৪-র ফাইনালের বহু পরেও বিতর্কের অবসান হয়নি।

হাঙ্গেরি তারপর আর একবার সুযোগ পায়। জলটান জিবর হঠাৎ বল নিয়ে যেন উড়ে গেলেন। তার নিখুঁত শট তুরেক কোনরকমে ঘুষি মেরে বাঁচান 'রবারের' শরীর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর হতাশ জিবর তখন মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন।

খেলা শেষ, বৃষ্টিও। সদ্য অবসর গ্রহণকারী ফিফা সভাপতি জুল রিমে নিজ হাতে কাপ তুলে দিলেন ফ্রিজ ওয়াল্টারকে, যা পাওয়ার কথা ছিল ফেরেঙ্ক পুসকাসের। ড্রেসিং-রুমে গুস্তাভ সেবেস বললেন, 'ভাগ্য মন্দ, তাই আজ পরাজয়।' বেঞ্চের উপর অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। আর হারবার্জার তাঁদের (জার্মানী) এই খেলায় অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়ায় প্রশংসা করলেন, অভিনন্দন করলেন উদ্দালোর। তার দল শারীরিক সক্ষমতায়

তুঙ্গে ছিল, মনোবল ছিল অসাধারণ, ট্যাকটিকসে তারা বিপক্ষকে ধারে-কাছে আসতে দেয়নি—এই সবের মিলনই জয় এনে দিয়েছে।

কিন্তু বিতর্কের অবসান ঘটল না। কেউ কেউ বললেন, আদর্শ পরিবেশ হলে হাঙ্গেরিই জিতত। তাছাড়া যদি পুসকাস জার্মানীর সঙ্গে খেলায় লাথি খেয়ে আহত না হতেন, যদি ফাইনালে তাঁর দেওয়া গোল বাতিল না হত অফ্‌সাইডের অজুহাতে ইত্যাদি। কিন্তু একথা অস্বীকার করলে চলবে না—হাঙ্গেরি ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে বিজিত—রানার্স। এবং বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই কথাই খোদিত থাকবে, ঠিক যেমনটি দেখা যায় অলিম্পিকসে স্বর্ণ পদক না পেলে।

গার্ট্রুড স্টেনের কথায় বরং বলতে হয়: 'এ কাপ ইজ এ কাপ, ইজ এ কাপ।'

পুল—১

যুগোশ্লাভিয়া ১ : ফ্রান্স ০
(মিলুটিনভিক)

বিরতি ১—০

ব্রাজিল ৫ : মেক্সিকো ০
(বাল্টাজার, ডিডি, পিঙ্গা ২, জুলিনো)

বিরতি ৪—০

ফ্রান্স ৩ : মেক্সিকো ২
(ভিন্সেন্ট, কার্ডেনাস-আত্মঘাতী, কোপা-পেনাল্টি) (নারানজো, বালকাজার)

বিরতি ১—০

ব্রাজিল ১ : যুগোশ্লাভিয়া ১
(ডিডি) (জেবেক)

বিরতি ০—১। নির্দিষ্ট সময়ের পরে ১—১

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
ব্রাজিল	২	১	১	০	৬	১	৩
যুগোশ্লাভিয়া	২	১	১	০	২	১	৩
ফ্রান্স	২	১	০		৩	[illegible]	২
মেক্সিকো	২	০	০	২	২	৮	০

পুল—২

হাঙ্গেরি ৯ : কোরিয়া ০

(জিবর, কোজিস ৩, পুসকাস ২
ল্যাণ্টোস, পালোটাস ২)

বিরতি ৪—০

পশ্চিম জার্মানী ৪ : তুরস্ক ১

(রুদ, মরলক, শেফার, ও ওয়াল্টার) (সুয়াত)

বিরতি ১—১

হাঙ্গেরি ৮ : পশ্চিম জার্মানী ৩

(হিদেকুটি ২, কোজিস ৪, পুসকাস, টথ) (পাফ, হেরমান, রান)

বিরতি ৩—১

তুরস্ক ৭ : কোরিয়া ০

(বারহান ৩, এরল, লেফার,
সুয়াত ২)

বিরতি ৪—০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
হাঙ্গেরি	২	২	০	০	১৭	৩	৪
পশ্চিম জার্মানী	২	১	০	১	৭	৯	২
তুরস্ক	২	১	০	১	৮	৪	২
কোরিয়া	২	০	০	২	০	১৬	০

প্লে-অফ্ : **পশ্চিম জার্মানী ৭ : তুরস্ক ২**

(মরলক ৩ ও ওয়াল্টার, এফ ওয়াল্টার, শেফার ২) (মুস্তাফা, লেফার)

বিরতি ৩—১

পুল—৩

অস্ট্রিয়া ১ : স্কটল্যাণ্ড ০

(প্রোবস্ট)

বিরতি ১—০

উরুগুয়ে ২ : **চেকোশ্লোভাকিয়া ০**
(মিগুয়েজ, শিয়াফিনো)
বিরতি ০—০

অস্ট্রিয়া ৫ : **চেকোশ্লোভাকিয়া ০**
(সোজসপল ২, প্রোবস্ট ৩)
বিরতি ৪—০

উরুগুয়ে ৭ : **স্কটল্যাণ্ড ০**
(বোরজেস ৩, মিগুয়েজ ২, আবাদি ২)
বিরতি ২—০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
উরুগুয়ে	২	২	০	০	৯	০	৪
অস্ট্রিয়া	২	২	০	০	৬	০	৪
চেকোশ্লোভাকিয়া	২	০	০	২	০	৭	০
স্কটল্যাণ্ড	২	০	০	২	০	৮	০

পুল—৪

ইংল্যাণ্ড ৪ : **বেলজিয়ম ৪**
(ব্রডিস ২, লফটহাউস ২) (অনৌল ২, কোপেনস, ডিকিন্সন-আত্মঘাতী)
বিরতি ২—১

ইংল্যাণ্ড ২ : **সুইজারল্যাণ্ড ০**
(মুলেন, উইলশ)
বিরতি ১—০

সুইজারল্যাণ্ড ২ : **ইতালি ১**
(বালাম্যান, হুগি) (বোনিপার্টি)
বিরতি ১—১

ইতালি ৪ : **বেলজিয়ম ১**
(প্যাণ্ডলফিনি-পেনাল্টি, গালি, ফ্রিজনানি, লরেঞ্জি) (অনৌল)
বিরতি ১—০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ইংল্যাণ্ড	২	১	১	০	৬	৪	৩
ইতালি	২	১	০	১	৫	৩	২
সুইজারল্যাণ্ড	২	১	০	১	২	৩	২
বেলজিয়ম	২	০	১	১	৫	৮	১

প্লে-অফ্ : **সুইজারল্যাণ্ড ৪ : ইতালি ১**
(হুগি ২, বালাম্যান, ফেটন) (লেস্তি)
বিরতি ১-০

কোয়ার্টার ফাইনাল

জেনিভায়

পশ্চিম জার্মানী ২ : যুগোশ্লাভিয়া ০
(হোর্ভাট-আত্মঘাতী, রান)
বিরতি ১-০

তুরেক ; লাবাণ্ড, কোহলমেয়ের ; ইকেল, লাইব্রিশ, মাই ; রান, মরলক, ও ওয়াল্টার, এফ ওয়াল্টার (অধিনায়ক), শেফার।

বিয়ারা ; স্ট্যানকোভিক, ক্রনকোভিক ; কাইকোস্কি, হোর্ভাট, বসকভ ; মিলুটিনভিক, মিটিক (অধিনায়ক), ভুকাস, ববেক, জেবেক।

বার্ন-এ

হাঙ্গেরি ৪ : ব্রাজিল ২
(হিদেকুটি ২, কোজিস, ল্যাণ্টোস-পেনাল্টি) (ডি স্যাণ্টোস, জুলিনো)
বিরতি ২-১

গ্রসিকস ; বুজানাস্ক, ল্যাণ্টোস ; বোজসিক (অধিনায়ক), লোরাণ্ট, জ্যাকারিয়াস ; এম টথ, কোজিস, হিদেকুটি, জিবর, জে টথ।

ক্যাস্টিলো ; ডি স্যাণ্টোস, এন স্যাণ্টোস, ব্রাণ্ডাওজিনো, পিনহিরো (অধিনায়ক), বাউয়ের, জুলিনো, ডিডি, ইণ্ডিয়ো, টজি, মাউরিনো।

লুসান-এ

অস্ট্রিয়া ৭ : সুইজারল্যাণ্ড ৫

(এ কোয়ের্নার ২, অকির্ক, ওয়াগনার ৩, প্রোবস্ট) — (বালাম্যান ২, হুগি ২, হানাপ্পি-আত্মঘাতী)

বিরতি ২-৪

স্মিড ; হানাপ্পি, বার্শাও ; অকির্ক, (অধিনায়ক), হাপেল, কোলার ; আর কোয়ের্নার, ওয়াগনার, সোজাসপল, প্রোবস্ট, এ কোয়ের্নার।

পার্লার ; নিউরি, কার্নেন ; এগিম্যান, বকোয়েট (অধিনায়ক), কাজালি ; আন্টেনেন, ভনলানথেন, হুগি, বালাম্যান, ফেটন।

ব্যাসেল-এ

উরুগুয়ে ৪ : ইংল্যাণ্ড ২

(বর্জেস, ভারেলা, শিয়াফিনো অ্যাম্বরয়) — (লফটহাউস, ফিনি)

বিরতি ২-১

মাসপোলি ; সান্তামেরিয়া, মার্টিনেজ ; আন্দ্রাদে, ভারেলা (অধিনায়ক) ক্রুজ ; আবাদি, অ্যামব্রয়, মিগুয়েজ, শিয়াফিনো, বর্জেস।

মেরিক ; স্ট্যানিফোর্থ, বার্ন ; ম্যাকগ্রে, রাইট (অধিনায়ক), ডিকিনসন ; ম্যাথিয়ুস, ব্রডিস, লফটাহউস, উইলশ, ফিনি।

সেমি ফাইনাল

ব্যাসেল-এ

পশ্চিম জার্মানী ৬ : অস্ট্রিয়া ১

(শেফার, মরলক, এফ ওয়াল্টার ২ পেনাল্টি, ও ওয়াল্টার ২) — (প্রোবস্ট)

বিরতি ১-০

তুরেক ; পসিপল, কোহলমেয়ের ; ইফেল, লাইব্রিশ, মাই ; রান, মরলক, ও ওয়াল্টার, এফ ওয়াল্টার (অধিনায়ক), শেফার।

জেমান ; হানাপ্পি, প্লেজার ; অকির্ক (অধিনায়ক), হাপেল, কোলার ; আর কোয়ের্নার, ওয়াগনার, সোজসপল, প্রোবস্ট, এ কোয়ের্নার।

লুসান-এ

হাঙ্গেরি ৪	:	**উরুগুয়ে ২**
(জিবর, হিদেকুটি, কোজিস ২		(হোবার্জ)

বিরতি ১-০

গ্রসিকস ; রজানস্কি, ল্যাণ্টোস ; বোজসিক (অধিনায়ক), লোরাণ্ট, জ্যাকারিয়াস ; বুদাই, কোজিস, পালোটাস, হিদেকুটি, জিবর।

মাসপোলি, সান্তামারিয়া, মার্টিনেজ ; আন্দ্রাদে (অধিনায়ক), কার্বালো, ক্রুজ, সাণ্তো, অ্যামব্রয়, শিয়াফিনো, হোবার্জ, বোরজেস।

তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলা

জুরিখে

অস্ট্রিয়া ৩	:	**উরুগুয়ে ১**
(সোজশপল-পেনাল্টি, ক্রুজ-আত্মঘাতী, অকির্ক)		(হোবার্জ)

বিরতি ১-১

শ্মিড ; হানাপ্পি, বার্শাগু ; অকিক (অধিনায়ক), কোলম্যান, কোলার ; আর কোয়ের্ণার, ওয়াগনার, ডিয়েনস্ট, সোজস-পল, প্রোবস্ট।

মাসপোলি ; সান্তামারিয়া, মার্টিনেজ ; আন্দ্রাদে (অধিনায়ক), কার্বালো, ক্রুজ, আবাদি, হোবার্জ, মেণ্ডেজ, শিয়াফিনো, বোরজেস।

ফাইনাল—৪. ৭. ৫৪ (৫৫ হাজার দর্শক)

বার্ণ-এ

পশ্চিম জার্মানী ৩	:	**হাঙ্গেরি ২**
(মরলক, রান ২)		(পুসকাস, জিবর)

বিরতি ২—২

তুরেক ; পসিপল, কোহলমেয়ের ; একেল, লাইব্রিশ, মাই ; রান, মরলক, ও ওয়াল্টার, এফ ওয়াল্টার, শেফার।

গ্রসিকস ; বুজানস্কি, ল্যাণ্টোস ; বোজসিক, লোরাণ্ট, জ্যাকারিয়া ; জিবর, কোজিস, হিদেকুটি, পুসকাস, জে টথ।

সুইডেন
১৯৫৮



বিজয়ী ব্রাজিলের ব্যাজ

সুইডেনে ১৯৫৮-র বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা নানা কারণে স্মরণীয়। পেলের আবির্ভাব, ৪-২-৪ পদ্ধতিতে প্রথম ফুটবল খেলা এবং ব্রাজিলের প্রথম জুল রিমে কাপ জয় আন্তর্জাতিক ফুটবলে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স তৃতীয় স্থান দখল করে যেমন, তেমনি তাদের লেফট ইন ফনটাইন বিস্ময়কর ফুটবল দেখালেন। এবারের কাপ সেরা দলই ঘরে তুলেছে, এমন না বলে বলা উচিত—শুরু থেকে শেষ বিশ্ব-ফুটবলের সেরা প্রতিযোগিতা হয়েছে সুইডেনে।

সুইডেন: সুইডেন স্বদেশের মাটিতে অসংখ্য সমর্থকপুষ্ট হয়ে নিজেদের সম্মান বাড়াতে দারুণ খেলল এবং যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সকলের প্রশংসাভাজন হল রানার্স আপের মাধ্যমে। অবশেষে সুইডিশ ফুটবল ফেডারেশন স্থির করে পেশাদারী ফুটবল ছাড়া গতি নেই। তাই সব পেশাদার খেলোয়াড়ের ডাক পড়ল বিশ্বকাপের জন্য জাতীয় দল গড়তে। শুধু গুনার গ্রেণ নামক শীর্ষস্থানীয়ের সুইডেনে ফেরার ডাক পড়ল না। ইতালি থেকে সকল পেশাদার সুইডেনে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে জর্জ রেনরকে জাতীয় দলের ম্যানেজার করা হয়েছে। ইতালিতে থাকাকালে শুধু খেলোয়াড়রা তাঁর অন্তরকে আহত করেননি, কর্মকর্তা ও দর্শকদের ব্যবহারেও তিনি মর্মাহত হন। রেনর সর্বদা ফুটবল সম্পর্কে বলতেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ফুটবল ভদ্রলোকদের খেলা।" কী কুক্ষণে যে তিনি রোমে গিয়ে চুক্তিতে সই করেছিলেন,

তা না হলে অমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটবে কেন? নিয়েল লিডহোম তাঁর সম্পর্কে জানান, "একটি সুখী দলের সর্বাপেক্ষা উপযোগী ম্যানেজার।" তাছাড়া রেনরের চরিত্র অনুরূপ উপাদানে গঠিত। দলকে সাফল্যের মাপকাঠিতে শুধু নয়, একটি পরিবারের মত তিনি ওদের গড়ে তুলতে চাইতেন।

১৯৫৮-র বিশ্বকাপের খেলা স্বদেশে হলেও সুইডেন অতীতকে অত্যন্ত মর্যাদা দিল। তারা শুধু ১৯৫০-এ ব্রাজিলে যে দল খেলেছিল তাদের নয়. ১৯৪৮-এর ওলিম্পিক ফুটবল দলকেও স্মরণ করল। ওদের ভিতর গ্রেণ ও লিডহোম তখনও প্রায় স্বমহিমায় বিরাজিত। শক্তিমান ও বুদ্ধিদীপ্ত সেণ্টার ফরোয়ার্ড গুনার নরডাল সুইডেন ছেড়ে মিলানে চলে গিয়েছিলেন, তিনিও এলেন। এঁরা খ্যাত হন 'গ্রেণলি ত্রয়ী' নামে। নরডাল খেলবেন মধ্যস্থলে, 'প্রফেসর' গ্রেণ রাইট ইন ও নিয়েলস লিডহোম লেফট ইনে। লিডহোম অবশ্য বহুদিন রাইট হাফে থরহরি এনেছিলেন, তবুও লেফট ইনে খেলে চমক আনলেন মিলান দলে। অবশ্য ব্রাসেলসে ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ ৩-২ গোলে মিলানকে হারিয়েছিল। যেমন উচ্চতায়. তেমনি ক্ষমতায়; প্রচণ্ড মার ও বুদ্ধির দ্বারা তিনি লেফট বা রাইট ইনে তো বটেই, উইং হাফেও খেলতে সক্ষম ছিলেন। গ্রেণ ছিপছিপে, ধূর্ত, চমৎকার পাসে ও বল মারায় বিচক্ষণ— বিশেষত ডান পায়ে। স্বদেশে—গেটেবার্গে ফেরার আগে মিলান, ফ্লোরেন্স ও জেনোয়া দলে ছিলেন।

আট বছর বাদে মিলান ইণ্টারন্যাশনাল থেকে ফিরে এলেন খর্বকায় ও লম্বা চুলের ন্যাকা স্কোগ্লাং। স্কোগ্লাং ওখানে লেফট ইন থেকে লেফট উইং-এ গিয়ে চমৎকার বলপ্লেয়ারের খ্যাতি অর্জন করেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বাঁ পায়ের শটদ্বারা। রাইট উইং-এ এলেন ইতালি থেকে সাম্প্রতিক 'রপ্তানী' কুর্ট (কুরে) হ্যামরিন। ইনিও বেঁটেখাটো, কিন্তু ড্রিবলিং-এ অদ্বিতীয়। যেমন তিনি মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে যান, তেমনি উইং-এও অপ্রতিরোধ্য। একবার বলোগণার বিরুদ্ধে ফিওরেণ্টিনার পক্ষে হ্যামরিনকে নামানো হল, কোচ ওই ম্যাচে ওঁর খেলা দেখে শুধু একটি কথাই বললেন, চমৎকার! হ্যামরিনের সঙ্গীরা বললেন, তোমাদের দলটি বেশ ভাল। হ্যামরিন বললেন, কোচ নতুন উইঙ্গারটির কথা উল্লেখ করছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এই দুই উইঙ্গারই মাত করে রেখেছিলেন। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলদলকেফাইনালেপৌছে দেওয়া।

ইতালিতে 'রে অফ মুনলাইট' নামে খ্যাত চমৎকার লেফট উইঙ্গার ও লেফট ইন আর্নে সেলমোসোনকে কোচ রেনর একটির বেশি ম্যাচ খেলতে দিলেন না। খেলাননি দলের স্ট্রাটেজি ও ট্যাকটিক্যাল কারণে। সেলমোসোন সম্পর্কে কোচ বললেন, "তার ধীর গতির খেলা এই সম্ভ্রান্ত দলকে আরও পিছনে ফেলে দেবে। উপরন্তু এবারের বিশ্বকাপে সুইডেনই সর্বাপেক্ষা ধীরগতির দল।" সুইডেন ২-১ গোলে হারবার পরই কোচ ওই মন্তব্য করেন। তিনি আরও বললেন, "যদি এখানে ১০০ গজের রিলে দৌড় হয়, তবে সুইডেন সকলের শেষে পৌছবে, তবুও ফুটবলে আমরা ফাইনালে উঠছিই।" রেনর সেকথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়েছিলেন।

সেণ্টার হাফে ডাকা হল আর একজন ইতালো-সোয়েডকে। তিনি পুলিশ বিভাগের প্রাক্তন জুলি গুস্তাভসন। আটালাণ্টার এই খেলোয়াড় ১৯৫৫-য় বেলফাস্টে অবশিষ্ট ইউরোপীয় দলে খেলেন এবং এদেরই কাছে গ্রেট ব্রিটেন পরাস্ত হয়। আটালাণ্টার বিরুদ্ধে ইতালীয় ফেডারেশন দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিল বারি-র সঙ্গে একটি খেলা নিয়ে। গুস্তাভসন তখন ওই দলে। এই গণ্ডগোলের সময় আটালাণ্টা ওঁকে নিতে রাজি হলেও আগে ওঁর আবেদনে সাড়া দেয়নি। আবার গণ্ডগোল যখন মিটল, তখন এমন অবস্থা যে, গুস্তাভসন সুইডেনের পক্ষে সেমি ফাইনালেও খেলতে পারবে না এবং ফাইনালে খেললে ২৫ হাজার ক্রাউন খেসারত দিতে হবে। গুস্তাভসন খেললেন কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভালই প্রতিরোধ করলেন।

ইতালি থেকে আগত একজনই শুধু হতাশ করলেন। গ্রেণ ও লিডহোমের সূচনা শুভ হলেও শক্তিমান ও চমৎকার গোলদাতা ও ফরোয়ার্ড ব্রর মেলবার্জ আশানুরূপ খেলতে পারলেন না। গোলমুখে বল পেয়ে শেষ কাজটুকু করতে অক্ষম হওয়ায় দ্রুত দল থেকে বাদ পড়লেন।

আশ্চর্যের কথা শুরুতে সুইডেনের সাংবাদিকরা, সাধারণ দর্শকবৃন্দ-- কেউই ভাবেননি সুইডেন ফাইনালে উঠবে। অথচ তাঁরা জানতেন, দল খেলছে ভাল, স্বদেশের মাঠে সমর্থকও অসংখ্য। অবশ্য শুরুর ওই আত্ম-প্রশংসা অনেক সময় ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায় পরিণামে। তবে সুইডেন একের পর এক যখন ম্যাচ জিতেছে, ক্রমশ খেলার উন্নতি ঘটিয়েছে, তখনই নিরপেক্ষ ও শান্তিপ্রিয় দর্শক সমৃদ্ধ এই দেশের জনসাধারণ সাবাস জানিয়েছেন নিজেদের দলকে। কিন্তু তাঁরা দেশপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন সেমি ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর

বিরুদ্ধে। দেশপ্রেমের এমন উগ্র প্রকাশ কদাচিৎ চোখে পড়ে, অন্তত খেলার মাঠে।

রাশিয়া: রাশিয়া এই প্রথম বিশ্বকাপে খেলতে এল। ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে এলেন গ্যাব্রিয়েল ক্যাচেলিন এবং তাঁর সহকারী রুশ-বিপ্লবের বীর সৈনিক মিখাইল ইয়াকুশিন। এই ইয়াকুশিন ১৯৪৫ সালে মস্কো ডায়নামো দল নিয়ে ব্রিটেন ও সুইডেন সফরে গিয়ে খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন। ওই সফরের পর রাশিয়ার ফুটবল দ্রুত উন্নতির পথ ধরে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁরা এগোয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা ১৯৫২-য় হেলসিংকি ওলিম্পিকের আগে পর্যন্ত তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। হেলসিংকিতে তারা যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে ৫-৫ ড্র করে প্রচণ্ড লড়াই দ্বারা, তারপর অবশ্য ১-৩ গোলে হারে। সুইডেনে আসার আগে মস্কোয় তারা ইংল্যাণ্ডকে জিততে দেয়নি। তাদের সঙ্গে ড্র হয়। সুইডেনে আবার তারা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ব্রাজিল ও অষ্ট্রিয়া গ্রুপে খেলল।

রুশদলে বেশ ভাল কয়েকজন খেলোয়াড় ছিলেন। সারা মাঠে বিচরণকারী আর্মেনিয়ান সেণ্টার ফরোয়ার্ড সিমোনিয়ানের তো তুলনাই হয় না। আর গোলে সর্বকালের সেরা লেভ ইয়াসিন। ১৯৫৮-য় তিনি শ্রেষ্ঠত্বের কিছু নজির দেখান। মস্কো ডায়নামোর 'টাইগার' খোমিচের খেলাকে তিনি ম্লান করে দিলেন। লেফট ইন্ সালনিকভ ও লেফট হাফ ইগর নেটো অপ্রতিরোধ্য ও দুর্ভেদ্য। অধিনায়ক নেটোর কৃতিত্বে রাশিয়া ১৯৫৬-য় মেলবোর্ণ ওলিম্পিকে ফুটবল-সোনা জেতে। কিন্তু সুইডেনে এসে হাঁটুতে ভীষণ আঘাত পাওয়ায় তাঁর মাঠে নামা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাঁর আঘাত গোটা রুশ দলের উপরেই আঘাত হানল। কেননা, তাঁর প্রাণবন্ত ও আক্রমণাত্মক খেলার উপরে রাশিয়াকে বেশ নির্ভর করতে হত।

রুশদলের আরও ক্ষতি হল তরুণ শক্তিমান সেণ্টার ফরোয়ার্ড এডওয়ার্ড স্ট্রেলসভ বারো বছরের জন্য লেবার ক্যাম্পে নির্বাসিত হওয়ায়। টর্পেডো মস্কোর এই খেলোয়াড়কে সাজা দেওয়া হয় ধর্ষণের অভিযোগে। অর্থাৎ তাঁর জীবন অন্যপথে প্রবাহিত হওয়ার উপক্রম। কিন্তু 'রাজক্ষমার' দ্বারা তাঁর শাস্তি মকুব হল এবং তিনি শুধু ফুটবলে ফিরলেন না, আন্তর্জাতিক দলেও খেললেন। দুবার তিনি 'ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হলেন। অবশ্য কখনও বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাননি।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, ওয়েলস্ ও স্কটল্যাণ্ড : ব্রিটিশ দলগুলির মধ্যে সকলের প্রিয় ইংল্যাণ্ড। কিন্তু উত্তর আয়ারল্যাণ্ড চমৎকার খেলোয়াড়পুষ্ট হয়ে এল। এই প্রথম ব্রিটেনের চারটি দলই ফাইনাল পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল।

ইংল্যাণ্ডের সব আশা-ভরসা নির্মূল হয়ে যায় এর আগের ফেব্রুয়ারিতে মিউনিখে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায়। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সেরা খেলোয়াড়রা দুই-এঞ্জিনের যে বিমানে ছিলেন সেটি রানওয়ের প্রান্তে গিয়ে একটি বাড়ির গায়ে ধাক্কা খায়। বরফে ঢাকা থাকায় পাইলট সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না সেদিন। এর ঠিক আগেই বেলগ্রেডে ইউরোপীয়ান কাপে ওরা ৩-৩ করে। নিহতদের মধ্যে ছিলেন অধিনায়ক ও ইংল্যাণ্ডের প্রতিভাবান লেফট ব্যাক রজার বিয়ার্ণে, চমৎকার সেণ্টার ফরোয়ার্ড টমি টেলর। টেলর যেমন শূন্যে তেমনি মাটিতেও দুর্ধর্ষ ছিলেন। ডানকান এডওয়ার্ডসের বয়স একুশ। অনেকের মতে যুদ্ধের পরে তাঁর মত অত ভাল লেফট হাফ ইংল্যাণ্ডে পাওয়া যায়নি। তাঁর মৃত্যু আরও করুণ। ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তিনি গেলেন হাসপাতালে। সেখানে তাঁর যকৃতে মেসিন লাগিয়ে বাঁচাবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

একুশ বছর বয়সী ববি চার্লটনকে তেমন সমর্থ মনে হল না। তাঁর লজ্জাটে মনোভাব তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখে বহুদিন। তবে প্রাক-বিশ্বকাপের খেলাগুলিতে খেলেন এবং বেলগ্রেডে তাঁর খেলা কারুর পছন্দ হয়নি। যুগোশ্লাভিয়ার কাছে তো ৫-০ গোলে হার হল। তাঁকে বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচেই নামানো হল না। নির্বাচকমণ্ডলী ও ম্যানেজারের ওই সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা হলেও যে অবস্থায় চার্লটন বাদ পড়েন আখেরে তা চার্লটনের পক্ষে শুভফলই দিয়েছিল।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ফাইনাল রাউণ্ডে উঠল অভাবনীয়ভাবে ইতালিকে হারিয়ে, নির্মূল করে দক্ষিণ আমেরিকানদেরও। তারা রোমে অবশ্য দুর্ভাগ্য-বশত ০-১ গোলে হারে। ক্ষুদে উইলবার কুশ সেণ্টার হাফে বেশ খেলেন, ফ্রি-কিক্ থেকে সার্জিও সার্ভাটো গোল দিতে পারতেন। অবশ্য বেলফাস্টে তাদের আশা সিদ্ধ হয়। জানুয়ারিতে চূড়ান্ত খেলার দিন ধার্য হল। কিন্তু নাট্য-পরিচালক হাঙ্গেরীয় রেফারি ইশভ্যান জল্ট আটকে গেলেন কুয়াশার জন্য। ওদিকে ইতালীয়রা আইরিশ রেফারির পরিচালনায় খেলতে অসম্মতি জ্ঞাপন

করল। তবুও উদ্যোক্তারা খেলার দিনক্ষণ না পাল্টে পূর্ব-সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

জুয়ান শিয়াফিনো—যিনি গত দুটি বিশ্বকাপে উরুগুয়ের প্রধান হাতিয়ার ছিলেন, এখন তিনি মিলানে এবং সেই সুবাদে ইতালির জাতীয় দলে। তিনি এক লাথিতে উইলবার কুশকে কুপোকাত করলেন। আয়ারল্যাণ্ডের গোল-রক্ষককে আঘাত দিতে সক্ষম না হয়ে ফাওরেন্টিনার রাইট হাফ চিয়াপেলা বিপক্ষের ম্যাক আদমের পিঠে লাফিয়ে পড়লেন। ফলে শেষ বাঁশি (২-১) বাজতেই দর্শকরা মাঠে ঢুকে পড়ে। আইরিশ অধিনায়ক ড্যানি ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার প্রতিটি ইতালীয় খেলোয়াড় পিছু একজন করে আইরিশকে দাঁড করিয়ে দিলেন। ইতালির লম্বা-চওড়া যে সেণ্টার হাফ ফেরারিও খেলার সময় দুজন আইরিশের উপর লাফিয়ে পড়েছিলেন, এবার তাঁর অবস্থা কাহিল হল। দর্শকরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে ধরাশায়ী করে ফেলল। মাঠে তখন বীভৎস দৃশ্য। চারিদিকে কেবল চিৎকার আর হুটোপুটি। পুলিশ কিন্তু এমন কয়েকজনকে বেদম প্রহার করলেন, যাঁরা শুধু অটোগ্রাফের জন্যই এসেছিলেন। সত্যিই নৃশংস ঘটনা কিন্তু আসল খেলায় আয়ারল্যাণ্ড ভাল খেলেই ২-১ গোলে জিতল। গোল দিলেন ম্যাকলরি ও আহত কুশ। ইতালি দলে ১৯৫০-এর বিশ্বকাপের আর এক খ্যাতনামা উরুগুয়ান ঘিঘিয়া খেলেন। কিন্তু তাঁকে দেশে পাঠানো হয় লঘুপাপে।

বেশ সাহসিকতা দেখিয়েই আয়ারল্যাণ্ড ফাইনাল রাউণ্ডে গেল। রবিবারে খেলা পছন্দ নয়, তবুও উলস্টারে খেলতে হল চাপে পড়ে বিশ্বকাপের স্বার্থেই। গোঁড়ামি নিয়ে আইরিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন খুবই হৈ-চৈ করেছিল, পরে ওরা থেমে যায়।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের অভূতপূর্ব উন্নতি ও সাফল্যের মূলে ছিলেন উৎসাহী ম্যানেজার পিটার ডোগার্টি এবং তরুণ ও প্রতিভাময় গ্রেগ, ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার, পিকক, ম্যাক পারল্যাণ্ড, কুশ ম্যাকলরি ও কিংহ্যাম। মিউনিখ দুর্ঘটনার আগে এদের ভাল সেণ্টার ফরোয়ার্ড ছিল। ডেরেক ডাউগন তখন কাঁচা থাকলেও এখন তিনি পরিণত হতেন। মিউনিখের পর তারা সেণ্টার হাফহীন হল। ওই দুর্ঘটনায় ড্যানির ছোটভাই জ্যাকি ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার নিহত হন। গোলরক্ষক হ্যারি গ্রেগও মানসিক অশান্তিতে ছিলেন। তাই সুইডেনে গিয়ে ট্রেনার গেরি মরগ্যান ওদের সঙ্গেই শুতেন। অনেক রাত গেছে যখন মরগ্যান

ও গ্রেগ সারারাত পায়চারি করেছেন উপর থেকে নিচে ও নিচে থেকে উপরে। মিউনিখে তাঁর অতুলনীয় ব্যবহারের কথা ভোলা যায় না। মরগ্যানই অনেক যাত্রীকে রক্ষা করেছিলেন নিশ্চিত মৃত্যু থেকে।

পিটার ডোহার্টি চমৎকার লেফট ইন ছিলেন ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন ক্লাবে। তবে বেশি খ্যাত হন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও ডার্বি কাউন্টিতে খেলার সময়। যুদ্ধ-পূর্ব বছরগুলিতে আইরিশ জাতীয় দলের একজন খেলোয়াড় হলেও ইংল্যাণ্ডের শীর্ষস্থানীয় ক্লাবগুলির ব্যবহার তাঁকে বেশ দাগা দিয়েছিল। তারা আইরিশ খেলোয়াড়দের শেষ সময়ে ছেড়ে দেয়, ফলে তাদের পক্ষে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলার জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভব ছিল না। ডোহার্টি ম্যানেজাররূপে ওই কথা মনে রাখেন এবং স্থির করেন আয়ারল্যাণ্ডকে কখনও ওরকম অসুবিধার মধ্যে পড়তে দেবেন না।

ডোহার্টি ভাগ্যবান ছিলেন। মাঠে তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণে দুজন দোসর পেলেন। একজন রাইট হাফ ড্যানি ব্লাঙ্কফ্লাওয়ার অপরজন ইনসাইড ফরোয়ার্ড জিমি ম্যাকলরি। উভয়ের যেমন টেকনিক্যাল জ্ঞান, তেমনি ট্যাকটিকসে প্রজ্ঞা। এঁদের দুজনের খেলাই গোটা দলের রাশ টেনে ধরত মাঠে এবং এঁদের প্রভাবেই বাকি নয়জন খেলা চালিয়ে যেতেন। বিশ্বকাপের আগে পশ্চিম জার্মানীর চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে, চেকদের সঙ্গে ও আর্জেন্টিনিয়ানদের সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ড ড্র করল। ব্লাঙ্কফ্লাওয়ার হঠকারী পরিকল্পনা নিলেন—"অন্যরা আবার গোল করার আগে আমাদের ড্র করতেই হবে।"

বিলি বিংহ্যাম খুদে হলেও সাণ্ডারল্যাণ্ড ও লুটনের রাইট আউটে খ্যাত ছিল। কুশ তো চমৎকার রাইট আউট। ইনি পরবর্তীকালে দলের ম্যানেজার হন। দলের সাফল্যে তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। উপযুক্ত সেণ্টার ফরোয়ার্ড না থাকায় তাঁর 'ডাবল' সেণ্টার ফরোয়ার্ড পরিকল্পনা বেশ কার্যকর হয়। তাছাড়া ফ্রি-কিক্, কর্ণার ও থ্রো-ইনের কঠোর অনুশীলন দ্বারা দল অনেক উন্নত হল। অতঃপর সামান্য পরিবর্তনের দ্বারা তিনি আয়ারল্যাণ্ডকে অনেকটা 'ক্লাব সাইড'-এর মত গড়লেন।

ওয়েলসও সমান দৃষ্টি কেড়ে নিল। তবে তাদের সুইডেন গমন রীতিমত ভাগ্যের ব্যাপার বৈ নয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছে হেরে তারা প্রাথমিক পর্বে ছাঁটাই হয়েছিল। যখন ইজরায়েল-বিরোধী বিভিন্ন দেশ প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিল রাজনৈতিক কারণে, তখনই ওয়েলস-এর

সুইডেন গমনের সুযোগ এল। ফিফা ঘোষণা করল যারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে তারা নাম প্রত্যাহারকারী প্রথম দলগুলির জায়গায় খেলবে। উরুগুয়ে রাজি হয়নি ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নামতে, তাই ওয়েলসকে খেলতে হল। 'হোম' ও 'আওয়ে'তে ওয়েলস্ ২-০ গোলে ইজরায়েলকে হারাল ও সুইডেনে গেল। ইতিমধ্যে জুভেন্টাস তাদের দল থেকে কুশলী সেণ্টার ফরোয়ার্ড জন চার্লসকে ছেড়ে দিয়েছে। চার্লসকে পেয়ে ওয়েলসের খেলায় দারুণ উন্নতি হয়। মাত্র ১৭ বছর বয়সে চার্লস আন্তর্জাতিক ফুটবলে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথম মরশুমে ইতালিতে দারুণ খেলেছেন। ওয়েলসের ম্যানেজার জিমি মারফি দিলখুস মানুষ। মিউনিখ বিমান দুর্ঘটনায় ম্যাটবুসবি গুরুতর আহত হলে তিনিই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের দায়িত্ব পালন করেন কৃতিত্বের সঙ্গেই। ওয়েলসে চার্লস ছাড়াও রয়েছেন বিখ্যাত ও শান্ত দীপ্তিময় গোলরক্ষক জ্যাক কেলসি এবং উঁচুদরের লেফট ইন আইভর অলচার্চ।

ওয়েলস্ ভীষণ উপকৃত হল সালজোব্যাডেন-এ প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়ে। ওখানে নাকি প্রচুর বিয়ার বোতল দ্রুত নিঃশেষিত হত। কিন্তু নিরামিষাশী ব্রাজিলকে তবুও ওয়েলস্ ঢিট করতে পারেনি। ফ্রান্স ও ওয়েলস্ উভয়েই কোপারবার্জের ধ্যানধারণায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। হাঙ্গেরীয় পদ্ধতিতে তারা স্থানীয় দলগুলির বিরুদ্ধে গাদা গাদা গোল দিত। এসব জয়ের তেমন মূল্য না থাকলেও গোলের সংখ্যা নিশ্চয়ই সাহস বাড়াবার পক্ষে কার্যকর ছিল।

স্পেনকে ছাঁটাই করে স্কটল্যাণ্ড ভাল কাজই করেছিল, কিন্তু হ্যামডেনে তারা ইংল্যাণ্ডের কাছে ০-৪ গোলে হারল। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী গ্রুপের সর্বনিম্নে স্থান পেল। তারা হারে উরুগুয়ে বিজয়ী প্যারাগুয়ের কাছে। হারে যুগোশ্লাভিয়া ও ফ্রান্সের কাছেও।

হাঙ্গেরি: ১৯৫৪-র ফাইনালে হাঙ্গেরির পরাজয় হলেও তাদের নৈতিক জয় হয়েছিল। এবার তাদের পঞ্চাশের দশকের শুরুর দলের বিপরীত মনে হল। ১৯৫৬-য় হাঙ্গেরিতে বিপ্লব হল। সামরিক বাহিনীতে তখন দোদুল্যমান অবস্থা থাকলেও হনভেড মিলিটারি দল সেরা খেলোয়াড়পুষ্ট হয়ে বিদেশে খেলে বেড়াচ্ছিল। কর্তৃপক্ষ নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাতের জন্য সব কাজ ত্বরান্বিত করল। অপূরণীয় ক্ষতি হল কোজিস ও পুসকাস নিজেদের 'নির্বাসিত' করে রাখায়। কুবালা তো এঁদের আগেই স্প্যানিশ ফুটবলে নিজেকে নিয়োজিত

করেন। চমৎকার উইঙ্গার জোলটান জিবর অন্যত্র চলে গেলেন, আর যদিও জোসেফ বোজসিক ও ন্যানডর হিদেকুটি প্রগাঢ় দেশপ্রেমের জন্য স্বদেশেই রইলেন, তবুও তাঁরা তো ফুটবলার হিসাবে তখন প্রবীণের দলে।

এর উপরে আবার অন্য অভিযোগ: বুদাপেস্ট বিমানঘাঁটিতে পুলিশ হাঙ্গেরির খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বেআইনী টাকা বাজেয়াপ্ত করল। ওরা নাকি ওই অর্থ নিয়ে যাচ্ছিল বিদেশে বাজার করতে। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, খেলোয়াড়দের কিন্তু ভীষণ বিষণ্ণ মনে হচ্ছিল। ১৯৫৪-র বিশ্বকাপ দলের অধিনায়ক গুস্তাভ সেবেস মন্তব্য করলেন, "আমি কখনও হাঙ্গেরি দলকে এমন শারীরিক অবসাদগ্রস্ত ও মানসিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখিনি। তারা প্রত্যেকেই স্নায়ুর চাপে ভুগছিল।" অথচ কিছুদিন আগেও তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারত না। ট্যাকটিকসে তাদের জুড়ি কেউ ছিল না। তাদের কঠোর ট্রেনিং এবারও অব্যাহত ছিল। কিন্তু সবই যেন ধুলোয় মিশে গেল। অবশ্য অভয় দিলেন সাংবাদিকরা, "এবার হাঙ্গেরি যা-ই খেলুক, তাদের ভবিষ্যৎ আছে।"

ফ্রান্স: কোপারবার্জে প্রতিযোগিতার ১৯ দিন আগে ফরাসীরা এলো পরম উৎসাহী ও নিষ্ঠাবান মঁসিয়ে পল নিকোলাসের অভিভাবকত্বে। মঁসিয়ে পল নিজেও এক সময় জাতীয় দলে খেলেছেন। তাঁর সঙ্গে এলেন প্রাক্তন দুর্ভেদ্য গোলরক্ষক আলেক্স থেপট; থেপট এখন নির্বাচকমণ্ডলীতে। ম্যানেজার অ্যালবার্ট ব্যাটেক্সের সহকারী হিসাবে সুইডেনে দেখা গেল জিন স্নেলা-কে। ফ্রান্স সম্পর্কে শুরুতে কেউই ভাবেনি তারা অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে ফুটবলে। তাই কেউ তাদের সঙ্গে তেমন গা লাগিয়ে খেলেওনি। রিয়াল মাদ্রিদ রেমণ্ড কোপাকে ছেড়ে দেওয়ায় ফ্রান্স দলের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হলেও তারা খুব আহামরি কিছুই খেলেনি। ডি স্টিফানোর কুশলতার দাপটে উইং-এ কোপার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় রিয়ালে। কুবালার সহযোগিতায় তার স্পেন অক্ষম ছিল স্কটল্যাণ্ডকে পদানত করতে। কিন্তু ফ্রান্সে তিনি সেণ্টার ফরোয়ার্ডে এসে খেলা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে ফুটবলে চমক দেখালেন। যেমন বল নিয়ন্ত্রণে, তেমনি থ্রু পাসে। তাঁর সঙ্গে সমানভাবে সহযোগিতা করতে লাগলেন ফনটাইন। গোটা প্রতিযোগিতায় সবজনপ্রিয়দের অন্যতম হলেন ফনটাইন। গোল দিলেন রেকর্ড সংখ্যক— ১৩টি।

ফনটাইনের জন্ম মরোক্কোয়। সুইডেনে আসেন রিজার্ভ খেলোয়াড় হয়ে।

তাঁর কথায়, "আমি সেণ্টার ফরোয়ার্ড ছিলাম কোপা আসার আগে পর্যন্ত।" ফনটাইনের দলে আসা সুনিশ্চিত হয় যখন ট্রেনিং-এর সময় রেনে ব্লেয়ার্ড গোড়ালিতে আঘাত পেয়ে দেশে ফিরলেন। ময়লা, সুঠামদেহী ফনটাইনের গুণ অনেক—যেমন দ্রুত পাস দেন, তেমনি বল নিয়ে অ্যাথলীটের মত ছুটতে পারেন এবং প্রতিটি শট নিখুঁত। শুধু তাই নয়, কোপার নির্দেশমত প্রতিটি কাজ করলেন মাঠের মধ্যে। ফরাসী সাংবাদিকরা যখন ১৯৫৮-র প্রতিযোগিতা শেষে বললেন, "লে ভ্রায় ডাউফিন", তখন তা মোটেই নিছক প্রশস্তি ছিল না।

পশ্চিম জার্মানী: গতবারের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানী এল যেন নৈতিক দায়িত্ব মেটাতে। রাশিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, প্যারাগুয়েকেও তাই মনে হল। আগেই জানা গেছে, রাশিয়া স্ট্রেলসভকে কারাগারে পাঠায়। রাইট উইঙ্গার বরিস টাটুসিন ও লেফট ব্যাক ওগোনকভ বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়লেন শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে। 'পেশাদারীত্বে'র অভিযোগে প্যারাগুয়ে বাদ দেয় তাদের দুই সেরা ফরোয়ার্ড জারা ভ্রাতৃদ্বয়কে। চেকোশ্লোভাকিয়া অযোগ্য ঘোষণা করল দুর্ধর্ষ সেণ্টার হাফ জিরি হেলডিক-কে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ট্রান্সফার চেয়েছিলেন।

পশ্চিম জার্মানা অবশ্য হেলমুট রানকে সাসপেণ্ড করেনি। তাঁকে 'পুনর্বাসন' দেওয়া হল। গত বিশ্বকাপের ফাইনালে জার্মানীর পক্ষে বোমাবর্ষণকারী এই রাইট উইং ভীষণ পানাসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর ওজন বাড়তে থাকে। এছাড়াও মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে জেলেও যান। সুইডেনের সাংবাদিকরা 'আঙ্কেল' শেপ হারবার্জারের আচরণে প্রমাদ গণলেন। তাঁরা বললেন, "আঙ্কেল, তুমি তোমার খেলোয়াড়দের প্রতি সু-আচরণ কর না। মনে হয় ওরা তোমার কাছে সংখ্যা বৈ নয়। তুমি বড্ড বাস্তবধর্মী। বাস্তববাদী ও নীতিবাদীতে কিন্তু পার্থক্য অনেক।" জার্মানদের 'আঙ্কেল' তখন শুধু হেসে-ছিলেন। রানকে ১৯৫৪-য় দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সুইজারল্যাণ্ডে খেলতে পাঠানো হয়েছিল, এবার সুইডেনেও সেই মর্যাদাই পেলেন। অন্যায় মকুব করে তাঁকে পূর্ণ মর্যাদাই দেওয়া হয়।

বারণ-এ ফাইনালে জয়ের পরে পশ্চিম জার্মানদের অনেক দোষও গুণ হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু তার ফল দেখা যায় কিছুদিনের মধ্যেই। অপরিমিত মদ্য-পানের জন্য তাদের দলে জণ্ডিস সংক্রামক হয়ে দেখা দিল। ১৯৫৪-র দুই বা

একজন নয়, ছয়জন বাদ গেলেন। ওঁরা—তুরেক, কোহলমেয়ের, লিবেরিশ, মাই, ওটমার, ওয়াল্টার ও মরলক। ফ্রিজ ওয়াল্টার ৩৭ বছর বয়সেও দলের স্ট্রাটেজি রচনার মুখ্য ভূমিকা নিলেন। হান্স শেফার আলোচনার পর রানকে উইং-এ রেখে দিলেন। উপরন্তু দলে তুটি নতুন শক্তিশালী মুখ দেখা গেল। একজন লেফট হাফ হোর্স্ট জিমানিয়াক, আর একজন (পরবর্তীকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী) সারামাঠ বিচরণকারী শক্তিমান সেণ্টার ফরোয়ার্ড হামবুর্গের তরুণ উয়ে জিলার। ১৯৫৪-য় আঠার বছর বয়সেই তিনি জাতীয় দলে নির্বাচিত হন। জার্মানীর ফুটবলে অনাগতকালের আদর্শ এই জিলার।

আর্জেণ্টিনা ঃ আর্জেণ্টিনা খেলল পশ্চিম জার্মানীর গ্রুপে। তাদের দল অবশ্য এর আগেই ইতালির দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিল। মাত্র একবছর আগে আর্জেণ্টিনার তিন প্রতিভাবান ম্যাসিও, অ্যাঞ্জেলিলো ও সিভোরি লিমায় 'দক্ষিণ আমেরিকা বিজয়ী' হন। ওঁদের খেলা দেখে ইতালির ক্লাবগুলি লোভ সামলাতে পারেনি। ওদের জালে ধরা পড়লেন শান্ত মেজাজী লেফট ইন আর্নেস্টো গ্রিলো।

আর্জেণ্টিনা কৌশলে রিভার প্লেটের লেফট ইন অ্যাঞ্জেল লাব্রুনাকে এনে অতিকষ্টে কোয়ালিফাইং রাউণ্ড অতিক্রম করলেও অখ্যাত বলিভিয়ার কাছে তারা হেরে যায়। আর এক প্রবীণ খ্যাতনামা সেণ্টার হাফ নেস্তর রসি-কে তারা পেলেও তিনি খুব কার্যকরী ছিলেন না।

ব্রাজিল ঃ ব্রাজিলের সুইডেনে আসার পথ সহজ না থাকলেও তারা এখানে এসে ক্রমশ 'ফেভারিট' হয়ে ওঠে। তাদের শেষ কোয়ালিফাইং ম্যাচ হল রিও-তে পেরুর বিরুদ্ধে। ব্রাজিল এই খেলায় মাত্র ১-০ গোলে জেতে। ডিডি-র অন্যতম বিখ্যাত 'ফগিলা সেক্কা' (ফলিং লিফ) ফ্রি-কিকই গোলটি দেয়। ১৯৩০-এর বিশ্বকাপে ওই কিক্ 'ব্যানানা শট' নামে খ্যাতিলাভ করে। তুই বছর আগে ওয়েমব্লিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ডিডি অনুরূপ শটে বেশ সফল হন, তা না হলে তাদের পরাজয়ের ব্যবধান নিশ্চয়ই ২-৪ গোলের বেশি হতই। তথাপিও এই ডিডি ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে খেলা থেকে বাদ পড়ার উপক্রম হন এবং উদ্বোধনী খেলায় তাঁর নামার পর ডিডি-অনুরাগীরা আশ্বস্ত হন। ডিডি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল একাধিক। প্রথমত তাঁর বয়স ত্রিশ। অর্থাৎ খুব বুড়ো। দ্বিতীয়ত তিনি শ্বেতকায় মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তৃতীয়ত

তিনি আগের মত কঠোর অনুশীলন করছিলেন না। এই সব শুনে ডিডি ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "ওরা যদি আমাকে বাদ রেখে যায় তবে তা বেশ হাস্যকর ব্যাপার হবে। তা ছাড়া আমি তো ওদের টিকিটের দাম দিয়েছি।" অনেকটা ব্যাভেনাথা ক্লাবের নিগ্রো জ্যাজ সঙ্গীতজ্ঞের মত দেখাত। তাই ওই ব্যঙ্গোক্তি।

১৯১৬-য় ব্রাজিলের ইউরোপ সফর তেমন দৃষ্টি কেড়ে না নিলেও তারা এই সফর থেকে দারুণ সুফল পেল। তিন ব্যাকের খেলা তাদের কাছে 'বিদেশী', তাই ওর বদলে ৪-২-৪ পদ্ধতিতে খেলা শুরু করে এই সফরে। ব্রাজিলীয় ফুটবলেও ৪-২-৪ নিয়ে ভীষণ সমালোচনা হয়। অবশ্য কেউ কেউ বললেন, প্যারাগুয়ের কোচ বিখ্যাত ফ্লেইরাস সোলিচ এই পদ্ধতি রিওতে আমদানী করেন। এই পদ্ধতির প্রতিটি মুহূর্ত ভীষণ বেগবান। আর সাওপাওলোর ভিসেন্ট ফিওলা জাতীয় দলের মধ্যে এ পদ্ধতি প্রয়োগ শুরু করেন।

এই ফিওলা সুইডেনে নিয়ে এলেন সেরা ব্রাজিল দল। ইতিপূর্বে এত চৌখস ব্রাজিল কখনও ইউরোপ সফরে আসেনি। সুইডেনে তাঁর দক্ষিণহস্ত ছিলেন দারুণ উৎসাহী ও কর্মঠ চিকিৎসক ডাঃ হিল্টন গসলিং। সুইডেনে পৌঁছে তিনি শত শত মাইল ঘুরলেন দলের প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করতে। গেটেবার্গের বাইরে হিণ্ডাস বনের মধ্যে তিনি মনের মত স্থান পেলেন। রুশ দলও ওখানে বাস নিল। রুশরা যখন মাছ ধরার নেশার ফাঁকে অবসর পেতেন, তখনই বনের মধ্যে চলে যেতেন ও ভল্লুকের মত উঁকি মেরে ব্রাজিল দলের আনন্দময় অনুশীলন দেখতেন আর শুনতেন বহু পুরুষকণ্ঠের সমস্বর চিৎকার। ইংল্যাণ্ড এল। তবে হিণ্ডাস বনের মধ্যে অনুশীলনের পক্ষে অনেক দেরী হয়ে গেছে। তারা গেটেবার্গের মধ্যস্থলে এক হোটেলে বাস নেয়। বোঝা গেল তাদের দূরদর্শিতার বেশ অভাব। ওয়েলসীয় বা আইরিশদের মত বন্ধুত্বের বা এক পরিবারভুক্ত হওয়ার মনোভাব যে ইংল্যাণ্ডের নেই, বেশ বোঝা যায়। জর্জ রেনর বললেন, "এ কি পাপ বা লজ্জা নয় যে, ইংল্যাণ্ড একাকী পার্ক এভিনিউয়ে থাকবে?"

ব্রাজিলীয়রা গসলিং-কে পিতৃসম শ্রদ্ধা করতেন। বারণ-এর স্মৃতি তাদের প্রত্যেকের মনে। গসলিং তাদের মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শদাতা শুধু নন, তিনি খেলোয়াড়দের দেখেই বুঝতেন, তার মধ্যে সারবস্তু কী আছে। গসলিং নিজেকে জাতীয় স্বার্থে এমনভাবে নিয়োজিত করেছিলেন যে, কখনও কখনও দিনের পর দিন গোঁফ-দাড়ি কামাবারও সময় পেতেন না। গসলিং কখনও সব খেলোয়াড়কে

জড়ো করে বাগড়াম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন না। আবার পৃথকভাবে কথা বলাও ভীষণ অপছন্দ ছিল। কেননা, তিনি মনে করতেন এসবে সমস্যা আরও বাড়ে। এর বদলে তিনি খেলোয়াড়দের সামনে বিপক্ষদলের কোনো খ্যাতনামার খেলার চিত্র তুলে ধরতেন। সেই খেলোয়াড় এমন কেউ হতেন যিনি বিপক্ষের নামী খেলোয়াড় শুধু নন, ব্রাজিল যার আক্রমণে বিপর্যস্ত হতে পারে বা যাঁর রক্ষণে ব্রাজিলের আক্রমণভাগ বাধা পেতে পারে। অর্থাৎ বিপক্ষের ম্যাচ যাঁর হাতে। গসলিং দেখাতেন ব্রাজিলের কোন্ খেলোয়াড় কখন ওদের কীভাবে কাটাবে বা বাধা দেবে। রক্ষণভাগ, আক্রমণভাগ প্রত্যেকের কাজ পৃথকভাবে বোঝাতেন। যিনি যে মানের খেলোয়াড়, তাঁকে সেইভাবে বোঝাতেন গসলিং। আবার পশ্চিম জার্মানীর এরহার্ডের মত দুর্ধর্ষ ডিফেণ্ডারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের স্ট্রাটেজি যে ভিন্নধরনের তাও জানাতেন।

ফিওলা ইতিমধ্যে তাঁর বিরাট মাথাটি নেড়ে বললেন, ওদের অত কথা তিনি কেমন করে জানবেন? তিনি ১৯ বছর বয়সী সেণ্টার ফরোয়ার্ড জোস আলতা-ফিনিকে নিয়েও খুব খুশি ছিলেন না। আলতাফিনি অবশ্য 'ম্যাজোলা' ডাকনামে পরিচিত ছিলেন। স্যাণ্ড্রিনোর বাবা ইতালির প্রাক্তন অধিনায়ক ম্যাজোলা-র চেহারার সঙ্গে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। আলতাফিনি সম্প্রতি মোটা টাকার বিনিময়ে মিলানে ট্রান্সফার নিয়েছিলেন। সুইডেনে আসার আগে তিনি ওই দলের দুটি ম্যাচে বেশ খেলেন। ফিওলার অভিযোগ, "তার বয়স ১৯। মিলানে তার ট্রান্সফারের খবর বেশ চাউর হয়েছে। সে এখন এখানে কেমন করে খেলবে? সে তো আমাদের দলে আসার যোগ্য নয়।"

ফিওলার পছন্দ তাই অনায়াসে চলে যায় অ্যাজটেকের তরুণ ভাস্কো-ডা-গামা দলের শক্তিমান সেণ্টার ফরোয়ার্ড ভাভা-র প্রতি। অবশ্য তিনি ছাড়া আরও দুই অসামান্য প্রতিভাধর তাঁর সন্ধানে ছিলেন। ১৭ বছর বয়সী পেলে ইতিমধ্যে ব্রাজিলের ইতিহাসে সবচেয়ে কুশলী ও সুন্দরতম বলে খ্যাতিলাভ করেছেন। অবশ্য পেলে তখন আহত। ফিওলা ওঁর সম্পর্কে কিছুটা অনীহা দেখালেন। মনস্তাত্ত্বিক গসলিং রাইট আউট গ্যারিঞ্চাকে সবচেয়ে নিখুঁত আখ্যাত করলেন।

'লিটল বার্ড' গ্যারিঞ্চা সারাক্ষণ বিপজ্জনক শুধু নন, তাঁর সম্পর্কে কোনো-রকম ভবিষ্যদ্বাণী করাও অসম্ভব। শৈশব থেকেই গ্যারিঞ্চা পঙ্গু হলেও ঐশ্বরিক শক্তিতে তিনি শক্তিমান। যেমন স্পিড, তেমনি তাঁর অপূর্ব সোয়ার্ভের ক্ষমতা,

প্রতিমুহূর্তে তিনি নব নব ক্রীড়াধারা রচনা করেন। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য শুরুতে ফ্লামেঙ্গোর জোয়েলকে নেওয়া হয়েছিল, আর এক ফ্লামেঙ্গো উইঙ্গার জাগালো এলেন লেফট আউটে। তাঁর ক্লাব-সতীর্থ ডিডি রাইট ইনে। পাশে রইলেন ভাভা।

৪-২-৪ পদ্ধতি ব্রাজিলীয়দের পুরোন সমস্যার সমাধান করে দিল বেশ সহজেই। লেফট হাফ এগিয়ে এলেন সেণ্টার হাফের কাছাকাছি, রক্ষণভাগের আগের শূন্যস্থান পূর্ণ হল। হাঙ্গেরি জ্যাকেরিয়াদের বিরুদ্ধে এই পদ্ধতি নিয়েছিল। এতে দুজন মাঝমাঠ পর্যন্ত বিচরণ করবে, দুজন উইঙ্গার ও দুজন সেণ্টার স্ট্রাইকার আক্রমণভাগে থাকবে। যদি কোনো দলে ব্রাজিলের মত অসামান্য প্রতিভাবান ও পরিশ্রমী এবং কুশলী কেউ থাকেন, তবে এই পদ্ধতির জুড়ি নেই। যদি অমন খেলোয়াড়ের অভাব থাকে তবে নানা সমস্যায় পড়তে হবে, অন্তত মাঝ মাঠে তো বটেই।

ব্রাজিল এই পদ্ধতিকে প্রাণবন্ত করে তুলল প্রথম ম্যাচেই মারিও লোবো জাগালো-র দ্বারা। অথচ শুরুতে ওঁর কাছে অমন খেলা কেউই আশা করেননি। তাঁর ফুসফুসের ক্ষমতা দেখে সকলে অবাক হলেন। টাচলাইনের বরাবর তার ওঠা-নামা ও অতন্দ্র প্রহরা সত্যিই বিস্ময়কর। সুইডেনে ৪-২-৪ পদ্ধতিতে ব্রাজিল সুফল পেল। চার বছর পরে চিলিতে এই পদ্ধতি আরও কার্যকর হয়।

ইংল্যাণ্ড : আশা ছিল গোটেবোর্গ থেকে ইংল্যাণ্ড কোয়ার্টার-ফাইনালে আসবে। কিন্তু সে আশায় বাদ সেধেছিল মিউনিখের ঘটনা অনেক আগেই। বস্তুতপক্ষে মিউনিখের বিমান দুর্ঘটনা ইংল্যাণ্ডের জাতীয় দলকেও অনেকটা পিছিয়ে ফেলে। তারা ২২ জনের জায়গায় ২০ জনের দল নিয়ে সুইডেনে আসে (চেকোশ্লোভাকিয়া ১৮ জন নিয়ে এসেছিল)। কিন্তু ওই দলে না ছিলেন স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুস, না ন্যাট লফটহাউস। ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে উভয়ের কৃতিত্বের কথা নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। দুজনের খেলাই বেশ তুঙ্গে তখনও। ম্যাথিয়ুস তো ১৯৫৬-য় ৪১ বছর বয়সে ব্রাজিলের লেফটব্যাক নিলটন স্যাণ্টোসকে নাস্তানাবুদ করেন ওয়েমব্লিতে। লফটহাউস কাপ ফাইনালে বলটনের দুটি গোলই দেন।

এডওয়ার্ড, বিয়ার্ণে ও টেলরের মৃত্যু তো অপূরণীয় ক্ষতি। দুর্ঘটনায় ক্ষতি হয় ফুলহাম ও ব্ল্যাকবার্ন রোভার্সেরও। যদিও শক্তি পুনরুদ্ধার অকল্পনীয় ছিল,

তবুও তারা দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে উন্নীত হওয়ার জন্য হাস্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। লণ্ডনের তরুণ ফুলহামের জনি হাইনেস থ্রু ও ক্রশফিল্ড পাসে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেন ; জাতীয় দলের তিনি হলেন আক্রমণের পুরোধা। ববি রবসন ফুলহামে ইনসাইডে ফরোয়ার্ড ছিলেন, গেটেবার্গেও তাই। রাইট উইং-এ ব্ল্যাকবার্ণের ব্রায়ান ডগলাস ; তবে ব্ল্যাকবার্ণের অধিনায়ক রনি ক্লেটনকে শুধু গ্রুপের প্লে-অফ্ ম্যাচে সুযোগ দেওয়া হয়।

গ্রুপ ম্যাচ : গেটেবার্গের নবনির্মিত উলেভি স্টেডিয়াম শুরুতেই অশুভ সংকেত বয়ে আনল। স্টেডিয়ামের ছাদে তালগোল পাকানো তার দেখে মনে হচ্ছিল দৈত্যের মত কোনো পুতুল দাঁড়িয়ে। ওই ছাদে আহত হলেন টম ফিনে। কিন্তু তাঁর আঘাত ইংল্যাণ্ডকে তেমন ক্ষতি করেনি। বরং শেষ আধ-ঘণ্টা তিনিই ইংল্যাণ্ডকে সাহস যোগালেন। খেলা সমাপ্তির ছয় মিনিট আগে তাঁর পেনাল্টি-কিকেই ড্র হল। ডগলাসকে ট্রিপ করায় ইংল্যাণ্ড পেনাল্টি পেয়েছিল। কিন্তু আঘাত পেয়ে ডগলাসের নিষ্ক্রমণ ইংল্যাণ্ডের ক্ষতি করল। প্রকৃতপক্ষে এই সময় ডগলাসের মত বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর এমন কুশলী ফরোয়ার্ড ইংল্যাণ্ড দলে আর ছিলেন না। তাছাড়া হাইনেস, ডগলাস ও রবসনের স্থান দখলের মত জাতীয় দলে আর কেউ ছিলেন না।

এই দর্শনীয় খেলায় দলের আক্রমণ রচনা ও আত্মরক্ষার সব দায়িত্বের দিক থেকে শুরুতে হাইনেসের নাম উচ্চারিত হলেও রাশিয়ার সবলিনকভ ফুটবলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন নেটো ছাড়াই। তাঁর বদলে সুযোগ পান ভয়নর্ভ ও তাসারেভ নামক দুই বিশালদেহী হাফ। সেণ্টারে প্রাধান্য ছিল ক্রিশেভস্কির। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ঠাণ্ডা মাথার গোলরক্ষক বার্ণলে-র কলিন ম্যাকডোনাল্ডকে রাশিয়ার লেভ ইয়াসিনের মত তৎপর দেখাচ্ছিল।

এই ম্যাকডোনাল্ড শুরুর ১৩ মিনিট পরে দুর্ধর্ষ লেফট উইঙ্গার ইলিয়ানের ও পরে সিমোনিয়ার শট ঠেকিয়ে দেন। ইংল্যাণ্ডের ছোট ছোট স্কোয়ার পাসের কি উদ্দেশ্য ছিল বোঝা গেল না। কেননা ওর দ্বারা রাশিয়ার রক্ষণভাগকে ভেদ করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের দশম মিনিটে রাশিয়া দ্বিতীয় গোলটি দেয়। তাদের রাইট ব্যাক কাসেরভ যখন বল নিয়ে এগোলেন এবং তাঁর চমৎকার ক্রশপাস থেকে ইভানিভের গোল দেওয়া পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের রক্ষণভাগ যেন বিমূঢ় ছিল। ফিনের বুদ্ধিমত্তাই পরের বার কাসেরভকে আটকাতে সমর্থ হয়েছিল।

৬৫ মিনিটের সময় দুর্ভেদ্য সেণ্টার হাফ ও ইংল্যাণ্ডের সুযোগ্য অধিনায়ক বিলি রাইট রাশিয়ার গোলের সামনে বল ফেললেন ফ্রি-কিক্ থেকে। কিভ্যানের হেড দ্বারা যে বল উঁচুতে উঠল, সেটি নিচে পড়ার আগেই আবার তিনি ওতে মাথা ছোঁয়ালেন ও ইয়াসিন পরাস্ত হলেন (২-১)।

বোরাস-এর ছোট মাঠে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ব্রাজিলের জিততে বেগ পেতে হয়নি। ম্যাজোলা দুটি গোল দিলেন, নিলটন স্যাণ্টোস ব্যাক থেকে এগিয়ে গিয়ে দেন আর একটি। তবুও ব্রাজিলের সমালোচকরা সন্তুষ্ট হলেন না। ডিডি সম্পর্কে তাঁরা খুব কড়া মন্তব্য করলেন, তিনি কয়েকবার বল ছাড়াই ছুটেছিলেন বলে।

স্টকহমে ৮ জুনের ভরদুপুরে সুইডেন ৩-০ গোলে হারাল মেক্সিকোকে। মেক্সিকো এতদূর এগিয়েও কেমন যেন অনীহা দেখাল গোটা ম্যাচে। সুইডেনের দুটি গোল আসে লম্বা ও তরুণ প্রতিভাবান সেণ্টার ফরোয়ার্ড আগ্নে সিমনসনের পা থেকে। বাকিটি দেন ৩৬ বছর বয়সী রাইটহাফ লিডহোম পেনাল্টি থেকে।

এক নম্বর গ্রুপে হামস্টাডে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের কুশ-এর একমাত্র গোলে হারল চেকোশ্লোভাকিয়া। আর মালমো-য় গতবারের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানী সুযোগ নিল আর্জেণ্টিনার সব দুর্বলতার। তারা জিতল ৩-১ গোলে। বেচারা জার্মানীর ফ্রিজ ওয়াল্টার; এই খেলার পর গোটা প্রতিযোগিতায় তিনি নার্সিং হোমে কাটালেন আঘাত নিয়ে। এই খেলার শেষদিকে রসি তাঁকে মারাত্মক ফাউল করেন। এমন ফাউল যে, অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন রসিকে মাঠের বাইরে পাঠানো হবে। কিন্তু তা হল না।

আর্জেণ্টিনা এই ম্যাচের শুরুতেই সুযোগ পায়। দ্বিতীয় মিনিটে ওদের ভয়ঙ্কর ছিপছিপে রাইট আউট কোরবাট্টা জার্মানীর পেশীবহুল জুসকোয়াইকে কাটিয়ে গোল দেন। কোরবাট্টা সফল হলেও আর্জেণ্টিনার উদ্যম বৃদ্ধি হল না। দলগত খেলা ও স্ট্যামিনায় জার্মানরা অনেক এগিয়ে থাকায় আর্জেণ্টিনা প্রতি মুহূর্তে দমে যাচ্ছিল। তাছাড়া তারা যেন ঘুষোঘুষি ইত্যাদিতে বেশি ব্যস্ত ছিল। তাই রান ওদের গোলের আধঘণ্টার মধ্যে ১-১ করলেন হঠাৎ ওয়াল্টারের পাস থেকে। বিরতির পাঁচ মিনিট আগে ২-১ হল। ইকেল আঘাত পেয়ে সারা দ্বিতীয়ার্ধ খুঁড়িয়েছেন, কোনো বলই ঠিকমত ধরে পাস দিতে পারছিলেন না। কিন্তু সমাপ্তির দশ মিনিট আগে তাঁর ছোট্ট পাস থেকে রান বাঁকা শটে প্রবীণ কারিজো-কে পরাস্ত করলেন। জার্মানীর ৩-১ গোলে জয় হল।

যে আয়ারল্যাণ্ড দল লেগান নদীর কাছে লম্বা দৌড় ও বেলফাস্টের উইণ্ডসর পার্কে স্প্রিন্ট্ অনুশীলন করেছিল, তারা সেণ্টার ফরোয়ার্ডে নিল ডেরেক ডোগানকে। অবশ্য ফরোয়ার্ডে প্রথম মনোনীত ছিলেন রেঞ্জার্সের বিলি সিম্পসন। কিন্তু সুইডেনে এসে পাঁচমিনিট অনুশীলনের পরেই তাঁর পেশীতে টান ধরে। ডোগান প্রথমার্ধে মোটেই ভাল খেলতে পারলেন না। কিন্তু বিলি বিংহাম দ্বিতীয়ার্ধে যখন তাঁকে মাঝখানে ঠেলে দিলেন, তখন যেন তাঁর দেহে দ্বিগুণ শক্তি। সুইডেনে সমুদ্রপথে আগত হ্যারি গ্রেপ গোলে নির্ভয়ে খেললেন চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে। লেফট হাফে বার্টি পিকক অতুলনীয় খেললেন। পিটার ম্যাকপারল্যাণ্ডের সেণ্টার থেকে উইলবার কুশ একমাত্র গোলটি দিলেন। অত্যন্ত ম্লান মনে হল জ্যাকি ব্লাঞ্চফ্লাওয়ারকে। সম্ভবত সহোদর উইলি ক্যানিংহামকে খেলাবার জন্য তিনি ঢিমেতালে খেলেন। তবুও শেষের দিকে আয়ারল্যাণ্ডের রক্ষণভাগকে প্রচণ্ড চাপ রুখতে হয়েছিল।

নরকপিং-এ ফ্রান্সের শুরুটা চমৎকার। ৭-৩ গোলে তারা প্যারাগুয়েকে হারাল এবং পাঁচটি গোল করে তারা দ্বিতীয়ার্ধে, তার মধ্যে ফনটাইনের তিনটি। প্যারাগুয়েই আগে গোল দেয় আনারিলা দ্বারা। বিরতির সময় ২-২ হয়। তারপর ফ্রান্সের ইনসাইড ফরোয়ার্ড কোপা, ফনটাইন ও রজার পিয়ানটনির শক্তির কাছে প্যারাগুয়ে দাঁড়াতেই পারেনি।

ভ্যাস্টেরাস-এ স্কটল্যাণ্ড বেশ খেলল যুগোশ্লেভিয়ার বিরুদ্ধে এবং ১-১ করল। তাদের প্রধান তারকা ছিলেন ৩৫ বছর বয়সী রাইট হাফ এডি টার্নবুল। গ্রেণ, লিডহোম, গুয়ার্ণ্টার ও টার্নবুল—এঁদের দেখে মনে হল সুইডেনের বিশ্বকাপ নিতান্তই বুড়োদের খেলা। প্রাক্তন লেফট ইন টার্নবুল সেণ্টারে খেললেন। কিন্তু বিশ্বকাপে প্রথম ও একমাত্র ম্যাচে তিনি দর্শকদের স্মৃতিচারণের বিষয় হয়ে রইলেন।

টেকনিকে যুগোশ্লাভিয়া অনেক এগিয়েছিল স্কটল্যাণ্ডের তুলনায়। শুরুতে যুগোশ্লাভিয়া এমন খেলছিল যে, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলার মতই তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেছে স্কটল্যাণ্ডকেও। সেণ্টার ফরোয়ার্ড মিলস মিলুটিনোভিকের খেলা তখন তুঙ্গে। তাঁকে ভীষণ সাহায্য করলেন ময়লা দোহারা চেহারার লেফট ইন ড্রাগোশ্লাভ সেকুলারাক ও উইং হাফ বসকভ। তিনজন মিলে ঘন ঘন হানা দিতে থাকলেন স্কটল্যাণ্ডের গোলের দিকে। এক সমালোচক ওই খেলা নিয়ে বললেন, শুরুর দিকের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল স্কটরা জুনিয়র এবং

তারা সিনিয়রদের (যুগোশ্লাভ) কাছে খেলার পাঠ নিচ্ছে। রাইট উইঙ্গার পেটাকোভিকের শট পরক্ষণেই পরাস্ত করল স্কটল্যাণ্ডের গোলরক্ষক টমি ইয়ঙ্গারকে। মিলুটিনোভিকের পাস তারপর এরিক কালডো কার্যকর হতে দেননি। ইয়ঙ্গার উপর্যুপরি কয়েকটি অবধারিত গোল বাঁচালেন।

দ্বিতীয়ার্ধে স্কটল্যাণ্ডের তরুণদল দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বিপুল উদ্দীপনায় চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকল যুগোশ্লাভিয়াকে। পেটাকভিকের একটি শট বিপক্ষের বারে লেগে ফিরতেই টার্নবুল ক্রশপাস দিলেন বেয়ারাকে, তারপর গোলমুখে ক্রিষ্টিক খেই হারান। কিন্তু মারের হেডে ১-১ হয়ে গেল। যদিও যুগোশ্লাভিয়ার ভ্যাসেলিনোভিকের জোরালো শট পোস্টে লাগলেও মাঠে এই সময় তাদের আধিপত্য হ্রাস পেয়েছে। ফরাসী সমালোচক বললেন, জাগ্রেব ও বেলগ্রেডের শিল্পীরা এডিনবরা ও গ্লাসগোর গ্রাম্য মিস্ত্রীদের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে গেল।

স্যাণ্ডভিকেনে এক নম্বর গ্রুপের খেলায় হাঙ্গেরি-ওয়েলস্ ড্র হল। হাঙ্গেরি ম্যাচ শুরুর আগে আধঘণ্টা শুধু ওয়ার্ম আপ করে নিল। কিন্তু মাঝে তাদের ডিফেন্সের খেলা আগুন হয়ে উঠছিল। চতুর্থ মিনিটে জোসেফ বোজসিক গোল দিলেন। ওয়েলসের গোলরক্ষক কেলসি রোদের জন্য বল দেখতেই পেলেন না। একবার জন চার্লস লাফিয়ে হেড দিয়ে হাঙ্গেরির কর্ণার থেকে একটি গোল বাঁচান।

গটেবার্গে তখন ইংল্যাণ্ড-ব্রাজিলে প্রথম দেখা বিশ্বকাপে। ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রগুলির দৌলতে ইংল্যাণ্ড দলে কোনো পরিবর্তন করা গেল না। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যাঁরা খেলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আহত ফিনে-র বদলে এ' কোর্টকে নেওয়া হল। তাদের দলে পরের ম্যাচগুলিতেও পরিবর্তন হয়নি ওয়াল্টার উইণ্টারবটমের জন্যই। নির্বাচকমণ্ডলীর উপর তাঁর প্রভাব ছিল ভীষণ, তবুও উইণ্টারবটম সর্বদা নির্বাচকদের মতামত নিতেন। পার্ক এভিনি-উয়ের লবিতে এক নির্বাচক বললেন, "আমি চার্লটনকে নিতে চাই।" তারপর কমিটির সভায় তাঁর নাম উঠল, দলেও এলেন তিনি। চার্লটন হঠাৎ দলে এলেও খেলার সময় তাঁর নাম না থাকায় অনেকে মনে করলেন, আসলে তিনি নির্বাচিতই হননি। বিশ্বকাপের খেলায় চার্লটন এবার নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেও পরবর্তী বিশ্বকাপে তাঁকে বাদ দিয়ে জাতীয় দল গড়া সম্ভব ছিল না।

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের বুদ্ধি ও কুশলতাই পরাজয় থেকে রক্ষা করে। অবশ্য এজন্য অধিকাংশ কৃতিত্ব টটেনহাম হসপারের কোচ (পরে ম্যানেজার)

বিল নিকলসনের। নিকলসন এর আগে ব্রাজিলিয়ানদের খেলা দেখে তাদের স্ট্রাটেজি ও পদ্ধতি বুঝে নিয়ে তা নিজের ছেলেদের বলে দেন। ওয়েস্ট ব্রমউইচের রাইট ব্যাক লম্বা ডন হো সেইভাবে কাজও করেন, অবশ্য তাঁর ধারেই ছিলেন সেণ্টার হাফ বিলি রাইট। অ্যাটাকিং ফুলব্যাকের দায়িত্ব উলভস হাফব্যাক এডি ক্ল্যাম্পের উপর। আর ডিডি-র সামনে আর এক উলভস বিল স্ল্যাটার।

ব্রাজিলের আক্রমণে পেলে ও গ্যারিঞ্চাকে তখনও যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যদিও ম্যাজোলার ধারেই ছিলেন ভাভা। এঁদের স্কিমেই ব্রাজিল শক্তি পেল। প্রথমার্ধে ব্রাজিলের প্রাধান্য দেখা গেল। ডিডি ও অ্যাটাকিং রাইট হাফ টেঁকো ডিনো মাঝমাঠে একাধিপত্য বজায় রাখলেন। ভাভার শট বারে লাগল। ক্ল্যাম্প বাঁচালেন গোললাইন থেকে বল মেরে। ম্যাজোলার দুটি হেড রক্ষা করলেন কলিন ম্যাকডোনাল্ড।

দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যাণ্ড খেলার ধারা বদল করল এবং জেতার মতই খেলল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের পেনাল্টি পাওয়া নিয়ে অনেকেই বলেছিলেন, ফাউলটি পেনাল্টি বক্সের বাইরেই হয়েছিল, কিন্তু ইংল্যাণ্ডই হতভাগ্য ছিল। হাইনের চমৎকার পাস ধরতে গেলে বেলিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন কেভানের উপরে।

কিন্তু মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ইংল্যাণ্ডের আক্রমণভাগ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যেমন ম্লান ফুটবল খেলেছিল, তেমনি খেলল আজও। তাদের আরও পাণ্ডুর করে তোলে ফিনে-র অনুপস্থিতি। তবুও ইংল্যাণ্ডের ডিফেন্স দারুণ খেলল। বল্টনের লেফট ব্যাক টনি ব্যাঙ্কসের এমন খেলা আগে কখনও দেখা যায়নি। একবার ডন হো আকাশে বল মারতেই ব্যাঙ্কস তাতে এমনভাবে ছোঁ দিলেন যে, প্রত্যেক ব্রাজিলিয়ানই তা ঈর্ষার চোখে দেখলেন।

বোরাস-এ ইলিয়ান ও ভ্যালেটিন ইভানভের গোলে রাশিয়া ২-০ জিতল অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দিল।

আয়ারল্যাণ্ড অত্যন্ত খারাপ খেলল আর্জেণ্টিনার বিরুদ্ধে এবং ৩-১ গোলে হেরে গেল হ্যামস্টাডে। আইরিশরা আর্জেণ্টিনার রাফ ও টাফ খেলায় বেশ হকচকিয়ে গেলেন। তাঁরা আরও অবাক হলো সুড়ঙ্গের মধ্যে ওঁদের একদল বেঁটেখাটো মোটাসোটা লোকের সঙ্গে দেখে। বেঁটেরা আইরিশদের দেখে সারাক্ষণ হেসেছে আর দর্শকদের মধ্যে মেয়েদের দেখে হাত তুলে ডাকাডাকি

করেছে। পরে ওই মেয়েদেরই কয়েকজনকে আর্জেন্টিনার হোটেলে ড্রেনপাইপ বেয়ে উঠতে দেখা যায়।

যাই হোক পিটার ম্যাকফারল্যাণ্ড তৃতীয় মিনিটে যখন বিংহোমের ক্রশে হেড দিয়ে গোল করলেন, তখন তাদের দ্বিতীয় জয় সম্পর্কে অনেকেই আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু এর পরেই আর্জিন্টিনার শুধু স্কিলই আইরিশদের পদানত করে। তারা আর মাঝমাঠে দাঁত বসাতেই পারেনি। ডোগানের বদলে হঠাৎ কয়েল নামায় খেলার উন্নতি পরিলক্ষিত হল না। ড্যানি ব্লাঞ্চফ্লাওয়ারের বুদ্ধিমত্তার তেমন কাজ দিল না। তাঁর উচিত ছিল মাঝমাঠে রসি ও ল্যাক্রুনার কাছে বল পাঠানো। ওঁরা ওখানে কর্তৃত্ব করছিলেন। কিন্তু তার বদলে ব্লাঞ্চফ্লাওয়ারের বল ডিফেন্সে যেতে থাকে। পিটার ডোহার্টির বোঝা উচিত ছিল তাঁদের রাইট হাফ এখন যেন রাইট ব্যাকেরই সামিল। দুই স্টপারের ডিফেন্সের বিরুদ্ধে আইরিশদের ট্যাকটিকস কাজে এল না।

একথাও ঠিক আইরিশদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। শুরুর আধঘণ্টা পরে বল ভিজে ঘাসে পড়ে লাফিয়ে কানিংহামের হাতে লাগে এবং পেনাল্টি থেকে কোরবাট্টা গোল দেন। হ্যারি গ্রেগেরও তখন খেলা অনেকটা পড়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে মেনেডেজ-এর গোল দেওয়ার সময় হ্যারি গোল থেকে অনেক দূরে ছিলেন। কোরবাট্টার দেওয়া দলের তৃতীয় গোলটি হ্যারি বুঝতেই পারেননি।

হালসিংবর্গে পশ্চিম জার্মানী হ্যান্স শেফারকে উইং থেকে লেফট ইনে নিয়ে গেল। তারপর তিনি 'গোলমেলে' গোল দিলেন, আর তাই-ই খেলার মোড় ফিরিয়ে দিল। প্রাণবন্ত চেকোশ্লোভাকিয়া পড়ল ঝিমিয়ে। জার্মানী ২ গোলে পিছিয়ে ছিল। তারা ১-২ করে, যখন শেফার গোললাইনে চেক গোলরক্ষক ডোলেজসি-কে চার্জ করেন। রেফারি গোলটি বাতিল করেননি। ২-২ হয় হেলমুট রানের গোলে।

ভ্যাস্টোরাস-এ অঘটন ঘটে গেল। ফ্রান্স ২-৩ গোলে হেরে গেল যুগোশ্লাভিয়ার কাছে ফনটাইনের দুটি গোল সত্ত্বেও। আসলে ফ্রান্সের ডিফেন্স এদিন বেশ দুর্বল ফুটবল খেলেছে যদিও সেণ্টার হাফে বব জঁকোয়েটের মত নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন। ডিফেন্স কাজে লাগাতে পারেনি উইসনিস্কি ও জঁা ভিন্সেটের মত উইঙ্গারদের। আবার ফনটাইনকে ফাউল করা সত্ত্বেও পেনাল্টি দেওয়া হল না। এসব মিলিয়েই ফ্রান্স হারল। ওদিকে যুগোশ্লাভিয়ার ভ্যাসেলিনোভিক সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন ও দুটি গোল করেন।

খেলা শেষের তিন মিনিট আগে ফ্রান্সের একটি গোল নাকচ হলে যুগোশ্লাভিয়ার জয়ের সুযোগ আসে। তারা শেষ তিন মিনিট ফ্রান্সকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। লেফট ব্যাক রজার মার্শের ভুলে ভ্যাসেলিনোভিক দ্বিতীয় গোলের সুযোগ পেলেন।

যুগোশ্লোভিয়ার বিরুদ্ধে খেলার পর আয়ারল্যাণ্ডকে চিন্তিত মনে হচ্ছিল। নরকপিং-এ তারা ২-৩ গোলে হারল প্যারাগুয়ের কাছে। ইতালীয় ফুটবলের অভিজ্ঞতা নিয়ে সিলভিও প্যারডি ফরোয়ার্ডে আধিপত্য বজায় রাখলেন। সেণ্টার হাফে বেশ খেললেন ববি ইভান্স। উল্লেখ্য, এই রাউণ্ডে কোনো ব্রিটিশ দলই জিততে পারল না। স্টকহমে ওয়েলস্ ১-১ করল মেক্সিকোর সঙ্গে খুব খারাপ খেলে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ফরওয়ার্ড কালন ওয়েবটার সম্পর্কে সব সময় চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, "প্রতিবারই তুমি ওদের একজনকে ল্যাং মারছ।" কিন্তু কেলসি বল নিয়ন্ত্রণ ও ফিটনেস দ্বারা সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেন।

ওই স্টেডিয়ামে সন্ধ্যার খেলায় সুইডেন জিতল হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে। হাঙ্গেরির লাজো টিশির দারুণ ডান পায়ের শট সকলের প্রশংসা কুড়োল আর সুইডেনের কুরে হ্যামারিনের মারাত্মক 'ফিনিশিং' মনোহরণকারা ছিল।

হাঙ্গোর হিদেকুটিকে বাদ দিয়ে ডিপ সেণ্টার ফরোয়ার্ডে বোজসিককে খেলাল। বোজসিক ভাল খেললেও খুশি ছিলেন না। সুইডেনের দুই ইনসাইড ফরোয়ার্ড গ্রেণ ও লিডহোম এবং দুই উইঙ্গার হ্যামরিন ও স্কোগ্লাণ্ডে-র জুড়ি কেউ ছিলেন না। প্রথম গোলটির জন্য স্কোগ্লাণ্ড দুজনকে কাটিয়ে পাস দেন হ্যামারনকে (১-০)। দ্বিতীয়ার্ধে শুরুর দশ মিনিট পরে টিশির জোরালো শট ক্রশবারে লাগে। স্ট্যাণ্ড থেকে মনে হচ্ছিল গোলই হয়েছে। কিন্তু খেলা চলতে থাকে। আধমিনিট বাদে হ্যামারনের লব গ্রসিকসকে পরাস্ত করলে ২-০ হয়। লিডহোম পেনাল্টিতে গোল দিতে পারলেন না। এরপর টিশির ড্রাইভে হাঙ্গেরি ২-১ করে। খেলা শেষে রেনর বললেন, "আমাদের ডিফেন্সকে খুব ছোটাছুটি করতে নিষেধ করি।" স্কোগ্লাণ্ড ম্যাট্রের সঙ্গে হট্টগোল শুরু করলেও পরদিন বলেন, "আমরা এখানে সার্কাসের লোক হয়ে আসিনি।"

হালসিংবর্গে রাউণ্ডের শেষ ম্যাচে চেকোশ্লোভাকিয়া যেন ৬-১ গোল দিয়েও প্রতিহিংসার সমাপ্তি ঘটাতে পারেনি। আর্জেন্টিনার এই শোচনীয়

পরাজয় আর্জেণ্টিনার ফুটবলে কিছুটা মোড় ঘুরিয়ে দেয়। চেকোশ্লোভাকিয়া এই খেলায় তাদের এমনভাবে কোণঠাসা করে রেখেছিল যে, সমালোচকরা বলতে থাকেন, ফুটবল এত ধীর গতির হতে পারে? ১৯৩০-র বিশ্বকাপেও ওরা এই সমালোচনার যোগ্য উত্তর দিতে পারেনি।

চেকদলের সেণ্টার হাফ পপলাহার খেললেন বিশ্বকাপে দ্বিতীয় ম্যাচ। তিনি আর্জেণ্টিনাকে যেন পুতুলের মত নাচাচ্ছিলেন। এক সমালোচক বললেন তাঁর সম্পর্কে, তিনি যেন হোটেলের বাইরে হেড টেনিস খেলছেন। জার্মানীর সঙ্গে বোরোভিকা খেলেননি। আইরিশ ম্যাচের সময় তিনি ড্রেসিংরুমে ভীষণ ঝগড়া করেন, কিন্তু এদিন মলনার-এর সঙ্গে বেশ খেললেন। অত্যন্ত সফল রাইট আউট হোভোরকা দুটি গোল দেন। আরও দুটি দিলেন লেফট আউট জিকান। কোরবাট্টার পেনাল্টি থেকে আর্জেণ্টিনা একটি গোল শোধ দেয়। কোরবাট্টা, মেনেনডেজ ও ভারাকা ছাড়া আর কেউ তেমন খেলতে পারেননি। গোটা দলকে গতিহীন ও 'আনফিট' মনে হয়েছে।

আর্জেণ্টিনার ম্যানেজার ও ১৯৩০-বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা গুইলারমো স্ট্যাবিল চেক ম্যানেজার কলস্কি-র দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "আপনার চেকোশ্লোভাকিয়ার মত এমন সুন্দর দল কখনও দেখিনি। আপনাকে অভিনন্দন, ও দলের সাফল্য কামনা করছি।"

আর্জেণ্টিনা দল যখন বুয়েনস্ আয়ার্স বিমানবন্দরে অবতরণ করল ওঁরা বুঝতেই পারেননি অমনভাবে অপমানিত হবেন। ক্রীড়ামোদীরা এত রেগেছিলেন যে, খেলোয়াড়দের দিকে রাবিশ ছুঁড়তে লাগলেন। একে শোচনীয় পরাজয়, তদুপরি দেশে ফিরে অবমাননা। দলের প্রত্যেকের মনকে ভীষণভাবে আহত করল। ভবিষ্যতে দেখা যায় এরই ফলশ্রুতি। তারা পুরোন প্রথা 'দর্শনীয় ও শৈল্পিক' খেলা ছেড়ে নেতিবাচক ফুটবল বাদ দিয়ে রাফ ও টাফের দিকে ঝুঁকল।

মালমো-তে হাজার হাজার সমর্থকদের উপস্থিতিতে পশ্চিম জার্মানী ২-২ করল উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে। আইরিশ গোলরক্ষক হ্যারি গ্রেগ ভীষণ লড়লেন ও লেফট আউটে ম্যাকপারল্যাণ্ড প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন।

আইরিশ খেলোয়াড়রাই অবাক হয়ে গেলেন তাঁদের লেফট হাফ টমি কেসি-কে সেণ্টার ফরোয়ার্ড খেলানোয়। কেসি-র দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিজের বাছা পজিশন অপেক্ষা নতুন পজিশনে আরও ঔজ্জ্বল্য এনে দিল। ২০ মিনিটের

মধ্যে আয়ারল্যাণ্ড এগিয়ে গেল বিংহাম সেণ্টার করলে। কুশ বল নিয়ে গেলেও হারকেনরাথকে পরাস্ত করার আগেই ব্যর্থ হলেন। কিন্তু ম্যাকলরি বল ধরে ম্যাকপারল্যাণ্ডকে দিতেই ১-০ হয়।

নিউক্যাসল ইউনাইটেডের প্রধান শক্তি ব্যাক ডিক কিথ লাল চুলের আলফ ম্যাকমিচেল জার্মান উইঙ্গারদের সঙ্গে বেশ যুঝলেন, খুদে বার্টি পিপক মাঝমাঠে দুর্ধর্ষ ছিলেন। গতবারের কাপ বিজয়ী পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড আশাতীত ভাল খেলল রান কয়েক মিনিট পরে গোল শোধ (১-১) দিলেও। গ্রেগের গোড়ালিতে ভীষণ আঘাত লাগল, তবুও জার্মানীর বুটের মধ্যে তিনি অকুতোভয় রইলেন। কেসি-র ডান পায়ে হাঁটুর নিচে আটটি সেলাই সত্ত্বেও তাঁকে খেলা থেকে বিরত করা গেল না। এক ঘণ্টা পরে আয়ারল্যাণ্ড আবার এগিয়ে গেল। বিংহাম কর্ণার-কিক্ করে দিলেন কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা কুশকে। কুশের ক্রশপাস গেল ম্যাকরয়ের পায়ে। ম্যাকপারল্যাণ্ড তাঁর কাছ থেকে বল পেয়ে ২-১ গোলে এগিয়ে দিলেন উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে।

সমাপ্তির বারো মিনিট আগে ত্রিশ গজ দূর থেকে উয়ে জিলার ২-২ করলেন। কিন্তু শেষের মিনিটগুলিতে আইরিশরাই বল নিয়ে জার্মানদের গোলমুখেই রইলেন। সমাপ্তির বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেগকে বিপুল অভিনন্দন জানানো হল। মালমাওয়ে আয়ারল্যাণ্ড-চেকোশ্লোভাকিয়া প্লে-অফ্ ম্যাচে আয়ারল্যাণ্ড ২-১ গোলে জিতল।

গেটেবার্গে ব্রাজিল চমক দেখাল রাশিয়ার বিরুদ্ধে। তারা ২-০ কেন, এর দ্বিগুণ বা তিনগুণ গোলের ব্যবধানেও জিততে পারত। বিস্ময়কর ফুটবল দেখালেন পেলে, বোঝা গেল গ্যারিঞ্চাও অনমুকরণীয়।

পেলে গত একবছর আন্তর্জাতিক ফুটবলে এসেছেন। মিনাস জেরিয়াস রাজ্যের ট্রেস কোরাকোসের এক দরিদ্র নিগ্রো পরিবারে এই স্ট্রাইকিং ইনসাইড ফরোয়ার্ডের জন্ম। বাল্যে ব্রাজিলের এক আন্তর্জাতিক ফরোয়ার্ড ডে ব্রিটো তাঁকে প্রশিক্ষণ দেন। তিনিই পেলেকে স্যাণ্টোস ক্লাবে নিয়ে যান, কৃষ্ণকায় ছেলেটি সেখানে অসামান্য ক্ষমতা দেখায়। উচ্চতা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, ওজন সাড়ে দশ স্টোন, যেমন চমৎকার পেশীবহুল দেহ, তেমনি অদ্ভুত গোলদাতা। জিমন্যাস্টের মত কর্মচঞ্চল কিন্তু ভীষণ নম্রস্বভাবের, অথচ বল পায়ে পড়লে প্রতি মুহূর্তে যাদু দেখান। ডান পায়ে দারুণ শট, আর লাফিয়ে ওঠেন অনেক উঁচুতে

এবং লটনের মত হেডে পারদর্শী। মাঠে খেলার সময় যত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা যুদ্ধই হোক, খেলা যত তুঙ্গেই উঠুক, পেলে মানস সরোবরের মত ধীর স্থির থাকেন এবং খেলেন অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়।

পরবর্তী দশকে এই পেলের মুখ বিশ্বময় পরিচিত হয়। কোনোদিন তার মুখ থেকে শিশুর সারল্য লুপ্ত হয়নি। ব্রায়ান গ্লানভিলের ভাষাতেই বলি :

He was no saint, in years to come his policy under provocation was much more the Old Testament one of an eye for an eye than the New Testament's turning the other heek, but somehow the image remained untarnished, the pristine appeal untouched.

খেলোয়াড়দের অধিকাংশের অনুরোধে গ্যারিঞ্চা দলভুক্ত হলেন। নিল্টন স্যাণ্টোসের নেতৃত্বে ফিওলার কাছে ডেপুটেশন যায় তাঁকে দলে নেওয়ার জন্য। ফিওলা ওঁদের অনুরোধ রাখলেন। কিক-অফের আগে যখন ব্রাজিল সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো, নিল্টন স্যাণ্টোস তাকালেন গ্যারিঞ্চার দিকে—'তুমি আমার মুখ রেখো।' সদাহাস্যময় গ্যারিঞ্চা উত্তর দিলেন—'তুমি লাইন্সম্যানের দিকে তাকাও, লাইন্সম্যানটা ঠিক চার্লি চ্যাপলিন।' তিনি নিল্টনকে বোঝালেন তিনি কতটা চিন্তামুক্ত ও স্বাভাবিক রয়েছেন।

গ্যারিঞ্চার খেলার তোড়ে তাঁর বিপক্ষ খেলোয়াড় রাশিয়ার কুজনেতসভের সব কলাকৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল। শুরু থেকেই গ্যারিঞ্চার অতুলনীয় সোয়ার্ভ এবং সারামাঠ জুড়ে খেলা কুজনেতসভকে নাস্তানাবুদ করতে থাকে। প্রথমেই গ্যারিঞ্চা গগনে গগনে খেলে তাঁকে পরাস্ত করলেন, তারপর শটে এবং অবশেষে বাঁদিকের পোস্টে তাঁর বল ধাক্কা খেল। এরপর পেলের মার ডানদিকের পোস্টে লেগে ফিরল। এর তিন মিনিট পরে ডিডি ঠাণ্ডা মাথায় বল নিয়ে রাজকীয় ভঙ্গীতে একদল রুশ রক্ষণব্যূহের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং পাস দিলে ভাভাকে। ভাভা গোল দিতে ভুল করেননি।

ডিডি এবার জাতীয় দলে স্যাণ্টোসের রাইট হাফ জিটোকে যোগ্য জুড়ি রূপে পেলেন। জিটো এলেন ডিনো-র বদলে। ব্রাজিলের ডিফেন্স বেশ শক্ত হল না শুধু, তাঁরা এগিয়ে গিয়ে গোলের সুযোগও নিতে থাকেন। জিটো এই প্রতিযোগিতায় সেরা হাফব্যাক পরিগণিত হলেন।

রাশিয়ার ঘাবড়ে যাওয়া ডিফেন্স তের মিনিট পর্যন্ত কোনোরকমে ঠেকিয়ে

রেখেছিল। তারপর ভাভা ও পেলে বল দেওয়া-নেওয়া করতেই ওদের রক্ষণভাগ তছনছ হয়ে যায়। একবার গ্যারিঞ্চাকে ঘিরে ধরেন পাচ'ন রুশ খেলোয়াড়। কিন্তু তাঁরা বল কেড়ে নিতে পারেননি। আসলে প্রতিভাবানরা সহজেই বোধ হয় সব বাধা অতিক্রম করতে জানেন।

বোরাসের নিম্নাঞ্চলে ইংল্যাণ্ড অতিকষ্টে প্রাণবন্ত অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ড্র করল। অষ্ট্রিয়া এই খেলায় দুবার এগিয়েছিল। রেফারি নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিলে এদিন জয় হতো ইংল্যাণ্ডের। কিন্তু নৌবাহিনীর অফিসার (রেফারি) ব্রিটিশ নাগরিক জানালেন বল গোলে প্রবেশ করেনি। হাইনেরও উচিত ছিল কেভানকে দিয়ে আরও গোলের চেষ্টা করা। অষ্ট্রীয় স্টপার হ্যাপেলকে কাবু করলেই ওই উদ্দেশ্য সফল হত। ৫৬ মিনিট পরে হাইনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম গোলটি দেন। দ্বিতীয়টি কেভানের দেওয়া। অষ্ট্রিয়ার দুটি গোলই আসে দর্শনীয়ভাবে কলার ও কোয়েরনারের লম্বা শট থেকে।

দুই নম্বর পুলে (বা গ্রুপ) ফ্রান্স হারায় স্কটল্যাণ্ডকে, কিন্তু জিততে দারুণ লড়াইয়ে নামতে হয়েছিল। দুটি দলই গোলরক্ষক বদল করে। ডানডির (পরে স্পারসের) বিল ব্রাউণ ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে কোপা ও ফনটাইনের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়োলেন। ফ্রান্সের রেমেটারের বদলে আবেস গোলে এলেন। ফনটাইনের ক্রশপাসে কোপা ভলি মারতেই বল চলে গেল নিজেদের দিকে। তারপর বল দেওয়া-নেওয়া করে ফ্রান্স আবার এগিয়ে গেল, কিন্তু স্কটল্যাণ্ড প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা প্রতিহত করল ওই আক্রমণ। মারের মার আবেস সুন্দর-ভাবে ঠেকালেন। জকোঁয়েট ও রাইট হাফ আর্মণ্ড পেঁভার্ণ ফাউল করলে জন হিউইয়ের পেনাল্টি-কিক্ পোস্টে লেগে ফিরে আসে।

প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে ফনটাইন জকোঁয়েটের কাছ থেকে বল পেয়ে ২-০ করেন। দ্বিতীয়ার্ধেও ফ্রান্স খেললেও একটু ঢিলেঢালা মনে হচ্ছিল তাদের। বেয়ার্ড সেই সুযোগ নিয়ে স্কটল্যাণ্ডের পক্ষে একটি গোল দিয়ে ২-১ করলেন।

একিলস্টুনায় যুগোশ্লাভিয়ার খ্যাতনামা গোলরক্ষক ভ্লাদিমির বেয়ারা প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম ম্যাচ খেললেন। ফল ৩-৩ হল এবং প্যারাগুয়ে তিনটি গোলই দিতে পেরেছিল বেয়ারার দোষেই। প্যারাগুয়েনরা তিনবার যুগোশ্লাভদের গোল শোধ করে। এদিনও প্যারাগুয়েকে উৎসাহদানের মূলে ছিলেন প্যারডি। যুগোশ্লাভরা খেলে প্রধান হাতিয়ার মিলুটিনোভিক-কে বাদ রেখে, তবুও তাদের কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া আটকানো গেল না।

কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য প্লে-অফ্ ম্যাচ: গোলের হিসাবেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় তিনটি ব্রিটিশ দলকে প্লে-অফ্ ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হল, কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে গেল দুটি দল। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ঘটল গেটেবার্গে—ইংল্যাণ্ড ০-১ গোলে হারল রাশিয়ার কাছে। একগুঁয়েমিই হোক আর বোকামিই হোক ইংল্যাণ্ড চার্লটনকে বাদই রাখল, বরং ফরোয়ার্ডে এলেন দুটি নতুন মুখ। একজন চেলসি-র রাইট উইঙ্গার পিটার ব্রাবুক, আর একজন উলভসের রাইট ইন অত্যন্ত পরিশ্রমী পিটার ব্রডবেণ্ট। এ নিয়ে জর্জ রেনর বললেন: "আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলায় আমরা কখনও এ ধরনের নতুন খেলোয়াড়কে মাঠে নামাইনি, তবে অমনটি করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। সেণ্টার ফরওয়ার্ড আগ্নে সিমোনসনের কথাই বলি। জাতীয় দলে নেওয়ার আগে বারো বার আমি ওকে দেখে তবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।"

ইষদুষ্ণ আবহাওয়ার উলেভিতে ইংল্যাণ্ডের পরাজয়ের কোনো কারণই ছিল না। যদিও হাইনেসকে স্পর্শ করার মত ক্ষমতা কারুর ছিল না, তবুও তিনি আবার ভীষণ খারাপ খেললেন। ব্রাবুকের শট দুবার বারে লেগে ফিরল। আর ইলয়িন আটষট্টি মিনিট বাদে একটিই সুযোগ পেলেন ও গোল দিলেন। ম্যাকডোনাল্ডের কোনো দোষ ছিল না, যদি তিনি অসাবধান হয়ে থ্রো-টি না করতেন। আর এইজন্যই তো রাশিয়া এগিয়ে গেল।

আশ্চর্য খেলল হতমান আয়ারল্যাণ্ড। যে চেকোশ্লোভাকিয়া আর্জেন্টিনাকে নাস্তানাবুদ করেছিল—মালমো-তে সেই চেকদল হারল আয়ারল্যাণ্ডের কাছে। পিটার ডোহার্টির কথা কাজে পরিণত হল।

গোলে নরম্যান আপরিচার্ড এলেন গ্রেগের বদলে। আহত টমি কেসির জায়গায় প্রথম জাতীয় দলে এলেন জ্যাকি স্কট। কিন্তু আপরিচার্ড আহত হলেন, আহত পিককও। চেকোশ্লোভাকিয়া ১-০ এগিয়ে। অতিরিক্ত সময়েই আয়ারল্যাণ্ড জেতে। অতিরিক্ত সময়ের খেলা শুরুর আগে বিলি বিংহামের পরামর্শ আয়ারল্যাণ্ডের কাজে লাগল। বিলি দেখেছিলেন চেকদের মত আইরিশরাও শ্রান্ত ও ক্লান্ত। কিন্তু তাঁর সঞ্জীবনী মন্ত্রে ওরা যেন নতুন শক্তি পেল।

১৯ মিনিটের সময় জিকানের গোল চেকোশ্লোভাকিয়াকে এগিয়ে দেয়। বিরতির পরমুহূর্তে কৃশ অপ্রতিরোধ্য ম্যাকপারল্যাণ্ডের দুটি জোরালো শট

আটকালেও তৃতীয়টিতে পরাস্ত হলেন। ১-১ হল। অতিরিক্ত সময়ের নবম মিনিটে জি ম্যাকপারল্যাণ্ড ভলি মারলেন ড্যানি ব্লাঙ্কফ্লাওয়ারের ফ্রি-কিকে। আয়ারল্যাণ্ড ২-১ গোলে জিতল। ওরা ফ্রি-কিক্ পায় বুবেরনিকের ফাউলে। স্টকহমে ওয়েলস্ হারিয়ে দিল হাঙ্গেরিকে এবং তাও অতিরিক্ত সময়ে। এই ম্যাচেও সিপস নৃশংসভাবে হিউইটকে লাথি মারায় মাঠের বাইরে যান।

টিশি-র একটি শট হাঙ্গেরিকে প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে দেয়। আইভর অলচার্চ চল্লিশ গজ দূর থেকে দারুণ ভলি মেরে ১-১ করেন। টেরি মেডউইনের জয়সূচক গোল আরও দর্শনীয়। গ্রসিকস আস্তে করে সারোশিকে গোল-কিক্ মারলে মেডউইন সেটি ছিনিয়ে নিয়ে গোলে পাঠান।

কোয়ার্টার ফাইনাল: কোয়ার্টার ফাইনালে একটিও ব্রিটিশ দল টিকে থাকতে পারেনি। তবে শক্তিধর জন চার্লস ছাড়াই গেটেবার্গে ওয়েলস্ ব্রাজিলকে বেশ বেগ দিয়েছিল। চার্লস থাকলে হয়ত শুরুতেই সুযোগ নিতেন, কিন্তু তাঁর সহকারী ওয়েবস্টার ততটা কুশলী ছিলেন না।

তা না করে ওয়েলস্ ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করেই চলল এবং বিপদেও পড়ে। ওদিকে ভাভার জায়গায় ম্যাজোলা খেললেন। গ্যারিঞ্চার সঙ্গে চমৎকারভাবে মোকাবিলা করলেন মেল হপকিন্স। ওয়েলসের অধিনায়ক ডেভ বাউয়েনের উৎসাহে রাইট ফ্লাঙ্কে স্টুয়ার্ট উইলিয়মস ও ডেরেক সুলিভানকে সারাক্ষণ লড়তে দেখা গেল। ওঁদের পিছনে অর্থাৎ গোলে জ্যাক কেলসিকে বল ভেদ করা সহজ ছিল না। প্রত্যেকটি বল ধরার পর বিনয়ের সুরে তাঁকে বলতে শোনা যায়: চুইং গাম। সব সময় চুইং গাম খাবে, আর মাঝে মাঝে আমার হাতে ছুঁড়ে দেবে। আর হাতে ঘষে দেবে, দেখবে কোনো বলই ফস্কাচ্ছে না।

পেলে সম্পর্কে বলা হয়—এই ম্যাচে ঠিক ষাট মিনিটের সময় যেভাবে শক্তি প্রয়োগ দ্বারা ওয়েলসের রক্ষণব্যূহ ভেদ করেছিলেন তেমনটি নাকি জীবনে করেননি। পেলের ভাগ্যও বলতে হবে। তা না হলে নিখুঁত উইলিয়মস যে বল কখনও আটকাতে ব্যর্থ হন না, তা কেন তা তাঁর পা থেকে ফস্কাবে? এবং কেন কেলসিই বা ধরতে পারবেন না? ওয়েলসও সুযোগ পেয়েছিল একবার তো ব্রাজিলের গোলমুখে হলুদ জার্সিপরা তাদের শরীরগুলি স্তূপীকৃত

হয়ে পিরামিডের মত দেখাচ্ছিল। তবুও ওয়েলস গোল করতে পারেনি। কিন্তু সেদিন যদি জন চার্লস ওই সময় ব্যর্থ হতেন, তবে তখনই ওর ছোট ভাই মেল চার্লস সে সুযোগ নিতেন।

ক্ষতবিক্ষত আয়ারল্যাণ্ড শুধু চিন্তিতই ছিল না। তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল একটি বাজে কোচে ভ্রমণ। তবুও তারা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়ে লড়েছিল, কিন্তু ফ্রান্সের আঘাতে আয়ারল্যাণ্ড বিধ্বস্ত হয়। খেলার আগের দিন দু'শ' দশ মাইল মোটরে করে নরকপিং যাওয়া প্রত্যেক আইরিশের মধ্যে ক্লান্তি এনে দেয়। এতবড় খেলার পক্ষে ওই মোটর-ভ্রমণ নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত ছিল না। তারা প্রস্তুতও হতে পারেনি। শুধু তাই নয়—দলে অনুপস্থিত গ্রেগ ও পিকক। তাঁদের গ্রন্থি ছিন্ন। আহত কেসি-ও দলের দুর্বলতাই বাড়ালেন। আয়ারল্যাণ্ড একটিই সুযোগ পেয়েছিল শুরুতে। সেই সুযোগ যদি তারা কাজে লাগাত দলের মধ্যে যাদু ঘটে যেতে পারত তখনই। ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার যেই থ্রো করলেন বিংহামের মাথায়, তিনি সেটি বাড়ালেন ম্যাকরয়ের কাছে। কিন্তু ম্যাকরয় শুটিং-এর বদলে স্কোয়ার পাস দিলেন। এই সেই শুভক্ষণ। অথচ ম্যাকপারল্যাণ্ড মাঝপথে যেন হারিয়ে গেলেন। ফ্রান্সের উইসনিস্কি বিরতির একটু আগে ১-০ করলেন আর আয়ারল্যাণ্ড যেন বিধ্বস্ত হয়ে গেল। বিরতির পরে ফনটাইন দুটি ও পিয়ানটনি একটি গোল দিলেন।

স্টকহোমে সুইডেন ক্লান্ত রাশিয়াকে বেশ শক্তিশালী বিপক্ষ দল হিসাবেই পেল প্রথমার্ধে। খেলা নিয়ে দর্শকদের তেমন আগ্রহ ছিল না। সাকুল্যে কোনরকমে বত্রিশ হাজার আসন পূর্ণ হল। বিরতির পরে কুর্ট হ্যামরিন প্রায় একাকীই বল নিয়ে রাশিয়ার গোল ভেদ করলেন। হেড দিয়ে আরও একটি গোল তিনি করতে পারতেন, কিন্তু সামান্যর জন্য ব্যর্থ হন। বল নিয়ে তিনি রাশিয়ার গোলমুখে পৌঁছেও যান। সুইডেন খেলা শেষের আড়াই মিনিট আগে যে দ্বিতীয় ও শেষ গোলটি দেয় তার স্রষ্টাও হ্যামরিন, কিন্তু শেষ কাজটুকু করেন সিমোনসন।

ফ্রান্সের অভিজ্ঞ কোচ জাসের সুইডেনের খেলা দেখে অবাক হলেন। যদি ঠিকমত খেলে তবে তো তাদের হারান অসম্ভব। যেভাবেই হোক, রেনর ওই খবর পেয়েছিলেন ব্রাজিল পরে তা কাজেও লাগায়।

মালমো-তে হেলমুট রান পশ্চিম জার্মানীকে আবার জিতিয়ে দিলেন। দ্বাদশ মিনিটে অপ্রতিরোধ্য ক্রনকোভিককে কাটিয়ে দ্রুত ধেয়ে গোলটি দেন।

ক্রিভোকুকা আসলে অত তাড়াতাড়ি ফোকরটি বন্ধ করতে পারেননি। সত্যি বলতে কি এই ম্যাচে হৃদয়হীন ফুটবল খেলেন জাসকোয়াইক ও এরহার্ড। ওঁরা ভাগ্যবান—খেলা শেষ হবার নয় মিনিট আগে পেনাল্টি দেওয়া হয়নি। ওঁরা তখন শুধু মিলুটিনোভিককে ধরাশায়ী করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। এমনভাবে মেরেছিলেন ওঁকে যে, বহুদিন মিলুটিনেভিকের পা অকেজো ছিল। এই ঘটনা দেখে যুগোশ্লাভ ম্যানেজার ও তাদের ১৯৩০ বিশ্বকাপের রাইট উইঙ্গার আলেকজাণ্ডার টির্নানিক মন্তব্য করলেন: এটি অবধারিত পেনাল্টি। যে কেউ দেখলে বলতেন, এমন পেনাল্টি কমই হয়। কিন্তু পেনাল্টি পেলেও খেলার ফলের পরিবর্তন হত না। আমার দল গোল করতে পারত না। বরং তিক্ততাটাই দীর্ঘস্থায়ী হত।

সেমি ফাইনাল

সুইডেন পশ্চিম জার্মানীর খেলা পড়ল গেটেবার্গে এবং ব্রাজিল-ফ্রান্সের স্টকহমে।

সুইডেন: পশ্চিম জার্মানী—গেটেবার্গের খেলায় সুইডিশদের জাতীয়তাবোধ এমন তুঙ্গে উঠল যে, জার্মানরা যেন ছায়ায় ঢাকা পড়ল। খেলার আগে এমনও মনে হল খেলার আর দরকার কি! ফল তো হয়েই গেছে।

সমর্থক তথা প্রিয়জনদের জন্য আতিথেয়তার চূড়ান্ত করে ছাড়ল সুইডিশরা। আবার সেই উগ্র জাতীয়তাবাদের নজির খেলার মাঠে। যদিও দারুণ অসঙ্গতি দেখা গেল দর্শকদের আচরণে, তবু হয়তো প্রয়োজন ছিল ওদের এই মনোভাবের। ইতিমধ্যে গম্ভীর চেহারার স্বাস্থ্যবান এক ব্যক্তি নীল ব্লেজার পরে সুইডিশ পতাকা হাতে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম শ্লোগান দিলেন। কয়েকটি গানের কলি আওড়ালেন; এর পর মাঠের মধ্যে পতাকা হাতে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করছিলেন যে ভাঁড়রা, তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তবে জার্মানীর ভাঁড়রা দৌড়ের ট্র্যাকেই গণ্ডীবদ্ধ রইলেন।

গ্যালারিতে জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ পেকস বাওয়েন্‌স ও সুইডিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে দারুণ কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। (১৯৫৪-র বিশ্বকাপের পর এই বালয়েন্‌স-এর উৎকট স্বদেশপ্রীতি গোটা জার্মানীতেও বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল।) গেটেবার্গের গ্যালারিতে সুইডিশরা কিছু জার্মান সমর্থককে আসন দিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় অবস্থা ঘোরালো

হয়ে উঠল। ডাঃ বাওয়েন্‌স হুমকি দিলেন, যদি তাঁদের সমর্থকদের বসার ব্যবস্থা না করা হয়, তবে তিনি দল প্রত্যাহার করে নিয়ে যাবেন। হুমকিতে কাজ হল, ওঁরাও জায়গা পেলেন।

খেলাটি দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। যদিও খেলায় ফাউলের আধিক্য দেখা যায় এবং অন্তত একবার মারাত্মক ভুলও হল রেফারিং-এ। সুইডিশ সমর্থকরা একস্বরে চীৎকার করতে লাগলেন 'হেজা, হেজা, হেজা', আর এই শব্দে সারা স্টেডিয়াম যেন ফেটে পড়ছিল। স্থানীয় দলই শুরুতে সারা মাঠে পদচারণা করল। জার্মান দল ভুল স্ট্রাটেজি নিয়েছিল। পিচ্ছিল মাঠে এরহার্ড ভুল 'স্টাড' নিয়ে খেলতে গিয়ে ঘন ঘন পড়ে যেতে থাকেন। গোলরক্ষক হারকেনরাথকে দেখে মনে হল এত গুরুত্বপূর্ণ খেলার পক্ষে তিনি যোগ্য নন। তবুও জার্মানীই প্রথম গোল দিয়ে সারা মাঠে নিস্তব্ধতা সৃষ্টি করল।

জিলার সর্বদা বল নিয়ে সুচিন্তিতভাবে এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত করে বেড়াতে থাকেন। মাঝে মাঝে পাসগুলি ধরার জন্য দ্রুত ধেয়ে যান। একটি বল ধরে নিজে খেলতে না পেরে সেণ্টার করলেন। হান্স শেফার পঁচিশ গজ দূর থেকে দারুণ ভলি মারতেই সুইস গোলরক্ষক স্বেনসন পরাস্ত হলেন। পশ্চিম জার্মানী ১-০ গোলে এগিয়ে গেল।

সুইডেনের লিডহোম ও গ্রেণের অক্লান্ত পরিশ্রমে খেলা তাদের দিকে ফিরে এল ক্রমশঃ। অবশ্য এজন্য সর্বাধিক কৃতিত্ব লিডহোমেরই। একবার তিনি হাত দিয়েও বল নিয়ন্ত্রণে আনলেন, কিন্তু রেফারির হস্ত-আন্দোলন দ্বারা বুঝলেন, হাণ্ডবল হয়নি। স্কোগ্লাণ্ড কোণাকুণি শটে ১-১ করলেন। জার্মানী ও সুইডেনের এই দুটি গোলের ব্যবধানে সময় ছিল পাঁচ মিনিট।

হামরিন দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জাসকোয়াইককে কয়েকবার অতিক্রম করলেন। তখন খেলার সিংহভাগ সুইডেনের পক্ষে। তৃতীয় মিনিটে হারকেরনাথের হামরিনের পায়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়া বৈ উপায় ছিল না। দ্বাদশ মিনিটে হামরিন ফাউল করলেন জাসকোয়াইককে। এমন বোকার মত ফাউলে সারা গ্যালারি হৈ-চৈ করে উঠল। এজন্য দায়ী অবশ্যই হামরিন। জাসকোয়াইক অজ্ঞান হয়ে গড়াতে গড়াতে বাইরে গেলেন। অবশ্য আবার মাঠে ফিরতে তার বেশি সময় লাগেনি।

খেলা শেষের ষোল মিনিট আগে সুইডেনের শক্তিমান ও লোহার তৈরি লেফট-হাফ পারলিং মারাত্মক ফাউল করলেন ক্রিজ ওয়াল্টারকে। শাস্তিস্বরূপ

পারলিংকে তৎক্ষণাৎ মাঠের বাইরে যেতে হল। আহত ওয়াল্টারকেও ধরাধরি করে বাইরে নেওয়া হল কয়েক মিনিটের জন্য। পরদিন তিনি সারাক্ষণ শয্যায় কাটালেন। অর্থাৎ সুইডেন তখন খেলছে নয়জনের বিরুদ্ধে।

খেলা শেষ হতে তখন নয় মিনিট বাকি। হ্যামরিনের একটি জোরালো শট আটকালেন হারকেনরাথ। সুইডেনের রাইট ইন গুনার গ্রেণ তক্কে তক্কে ছিলেন। হারকেনরাথের মারা বল বাঁ পায়ে উড়ন্ত অবস্থায় লুফে নিয়ে ওই পায়েই বাঁ কোণ দিয়ে দর্শনীয় গোল (২-১) দিলেন। এরপর সেণ্টার হতেই হ্যামরিন বল নিয়ে এগোতে লাগলেন দারুণ কুশলতায়। বল একটু থামিয়ে ডানদিকের টাচলাইন ধরে সোজা চললেন। এবার একটু বিমর্ষ তিনি। তারপর তিনজনকে কাটালেন নাচতে নাচতে এবং অবশেষে পরাস্ত হলেন হারকেনরাথ (৩-১)। প্রতিযোগিতার সবচেয়ে ধীরগতিসম্পন্ন দল ফাইনালে উঠল।

ব্রাজিল : ফ্রান্স—স্টকহমে ফাইনালে উঠল ব্রাজিল। ফ্রান্স অবশ্য লড়াইয়ের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। যাঁরা সেদিন খেলা দেখেছেন, একবাক্যে স্বীকার করেছেন ফ্রান্সের ফনটাইন ও পিয়ানটনির গোলের তৃষ্ণা মেটাতে কিভাবে সাহায্য করেছিলেন কোপা। ওঁরা ব্রাজিলের নড়বড়ে মধ্যবর্তী রক্ষণভাগকে বেগ দিলেন। সাঁইত্রিশ মিনিট ধরে বেঁটেখাটো কোপা অভূতপূর্ব ফুটবল খেললেন আর থরহরি সৃষ্টি করলেন। ডিডি, গ্যারিঞ্চা ও পেলে মিলে ভাভাকে দিয়ে দারুণ গোল করালেন দ্বিতীয় মিনিটে, কিন্তু নয় মিনিটের মধ্যে ফনটাইন ১-১ করে ফেললেন। এরপর বব জঁকোয়েত আহত হয়ে বিরতির সময়ে মাঠের বাইরে গেলেন। ডিডি দু'মিনিটের মধ্যে ২-১ গোলে এগিয়ে দিলেন ব্রাজিলকে। দ্বিতীয়ার্ধে পেলে একাকীই গোলের ঝড় বইয়ে দেন (৫-১)। অর্থহীন হলেও পিয়ানটনি দেরিতে একটি গোল শোধ করেন (৫-২)।

ফাইনাল

সুইডেন : ব্রাজিল—গেটেবার্গে সুইডেন-জার্মানীর সেমি ফাইনালের উত্তপ্ত পরিবেশের কথা মনে পড়ায় ব্রাজিল খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। কেননা, ফাইনালে সুইডিশরা আরও যে উচ্ছ্বসিত ও উত্তেজিত থাকবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। বিশ্বকাপ কমিটি স্থির করলেন, সেমি ফাইনালের

পরিস্থিতি ফাইনালে কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না। গ্যালারিতে যাই হোক, মাঠে যেন খেলা নির্বিঘ্নেই চলে। কমিটি জানিয়ে দিলেন, মাঠের মধ্যে ভাঁড়-নেতাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আনন্দ, উত্তেজনা ও হৈ-হুল্লোড় থেকে বঞ্চিত হওয়ার নির্দেশ পেয়ে রাস্থুণ্ডার জনতা অদ্ভুতভাবে শান্ত রইলেন।

তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় গেটেবার্গে ফ্রান্সের কোপা ও ফনটাইন অশ্বগতিতে ছিনিমিনি খেললেন দুর্বল জার্মানীর বিরুদ্ধে। এই নিয়ে পশ্চিম-জার্মান দলে তরুণ ও স্বাস্থ্যবান রাইটহাফ কার্লহেঞ্জ সেলিঞ্জার দ্বিতীয়বার জাতীয় দলের পক্ষে খেললেন। পোলিশ খনি মালিক ও ফরাসী মহিলার পুত্র কোপা তো অপ্রতিরোধ্য ছিলেন। কোপার সাহায্যেই ফনটাইন চারটি গোল দিলেন। কোপা দিলেন একটি পেনাল্টি থেকে। ফ্রান্স জিতল ৬-৩ গোলে।

স্টকহমে ফাইনালের দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হল। জর্জ রেণর আনন্দে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন : ব্রাজিল যদি শুরুতে গোল খায় তবে সারা ম্যাচে তারা থরহরি সৃষ্টি করবেই। হলও তাই। শুরুতেই তারা ১-০ গোল পিছিয়ে গেল এবং তারপর থেকে প্রাণবন্ত ফুটবল খেলা আরম্ভ করল।

ফিওলা ডিফেন্সে দৃঢ়তার সঙ্গে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটালেন। রাইট ব্যাক ডি সোরডিকে তুলে নিলেন। তাঁর জায়গায় আনলেন ১৯৫৪-র অভিজ্ঞ জালমা স্যান্টোসকে। বলাবাহুল্য ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে এটি তাঁর প্রথম খেলা। ডিফেন্সের দুই স্যান্টোস সুইডেনের আক্রমণভাগের দুই ফলা হ্যামরিন ও স্কোগ্লাণ্ডকে আগলে রইলেন এবং ঘন ঘন তাদের আক্রমণধারাকে প্রতিহত করলেন।

তবুও চতুর্থ মিনিটে সুইডেন গোলের রচয়িতা গ্রেণ ও লিডহোম। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার এই গোলটি বহুদিন ফুটবলারদের আদর্শ হয়ে থাকবে। গ্রেণ বলটি পাস দেন লিডহোমকে। তিনি ওটি ধরে আস্তে আস্তে দুই ব্রাজিলিয়ান রক্ষককে কাটিয়ে পেনাল্টি বক্সে প্রবেশ করেন ডান কর্ণারের দিক থেকে ও গোলরক্ষক জিলমারকে পরাস্ত করেন নিজ জোরালো শটে। গোটা প্রতিযোগিতায় ব্রাজিলকে এই চার মিনিট কেমন যেন দুর্বল মনে হচ্ছিল।

অবশ্য ছয় মিনিট পরে ব্রাজিল ১-১ করে এবং এজন্য সবচেয়ে প্রশংসা পেলেন গ্যারিঞ্চা। জিটোর কাছ থেকে বল পেয়ে কেউটের মত ছোবল দিয়ে গ্যারিঞ্চা পারলিংকে কাটিয়ে অক্সবম পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। তাঁর সোয়ার্ভের কাছে

সুইডিশ রক্ষকদ্বয় পরাস্ত হলেন। তারপর প্রচণ্ড বেগের মধ্যেই বল পিছনে ঠেলে দিলেন ভাভার কাছে। ভাভা ১-১ করলেন।

খেলার গতি ফিরে গেল। গ্যালারিতে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। পেলের জোরালো শট পোস্টে লেগে ফিরে এল। ফরওয়ার্ডে খেললে কি হবে জাগালো ব্রাজিলের বারের নিচ থেকে হেড দিয়ে একটি অবধারিত গোল বাঁচালেন। বত্রিশ মিনিট পরে গ্যারিঞ্চা আবার ধাবিত হলেন ও সুইডিশ লেফট ফ্ল্যাঙ্ককে অতিক্রম করে বল পৌঁছে দিলেন ভাভার কাছে। ভাভা এবার ব্রাজিলকে ২-১ গোলে এগিয়ে দিলেন।

সুইডেনের খেলা এবার মাঝমাঠেই সীমিত রইল। তাদের উইঙ্গাররা যেন মৃত। বিরতির দশ মিনিট পরে তাদের শেষ আশার জীবনাস্ত হল যখন পেলে চমৎকার গোলটি দিয়ে ৩- করলেন। পেলের ওই গোলের তুলনা হয় না। একটি উঁচু বল পেনাল্টি বক্সের মধ্যেই উরু দিয়ে ধরে হুক করলেন মাথার উপরে। সেই বলে এমন ভলি মারলেন যে, প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে তা স্বেনসনকে অতিক্রম করল।

এবার জিটো ও ডিডি খুশিমত বল দেওয়া-নেওয়া শুরু করলেন সুইডেনকে হতমান দেখে। ফুলব্যাক জালমা স্যাণ্টোস দৌড়ে দৌড়ে বিপক্ষের রক্ষণভাগ অবধি যেতে লাগলেন। এদিকে ওঁদেরই সঙ্গে পেলে ও ভাভা মদত দিতে থাকেন পাসের মাধ্যমেই। তের মিনিটের মধ্যেই জাগালো অতিক্রম করলেন বোয়ারসেনকে, তারপর বার্জমার্ককে। ব্রাজিলের পক্ষে চতুর্থ গোলটি দিয়ে জাগালো আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর চোখেও আনন্দাশ্রু।

ব্রাজিলের সমর্থকরাও ধরে নিলেন জুল রিমে ট্রফি এবার তাদের করায়ত্ত। তারাও আনন্দে 'আম্বা, আম্বা' চিৎকারে স্টেডিয়ামে সাড়া জাগালেন। সুইডেনের লিডহোম এর কিছু পরে বল বাড়ান আগ্রে সিমোনসনের কাছে। তিনি সুইডেনের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন। এটি অফ্‌সাইড ছিল—সমালোচকরা ও ব্রাজিলের সমর্থকরা ওই মন্তব্য করলেও ব্রাজিল দল ওই নিয়ে হৈ-চৈ করেনি। ওরা রেফারির সিদ্ধান্তের যোগ্য জবাব দেয় আর একটি গোল (৫-২) দিয়ে। জাগালোর সেণ্টার থেকে পেলে তুরন্ত গতি প্রয়োগ করেন।

অবশেষে বিশ্বকাপ ব্রাজিলের দখলে এল। বালসুলভ চপলতা প্রকাশ পেল তাদের কাপ জয়ের আনন্দে। সারা মাঠ প্রদক্ষিণ করলেন ওঁরা নিজেদের পতাকা নিয়ে।

সন্দেহ নেই এবার সেরা দলই বিশ্বকাপ ফুটবল বিজয়ী হল। শ্রেষ্ঠ দল তো বটেই, তাদের খেলাও ছিল চমৎকার ও অতুলনীয়।

পুল—১

পশ্চিম জার্মানী ৩ (রান ২, স্মিড) — **আর্জেন্টিনা ১** (কোরবাট্টা)

বিরতি ২—১

উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ১ (কুশ) — **চেকোশ্লোভাকিয়া ০**

বিরতি ১—০

পশ্চিম জার্মানী ২ (শেফার, রান) — **চেকোশ্লোভাকিয়া ২** (ভোরাক-পেনাল্টি, জিকান)

বিরতি ১—০

আর্জেন্টিনা ৩ [কোরবাট্টা ২ (১ পেনাল্টি), মেনেনডেজ] — **উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ১** (ম্যাকপারল্যাণ্ড)

বিরতি ১—১

চেকোশ্লোভাকিয়া ৬ (ভোরাক, জিকান ২, ফিউবিজ্ল, ভোরকা ২) — **আর্জেন্টিনা ১** (কোরবাট্টা)

বিরতি ৩—১

পশ্চিম জার্মানী ২ (রান, জিলার) — **উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ২** (ম্যাকপারল্যাণ্ড)

বিরতি ১—১

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
পশ্চিম জার্মানী	৩	১	২	০	৭	৫	৪
চেকোশ্লোভাকিয়া	৩	১	১	১	৮	৪	৩
উত্তর আয়ারল্যাণ্ড	৩	১	১	১	৪	৫	৩
আর্জেন্টিনা	৩	১	০	২	৫	১০	২

প্লে-অফ্: **উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ২** (ম্যাকপারল্যাণ্ড) — **চেকোশ্লোভাকিয়া ১** (জিকান)

পুল—২

ফ্রান্স ৭ — **প্যারাগুয়ে ৩**

(ফনটাইন ৩, পিয়ানটনি, কোপা, উইসনিস্কি, ভিন্সেন্ট) — [আমারিল্লা ২ (১ পেনাল্টি), রোমেরো]

বিরতি ২—২

যুগোশ্লাভিয়া ১ — **স্কটল্যাণ্ড ১**

(পেটাকোভিক) — (মারে)

বিরতি ১—০

যুগোশ্লাভিয়া ৩ — **ফ্রান্স ২**

(পেটাকোভিক, ভেসেলিনোভিক ২) — (ফনটাইন)

বিরতি ১—১

প্যারাগুয়ে ৩ — **স্কটল্যাণ্ড ২**

(আগুয়েরো, রে, প্যারডি) — (মুডি, কলিন্স)

বিরতি ১—১

ফ্রান্স ২ — **স্কটল্যাণ্ড ১**

(কোপা, ফনটাইন) — (বেয়ার্ড)

বিরতি ২—০

যুগোশ্লাভিয়া ৩ — **প্যারাগুয়ে ৩**

(আনানোভিক, রাজকভ, ভেসেলিনোভিক) — (প্যারডি, আগুয়েরো, রোমেরো)

বিরতি ২—১

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
ফ্রান্স	৩	২	০	১	১১	৭	৪
যুগোশ্লাভিয়া	৩	১	২	০	৭	৬	৪
প্যারাগুয়ে	৩	১	১		৯	১২	৩
স্কটল্যাণ্ড	৩	০	১	২	৪	৬	১

পুল—৩

সুইডেন ৩ — **মেক্সিকো ০**

[সিমোনসন ২, লিডহোম (পেনাল্টি)]

বিরতি ১—০

হাঙ্গেরি ১ (বোজসিক) — **ওয়েলস্ ১** (চে চার্লস)

বিরতি ১—১

ওয়েলস্ ১ (অলচার্চ) — **মেক্সিকো ১** (বেলমণ্ট)

বিরতি ১—১

সুইডেন ২ (হ্যামরিন) — **হাঙ্গেরি ১** (টিশি)

বিরতি ১—০

সুইডেন ০ — **ওয়েলস্ ০**

হাঙ্গেরি ৪ (টিশি ২, স্যাণ্ডর, বেক্কসিক্স) — **মেক্সিকো ০**

বিরতি ১—০

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
সুইডেন	৩	২	১	০	৫	১	৫
হাঙ্গেরি	৩	১	১	১	৬	৩	৩
ওয়েলস্	৩	০	৩	০	২	২	৩
মেক্সিকো	৩	০	১	২	১৮	৮	১

প্লে-অফ: **ওয়েলস্ ২** (অলচার্চ, মেডউইন) — **হাঙ্গেরি ১** (টিশি)

বিরতি ১—০

পুল-৪

ইংল্যাণ্ড ২ [কেভান, ফিনে (পেনাল্টি)] — **রাশিয়া ২** (সিমোনিয়ান, এ ইভানভ)

বিরতি ০—১

ব্রাজিল ৩ (মাজোলা ২, এন স্যাণ্টোস) — **অস্ট্রিয়া ০**

বিরতি ১—০

ইংল্যাণ্ড ০ — **ব্রাজিল ০**

রাশিয়া ২ **অস্ট্রিয়া ০**
(ইয়াশিন, ভি ইভানভ)

বিরতি ১—০

ব্রাজিল ২ **রাশিয়া ০**
(ভাভা)

বিরতি ১—০

ইংল্যাণ্ড ২ **অস্ট্রিয়া ২**
(হাইনেস, কেণ্ডান) (কলার, কোয়েণার)

বিরতি ০—১

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
ব্রাজিল	৩	২	১	০	৫	০	৫
ইংল্যাণ্ড	৩	০	৩	০	৪	৪	৩
রাশিয়া	৩	১	১	১	৭	৪	৩
অস্ট্রিয়া	৩	০	১	২	২	৭	১

প্লে-অফ্ : **রাশিয়া ১** **ইংল্যাণ্ড ০**
(ইয়াশিন)

বিরতি ০—০

কোয়ার্টার ফাইনাল

নরকপিং-এ

ফ্রান্স—৪ **উত্তর আয়ারল্যাণ্ড—৩**
(উইসনিস্কি, ফনটাইন ২, পিয়ানটনি)

বিরতি ১—০

আবেস ; কেলবেল, লের, পেঁভার্ণ, জঁকোয়েত, মার্সেল ; উইসনিস্কি, ফনটাইন, কোপা, পিয়ানটনি, ভিন্সেণ্ট।

গ্রেগ ; কিথ, ম্যাকমাইকেল ; ব্লাঙ্কফ্লাওয়ার, কানিংহাম, কুশ ; বিংহাম, কেসি, স্কট, ম্যাকরয়, ম্যাকপারল্যাণ্ড।

মালমো-এ

পশ্চিম জার্মানী—১ **যুগোশ্লাভিয়া- ০**
(রান)

বিরতি ১—০

হারকেনরাথ ; স্টোলেনবার্ক, জাসকোয়াইক ; এ কে ল, এরহার্ড, জিমানিয়াক ; রান, ওয়াল্টার, জিলার, স্মিড, শেফার।

ক্রিভোকুকা, সিজাকোভিক, ক্রনকোভিক ; ক্রিস্টিক, জেবেক, বসকভ ; পেটাকভিক, ভেসেলিনভবিক, মিলুটিনোভিক, অগনানোভিক, রাজকভ।

স্টকহম-এ

সুইডেন ২ **রাশিয়া ০**

(হ্যামরিন, সিমোনসন)

বিরতি ১—০

স্বেনসন ; বার্জমার্ক, অক্সবম ; বোয়ারেসন,গুস্তাভসন, পারলিং ; হ্যামরিন, গ্রেণ, সিমোনসন, লিডহোম, স্কোগ্লাণ্ড

ইয়াসিন ; কেস্তারেভ, কুজনেৎসভ ; ভয়নভ, ক্রিজেভস্কি, জারেভ ; এ ইভানভ, ভি ইভানভ, সিমোনিয়ান, সালনিকভ, ইয়াসিন।

গোটেবার্গ-এ

ব্রাজিল ১ **ওয়েলস ০**

(পেলে)

বিরতি ০—০

জিলমার ; ডে সোরডি, এন স্যান্টোস ; জিটো, বেলিনি, অরল্যাণ্ডো ; গ্যারিঞ্চা, ডিডি, ম্যাজোলা, পেলে, জাগালো।

কেলসি ; উইলিয়মস, হপকিন্স ; সুলিভান, এম চার্লস, বাউয়েন ; মেডউইন, হিউইট, ওয়েবস্টার, অলচার্চ, জোন্স।

সেমি ফাইনাল

স্টকহম-এ

ব্রাজিল ৫ **ফ্রান্স ২**

(ভাভা, ডিডি, পেলে ৩) (ফনটাইন, পিয়ানটনি)

বিরতি ২—১

জিলমার ; ডে সোরডি, এন স্যান্টোস ; জিটো, বেলিনি, অরল্যাণ্ডো ; গ্যারিঞ্চা, ডিডি, ভাভা, পেলে, জাগালো।

আবেস ; কেলবেল, লের ; পেঁভার্ণ, জঁকোয়েত, মার্সেল ; উইননিস্কি, ফনটাইন, কোপা, পিয়ানটনি, ভিন্সেন্ট।

গোটেবার্গ-এ

সুইডেন ৩ (স্কোগ্লাণ্ড, গ্রেণ, হ্যামরিন)

পশ্চিম জার্মানী ১ (শেফার)

বিরতি ১—১

স্বেনসন ; বার্জমার্ক, অক্সবম ; বোয়ারসেন, গুস্তাভসন, পারলিং ; হ্যামরিন, গ্রেণ, সিমোনসন, লিডহোম, স্কোগ্লাণ্ড।

হারকেনরাথ ; স্টোলেনবার্ক, জাস-কোয়াইক ; একেল, এরহার্ড, জিমানিয়াক ; রান, ওয়াল্টার, জিলার, শেফার, সিয়েজলার্ক।

তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলা

গোটেবার্গ-এ

ফ্রান্স ৬ [ফনটাইন ৪, কোপা (পেনাল্টি), ডুইস]

পশ্চিম জার্মানী ৩ (সিয়েজলার্ক, রান, শেফার)

বিরতি ৩—১

আবেস ; কেলবেল, লের ; পেন্ডার্গ, লার্ফ, মার্সেল ; উইসনিস্কি, ডুইস, কোপা, ফনটাইন, ভিন্সেণ্ট।

কিয়াটোস্কি ; স্টোলেনবার্ক, এরহার্ড, শ্নেলিঙ্গার, উয়েয়ার্স, জিমানিয়াক ; রান, স্টার্ম, কেলবাসা, শেফার, সিয়েজকার্ক।

ফাইনাল (স্টকহমে ২৯ জুন, দর্শক ৪৯,৭৩৭)

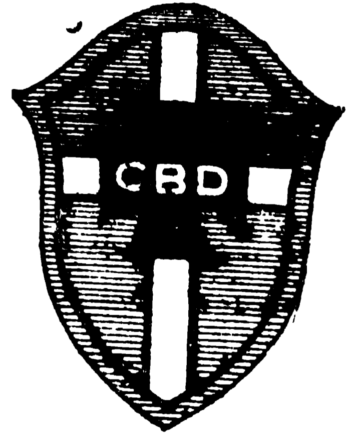
ব্রাজিল ৫ (ভাভা ২, পেলে ২, জাগালো)

সুইডেন ২ (লিডহোম, সিমোনসন)

জিলমার ; ডি স্যাণ্টোস, এন স্যাণ্টোস ; জিটো, বেলিনি, অরল্যাণ্ডো ; গ্যারিঞ্চা, ডিডি, ভাভা, পেলে, জাগালো।

স্বেনসন ; বার্জমার্ক, অক্সবম ; বোয়ারসেন, গুস্তাভসন, পারলিং ; হ্যামরিন, গ্রেণ, সিমোনসন, লিড-হোম, স্কোগ্লাণ্ড।

চিলি



বিজয়ী ব্রাজিলের ব্যাজ

তে চিলিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় জিতে বিশ্বকাপ নিয়ে গেল ব্রাজিল। প্রমাণ করল শুধু একজনের দৌলতেই তারা চ্যাম্পিয়ান হয়নি। তাদের দল এগারজনকে নিয়ে নয়, আরও কয়েকজনকে নিয়ে এবং একটি নক্ষত্রের পতন হলে, আর একটি তারকার উদয় হয়। অর্থাৎ একজনের বদলে আর একজন মাঠে নামলে তিনিও একই ধারায়, একই গতিতে খেলতে পারেন। অবশ্য বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতাকে বিশেষজ্ঞরা 'গ্যারিঞ্চার বিশ্বকাপ' বা 'ওয়ার্ল্ড কাপ অফ গ্যারিঞ্চা' আখ্যা দিয়েছেন।

বিশ্বকাপ স্মরণীয় হয়ে থাকবে ৪-৩-৩ পদ্ধতির জন্যও।

আয়তনে বিরাট অথচ সেই সময়ে দরিদ্র হয়ে পড়লেও চিলির ব্যবস্থাপনা সকলকে মুগ্ধ করল। যখন আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের সভায় ১৯৬২-র বিশ্বকাপের স্থান নির্ণয় হচ্ছিল, চিলি তখন বিধ্বংসী ভূমিকম্পের কবলে পড়ে রিক্ত ও নিঃস্ব। কিন্তু চিলি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কার্লস ডিটবর্ণ চমৎকারভাবে উপস্থাপিত করলেন তাঁর দাবি। যুক্তি দিয়ে বললেন : আমাদের দেশকে বিশ্বকাপের দায়িত্ব দিতেই হবে। কারণ, আপাতত ওই ছাড়া আমাদের আর কোনো অবলম্বন নেই।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন তাঁর দাবি মেনে নিলেন। পাহাড় ঘেরা ও বরফে ঢাকা সান্টিয়াগোয় দ্রুত একটি বিরাট অথচ চমৎকার স্টেডিয়াম তৈরি করে ফেললেন। আয়তনে ছোট হলেও আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধার আর

একটি স্টেডিয়াম ভিনা ডেল মার উপকূলে। সেখানে প্রস্তরখণ্ডগুলির উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে পেলিকান এসে বসে। স্টেডিয়ামের ভিতরে আছড়ে পড়ে সমুদ্র-লতাগুল্মের আন্দোলিত হাওয়া। তৃতীয় গ্রুপের খেলার ব্যবস্থা হয় রান্‌কাগুয়ায় ব্র্যাডেন কপার কোম্পানীর স্টেডিয়ামে। চতুর্থ গ্রুপের খেলা পড়ে কয়েক হাজার মাইল উত্তরে পেরুভিয়ান সীমান্তে আরিকো শহরে।

বিশ্বকাপের জন্য চিলি নিজেদের ফুটবল দলকেও দারুণভাবে প্রস্তুত করল এবং সে প্রস্তুতি আশাতীত। আর তাদের উপর্যুপরি সাফল্যে মনে হতে লাগল একশ' বছর আগে প্যাসিফিক যুদ্ধের পর এমন কৃতিত্ব, দেশব্যাপী এমন সাড়া আর দেখা যায়নি। বাস্তবিকই তাই। রাজধানীতে সে কী হুল্লোড়! সারা রাত রাজপথে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল ফুটবল আমোদীদের দ্বারা। আর মোটর গাড়িগুলি একসঙ্গে হর্ন বাজিয়ে বোঝাতে লাগল 'ভিভা চি-লি'!

চিলিকে ঘিরে সমালোচনা কম হল না। হবে না-ই বা কেন! সংগঠকরা যদি অকেজো হন, সমালোচনা হওয়া অবাস্তব নয়। টিকিট নিয়ে যদি চোরাকারবার বা দুর্নীতি হয়, অন্ততঃ একজন কর্মকর্তাও যদি ওর সঙ্গে জড়িত থাকেন তাহলেও সমালোচনার ঝড় তোলা যায়। চার বছর পরে ইংল্যাণ্ডেও অনুরূপ সমালোচনার ঝড় ওঠে। কিন্তু তাই নিয়ে বাদানুবাদ বেশিদূর এগোয়নি ধামাচাপা দেওয়ায়।

যদি আসনের জন্য বা টিকিটের জন্য বর্ধিত মূল্য দাবি করা হয়, তবে পুলিশ ডাকা যেতে পারে। যে দুজন ইতালীয় সাংবাদিক চিলিকে পিছিয়ে-পড়া দেশ বলে নানা নিবন্ধ লিখেছিলেন তাঁদের সংবাদপত্রে এবং সান্টিয়াগোয় খেলার আগে নিজেদের দলকে সেরা বলে জাহির করেছিলেন, খেলা শেষে ব্যবস্থাপনায় যখন অন্যরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং তাদের দলের ফল হতাশকর হল—তখন বোঝা গেল তাদের সব ধারণা, সব সমালোচনা নিরর্থক।

আদতে চিলিকে তখন কিছুটা নোংরা বা পিছিয়ে পড়া মনে হলেও সেখানকার আভিজাত্য বা ঐতিহ্য একেবারে মুছে যায়নি। চিলির শীতকালটা বড় হৃদয়-বিদারক। সান্টিয়াগোর আকাশে-বাতাসে কেমন যেন ধোঁয়াটে পরিবেশ। কেমন যেন ঝুলকালিপূর্ণ। সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর ওখানকার রান্নাঘর-গুলি। কতলোক যে প্রাণ হারিয়েছিল! তবুও বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়নি। বরং সুইডেন বা মেক্সিকো অপেক্ষা চিলিতে এসে বিদেশী দর্শক ও দলগুলি মধুর স্মৃতি নিয়েই স্বদেশে ফেরেন।

দক্ষিণ আমেরিকার মাটিতে নিজেদের অনুকূল আবহাওয়ায় নিঃসন্দেহেই ব্রাজিল ফেভারিট ছিল। অসুস্থতার জন্য বুদ্ধদেব চেহারার ভিনসেণ্ট ফিওলাকে ম্যানেজারের দায়িত্ব ত্যাগ করতে হয়। তাঁর বদলে ম্যানেজার হলেন জেজে-র ভাই আয়মোর মোরিরা। সাদা চুলের আয়মোর যেমন ধৈর্যশীল, তেমনি বিনয়ী। ওর সঙ্গে ছিলেন হিলটন গসলিং। এঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে ব্রাজিলের সাফল্য আরও অনায়াসলব্ধ হয়। ব্রাজিল প্রতিটি ম্যাচে দারুণ খেলল। ভিনা ডেল মার গ্রুপে তাদের সঙ্গে ছিল চেক, স্প্যানিয়ার্ড ও মেক্সিকানরা। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে আয়ারল্যাণ্ডের অধিনায়ক ডানি ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার চিলিতে এলেন সাংবাদিকের কাজ নিয়ে। ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার ব্যবস্থাপনায় মুগ্ধ হয়ে বললেন : প্রত্যেকটি দলের বেশ সুবিধা হল আগেভাগে কবে, কখন, কোথায় কার খেলা ইত্যাদি জানতে পারায়।

ভিনা গ্রুপ : ব্রাজিল, চেকোশ্লোভাকিয়া, স্পেন ও মেক্সিকো—১৯৫৮-য় যে ব্রাজিল ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বিশ্বকাপ জিতেছিল, সেই একতায় ভাঙন ধরে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু কী আশ্চর্য! বিশ্বকাপের আগে নাটকীয়ভাবে আবার খেলোয়াড়রা ঐক্যবদ্ধ হলেন। ফিরে এল পুরনো সংহতি।

যে দুজন খেলোয়াড় মাদ্রিদে চলে গিয়েছিলেন ভাগ্যান্বেষণে, আবার তাঁরা ফিরে এলেন। সেণ্টার ফরোয়ার্ডের যে ভাভা গতবার ফাইনালে দুটি গোল দিয়েছিলেন, তিনি চলে যান অ্যাটলেন্টিকো মাদ্রিদে এবং সেখানে কয়েকটি মরশুম বেশ খেলেছিলেন। তিনি আবার ব্রাজিলে খেলার জন্য ফিরে এলেন ও নিজের জায়গা দখল করলেন।

১৯৫৮-য় ডিডিও সুইডেনে মাতিয়েছিলেন। তার আগে ১৯৫৪-য় সুইজারল্যাণ্ডেও রীতিমত 'তারকা' ছিলেন। এই ডিডি ১৯৫৮-র পর যোগ দেন রিয়াল মাদ্রিদে। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদে ডি স্টিফানোর মত কুশলী খেলোয়াড় থাকায় ডিডিকে তেমন পাত্তা দেওয়া হল না। তা ছাড়া কয়েকটা মরশুম তাঁর খেলায় ভাঁটা পড়ে। তাই মাদ্রিদের হয়ে খেলার জন্য, একটি ম্যাচ পাওয়ার জন্য রীতিমত 'সংগ্রাম' করতে হত। ডিডি বিরক্ত হয়ে স্বদেশে ফিরলেন এবং ভাল খেলা দেখিয়েই ব্রাজিলের তরুণ সিনশিনহোকে স্থানচ্যুত করেন।

শেষ মুহূর্তে জেকুইনা বাদ পড়ায় জিটো সুযোগ পেলেন। আহত থাকায় পেলের একটি ম্যাচের পরে দলে আসার কোনো সম্ভাবনাই দেখা গেল না।

সুতরাং জাগালোকে লেফট উইং-এ স্থানচ্যুত করার সাধ্য কারুর ছিল না। সুতরাং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। পাও গ্রাণ্ডের জন্য সিদ্ধ গ্যারিঞ্চা আবার দলভুক্ত হলেন। আট মেয়ের বাবা গ্যারিঞ্চাকে এই সময়ে ব্রাজিলের বিখ্যাত গায়িকা এলসা সোর্সে'স-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে চলাফেরা করতে দেখা যায়। বিশ্বকাপের পর গ্যারিঞ্চা বিয়ে করলেন এলসাকে।

তবে রক্ষণভাগের মধ্যাঞ্চলে পরিবর্তন হল, ১৯৫৮-য় মাউরো রিজার্ভ ছিলেন, এবার হলেন সেণ্টার হাফ। বেঁটে, কালো জোজিমো ব্রাজিল দলের সঙ্গে ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন, তিনি অরল্যাণ্ডোর জায়গা দখল করলেন। অরল্যাণ্ডো অবশ্য চিলি যাওয়ার আগে আর্জেন্টিনায় ছিলেন খেলার দৌলতেই।

দুই স্যাণ্টোসই বুড়িয়ে যান। কিন্তু ছত্রিশ বছরের নিলটনকে বদল করার মত কোনো খেলোয়াড় ব্রাজিলে ছিল না। ধূসর জার্সির জিলমার গোলে যেন আগের চাইতে আরও দুর্ভেদ্য। আর পেলে? জিমন্যাস্টের মত অমন চমৎকার খেলোয়াড় আর কে আছে? শুধু নব নব আক্রমণ রচনা নয়। যেমন সাহসী, তেমনি অননুকরণীয় খেলা আর প্রতিমুহূর্তে তিনি এক-একটি বিস্ফোরকের মত। একুশ বছর বয়স হলে কী হবে! নিঃসন্দেহে তিনি বিশ্বের সেরা ফুটবলার। ডি ষ্টিফানো, পুসকাস সকলেই তাঁর কাছে ম্লান। ১৯৬০-র বিশ্বকাপের ঠিক আগে ইউরোপীয়ান ফাইনালে পুসকাস তিনটি গোল দেন। ডি ষ্টিফানো ওই খেলায় দারুণ দারুণ বল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন গোল করার জন্যই। তাদের ওই নয়নাভিরাম খেলাও পেলের খেলার কাছে ম্লান হয়ে গেল।

ভিনায় চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে আয়মোর মোরেরাকে ভীষণ ভীত মনে হল। তিনি স্বীকার করলেন: চেক দল 'অ্যাথলেটিক গেম' খেলেছে। ওরা যেমন শক্ত, তেমনি বলবান। ওদের এসব গুণ আমাদের বেগ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, টেকনিকেও তারা কুশলী। আয়মোর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন: এবারের বিশ্বকাপ রাফ এবং হিংস্র হবে। কমবে গোলের সংখ্যা।

কিন্তু চেকরা ব্রাজিলের ম্যানেজারের ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁদের সেরা গোলদাতা রুডলফ কুসেরা ভীষণ আঘাত পেলেন মাথায় এবং সেই আঘাত তাঁকে মাঠের বাইরে রেখে দিল। ব্রাসেলসে স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্লে-অফ্ ম্যাচে তাঁর খেলাই চেকোশ্লোভাকিয়ার জয়ের মূলে ছিল। চিলিতে নিজেদের সম্পর্কে ওরা এত দোনামোনা ছিল যে, তারা দুবার হোটেলও ছেড়েছিল। আর কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমি ফাইনালের

আগে তারা অভিজ্ঞ ম্যাসিওরও সঙ্গে রাখেনি খেলোয়াড়দের জন্য। চেক দলের খেলা অত্যন্ত মন্থর হলেও তাদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল বলে জনরব ছিল। এক অভিজ্ঞ ফরাসী সাংবাদিক মন্তব্য করেন : ওদের এই মন্থর গতির খেলা ও নির্লিপ্ততাই নানা সুবিধা এনে দেয়।

'মন্থর গতির' অর্থাৎ যারা অধিকাংশই চমৎকার বল প্লেয়ার এবং মাপা খেলায় রপ্ত—বেশি জায়গা নিয়ে খেলে। কিন্তু যেমন রক্ষণে দড়, তেমনি আক্রমণেও ধারালো। 'নির্লিপ্ত' অর্থাৎ তেমন চাপ সৃষ্টি করতে চায় না ঘনঘন। তাছাড়া বিপক্ষকে নিজেদের সম্পর্কে আসল ধারণা দিতে চায় না। বিপক্ষরা যেন মনে করে—ওরা আর এমন কি! আসলে চেকদল অনেকটা এই রকমই ছিল। এদের দলগত সংহতির ধারে-কাছে কম দলই আসতে পারত। কারণ অধিকাংশ খেলোয়াড়ই ডুকলা প্রাগ আর্মিক্লাবে খেলেছেন। আর তাদেরই দলে ছিলেন জোসেফ মাসোপোস্টের মত ঠাণ্ডা মাথার অথচ দারুণ চতুর লেফট হাফ যিনি গোলও করতেন মাঝে মাঝে। ডিফেন্সের মধ্যাঞ্চলে তেমনি শক্তিমান প্লুসকাল, টাকমাথার পপলাহার। এঁরা দুজনেই নিজেদের কালে বিশ্বের সেরা সেণ্টার হাফ পরিগণিত হয়েছেন। এঁরা যেমন দুর্ভেদ্য ছিলেন, তেমনি দুর্ভেদ্য আর এক টেকো অথচ রবারের মতই নমনীয় গোলরক্ষক উইলহোম স্রইফ। ফাইনালের আগের পর্যায় পর্যন্ত তাঁকে কেউ কেউ সেরা গোলরক্ষকও আখ্যা দেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ম্যানেজার হেলেনিও হেরেরা স্পেন দলের দায়িত্ব নিয়ে এলেন। হেরেরা এর আগে ইতালীর ম্যানেজার থাকাকালে তাঁর পার্শ্বচর বা কোচ ছিলেন গিয়ানিনো ফেরেরা। কিন্তু ইউরোপীয়ান কাপে জুভেণ্টাস হেরে যাওয়ায় এবং ইস্টারের খেলোয়াড়দের উত্তেজক ওষুধ সেবনের গণ্ডগোল তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করে। হেরেরা এর আগে স্পেনে বেশ কিছুকাল সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। এবার স্পেন তাই হেরেরাকে ম্যানেজারের দায়িত্ব দিল।

হেরেরা আলফ্রেডো ডি ষ্টিফানোর ব্যক্তিগত মনোমালিন্যে অনেক অবাক হলেন। স্পেন ত্যাগের আগে ষ্টিফানোর পেশীতে টান তাঁকে দলের সঙ্গে না আসার অজুহাত সৃষ্টি করে দিল। ষ্টিফানো ঘোষণা করলেন, তিনি চিলি যাবেন 'পর্যটক' রূপে। ষ্টিফানোর সদাহাস্যময়, আনন্দে টগবগে বাবা বুয়েনস আয়ার্স থেকে ওদের দুজনের মনোমালিন্য দূরীকরণ কবচ নিয়ে এলেন। কিন্তু

সকলেই ধরে নিয়েছেন তখন—কোনোরকম ম্যাজিক বা জোড়াতালি দিয়ে ডি ষ্টিফানো ও হেরেরার সম্পর্কচ্ছেদকে আর জোড়া লাগানো যাবে না।

দলে আছেন নব নব আক্রমণ রচনাকারী ফরোয়ার্ড লুই সুয়ারেজ। একদা তিনি হেরেরার সঙ্গে বার্সিলোনায় ছিলেন। এখন আবার তাঁরই সঙ্গে ইন্টারে রয়েছেন অ্যাটলান্টিকো মাদ্রিদের পিরো। এসেছেন প্যারাগুয়ে থেকে মার্টিনেজ ও হাঙ্গেরি থেকে পুসকাস। দল তেমন শক্তিশালী না হলেও, খেলোয়াড়রা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রতিভাবান।

মেক্সিকো ভিনায় উপনীত হতেই এক অস্ট্রেলীয় সাংবাদিক ওদের দুই খেলোয়াড়কে আক্রমণ শুরু করলেন তাঁর ডেসপাচে। তিনি লিখলেন ওই দুজনকে নিয়ে: এখানে এসেছেন শুধু ফুর্তি করতে।

এবারের বিশ্বকাপকে যতখানি 'জাগালোর বিশ্বকাপ' বলা যায়, ততখানিই বলতে হবে 'গ্যারিঞ্চার বিশ্বকাপ'। ব্রাজিলের জয়ের মূলে কার ভূমিকা সর্বাধিক ছিল—জাগালোর, না গ্যারিঞ্চার?—এই প্রশ্ন তুলে ফরাসী সাংবাদিক জাঁ-ফিলিপে রেথাকার নিবন্ধ লিখলেন। জাগালো সম্পর্কে তিনি লিখলেন, সাহসী ও দারুণ সক্রিয় ফুটবলার। নিজের পাস ও পজিশন সম্পর্কে যেমন সচেতন, তেমনি নিখুঁত। টেকনিকে বৈচিত্র্য। চেকোশ্লোভাকিয়ার যেমন মাসোপাস্ট, তেমনি ব্রাজিলের জাগালো ১৯৬২-র বিশ্বকাপে দারুণ প্রতিভাদীপ্ত খেলোয়াড়।

জাগালোর খ্যাতিলাভ গল্পকথা। ব্রাজিলের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। উপকূলভাগে যে খরস্রোত সেখানে সাঁতার কেটে কেটে জাগালো তাঁর ফুসফুসকে অত্যন্ত সক্রিয় করে তোলেন। বয়স তখন খুবই কম। জাগালো পরিবারের অন্যদের সঙ্গে চলে আসেন রিওতে। ব্রাজিলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্লাব ফ্লামেঙ্গোয় সই করলেন কনিষ্ঠতম লেফট উইঙ্গাররূপে। সুযোগ পেয়ে পেয়ে তৃতীয় রিজার্ভ খেলোয়াড় থেকে প্রথম দলে চলে এলেন। কিন্তু দর্শকদের পক্ষ থেকে তেমন সমর্থন পেলেন না জাগালো। অত ভাল খেলেও দর্শকদের মন জয় করতে পারলেন না। তাঁরা চমক দেখতে চান। জাগালো দেখালেন স্ট্যামিনা ও নিজে গোল না দিয়ে, অপরকে সেই সুযোগ দিয়ে আত্মত্যাগ করলেন। অনেক অনেক লড়াইয়ের পর অবশেষে দর্শকদের হৃদয় জয় করলেন।

তাঁর খেলার মস্ত গুণ প্রতিটি ম্যাচকে ভীষণ গুরুত্ব দেন। আর অসম্ভব

ব্যক্তিত্ব নিয়ে খেলেন। রিওয় কত গরম, তবুও প্রতি সন্ধ্যায় বেশ শান্ত চিত্তে প্রেমিকাকে নিয়ে বেড়াতে বের হবেন। প্রতি রবিবারে সকালে যেতেন গীর্জায়। ফুসফুসের শক্তি ও প্রচণ্ড উচ্চাশা তাঁকে আন্তর্জাতিক ফুটবলের প্রথম সারিতে স্থান করে দেয়। মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে বিপক্ষের গোলমুখে ধেয়ে যান ঘন ঘন। তারপর বলে জোরালো শট, মারাত্মক ও নিখুঁত ক্রস ইত্যাদিতে এই সময় ব্রাজিলে তাঁর চাইতে দক্ষ কেউ ছিলেন না।

রান্‌কাগুয়া গ্রুপ: ইংল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি, বালগেরিয়া ও আর্জেন্টিনা:—ইংল্যাণ্ড এবার ভাল ভাল খেলোয়াড় নিয়ে এল; অন্ততঃ খেলা দেখে তাই-ই মনে হল। কয়ার তরুণ মেয়রকে ধন্যবাদ,—তিনি ইংল্যাণ্ড দলের প্রতি একটু বেশিই যত্নবান ছিলেন। রান্‌কাগুয়ার বেশ উঁচু জায়গায় এমন একটি পাহাড়ী অঞ্চলে ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন, যেখানে নির্মল বাতাস বয়ে যায়। মানসিকতায় কোনোরকম বৈকল্য ঘটে না। অনুশীলনের সময় অন্য কেউ এসে বিরক্তও করে না। সারা অঞ্চলে সবুজ গল্‌ফ কোর্ট। সেখানকার সূর্যাস্ত দেখার মতনই। তবুও ইংল্যাণ্ড দল পৌঁছতেই তাদের এক খেলোয়াড় বললেন: জায়গাটা বড্ড হতাশ করেছে, ইচ্ছে করছে বসে বসে কাঁদি। তবে একথা অনস্বীকার্য কয়া অন্যান্য অঞ্চল থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। অনেকটা আমাদের পোর্টব্লেয়ার বা আন্দামানের মত। কয়ার নিঃসঙ্গতা অনেকেরই ভাল লাগার কথা নয়। সবচেয়ে সমস্যা একঘেঁয়েমি।

ইংল্যাণ্ডের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন উইণ্টারবটম। উইণ্টারবটমের জীবনের এটি চতুর্থ ও শেষ বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপের কিছু আগে তিনি হেরে যান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশানের সেক্রেটারি নির্বাচনে। উইণ্টারবটমকে কোচ হিসেবে সহযোগিতা করলেন ইংল্যাণ্ডের 'ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' বার্নলি-র জিমি অ্যাগমসন। লম্বা, দোহারার জিডডি (অধিনায়ক) পরে ক্লাবের ম্যানেজার হয়ে উইণ্টারবটমকে বরখাস্ত করেন।

ইংল্যাণ্ড এবার যেন তেমন খেলতে পারল না। এক কথায় এবার তারা ঘৃণিত ছিল মাঠে। অন্যরা নিল বদলা। তাছাড়া ১৯৩০-র বিশ্বকাপের জন্য তাদের প্রস্তুতি যেন সখের এবং সে প্রস্তুতিতে কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। প্র্যাকটিস ম্যাচে মাঝে মাঝে এক অস্ট্রেলীয় লাখপতিকে দেখা যেত এবং তার বয়সও ফুটবলারের উপযোগী নয়।

১৯৫৮-র বিশ্বকাপ দলে যাঁরা ছিলেন, তাদের অনেকেই ফুটবল জগৎ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য ব্যতিক্রম শুধু ইংল্যাণ্ডের আক্রমণ-ভাগে। এবারও আক্রমণ রচনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ফুলহামের জনি হেনেসের উপর। এবার তিনি অধিনায়কও। ব্রাজিলের কোচ নাটকীয় ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন ইংল্যাণ্ড দল সম্পর্কে : আচ্ছা, ইংল্যাণ্ডের দশ নম্বর ছাড়া আর কোনো খেলোয়াড় নেই ? দশ নম্বর কর্নার করে। দশ নম্বর থ্রো-ইন নেয়। সুতরাং আমাদের করণীয় তো একটিই। আমরা ওই দশ নম্বরের পিছনে একজন প্রহরী রেখে দিলাম। আর ইংল্যাণ্ডকে 'গুডবাই' করতে হল ১৯৩০-র বিশ্বকাপ থেকে।

হাঙ্গেরিয়ানরা প্রথম ম্যাচে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে দিল রান্‌কাগুয়ায়। রাকোশি বলের গতি লক্ষ্য করে প্রতিটি মুহূর্তে হেনেসকে ধাওয়া করেছেন। সমগ্র দলকে যদি একজনেরই উপর নির্ভর করতে হয়, তবে যে কত দুর্দশা অনিবার্য, ১৯৩০-র বিশ্বকাপে তার প্রমাণ মিলল। হেনেস গেটেবার্গে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ব্যর্থ হলেন চিলিতেও। কিন্তু এবার যেহেতু তিনি অধিনায়ক, তাই এই ব্যর্থতা আরও বড় করে চোখে পড়ল, তিনি কঠোর সমালোচনার মুখেও পড়লেন। অথচ তিনি জাত খেলোয়াড়। তাঁর অপূর্ব বল নিয়ন্ত্রণ, স্ট্র্যাটেজি এবং সর্বোপরি বাঁ পায়ের এমন ফুটবল-কুশলতা ক্ষণিকের হলেও চিলি কমই দেখেছে। তবে তিনি বড্ড বদমেজাজী থাকায় দলের সমূহ ক্ষতি হয় এবং সাংবাদিকদের সঙ্গেও ইংল্যাণ্ড দলের তিক্ত সম্পর্ক দেখা দেয়। কিন্তু ইংল্যাণ্ড দলের খেলোয়াড়দের বিজাতীয় মনোভাবের ব্যাপারে হেনেসকে দোষারোপ করা যায় না। চিলিতে অধিকাংশের চলাফেরা ও খেলায় প্রমাণ পাওয়া যায় তারা নিজ নিজ ক্লাবের জন্য যতখানি পরিশ্রম করতে চান, তার অর্ধেকও ইংল্যাণ্ডের জন্য দেননি। বিশ্বকাপে ওরা এসেছিল চিকিৎসক ছাড়াই। তার জন্য খেসারতও দিতে হল। ভিনা ডেল মার-এ রিজার্ভ সেণ্টার হাফ পিটার সোয়ান আঘাত পাওয়ার পর অন্যরা এগিয়ে না এলে কী ঘটত, কে জানে!

ব্ল্যাকবার্ণের বেঁটে, কুশলী রাইট আউট ব্রায়ান ডগলাস ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে খেলেছিলেন। পর্তুগালের বিরুদ্ধে কোয়ালিফাইং ম্যাচে একটি মূল্যবান গোল দিয়েছিলেন। ১৯৫৮-য় ববি চার্লটন তো ছিলেন সমালোচনার উর্ধ্বে। এই ক'বছরে তিনি আরও প্রস্তুত হয়েছেন। রাইট ইন থেকে এসেছেন লেফট

আউটে। এবং গোল দেওয়ার মাত্রাও বাড়িয়েছেন। বাঁ ও ডান দুই পায়েই তাঁর সোয়াভিং শট আগের চাইতে মারাত্মক হয়েছে।

চার্লটন অপেক্ষা সক্রিয় ও সপ্রতিভ 'বিস্ময়কর' জিমি গ্রিভস দলে এলেন। সতের বছর বয়সে এই 'ইস্ট এণ্ডার' চেলসি প্রথম ডিভিশনে খেলা শুরু করেন এবং সূচনার বছরেই সকলকে তাক লাগিয়ে দেন গোলের বন্যার দ্বারা। দ্রুততায় অতুলনীয়, গভীর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এই তরুণের বাঁ পা তো পা নয়, যেন হাতুড়ি। গোলের অনতিদূরে ডান দিকে তাঁর হঠাৎ উপস্থিতি দৈব ঘটনার মতই। জিমি এর আগের বছর সামান্য দিনের জন্য উড়ু উড়ু মনোভাব নিয়েই এ সি মিলানে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওখানকার পরিবেশ তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি। শৃঙ্খলা বলতে ওই দলে কিছুই ছিল না। তিক্ত বিরক্ত হয়ে তাই স্বদেশে ফেরেন। ফিরলেন টটেনহামে, চেলসিতে কিছুতেই নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংল্যাণ্ডে যত প্রতিভাধর ফুটবলার এসেছেন, জিমি গ্রিভস তাঁদের প্রথম সারিতেই। কিন্তু স্বদেশে ফিরে টাকার অঙ্ক কমে গেল। হেনেসের মত তাই তিনিও অনেকটা হতাশ হলেন।

পূর্ব লণ্ডনের আর একজন জাতীয় দলে এলেন। তিনি ববি মূর। ববি চিলি যাওয়ার পথে জাতীয় দলে প্রথম খেলেন পেরুতে। ইংল্যাণ্ড ওখানে ভীষণ ভাল খেলে ও ৪-০ গোলে জেতে। তিন বছর আগে এই মাঠেই ওরা ১-৪ গোলে হেরেছিল। ২১ বছর বয়সী, দোহারা, লম্বা ববি মূর রাইট হাফে দারুণ খেলেন। ববি-র এই ধরনের খেলা আগেও দেখা যায়। তখন তিনি 'যুব' দলে ছিলেন। খেলতেন ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেডে। ইংল্যাণ্ডের জাতীয় যুব দলে খেলার রেকর্ড আছে তাঁর। খেলার মাঠে মেজাজ হারানো তাঁর জীবনে কদাচিৎ ঘটেছে। এমন কি বিপক্ষের গোললাইন দুর্ভেদ্য দুর্গের মত সুরক্ষিত থাকলেও তিনি ঠাণ্ডা মাথায় এগিয়ে তাও ভেদ করতেন। তখনও মনে হত মূর খোস মেজাজেই রয়েছেন।

উইন্টারবটমের শিষ্য, ওয়েস্ট হামের ম্যানেজার রণ গ্রিণউডের কাছ থেকে দারুণ উৎসাহিত হয়ে মূর কঠোর ফুটবল সাধনায় নিমগ্ন হন। তাঁর নিখুঁত ট্যাকলিং, দূরের বল ধরা সকলকে মোহিত করল। তাঁর দুর্বলতা খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। মাঝে মাঝে ফরওয়ার্ডদেরও অনেক কাজ করে দিতেন মূর।

চিলির বিশ্বকাপে তাঁর পজিশনে ইংল্যাণ্ড দলে তিনি হলেন অদ্বিতীয়। নির্বাচকমণ্ডলী নিঃসন্দেহে সুনির্বাচন করেছিলেন মূরকে ডেকে। তবে রং

ফ্লাওয়ার্সকে অন্য উইং হাফে নিয়ে ইংল্যাণ্ড বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়নি। ৪-২-৪ পদ্ধতির খেলায় পায়ে যে তৎপরতার প্রয়োজন ফ্লাওয়ার্সের তার অভাব ছিল। তবে উপায়ও ছিল না একে না নিয়ে। ১৯৫৮ থেকে যে ববি রবসন হাফে প্রতিভাদীপ্ত বলে পরিচিত হন, লিমায় আহত হওয়ার দরুনই তিনি বাদ পড়লেন। তা না হলে ইংল্যাণ্ডের রক্ষণ ভাগের চেহারা নিশ্চয়ই অন্যরকম হত।

গোলে শেফিল্ড ওয়েডনেসডে-র দুঃসাহসী, সুদেহী ও সদাহাস্যময় রণ স্প্রিংগেটকে নিয়ে এল ওরা। ফুলহামে জন্ম, লাইনের উপর দারুণ কার্যকরী রণ কাছ থেকে জোরালো শটও করতে জানেন। তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ ছিল—দৃষ্টিশক্তি একটু ক্ষীণ থাকায় বল পরিষ্কার দেখা নিয়ে।

ব্যাকে একজোড়া দুর্দান্ত খেলোয়াড় জিম আর্মফিল্ড ও রে উইলসন। অবশ্য দুই শক্তিশালী সেণ্টার হাফ—টটেনহামের মরিস নরম্যান ও শেফিল্ড ওয়েডনেসডের পিটার সোয়ানের নাম উঠেছিল। এদের দুজনের মধ্যে আবার নরম্যানকেই সেরা মনে হত। কিন্তু সব খেলোয়াড়েরই পড়তি সময় আসে। নরম্যান, হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে এক প্রীতি ম্যাচে খেলতে গিয়ে পা ভাঙেন। সোয়ান ভিনায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন পেটের অসুখে। তারপর একটি ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ার শাস্তিস্বরূপ সাত বছরের জন্য ফুটবল থেকে বিতাড়িত হন। চৌত্রিশ বছর বয়সে আবার মাঠে নামলেও, তখন সোয়ানের আসল খেলার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়ে যায়।

সেণ্টার ফরোয়ার্ডে শ্রপশায়ারের খনি মালিক এবং দুঃসাহসী খেলোয়াড় জেরি হিচেন্সকে পাওয়া গেল। হিচেন্স এ মরশুমে গ্রিভসের মত মিলান ত্যাগ করেননি। বরং তিনি যেমন সুখে ছিলেন, তেমনি মহানন্দে মিলানের পক্ষে গোলের পর গোল দিতেও থাকেন। তিনি চিলি এলেন সকলের সানন্দ অভিনন্দন পেয়েই, সতীর্থরাও বেশ খুশি, আর তিনিও জার্সি পরলেন আপ্রাণ লড়তেই। এই বছরই ইংল্যাণ্ডের ফুটবলে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ-প্রদানের সীমা বাতিল হয়। আর নতুনদের জন্য সুযোগের দুয়ার খুলে যায়। শুধু তাই নয়, আগে এবারই দেখা গেল ইংল্যাণ্ড তার ফুটবলারদের উপর খুব খাটো করে চুল ছাঁটাইয়ের কঠোর নিয়মটি শেষবারের মত প্রয়োগ করে। এর পরে অধিকাংশকেই লম্বা চুল ও জুলপির দিকে নজর দিতে দেখা যায়। তবে লম্বা প্যাণ্ট আর ভারী বুটের যুগের অবসান ঘটে আগেই।

রান্‌কাগুয়া গ্রুপে ইংল্যাণ্ডকে ফেভারিট ধরা হল। এই গ্রুপে আর ছিল

হাঙ্গেরি, বালগেরিয়া ও আর্জেন্টিনা। ইংল্যাণ্ডের সমালোচকরা আশংকা করলেন, ওরা ভাল ফল দেখাতে পারবে না। তাদের মাঝারি কিছু নিয়েই দেশে ফিরতে হবে। ইংল্যাণ্ডের খেলার ফল বলে দিল সমালোচকদের আশংকা অমূলক নয়।

হাঙ্গেরির যদিও সম্প্রতি ইতালি 'বি' দলের কাছে হেরেছে তবুও ১৯৫৮-র চাইতে অনেক শক্তি নিয়ে চিলিতে এল। দু বছর আগে তারা বুদাপেস্টে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়েছিল। আশ্চর্য ফ্লোরিয়ান অ্যালবার্টের বুদ্ধিদীপ্ত খেলা। অনবদ্য এই সেণ্টার ফরওয়ার্ডের স্কিল হিদেকুটিকেও ম্লান করেছিল। টিশি তো ডান পায়ের মোক্ষম অস্ত্র দ্বারা বিপক্ষকে ঘায়েল করছিলেন, এঁদের সঙ্গে ছিপছিপে গোরোক্স যোগ দিলেন। ১৯৫০-এর শক্তিশালী দলের শুধু গুয়ালা গ্রসিকসকে দেখা গেল। দলে ছিলেন লম্বা, দোহারা যোগসূত্র স্থাপনকারী রাইট হাফ এর্নো সলিমসি। রক্ষণভাগে রইলেন জিব্রাল্টার পাহাড়ের মত সিপস ও মেজলি। রাইট উইং-এ দারুণ পরিশ্রমী ক্যারলি স্যাণ্ডর। কুর্ট হামরিনের মতই তিনি মোজা পরেন গোড়ালি ঘিরে।

আর্জেন্টিনার নতুন ম্যানেজার হয়ে এলেন তরুণ জুয়ান কারলস লোরেঞ্জো। ওঁরা এখন গতানুগতিক 'রোভিং' সেণ্টার হাফে বিশ্বাসী; এবং এবার ওই পজিশনে এলেন বাবুয়ানা চুলের সাচ্চি। সাচ্চি এবং শক্ত অ্যাটাকিং লেফট ব্যাক সিলভিও মার্জোলিনি দলকে প্রচুর শক্তি যোগালেন। ওঁদের সেরা স্কোরার জোসেফ সানফিলিপ্পোকে বাদ দেওয়া হচ্ছিল দীর্ঘকাল ভাল না খেলায়। লোরেঞ্জো-র কিন্তু জোসেফ-প্রীতি ছিল। তাই ওঁকে পরীক্ষা করতে নিয়ে গেলেন ডাক্তারের কাছে। মানসিক পরীক্ষাও হল। দুটি পরীক্ষাই ওঁর পক্ষে এল। বিনা দ্বিধায় লোরেঞ্জো দলভুক্ত করলেন জোসেফকে।

বালগেরিয়ার দল গড়া হল সোফিয়ার সি ডি এন এ মিলিটারি দল ঘিরেই। একটি প্লে-অফ্ ম্যাচে তারা ফ্রান্সকে হারায়, তবুও চিলিতে মনে হল তাদের তেমন শক্তি নেই। চতুর ও অভিজ্ঞ লেফট উইং ইভান কোলেভ ও তরুণ ইয়াকিমোভ কিন্তু বেশ খেললেন। স্পিড ও চমৎকার বল নিয়ন্ত্রণ এবং স্কিলের ক্ষমতা নিয়ে ফ্লাঙ্কে চলে গেলেন।

সান্টিয়াগো গ্রুপ : ইতালি, চিলি, পশ্চিম জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ড—ইতালি সান্টিয়াগোতে খেলতে এল কড়া সমালোচনা করতে করতে আগের মতই। হেরেরাই হৈ-চৈ করে বলতে লাগলেন, প্রতিবারই আমাদের

উদ্যোক্তা দেশের গ্রুপে রাখা হয়, এটা অত্যন্ত অন্যায় ও বিসদৃশ। বক্তা হিসাবেও হেরেরা কিছু কমতি ছিলেন না ; তাঁর বক্তব্য তরঙ্গায়িত হতে হতে ছড়িয়ে গেল। যেন ফণাওয়ালা কেউটে। নতুন নতুন শ্লোগান আবিষ্কার করে তা প্রয়োজন মত ব্যবহারও করতে থাকলেন। ছলে বলে কৌশলে তিনি এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করলেন যে হেরেরা বিশ্বের সবচেয়ে বিতর্কমূলক ও দামী ম্যানেজার হয়ে উঠলেন। তবে দলকেও প্রস্তুত করলেন বিশ্বকাপে লড়াইয়ের উপযোগী করেই। কিন্তু বিশ্বকাপ জয় তাদের ভাগ্যে জুটল না।

ইতিপূর্বে ইতালি দলে লেফ্‌ট ইন ফেরারিকে দেখা গেছে। মিজ্জা-র সঙ্গে ১৯৩৪ ও ১৯৩৮-এর বিশ্বকাপে তিনি খেলেছেন। তখন তো ইতালীয় ফুটবলের সুদিন। সকলেরই জানা পর পর ওই দুইবার বিশ্বকাপে ইতালি বিজয়ী হয়েছিল। মিজ্জা স্পান ক্লাবের সভাপতির সঙ্গে চিলিতে এলেও প্রতিযোগিতার শেষে ইতালীয় ফেডারেশনের খোলা চিঠিতে ইতালীয় দলের আচরণ সম্পর্কে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ইতালির ব্যাপারে তাঁর কোনো দায় দায়িত্ব নেই।

কাটানাকিও পদ্ধতি এখনও ইতালিতে বিদ্যমান এবং উদীয়মানরা তাতে বেশ রপ্তও। এবারের বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় তাদের ছোট্ট বাধা অতিক্রম করতে হয় তেল আবিবে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ইতালি ০-২ পিছিয়ে থেকেও ৪-২ গোলে জেতে। এই জয়ে সবচেয়ে কৃতিত্ব ইণ্টারের 'সম্পূর্ণ' খেলোয়াড় ভেরোনিজ ও মেরিও কোরসো-র। কিন্তু কোরসো-কে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত ফল নির্বাচনের সময় বাইশ জনের মধ্যে মনোনীত করা হল না। সান সিরোতে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিশ্বকাপ দলের বিরুদ্ধে ইণ্টারের জয়ে তাঁর গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা থাকলেও মাঠে তাঁর অসদাচরণ ফেরারি ও স্পান ক্লাব সভাপতি মিজ্জার দৃষ্টি এড়ায়নি। কোরসোকে ওই আচরণের খেসারত দিতে হল।

ফেরারি অনুসরণ করলেন পোজ্জোর পদ্ধতি। ফলে, হাস্যকর সব ব্যাপারে ঘটল। জোস আলফিনি—ইতালির মুখ্য গোলদাতা ও সেণ্টার ফরোয়ার্ড চলে গেলেন ব্রাজিলে। লুধাটো মাসিও এবং প্রতিভাবান লেফট-ইন ওমর সিভরি—যাঁর বাঁ পা-কে সকলে যমের মত ভয় পেতেন, তিনি চলে গেলেন আর্জেণ্টিনায়। দক্ষিণ আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ইতালির কোনো প্রচারই ধোপে টিকল না। তাছাড়া আর্জেণ্টিনার খেলা পড়ে সান্টিয়াগো থেকে মাত্র ৯০ কিলোমিটার দূরে রান্‌কাগুয়ায়।

কয়েকটি ইতালীয় ক্লাব দক্ষিণ আমেরিকান দলগুলির প্রশিক্ষণ শিবিরের

আশেপাশে চর পাঠিয়েই ক্ষান্ত হল না, দুজন ইতালীয়ান সাংবাদিক চিলির বিরুদ্ধে অপপ্রচারমূলক একটির পর একটি ডেসপাচ পাঠাতে লাগলেন স্বদেশের কাগজে।

ইতালির খ্যাতনামা ফুটবল সমালোচক অ্যান্তনিও ঘিরেলি-র লেখনী ব্যস্ত হয়ে পড়ল চিলির নানা সামাজিক অব্যবস্থা নিয়ে। ছোট্ট, গরিব দেশ অথচ কী তাদের অহঙ্কার! আরও ছোট বোধ হয় এদের বিশ্বকাপের সংগঠন। ঘিরেলি তুলনামূলক সমালোচনা করে লিখলেন, মুসোলিনী একদা যেমন তাঁর ক্ষুদ্র বিমান বহরকে পাঠিয়েছিলেন লণ্ডনে বোমা ফেলতে, তেমনি এদের ক্ষুদ্র ফুটবল সংগঠন জুল রিমে কাপের (বিশ্বকাপ) প্রতিযোগিতার খোয়াব দেখে এই আয়োজনে এগিয়েছে। চিলির রাজধানীতে আগন্তুকদের থাকার মত মাত্র সাতশ' শয়নকক্ষ আছে। টেলিফোনগুলি অকেজো। ইউরোপে একটি টেলিগ্রাম পাঠানোর যা খরচ, তার বদলে একজনের মাথা কেটে তার চোখ তুলে নেওয়াও যায়। একখানা এয়ার লেটার এখান থেকে ইউরোপ যেতে কমসে কম পাঁচদিন লাগে।

জানি না চিলির প্রকৃত অবস্থা কেমন ছিল। তবে মনে হয় বিদ্বেষবশতঃই ওই দুই সাংবাদিক উদ্দেশ্যমূলকভাবে ওই সব নিবন্ধ বা ডেসপাচ পাঠিয়েছিলেন। ঠিক যেমনটি সুইডেনের কিছু সাংবাদিক ১৯৩০ এর ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আগে কলকাতা সম্পর্কে নানা অপপ্রচার করে বলেছিলেন: কলকাতায় বিদেশীদের আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত নেই। কলকাতা ভিক্ষুকে ভরা। বিদেশে সংবাদ প্রেরণের আধুনিক ব্যবস্থা নেই ইত্যাদি। প্রতিযোগিতা অন্তে কিন্তু সকলেই কলকাতার ব্যবস্থাপনায় মুগ্ধ হয়ে যান।

ইতালির এক ভ্রাম্যমান সাংবাদিক তো চিলিয়ানদের সম্পর্কে অপপ্রচারের শেষ সীমায় পৌছান। আর সেই সাংবাদিক—কোরাডো পিজিনেলির লেখা পড়ে গণ্ডগোল শুরুর আগেই পিজেনেলি চিলি থেকে চম্পট দেন। তিনি লিখেছিলেন: অপুষ্টি, পতিতাবৃত্তি, নিরক্ষরতা, মদ্যপান, মিথ্যাচার ইত্যাদিতে সারা দেশ ছেয়ে আছে। আর প্রতিটি শহরেই প্রকাশ্যে পতিতাবৃত্তি চলে। অনুন্নত থাকায় চিলিকে অবশ্যই এশিয়ার ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিন্তু ওই দেশগুলি সম্পর্কে বলতে হয়—ওরা উন্নত হয়নি, আর চিলি? চিলি যা ছিল তাও নেই, পিছিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

প্রবন্ধগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয়রা উপলব্ধি করলেন: এর

প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং চিলিয়ানরা রীতিমত বিক্ষুব্ধ, আর ওই ক্ষোভ প্রকাশও করছেন বেশ চতুরতার সঙ্গেই। ক্ষোভ সবচেয়ে দানা বেঁধে ওঠে চিলি-ইতালির খেলার সময়। বস্তুত এ সম্পর্কে চিলির নাগরিকদের দোষারোপ করা যায় না। আবার ইতালির ফুটবলাররা ওই রচনাগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত মর্মাহত ছিলেন এবং সে কথা তারা জনিয়েও দেন। তাই বেচারা ফুটবলারদের প্রতি অনেকেই সহানুভূতিশীল হন।

দলে যদি 'ওরিয়ুণ্ডি' বর্তমান থাকেন, তবুও ইতালির অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ফুটবল তারকা গিয়ানি রিভেরা-র মূল্য একটুও হ্রাস পাওয়ার কথা নয়। মিজ্জার পরে ইতালিতে এমন প্রতিভাবান ও জাত খেলোয়াড় দেখা যায়নি। অথচ তাঁর বয়স মাত্র আঠার। বিশ্বকাপের আগে তিনি বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ব্রাসেলসে আর সেই খেলায় ইতালি জেতেও। রিভেরা এর আগে মিলানের আক্রমণভাগে দু-দুটি মরশুম খেলে অভিজ্ঞতা অর্জনও করেন। ময়লা, গম্ভীর প্রকৃতির অথচ হরিণ-শাবকের মত ছটফটে এই কিশোরটি ওলিম্পিকে খেলেন মাত্র ষোল বছর বয়সে, অথচ তাঁর সম্পর্কে কথাবার্তা ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞের মত শোনাচ্ছিল। রিভেরার টেকনিকে কোনো ভুল ছিল না। চেহারা লিকলিকে হলে কী হবে, বলে তাঁর চমৎকার স্ট্রোক এবং প্রতিটি পাসে অদ্ভুত কল্পনার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। রিভেরার বাবা আলেসান্দ্রিয়ার লোক, রেলকর্মী। তাঁর কাজের সূত্রে পরিবারের সঙ্গে রিভেরাও মিলানে চলে যান।

পশ্চিম জার্মানীও এই গ্রুপে ছিল। তারা এল বিখ্যাত যোদ্ধাদের নিয়ে। এলেন উয়ে জিলার, হর্স জিমানিয়াক, হ্যান শেফার, কার্ল হাই, স্নেলিঙ্গার প্রমুখ। কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে তাদের জিততে বেগ পেতে হল না গ্রীস ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। প্রতিভাবান অধিনায়ক শেপ হারবার্জারের ট্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের শেষ বিশ্বকাপে বেশ কার্যকর হল। পশ্চিম জার্মানীর শারীরিক সক্ষমতাই বিপক্ষদের সবচেয়ে চিন্তায় ফেলে। অগাস্টবের্গের হেলমুট হলারকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও হারবার্জার তাঁকে চিলিতে আসতে দিলেন না। হলারকে অপেক্ষা করতে হয় বলোগনা পর্যন্ত। তবে ফ্রিজ ওয়াল্টার বা হেলমুট রানের যোগ্য উত্তরাধিকারী পাওয়া যায়নি।

গ্রুপের চতুর্থ দল সুইজারল্যাণ্ড বার্লিনে প্লে-অফ্ ম্যাচে সুইডেনকে হারায়, তবে চিলিতে তারা আশার বাণী শোনাতে পারেনি।

স্বদেশের মাঠে চিলির দল যে আহামরি খেলবে তেমন ধারণা ওদের গোঁড়া সমর্থকদেরও ছিল না। তারা আস্থা আনতে পারেনি হাঙ্গেরির সঙ্গে ড্র বা সান্টিয়াগোয় রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই করে সামান্যের জন্য হেরেও। তবে একদা ফ্রান্সে খেলে যিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, সেই সুদর্শন ফার্নাণ্ডো রিয়েরার ম্যানেজারশিপে উঁচুদরের ফুটবলে তালিম নিয়েছিল। ৪-২-৪ পদ্ধতিতে তাদের খেলা অধৈর্য দর্শকদের বিরক্তি এনে দিল।

আরিকা গ্রুপ : উরুগুয়ে, রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, কলম্বিয়া—এক নম্বরের এই গ্রুপের খেলা পড়ল দূরবর্তী আরিকায়। এল তিনটি দৈত্য ও ফুটবলের একটি পিগমী। দৈত্যরা হল দুবার কাপ বিজয়ী উরুগুয়ে; নভেম্বরে দক্ষিণ আমেরিকা সফরকালে রাশিয়া হারায় এই উরুগুয়ে ও যুগোশ্লোভিয়াকে। পিগমী-কলম্বিয়া এল উঁচু পাহাড়ী অঞ্চল থেকে। তারা অবশ্য পেরুকে হারিয়েছিল। আরিকায় দেখা গেল বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ফুটবলার ইয়াসিন, সেকুলারাক, গনকালভেস প্রমুখকে।

উদ্বোধনী খেলা : সানটিয়াগোয় উদ্বোধনী খেলায় চিলি ৬৫ হাজার দর্শককে মাতিয়ে দিল ৩-১ গোলে সুইজারল্যাণ্ডকে হারিয়ে। চমৎকার পরিবেশে '-র বিশ্বকাপ ফুটবলের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হল। উজ্জ্বল সূর্যকিরণে বরফ ঢাকা পাহাড়গুলি অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করে। চিলির রাষ্ট্রপতি বক্তৃতা দিলেন। স্যার স্ট্যানলি রাউস বললেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণ চিলি ফুটবল ফেডারেশন সভাপতিরও। কারলস ডিটবর্ণের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন হল।

বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উদ্বেল চিলির নাগরিকরা। কিন্তু সেই উদ্দামতায় ভাঁটা এনে দেয় খেলার শুরুতেই। মাত্র সাত মিনিটের মধ্যে চিলির রক্ষণভাগের দুর্বলতায় সুইজারল্যাণ্ডের উটরিচ পঁচিশ গজ দূর থেকে দারুণ শটে ১-০ গোলে এগিয়ে যান। সুইসদের 'ভেরুয়া' ভীষণ কার্যকর ছিল তখন।

চিলির লম্বাটে শক্ত লেফট হাফ এলাডিও রজাস এবং পরম উৎসাহী রাইট ইন টোরো মাঝ মাঠে দারুণ খেলছিলেন। তবে তাঁদের 'জীবন্ত' হতে আধ ঘণ্টা কেটে যায়। বিরতির এক মিনিট আগে লাণ্ডার সেণ্টার থেকে লেওনেল সানচেজ ১-১ করেন। পেশাদার বক্সারের ছেলে সানচেজের এই গোল নানা কারণে স্মরণীয়। গ্যালারিগুলি আবার সতেজ হয় ওই গোলের সঙ্গে সঙ্গেই।

বিরতির ১০ মিনিটের মধ্যে মানসিকতার দিক থেকে চিলির অনুকূলে ছিল

খেলা। তারা সুইস রক্ষণভাগকে বারে বারে ছত্রখান করছিল। রামিরেজের গোলে চিলি ২-১ এগিয়ে গেল। এরপর সানচেজ বল ছিনিয়ে নিলেন গ্রোবাটির কাছ থেকে; তারপর একে একে কাটালেন অন্যদের। অবশেষে পঁচিশ গজ দূর থেকে জোরালো শটে ৩-১ গোলে এগিয়ে দেন চিলিকে।

দশাসই চেহারার ইলফোর্ডের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কেন্ আস্টন মুশকিলে পড়লেন খেলার জন্য দল নির্বাচন নিয়ে। খেলা শুরুর আগে যে পাঁচটি বল হাজির করা হল তার প্রত্যেকটিরই সংসেমিরা অবস্থা। প্রত্যেকটিরই গায়ের খোসা উঠে গেছে যেন। তিনি তার ভিতর থেকে একটি বেছে নিলেন, যেটির অবস্থা একটু ভাল। তখনই লোক পাঠালেন সান্টিয়াগো শহরে সুইডিশ বল আনতে। বিরতির দশ মিনিট বাদে শুই বল মাঠে পৌঁছয়। রেফারি একজন সুইস খেলোয়াড়ের নামও টুকে রাখলেন আর বললেন: যে খেলোয়াড়ের উরুতে বুটের ছটি কাঁটার দাগ আছে, সে যে খেলোয়াড় তা নিয়ে আর কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। ওদিকে আস্টন ও বিশ্বকাপের অন্যান্য রেফারিরা দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেলের এক-একটি ঘরে তিনজন করে আস্তানা নিয়েছেন। সুতরাং ঘিরেলি চিলির সংগঠন সম্পর্কে পুরোপুরি উদ্দেশ্য প্রণোদিত নিবন্ধ লেখেননি।

এই গ্রুপে পরদিন ইতালি পশ্চিম-জার্মানীর খেলায় উভয় দল অতি সাবধানী দুই বক্সারের মত খেলল চমৎকার আবহাওয়ায়। কোনো পক্ষই গোল দিতে পারল না। ইতালি খেলল আশানুরূপ। তুরিণের শক্ত হাফ ব্যাক ফেরিনি খেললেন মেকী রাইট আউটের মত। তাঁর খেলা নিয়ে সংবাদপত্রে ভীষণ সমালোচনা হল। সুইপার ছিলেন সালভেডর। ইনসাইড ফরোয়ার্ডে খেলেন রিভেরা, আলতাফিনি ও সিভরি। পশ্চিম জার্মানী এখনও তাদের 'কাটানাকিও' পদ্ধতিতে অবিচল। এদের সুইপার স্নেলিঞ্জার। দুই স্টপার এরহার্ড সুইডেনে দুর্ভেদ্য ছিলেন। এখানেও বেশ খেললেন। উইলি শুলজও দারুণ ট্যাকল করলেন। জিলারের মার একবার বিপক্ষের বারে লেগে প্রতিহত হলেও সেই শট তেমন জোরালো ছিল না। দুই দলের মধ্যে শক্তিতে ইতালিই ক্ষমতাবান ছিল, তারা স্কিলেও এগিয়ে। তবুও জিততে পারল না। সবটাই হল 'ট্যাংক-যুদ্ধ', বিমান আক্রমণ যেন তাদের অজানা ছিল। তবে তাদের কয়েকটি 'মুভ্‌মেণ্ট' সামান্য কার্যকর হলেও তার দ্বারা আসল ফল মেলেনি। অথচ মানসিকতায়, স্কিলে জয় তাদেরই প্রাপ্য ছিল। আশ্চর্য, এমন দলেও ছটি

পরিবর্তন হল চিলির সঙ্গে খেলার দিনে। আর এর ফলে তাদের সব আশা, সব ভরসা নির্মূল হয়ে গেল।

রান্‌কাগুয়ায় আর্জেন্টিনা ১-০ গোলে বালগেরিয়াকে হারানোর দ্বারা খেলা শুরু করলেও খেলাটি ছিল নিষ্প্রাণ। এই খেলার নিষ্পত্তি হয় ফাকাগুোর গোলে শুরুর একটু পরেই। একদিন বাদে হাঙ্গেরি ২-১ গোলে পরাস্ত করল ইংল্যাণ্ডকে। আর্জেন্টিনীয়রা ভয়ে ভয়ে খেলছিলেন, বিপক্ষের শরীরকে তারা দূরে সরিয়ে সরিয়েই খেলতে থাকেন। অথচ প্রত্যেকেই ছিলেন সুন্দর মজবুত চেহারার।

ইংল্যাণ্ডের ছন্দহীন আক্রমণে হাঙ্গেরির রক্ষণভাগকে তেমন বেগ পেতে হয়নি। সকলেই বিস্মিত হলেন ইংল্যাণ্ড মান অনুযায়ী খেলতে না পারায়। কারণও ছিল—জনি বিণির মত নিখুঁত ফরোয়ার্ডকে তারা সঙ্গে আনেনি। বিণি নাকি একটি লীগ ম্যাচের পরে ১৯৫৮-র বিশ্বকাপ রাইট ব্যাক ডন হাউয়ের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করেছিলেন। বিণিকে না দেখে যুগোশ্লাভ কোচ মিলোভান কিরিক মন্তব্য করেন : বিণির নয়, ক্ষতি হল ইংল্যাণ্ডেরই, কারণ, **এটা ফুটবল, এই খেলা মেয়েদের বা সাধুদের খেলার বিষয় নয়।**

হাঙ্গেরির অ্যালবার্ট বা সলিমসির মত অমন চমৎকার খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ড দলে কাউকে দেখা গেল না। অ্যালবার্টের যে গোলে হাঙ্গেরি জিতল একক প্রচেষ্টায় অমন গোল কদাচিৎ হয়। অ্যালবার্ট খেলা শেষের ১৮ মিনিট আগে ওটি দেন। টিশির কামানের গোলার মত লম্বা শটই হাঙ্গেরিকে এগিয়ে দেয় খেলার প্রথম কোয়ার্টারে। স্প্রিংগেটের দুর্বলতার প্রদর্শনী হল তখন। মেসজলি হাত দিয়ে বল ধরায় পেনাল্টি পেয়ে রন ফ্লাওয়ার্স ১-১ করেন। ২-১ গোলে হেরে ইংল্যাণ্ড মর্মাহত হয়ে কয়ার পাহাড়ে উঠল। হেনেস এক সাংবাদিককে বললেন : আপনারা চান, আমরা হারি, তাই না!

ভিনার সমুদ্রতীরের স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের বিপক্ষে মেক্সিকানরা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিল। তারা অবাক করল দর্শকদের এবং গোটা পাঁচেক স্বর্ণ সুযোগও পায় গোলের। ব্রাজিল জানত তাদের দলে কয়েকজন আছেন, যাঁরা বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন, তাঁদের খেলায় আগের সেই গতি নেই। তবুও জাগালোর খেলায় ঘাটতি দেখা গেল না। ৪-৩-৩ পদ্ধতির খেলায় পেলের কাছ থেকে চমৎকার পাস পেয়ে তাতে হেড দিয়ে ব্রাজিলের প্রথম গোলটি দিলেন।

মেক্সিকোর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গোলটি দেন পেলে। তাদের দুটি গোলই হল দ্বিতীয়ার্ধে। শেষ গোলটি হয় পেলে চারজন ডিফেণ্ডারকে কাটাবার পর।

চেকোশ্লোভাকিয়া ১-০ গোলে হারায় স্পেনকে সমাপ্তির দশ মিনিট আগে রাইট উইঙ্গার স্টিব্রানির কৃতিত্বে। স্পেনও সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু আহত রেজিয়া হয় বল দখলে রাখতে পারেননি অথবা স্যান্টামারিয়ার (১৯৫৪-র উরুগুয়ের স্টপার) পাস ধরতে অক্ষম হন। চেকদলের এগিয়ে যাওয়ার পথ অনেকটা সহজ হল। তাদের ডিফেন্স, বিশেষত গোলরক্ষক শ্রইফ শুরুর দিকে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেন স্পেনের সব আক্রমণ প্রতিহত করে। আর শেষদিকে মার্টিনেজ যখন দেখলেন তাঁর দল জিততে পারছে না, গোল দেওয়া অসম্ভব, অমনি শ্রইফের পেটে মারলেন দুম্‌ করে লাথি। চেকরাও ঠাণ্ডা হয়ে অপেক্ষা করলেন না। পরক্ষণেই তাঁরা স্পেনের খেলোয়াড়দের মারাত্মকভাবে 'ট্যাকল' করে চললেন। শ্রইফের আঘাত গুরুতর ছিল না। এর পরেও শ্রইফ যাদু দেখাতে লাগলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার পাল্টা আক্রমণ ছত্রখান করল স্পেনকে আর স্টিব্রানির গোলই তার পরিণতি। মাঝমাঠে মাসোপাস্ট আর কাসানিয়াকের চমৎকার খেলা চেকোশ্লোভাকিয়ার বিজয় ঘোষণা করল।

দূরবর্তী আম্রিকায় অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। ছোট্ট কলম্বিয়া শুরুতেই পেনাল্টি পেয়ে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ১-০ এগিয়ে গেল। কিন্তু খেলা শেষের পনের মিনিট আগে তাদের পরাজয় ঘটল ২-১ গোলে। উরুগুয়ের রাইট আউট কুবিল্লার দৌড়ের কাছে বিপক্ষরা ক্ষণে ক্ষণে পরাস্ত হয়। বিরতির পর সাসিয়ার বুলেটের মত শট কলম্বিয়ার চমৎকার গোলরক্ষক সান্‌চেজকে পরাস্ত করে।

পরদিন রাশিয়া ২-০ গোলে হারাল যুগোশ্লাভিয়াকে। তাদের দলে ১৯৫৮-র বিশ্বকাপ নায়কদের ইয়াসিন, ভরোনিন, ইভানভ, নেটো এবং দুই প্রাণবন্ত উইঙ্গার মেত্রেভেলি ও মেসকি। উঁচুমানের টেকনিক দুই দল দেখালেও খেলাটি তেমন জমেনি। যুগোশ্লাভরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করলেন। মুজিক এত বেড়ে গেলেন যে, ডুবিনস্কির পা ভাঙতে ছুটলেন। ফলও ভোগ করতে হল। মুজিককে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

লেভ ইয়াসিন এই ম্যাচে প্রমাণ করেন, বয়সের দিক থেকে বুড়িয়ে গেলেও রুশ দলে তিনি এখনও অপরিহার্য। গ্যালিক ও সেকুলারাকের দারুণ দারুণ মার তিনি অনায়াসে প্রতিহত করেন। জিপসি নাচিয়ের মত নমনীয় শুধু

নয়, এমন স্কিল, এমন শারীরিক সক্ষমতা, বিচক্ষণতা ও ঠাণ্ডা মাথায় বল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা চিলিতে আগত আর কোনো খেলোয়াড়ের নেই। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করলেন 'সেকি'-ই ১৯৩০-র প্রতিযোগিতায় সেরা ইনসাইড ফরওয়ার্ড।

রাশিয়ার দুটি গোলেই স্বাস্থ্যবান সেণ্টার ফরোয়ার্ড পোনেডেলনিকের অবদান ছিল। তিপ্পান্ন মিনিট পরে তাঁর বজ্রের মত শট বারে গিয়ে ধাক্কা খায়। পরক্ষণেই ফিরতি শটে ইভানভ পরাস্ত করেন যুগোশ্লাভিয়ার চমৎকার গোলরক্ষক সসকিক-কে। সমাপ্তির চার মিনিট আগে পোনেডেলনিক দ্বিতীয় গোলটি দেন। পোনেডেলনিক পরে অভিযোগ করেন, তাদের দলটি কেমন যেন 'ঠাণ্ডা' হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেকেই যেন নৈর্ব্যক্তিক। এমন কি এক সময়ে দেখা যায় একই ঘরে দুজনেই চুপচাপ শুয়ে আছেন পাশাপাশি অধিক রাত অবধি। কেউ কারুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলছেন না। এসব সমাজতন্ত্রের বাস্তব অবস্থা কিনা কে জানে!

সান্টিয়াগোয় দ্বিতীয় রাউণ্ডের ম্যাচে পশ্চিম জার্মানী ২-১ গোলে সুইজারল্যাণ্ডকে হারালেও ক্লান্তিকর খেলা হল। খেলার মাধুর্য আরও নষ্ট হয় জিমানিয়াকের নিষ্ঠুরতম ট্যাক্লিং-এ সুইস ফরওয়ার্ড নর্বার্ট এশম্যানের পা ভাঙলে। চতুর্দশ মিনিটের সময় এই ঘটনাটি দেখে গ্যালারিময় 'আহা-আহা' শব্দ শোনা যায়। এই অবস্থাতেও সুইজারল্যাণ্ডের খেলায় ঘাটতি দেখা যায়নি। তারা যে ২-১ গোলের বেশি হতে দেয়নি এটাই তো যথেষ্ট। জার্মানী ২-০ গোলে এগিয়েই ছিল অধিকাংশ সময়। কিন্তু স্নিটার সমাপ্তির পনের মিনিট আগে একটি গোল শোধ করেন।

এই খেলাটির ঔজ্জ্বল্য কমার যথেষ্ট হেতুও ছিল। এর আগেই চিলি-ইতালির উত্তেজনাময় খেলাটি হয়েছিল এবং সেই খেলা নানা ঘটনায় পূর্ণ ছিল। সেদিন শুধু দুজনকে বহিষ্কারই করা হয়নি; একজনের নাক ভাঙে। সারা মাঠে হিংসাত্মক ঘটনা। আসলে ইতালীয় সাংবাদিকদের দুটি প্রবন্ধ গ্যালারির দর্শকদের অগ্নিগর্ভ করে রেখেছিল। ওদিকে 'ওরিয়ুণ্ডি' ইতালিতে উত্তেজক ওষুধ খাওয়ার অভিযোগে হালফিলে বেশ বদনাম কিনেছিল। চিলির বিরুদ্ধে খেলার সময় দর্শকদের বোধহয় সব ঘটনাই মনে পড়েছিল। মাঠে মারামারি উত্তেজক ওষুধ খাওয়ারই পরিণতি বলে ওদের ধারণা হল। ইতালির বাদ পড়া খ্যাতনামা খেলোয়াড় ওমর সিভরি পরে অভিযোগ করেন: আমি খেলার আগের দিন মাঝরাতে শুনেছিলাম পাওলো মাজ্জা ও দুই

প্রভাবশালী সাংবাদিকই স্থির করেন ইতালি দলে কে কে খেলবেন। তাঁরা ষড়যন্ত্রও করেছিলেন। অন্য সূত্রে জানা যায় সিভরিকে এই ম্যাচে নামাবার কথাই ওঠেনি। কারণ তিনি বড্ড বদমেজাজী। তাছাড়া মাঠে কোনোরকম গণ্ডগোল বাধলে, তা থামানো তো দূরের কথা, বরং বেপরোয়া ঘুষি চালাতেন।

ইতালির খেলোয়াড়দের সম্পর্কে তাঁদের দেশের সাংবাদিকরাই লিখলেন: চিলিয়ানরা সহজেই ওদের প্ররোচিত করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং তারাই আগে মুখে থুতু ছুঁড়ে দেয়। ইতালির খেলোয়াড়রা কিন্তু অভিযোগ করেন: হিংসাত্মক প্ররোচনার কাজে ঢ্যাঙা রেফারি কেন্ আস্টন কম দায়ী ছিলেন না। এরপর বিশ্বকাপের বাকি খেলাগুলিতে তাঁকে আর ম্যাচ পরিচালনা করতে দেখা যায়নি। আস্টন বলে বেড়াতে থাকেন: ওই ম্যাচটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। লা' ইকুইপের সংবাদদাতা মন্তব্য করলেন: ইংলিশ রেফারি আস্টনের ওই ম্যাচ পরিচালনার ক্ষমতাই ছিল না। তিনি সর্বদাই সতর্ক ছিলেন জনগণের বক্তব্য সম্পর্কে। আর তাই করতে গিয়ে প্রাণবন্ত ম্যাচটিকে রাস্তার লড়াইয়ে পরিণত করেন। এই খেলার পর আস্টনের মূল্য যেন বেড়েই গেল দিনের পর দিন। ফিফা রেফারি কমিটিতে তাঁর স্থান হল এবং ও বিশ্বকাপ ফুটবলে রেফারিদের উপর কড়া নজর রাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁরই কাঁধে পড়ল।

একথা অনস্বীকার্য, আস্টন তাঁর দুই লাইন্সম্যানের সহযোগিতা পাননি। লাওনেল সানচেজ আস্টনের পিছন থেকে ম্যাসিও-র নাকে বাঁ হাতে প্রচণ্ড ঘুষি চালালেন। ঘটনাটি দুই লাইন্সম্যান ও রেফারির দৃষ্টি এড়ায়। অথচ ওই ঘটনায় দুনিয়ার তাবৎ টেলিভিশন দর্শকরা শিউরে ওঠেন। ম্যাচ পরিচালনাকারীদের কেউ না দেখায় সান্‌চেজ মাঠে রয়ে গেলেন যথারীতি। কিন্তু ফেরিনি কর্তৃক লাণ্ডা ধরাশায়ী হলেন সপ্তম মিনিটে। আর ডেভিড বদলা নিলেন সান্‌চেজের মাথায় লাথি মেরে। রেফারি বা লাইন্সম্যান এবার আর চোখ বুঁজে রইলেন না। ফেরিনি ও ডেভিডকে মাঠের বাইরে পাঠানো হল। ইতালি নয়জনে খেলতে লাগল। তারা সমাপ্তির পনের মিনিট আগে পর্যন্ত সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করল। লাওনেল সান্‌চেজের ফ্রি-কিকে রামিরেজ হেড দিতেই চিলি ১-০ গোলে এগিয়ে গেল। শেষ মিনিটে টোরো ২-০ করলেন। বলাবাহুল্য এদিনটি ছিল ফুটবলের ইতিহাসে অন্যতম ভয়ঙ্কর দিন।

এই গ্রুপে পশ্চিম জার্মানী বেশ সহজেই ২-০ গোলে চিলিকে হারায়। ইতালি ৩-০ গোলে হারাল সুইজারল্যাণ্ডকে। সুতরাং চিলি ও পশ্চিম জার্মানী কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল।

রান্‌কাগুয়ায় ইংল্যাণ্ড ভাল খেলল শেষদিকে, তারা ৩-১ গোলে হারাল আর্জেন্টিনাকে। ১৯৫৪-র বিশ্বকাপের পর কোয়ালিফাইং রাউণ্ডের বাইরে এটি তাদের প্রথম জয়লাভ।

এই সুফলের জন্য অনেকটা সাহায্য করে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে রদবদল হওয়ায়। এর আগে হিচেন্স অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ফুটবল খেলেন। আর্জেন্টিনার সঙ্গে তাঁর বদলে মিডলবরোর লম্বা, ক্রুকাট চুলের রক্ষীর চেহারার অ্যালান পিককে নামানো হল। নাভারো-র মার রিসিভ করা দুঃসাধ্য হলেও অ্যালান শূন্য থেকেই তাঁর সুবাদে বলগুলো সহজেই ধরতে থাকেন। শান্ত পিকক স্মিত হেসে নিজের সম্পর্কে দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন: আমার এই খেলা নিশ্চয়ই আপনারা পছন্দ করেন, তাই নয় কি? তবে কী জানেন, এই খেলার পরে সকালের দিকে আমার গলাটা কাঠের মত শক্ত হয়ে থাকে।

পিককের এটি প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ হলেও, অভিজ্ঞের মতই খেললেন এবং সপ্তদশ মিনিটের পবে ইংল্যাণ্ড যে গোলটি দেয়, তাতে তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। চার্লটন দ্রুত এগিয়ে সেণ্টার করলে পিকক তাতে মাথা ঠেকিয়ে দেন। বেগতিক বুঝে নাভারো বল ঠেকালেন হাতে। ফ্লাওয়ার্স পেনাল্টি থেকে ১-০ করলেন। সিরিজে ফ্লাওয়ার্সের এটি দ্বিতীয় গোল। প্রথমটিও দিয়েছিলেন পেনাল্টি থেকেই।

আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও খেলায় তেমন সংহতি ছিল না। সাচ্চি এবং মার্জোলিনি চমৎকার খেলতে থাকেন। কিন্তু মূর ও ফ্লাওয়ার্স দারুণ ট্যাকল করলেন। জিমি আর্মফিল্ডকে ভেদ করা দুঃসাধ্য ছিল। ব্রায়ান ডগলাস হাঙ্গেরির সঙ্গে যেমন প্রাণবন্ত ফুটবল খেলেছিলেন, এদিন তদপেক্ষা অনেক অ-নেক কার্যকর মনে হল। চার্লটন ডান পায়ের নিচু শটে বিরতির আগে ২-০ গোলে এগিয়ে দিলেন ইংল্যাণ্ডকে। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে ডগলাস প্রতিপক্ষকে বোকা বানিয়ে মর্মর-মূর্তির মত দাঁড় করিয়ে রেখে ডান পায়ে জোরালো শট মারলেন। রোমা কোনো রকমে ওটি পুশ করলেও গ্রিভসের রিটার্ণ শট ঠেকাতে পারলেন না। ইংল্যাণ্ড ৩-০ গোলে এগিয়ে গেল। দেরিতে হলেও আর্জেন্টিনার সানফিলিপ্পো একটি

গোল শোধ করলেন। ড্রেসিংরুমে ম্যানেজার লোরেঞ্জো তাঁকে চুমু খেলেন। সাবাস বলে অভিনন্দিত করলেন। তবে পরাজয়ে সানফিলিপ্পো কান্নায় ভেঙে পড়ে নিজের ভাষায় বলতে থাকেন 'মুই বিয়েন, জুয়ান কার্লোস'।

এই গ্রুপে হাঙ্গেরির খেলা ছিল সব চাইতে তুঙ্গে। বালগেরিয়াকে তারা ৬-১ গোলে হারায় এবং নেমেই প্রথম মিনিট না কাটতেই অ্যালবার্ট ১-০ করেন। বারো মিনিটের মধ্যে হল ৪-০। অ্যালবার্ট ও গেরোকস বল দেওয়া-নেওয়া করে সর্বদা এগোতে থাকেন ১৯৬০-এর রোম ওলিম্পিকসের মতই। ইলিয়েভ ও ডিয়েভকে বাদ দিয়ে বালগেরিয়ার কিছু করার তেমন শক্তি ছিল না। তাছাড়া গোলের বন্যায় ওরা আক্রমণ রচনার আগেই ভেসে যেতে থাকে। হাঙ্গেরি বর্ণময় ফুটবল খেলল সলিমোসি, অ্যালবার্ট, গেরোকস প্রভৃতির সমন্বয়ে। তাদের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল আবার হাঙ্গেরি যেন বোজসিক, হিদেকুটি ও পুসকাসের যুগে ফিরে এসেছে। অ্যালবার্ট তিনটি গোল দেন। ফল হল ৬-১।

গ্রুপের শেষ খেলায় হাঙ্গেরির বিচক্ষণ কোচ লাজোস বারোটি দলের সদস্যদের উপদেশ দিলেন: এই ম্যাচে খামোকা বেশি পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। একটি পয়েন্ট হলেই যথেষ্ট। আর্জেন্টিনার সঙ্গে ০-০ করল ওরা। অ্যালবার্ট ও স্যাণ্ডোর বিশ্রাম নিলেন। অষ্টাদশ মিনিটের সময় গেরোকসের একটি পেশী ছিঁড়ে গেল। সুদেহী মেজলি স্টপারে এত চমৎকার খেললেন যে, মাঠের বাইরেও ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা তাঁকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করলেন।

তবে পরদিন ইংল্যাণ্ড অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ফুটবল খেলল বালগেরিয়ার বিরুদ্ধে। তারা ০-০ ড্র করল কোনোক্রমে। বরং বেঁচে গেল—আর্মফিল্ডের কৃতিত্বে। গোললাইনের উপর দাঁড়িয়ে তিনি কোলেভের ক্রশ পাসটি ঠেকান। বালগেরিয়ার দুর্ভাগ্য কোলেভের ওই পাসে কেউ একটু পা ছোঁয়াজেন না। গ্রুপে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় স্থান হল এবং ভিনা ডেল মার-এ ব্রাজিলের মত শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। অর্থাৎ সামনে তাদের দারুণ সংকট। আর রান্‌কাগুয়ায় হাঙ্গেরি মুখোমুখি হল চেকোশ্লো-ভাকিয়ার এবং সহজেই জিতল।

ভিনা গ্রুপে ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসে অঘটন ঘটে গেল। উরুর পেশী ছিঁড়ে যাওয়ায় পেলে বিদায় নিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে খেলায়।

খেলাটি ০-০ হয়েছিল। পঁচিশ মিনিটের পরে গ্যারিঞ্চার কাছ থেকে বল পেয়ে পেলে পঁচিশ গজ দূর থেকে তীব্র শট করলে সেটি পোস্টের নিচের দিকে লেগে ফিরে আসে। ওই শটের সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে যান ও তাঁকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পেলে তখনই ১৯৩০-র বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেন।

উইং-এ পেলে বিহীন ব্রাজিলের কথা অচিন্ত্যনীয়। তারা দুর্বলও বটে। ড্র হল, কিন্তু ভাভা ও গ্যারিঞ্চা রক্ষণভাগে চলে গেলেন। চেকরা কোনো-রকমে আত্মরক্ষা করেই সন্তুষ্ট রইল। ব্রাজিলের আক্রমণে আর বিস্ফোরণ দেখা গেল না। তবে চমৎকার খেলল সারাক্ষণ। কিন্তু দর্শকরা খুশি হতে পারেননি। ব্রাজিল ড্র করুক এ তাদের মনঃপূত ছিল না।

ব্রাজিলের তূণে শরের অভাব ছিল না। টেনে বের করলেন বোটাফোগোর চব্বিশ বছর বয়সী লেফট ইন আমারিল্ডো-কে। পেলে নেই, কিন্তু নমনীয় অথচ বেগবান, উৎসাহী এবং সর্বদা গোল দিতে উদ্যোগী এই আমারিল্ডো কমতি ছিলেন না। উচ্ছ্বাসপ্রবণ, ফর্সা, বাবরি চুলের এই খেলোয়াড় শুরু থেকেই দর্শকদের করতালি কুড়োলেন। পেলের শূন্যস্থানে এসে তিনি অনেকটা ব্যবধান কমিয়ে দিলেন। উপরন্তু ভিনা ব্রাজিলের অনুকূলেই ছিল। একদল ছাত্র প্যারামিলিটারির মত লাল জ্যাকেট ও নীল ট্রাউজার্স পরে গ্যালারিতে বসে প্রতিটি খেলার শুরু থেকে শেষ একই সুরে উৎসাহিত করল।

গ্রুপের শেষ ম্যাচে স্পেনকে ভীষণভাবে যুঝতে হল মেক্সিকোর সঙ্গে। শেষ মুহূর্তে পিরোর গোলে স্পেনের জয় হয়। আর্জেন্টিনার স্কোপেনির প্রশিক্ষণে মেক্সিকো সারাক্ষণ দারুণ লড়েছিল। মেক্সিকোর কারবাজল তাঁর চতুর্থ বিশ্বকাপে নিখুঁত একটি গোল থেকে ব্যর্থ হলেন। এখন স্পেনের দরকার একটি জয়—কোয়ালিফাই করার জন্যই। হেরেরা ঝুঁকি নিলেন দুই বিখ্যাত ফরওয়ার্ড সোল ও সুয়ারেজকে বাদ দিয়ে। বাদ দিলেন গোলরক্ষক কারমেলো ও সেন্টার হাফ সান্তামারিয়াকেও। এখন পুসকাস আক্রমণ রচনার দায়িত্ব নিলেন আটলেটিকো মাদ্রিদের তিনজনকে দিয়ে। উড়ন্ত পাকো জেন্টো রইলেন লেফট আউটে। এই খেলায় ডিডি মাদ্রিদের বদলা নেওয়ার পরিকল্পনা করেন ডি স্টিফানোর উপর। মাদ্রিদে তিনি ডিডিকে অপমান করেছিলেন। কিন্তু বদলা নেবেন কি করে? ডি স্টিফানো তো খেললেন না আহত থাকায়। নিজের যুগের শ্রেষ্ঠ চৌখস ফরওয়ার্ড ডি স্টিফানো বিশ্ব-কাপের একটিও চূড়ান্ত পর্যায়ের ম্যাচে অংশ নিতে পারেননি।

'নতুনদের' নিয়ে গড়া স্পেন দারুণ আশা নিয়ে খেলল। খেলার আগে এমন প্রচার করল যেন তারাই বিশ্বকাপ পেতে চলেছে। কিন্তু খেলার শুরুতেই বোঝা গেল ওই সব ফুলে সৌরভ নেই। তবে এটি ছিল প্রতি-যোগিতার অন্যতম সেরা ম্যাচ। ব্রাজিলকে এই ম্যাচে জিতিয়ে দেয় গ্যারিঞ্চার হঠাৎ একক দারুণ লড়াই।

ইণ্টারের সঙ্গে থাকাকালে হেরেরা 'কাটানাকিও' পদ্ধতির বড় প্রবক্তা ছিলেন, এখন তিনি তা স্পেনে প্রয়োগ করলেন। রডরি খেললেন সুইপার হিসাবে। বাকি ডিফেণ্ডাররা প্রহরা দিলেন বিপক্ষের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে। এক ঘণ্টা যাবৎ স্পেনের এই ট্যাকটিক্‌স দারুণ কার্যকর হল। তারা ঘন ঘন ব্রাজিলকে আক্রান্তও করে। ব্রাজিলও সর্বশক্তি নিয়ে লড়ছে। চৌত্রিশ মিনিটের পরে পুসকাস ড্রিবল করে দারুণ পাস দিতেই এডেলার্ডো ভুল করেননি। স্পেন ১-০ গোলে এগিয়ে গেল।

আটত্রিশ মিনিট পর্যন্ত স্পেনের অগ্রগমন অব্যাহত রইল। তাদের ড্রাইভ এবং দ্রুতগতির খেলা ও ঘন ঘন আক্রমণ আরও একটি গোলের সুযোগ এনে দেয় পিরোর মাধ্যমে। পরক্ষণেই ব্রাজিলের আমারিল্ডো হঠাৎ আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দেন এবং জাগালোর সেণ্টারকে কাজে লাগিয়ে ১-১ করলেন। আবার স্পেন তেড়ে ফুঁড়ে এগোয় ও ভাগিস গোল দিয়েছিলেন প্রায়। সমাপ্তির চার মিনিট আগে বিদ্যুতের মত চমক দেখা গেল গ্যারিঞ্চার খেলায়। তাঁর ক্রশ পাসে হেড দিয়ে আমারিল্ডো জয়সূচক গোলটি দেন। ব্রাজিল জিতল ২-১ গোলে। খেলাটা হয়েছে তুল্যমূল্য। তবে স্পেন ভাল খেলেই হেরে গেল। ভাগ্য তাদের প্রতি অবিচারই করেছে বলব।

গ্রুপের শেষ খেলায় অভাবনীয় ফল হল। মেক্সিকো ৩-১ গোলে হারিয়ে দিল চেকোশ্লোভাকিয়াকে। অথচ মাঠে নেমেই চেকোশ্লোভাকিয়া গোলটি করে। পরে শোনা যায় চেকোশ্লোভাকিয়া ইচ্ছে করেই ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছিল। তারা বুঝেছিল কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের চাইতে হাঙ্গেরির মুখোমুখি হওয়া নিরাপদ। মেক্সিকোর সঙ্গে ২-১ বা ৩-১ গোলে হারলে বা ড্র হলেও গ্রুপে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্থান দ্বিতীয়ই হত। বিশ্বকাপ ফুটবলে চিরকাল মেক্সিকো মাঝামাঝি ধরনের ফল দেখালেও এটি ছিল তাদের সেরা খেলাগুলির অন্যতম।

কারবাজাল সেদিন নিজের তেত্রিশতম জন্মতিথি উদ্‌যাপন করেন এবং

যখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে মাসেক ১-০ গোলে চেকোশ্লো-ভাকিয়াকে এগিয়ে দেন। ধাক্কা কাটিয়ে উঠে দ্বাদশ মিনিটে মেক্সিকো ১-১ করে। রিয়েসের ক্রশ পাস পেয়ে মারাত্মক ড্রিবল করে রাইট আউট ডেল আগুইলা বল বাড়িয়ে দিতেই ভিয়াজ ১-১ করেন। মেক্সিকো-কে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন ডেল আগুইলা। শেষ মিনিটে পেনাল্টি হয় লালা বল ধরায়। এইচ হারনাণ্ডেজ ৩-১ গোলে দলকে জিতিয়ে নিতে ভুল করলেন না। যোগ্যতা অর্জন করায় সম্ভবত চেকোশ্লোভাকিয়া গা ছাড়া ফুটবল খেলেছিল। কিন্তু মেক্সিকোর ফুটবলে এ জয় কম উদ্দীপনা আনেনি।

অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়া-হাঙ্গেরি খেলা রান্‌কাগুয়ায় এবং ইংল্যাণ্ড গেল ভিনায় ব্রাজিলের মুখোমুখি হতে। বালগেরিয়ার সঙ্গে নিষ্প্রভ খেলে ইংল্যাণ্ড ০-০ করার পর ড্রেসিংরুমে হেনেস ক্ষোভের স্বরে বললেন এক সাংবাদিককে : এটা মনে করবেন না আপনাদের লেখনী ব্রাজিলের বিরুদ্ধে জয় এনে দেবে।

আরিকা-য় এক নম্বর গ্রুপের খেলায় অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। বিশ্বকাপের একমাস আগে মস্কোয় রাশিয়া ৫-০ গোলে উরুগুয়েকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। কিন্তু চিলিতে এসে রাশিয়া দেখল উরুগুয়ের রূপ দুটি। সে বিশ্বকাপে ও বিশ্বকাপের বাইরে দুই মূর্তিতে খেলে। দলেও নানা পরিবর্তন। উননব্বই মিনিট লড়াইয়ের পর রাশিয়া ২-১ গোলে জিতল অতি কষ্টেই এবং দৈবক্রমে। এলিসিও আলভারেজ আহত হওয়ায় উরুগুয়েকে একঘণ্টা খেলতে হল দশজনে, এবং তখন থেকেই তারা চমৎকার উইঙ্গার ডোমিঙ্গো পেরেজকে নামিয়ে আনে। মামিকিনের গোল সাশিয়া শোধ করেন পঞ্চাশ মিনিট পরে। সাশিয়ার তিনটি জোরালো শট রাশিয়ার পোস্টকে ধাক্কা দেয়। ওদের ৪-২-৪ পদ্ধতির খেলায় নিঃসন্দেহে নেস্টর গনকালভেস তাঁর সেরা স্কিল দেখালেন মাঝমাঠে।

তবে রাশিয়া দ্বিতীয় খেলায় মোটেই নপ্রতিভ ছিল না। কলম্বিয়া বিস্মিত করে দিল ৪-৪ ড্র করে। 'লা একুইপের' বার্ষিক সংখ্যায় এই ম্যাচ সম্পর্কে লেখা হল, 'আধুনিক ফুটবলের অন্যতম বড় বিস্ময়কর ঘটনা।'

আটষট্টি মিনিট পরেই সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। কর্ণার থেকে সরাসরি গোল হল লেভ ইয়াসিন থাকা সত্ত্বেও। হঠাৎ কলম্বিয়া দারুণ খেলা শুরু করল। ওদের ইনসাইড ফরওয়ার্ড ক্লিঙ্গার রুশ ডিফেন্সে ঘন ঘন রন্ধ্র তৈরি

করতে লাগলেন। রুশরা শুধু ছোটাছুটি করতে লাগলেন মাঠময়। রাডা তৃতীয় গোলটি দিলেন। তারপর ক্লিঞ্জার করলেন ৪-৪। 'লা ইকুইপ' লিখল এই নিয়ে-নিঃসন্দেহে দিনটি ঐতিহাসিক। আধুনিক ফুটবলের সেরা গোলরক্ষকের ক্রীড়া-জীবনের পরিসমাপ্তি এই খেলাতেই। ইয়াসিন শুধু বর্তমানের নয়, সম্ভবত সর্বকালের সেরা। কিন্তু তাঁর এ পরিণতি সুখকর ছিল না।

ওদিকে যুগোশ্লাভিয়া গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ৩-১ গোলে উরুগুয়েকে হারিয়ে দিয়েছে। সেকুলারাক সেদিন বোধহয় তুঙ্গে ছিলেন। যেমন তাঁর বল নিয়ন্ত্রণ, তেমনি অনবদ্য আক্রমণ রচনা। খেলা শেষে শুধু খেলোয়াড়রা নন, উপস্থিত উরুগুয়েনরা তাঁকে কাঁধে তুলে নাচলেন। তাঁর নিখুঁত টেকনিক, ভেবে-চিন্তে পাস, বিপক্ষের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় অদম্য শক্তি যুগোশ্লাভিয়াকে দ্রুত এগিয়ে যেতে সাহায্য করে শুরুতে উরুগুয়ের গোল দেওয়া সত্ত্বেও। তাঁর সতীর্থরাও শক্তিমান ছিলেন: ফলে দ্বিগুণ শক্তি প্রয়োগ করতে সমর্থ হয় যুগোশ্লাভরা। গালিক ও জারকভিক দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গোলটি দেন। তরুণ লেফট উইঙ্গার জসিপ স্কবলার দিয়েছিলেন প্রথমটি। পেনাল্টি স্পট থেকে জোরালো শটে তিনি উরুগুয়ের কাবরেরা-র দেওয়া গোলটি শোধ করেন।

তৃতীয় খেলায় যুগোশ্লাভিয়া ৫-০ গোলে হারাল শ্রান্ত ও ক্লান্ত কলম্বিয়াকে। জারকভিক দিলেন তিনটি। গ্রুপে যুগোশ্লাভিয়ার দ্বিতীয় স্থান। কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আবার পশ্চিম জার্মানী। বিশ্বকাপে যুগোশ্লাভিয়া তৃতীয়বার ওদের মুখোমুখি হল।

কোয়ার্টার ফাইনাল

ব্রাজিল : ইংল্যাণ্ড—ভিনায় চমৎকার পরিবেশে খেলা হল। একদিকে সমুদ্রের গর্জন। তার ঘূর্ণিঢেউ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল সামুদ্রিক কুয়াশা। আর রইল সেই সাম্বা ব্যাণ্ডের বাদ্য। সবার উপরে গ্যারিঞ্চার নাম ব্রাজিলের পক্ষ বা বিপক্ষের সকলের মুখে। সকলেরই ধারণা গ্যারিঞ্চা একাই ইংল্যাণ্ডের বিপর্যয় আনার পক্ষে যথেষ্ট। পেলে থাকলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু পেলে হীন ব্রাজিলে এখন গ্যারিঞ্চাই মধ্যমণি। গ্যারিঞ্চাকে অসীম ও বহু গুণাবলীতে ভূষিত করলেন সংবাদপত্র ও সমালোচকরা। কোয়ার্টার ফাইনালে গ্যারিঞ্চা

প্রশস্তি অনুযায়ী খেলারও আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ওদিকে ইংল্যাণ্ডের উইলসনও লড়তে থাকেন সাধ্যানুযায়ী। কিন্তু তাঁর সাধ্য কতটুকু—গ্যারিঞ্চা কি তাতে ঘায়েল হন? চিতাবাঘের মত লাফিয়ে তাঁর জোরালো সোয়াভিং শটের কথা অনেকেরই জানা। আর সেই শট গোললাইন অতিক্রম করবেই। তবে সুইডেনে ১৯৫৮-য় বিশ্বকাপে গ্যারিঞ্চার যে সব গুণ ছিল, এবার তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে দু' পায়ে আরও অস্বাভাবিক শক্তি এবং তা শূন্যের বলগুলিতেও। ব্রাজিলের প্রথম গোলটি একত্রিশ মিনিট পরে। কর্ণার-কিকের উঁচু বলটিতে হেড দিয়ে ক্লিয়ার করার জন্য ইংল্যাণ্ডের মরিস নরম্যান লাফালেন পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। গ্যারিঞ্চা দেখলেন, মরিসকে হারাতে গেলে আরও উঁচুতে উঠতে হবে। গ্যারিঞ্চা লাফালেন ছয় ফুট দুই ইঞ্চি, গ্যারিঞ্চার এই হেড কিন্তু হঠাৎ নয়, ইতিপূর্বেও তিনি ওই নাজর দেখিয়েছেন একাধিকবার।

রণ ফ্লাওয়ার্সেরই কয়েকটি মারাত্মক ভুলে ব্রাজিল ২-০ গোলে এগিয়ে গেল। স্প্রিংগেট যত ভালই ধরুন, প্রথম দুটি গোল ঠেকানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফ্লাওয়ার্স ডান পায়ে বলটি ধরবেন, কিন্তু তা না করে হঠাৎ ঘুরে সেই বল নিজের গোলের দিকে মারলেন। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন আমারিল্ডো। সামনে শুধু স্প্রিংগেট। তাঁর উচিত ছিল আমারিল্ডোর পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু অত দ্রুত হয়ত সে সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারেননি। এই গোলের জন্য পরে সব দোষ স্প্রিংগেটের কাঁধেই চাপানো হয়।

প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডের ফরওয়ার্ডরা এদিন আর একটি বাজে ম্যাচ খেলল। জিমি গ্রিভসও বাদ পড়লেন না এই অভিযোগ থেকে। কয়ায় তো তিনি বলেছিলেন: এখানে কিছু ভাল দলও বাজে ম্যাচ খেলল। আসলে প্রত্যেকে ভীত ছিল, আর দূরে দূরে দাঁড়িয়ে খেলেছে। চিলির এই কোয়ার্টার ফাইনালেও দেখা গেল গ্রিভস দ্বিতীয়ার্ধে একই পদ্ধতিতে খেলেছেন। বিপক্ষের শরীরের কাছাকাছি যাচ্ছেন না কিছুতেই। তবে প্রথমার্ধে একটি ফ্রি-কিকে গ্রিভস হেড দিলে সেটি বারে লাগে। ওই বলেই হিচেন্সের শট দ্বারা ১-১ হয়।

দ্বিতীয়ার্ধের পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গ্যারিঞ্চা খেলার নিষ্পত্তি করে ফেলেন। চুয়ান্ন মিনিট পরে তাঁর দুর্ধর্ষ ফ্রি-কিক স্প্রিংগেটের বুকে লেগে ফিরে আসতেই ভাভা সহজেই গোল করলেন, অনেকটা হিচেন্সের মতই। এরপরে তাঁর দুর্দান্ত দূরের সোয়াভিং শট গোলরক্ষককে পরাস্ত করে, ডান দিকের পোস্ট ঘেঁষে

গোলে প্রবেশ করায়। খেলা শেষে ব্রাজিল রেডিওর রিপোর্টাররা ড্রেসিংরুমে ঢুকে মহানন্দে নিজেদের মাইক্রোফোনে বক্তৃতা শুরু করে দেন।

ব্রাজিল যোগ্য দল হিসাবেই জিতল। কিন্তু তাদের খেলায় সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। কড়া সমালোচনা করলেন ফেরেঙ্ক পুসকাস। তিনি বললেন: ব্রাজিল অত্যন্ত ঢিলে হয়ে গেছে, তাদের খেলায় আগের সে গতিবেগ নেই, সবচেয়ে বড় কথা, তারা অত্যন্ত রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলল। আমি কখনও রক্ষণাত্মক ফুটবল পছন্দ করি না। আমি চাই খেলার ফল হোক ৫-৪ বা ৫-৩ গোলে, জয়-পরাজয় বা হারও হবে অমন সংখ্যক গোলেই। তবে এখানে তো ফুটবল খেলা হচ্ছে না। এটা যুদ্ধক্ষেত্র। খেলা সামান্যই, গোল আরও কম। ১৯৫৪-য় ফুটবল খেলা হয়েছিল অনেক বেশি পরিমাণে। ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে ওরা ফুটবল খেলেছিল।

পুসকাস এসব কথা বলে সহজে পার পেলেন না। আট বছরের মধ্যে তাঁর হাঙ্গেরিকে তো বিশ্বকাপের আশাই ত্যাগ করতে হয়। উপরন্তু ১৯৫৪-য় কী হয়েছিল? তিনি নিজেও কী লাথি খাননি সেবারের ফাইনালে?

যুগোশ্লাভিয়া : পশ্চিম জার্মানী—যুগোশ্লাভিয়া বিমানে সান্টিয়াগোয় পৌঁছল পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে খেলার জন্য। তারা উঠল এম্পারাডোর হোটেলে। শহরের প্রধান সড়ক—আভেনিদা বার্নার্ড ও হিগিনসের এই এলাকাটি সবদা চঞ্চল, সর্বদাই হৈ-চৈ ওখানে। সর্বদা মানুষের মিছিল, নানা রং-এর বাস যাতায়াত করে। মনে হবে যেন একটি বড় আধুনিক আস্তাকুড়। মাঝে মাঝেই আবার নানা ধরনের ফেস্টুন নিয়ে দেশাত্মবোধক শ্লোগান। যুগোশ্লাভ ম্যানেজার মিলোভান কিরিক এসব নিয়ে কোনো অভিযোগ করলেন না। টাক মাথার, ঠাণ্ডা মেজাজের কিরিকের মন খারাপ ছিল দলে ভাল উইঙ্গার না থাকায়। যদিও কোভাসেভিক ও স্কবলার পরবর্তীকালে ফ্রান্সে দারুণ নাম কিনেছিলেন। দুবলতা সত্ত্বেও ম্যানেজার জানালেন: আমি জানি, কেমনভাবে পশ্চিম জার্মানীর শারীরিক সক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

ইংরাজদের পদ্ধতিতে রদবদল চলে না। ওদের পদ্ধতি নমনীয় হওয়া উচিত—বললেন তিনি। কেন সব সময় উইং হাফ থেকে লেফ্ট ইন, লেফ্ট ইন থেকে রাইট আউট ও পরে ক্রশ হবে? আমাদের যদি চার্লটনের মত লেফ্ট আউট থাকত—কাপ আমাদের দখলেই যেত।

ভাগ্য পরীক্ষায় যুগোশ্লাভিয়া তৃতীয় বার জয়ী হল। জার্মানীর শারীরিক সক্ষমতা বা সুদেহ যুগোশ্লাভিয়ার ফিটনেসের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারল না। জার্মানী আবার 'কাটানাকিও' পদ্ধতিতে খেলল। আর যুগোশ্লাভরা ৪-২-৪ পদ্ধতিতে। দারুণ দ্রুত ও দর্শনীয় ফুটবল দেখল সান্টিয়াগোর দর্শকরা। সারা ম্যাচে শুধু ট্যাকটিক্‌সেরই প্রাধান্য এবং ঐ ট্যাকটিক্‌সই খেলার নিষ্পত্তি করল। জার্মানরা খেলল বেশ মেপে মেপে এবং সাবধানে। আর তার মূল্য দিতে হয়েছে। যুগোশ্লাভিয়ার বেঁটে রাইট হাফ রাডাকোভিক ওদের অতি সাবধানতার মধ্যে ফোকর খুঁজে নিয়েই ঘায়েল করে দিয়েছিলেন।

জার্মানরা লম্বা লম্বা পাসে খেললেন, যুগোশ্লাভরা ছোট ছোট পাসে। বেশ খানিকক্ষণ জার্মানদেরই প্রাধান্য ছিল। জিলারের একটা তীব্র শট লাগল যুগোশ্লাভের গোলপোস্টে। আধঘণ্টা পরে যুগোশ্লাভরা যেন দম পেল। বল তারপর সর্বদা যেন ওদের পায়ে, ওদের মাথায়। দ্বিতীয়ার্ধে উত্তেজনার কমতি না থাকলেও প্রথমার্ধের মত মনে হল না। উভয় দলকে এবার বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। স্নেলিঙ্গার বারংবার নিজের জায়গা ছেড়ে সুইপার হিসাবে খেলতে গিয়ে আক্রমণে সহায়তা করলেন। তাঁর কৌশলে কয়েকটি গোলেরও সুযোগ আসে। যুগোশ্লাভদের প্রধান হাতিয়ার রাডাকোভিক। জিলারের সঙ্গে ধাক্কায় তিনি আহত হলেন ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে খেলা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তাঁর খেলায় কিছুটা ঘাটতি দেখা গেল। জার্মানরা আশানুরূপ খেলতে পারল না। জিমানিয়াককে নিষ্প্রভ মনে হল। অথচ চিলির সঙ্গে দারুণ খেলেন। তাঁর এবার দায়িত্ব ছিল যুগোশ্লাভিয়ার সেকুলারাককে তক্কে-তক্কে রাখার। অবশ্য দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানরা ঝিমিয়ে পড়েছিল।

দীর্ঘক্ষণ ০-০ থাকায় মনে হচ্ছিল অতিরিক্ত সময়ে ছাড়া এই খেলার নিষ্পত্তি হবে না। ছিয়াশিটি শ্বাসরুদ্ধকারী মিনিট কাটার পর গালিক পিছনে টানলেন বল ও রাডাকোভিককে বাড়ালেন। পনের গজ দূর থেকে বার ঘেঁষা জোরালো শট করতেই জার্মানীর গোলরক্ষক ফারিয়ান পরাস্ত হলেন।

চিলি ঃ রাশিয়া—আরিকা-য় চিলি অঘটন ঘটাল রাশিয়াকে পরাস্ত করে। তাদের সমর্থকদের সেদিন কী উল্লাস! লেভ ইয়াসিনের ব্যর্থতা আবার প্রমাণিত হল। অথচ দূর থেকে মারা চিলির দুটি শটই তাঁর ধরা উচিত ছিল। লেওনেল সানচেজ দশ মিনিট পরে প্রথম গোলটি দেন বাঁ পায়ে পঁচিশ গজ দূর থেকে ক্রশ শটে। আঠার মিনিট পরে জয়সূচক গোল

হাফ ব্যাক এলাডিও রোজাসের। চিলির প্রথম গোলের দু মিনিট পরে রাশিয়ার চিসলেঙ্কো পঁয়ত্রিশ গজ দূর থেকে ১-১ করেন। কিন্তু লেভ ইয়াসিনের মত গোলরক্ষক প্রায় অমন দূরের শটেই পরাস্ত হতে পারেন, আজও তা বিস্ময়ের শুধু নয়, রহস্যেরও।

চিলি এই খেলায় টোরোকে ডিপে আনল। ৪-২-৪ পদ্ধতি কার্যত ৪-৩-৩-এ পরিণত হল। আর টোরো বেশ সহজেই পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করতে থাকেন রুশদের আক্রমণ ও রক্ষণে। সেমিফাইনালে উঠলেও দিনটি চিলির পক্ষে খুব আনন্দদায়ক ছিল না। মাঠে অন্তত সতের হাজার দর্শক তাদের সমর্থন করেছে গগনভেদী চিৎকারে। কিন্তু সমগ্র চিলি রুদ্ধশ্বাসে কাটিয়েছে সারাক্ষণ।

চেকোশ্লোভাকিয়া : হাঙ্গেরি—রান্‌কাগুয়ায় হাঙ্গেরির খেলোয়াড়রা চেকোশ্লোভাকিয়াকে ঘোল খাইয়ে ছাড়লেও চেক গোলরক্ষক শ্রইফকে পরাস্ত করতে পারেনি। হাঙ্গেরির অধিকাংশ বল ঠেকিয়েছে চেক গোলপোস্ট অথবা বার। তা না হলে শ্রইফকে লেভ ইয়াসিনের মতই ভুল করতে হত এবং পরিণতি ছিল পরাজয়। ত্রয়োদশ মিনিটে শেরার ক্রশ শটে গ্রসিকসে পরাস্ত করেন। পরাস্ত হয় সমগ্র হাঙ্গেরির রক্ষণভাগ। অথচ চেকদের এটি ছিল অত্যন্ত দুর্বল আক্রমণ। চেকোশ্লোভাকিয়া সেমিফাইনালে গেল। হাঙ্গেরি এই ম্যাচে একটি গোলও দেয়। কিন্তু রুশ রেফারি লাটিশেভ টিশি-র ওই গোলকে গোল বলে মেনে নিতে পারেননি। কেন না, টিশি পরিষ্কার অফ্‌সাইডে ছিলেন।

সেমিফাইনাল

ব্রাজিল : চিলি—'কন্‌ পেলে ও সিন পেলে, টোমেমেমস নেসকাফে'! সান্টিয়াগোর প্রতিটি বাসের গায়ে ওই কথাগুলি লেখা। অর্থাৎ পেলে খেলুন, আর না-ই খেলুন আমরা নেসকাফে খাবো। যদিও সারা শহর দারুণ উত্তেজনায় ভুগছিল, তবুও পেলে সম্পর্কে ওই শ্লোগান ব্যঙ্গ বা রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। কোয়ার্টার ফাইনালে চিলি যেদিন আরিকায় জিতেছিল, সান্টিয়াগোর রাস্তাগুলি সে রাত্রে জ্যাম হয়ে যায়। জনতা শ্লোগান দিতে থাকেন 'চি, চি, চি! লে, লে, লে! ভিভা চি—লে!' তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় জয়ের পরেও একই দৃশ্যের অবতারণা হয়। সমগ্র চিলি যেন শিশুদের

মত আনন্দে মেতেছিল। সব কিছুই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তারা খুঁজে বের করেন প্রবীণ ভিট্টোরিও পোজোকে। দেখতে পান পুসকাস এক দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে বাদাম চিবোচ্ছেন।

ব্রাজিল সেদিন চিলির চাইতে এত চমৎকার খেলল যে, খেলাটাই হল যেন একতরফা। গ্যারিঞ্চা ছিলেন অগ্নিগর্ভ। তাঁকে আটকাবার ক্ষমতা গোটা চিলিরও ছিল না। তিনি যেন একা শপথ করেই নেমেছিলেন : আজ জিততেই হবে। নয় মিনিট পরে লেফট ইন পজিশান থেকে শট মেরে তিনি এসকুইটিকে পরাস্ত করেন। বিশ গজ দূর থেকে তাঁর মারাত্মক শট ধরার ধৃষ্টতা এসকুইটির ছিল না। বত্রিশ মিনিট পরে জাগালোর কর্ণারে একটি দারুণ হাইজাম্প দিলেন ও ব্রাজিল ২-০ গোলে এগোল।

চিলিও আলস্যে সময় কাটাতে রাজি ছিল না। দশ মিনিট বাদে টোরো ডানপায়ে জোরালো ফ্রি-কিকে পরাস্ত করলেন জিলমারকে (২-১)। চিলি সম্বিত ফিরে পেল। দ্বিতীয়ার্ধে দুমিনিট না কাটতেই ব্রাজিল আবার চাপ দিল। গ্যারিঞ্চার ড্রপিং কর্ণারে মাথা ঠেকিয়ে ভাভা ব্রাজিলকে আবার এগিয়ে দিলেন ৩-১ গোলে।

চিলি আবার জেগে উঠল টোরোর খেলায়। রোজাসও কমতি নন কোনো অংশে। এজাগুইরেও দারুণ লড়ছেন। ব্রাজিলের জোজিমো পেনাল্টি সীমানার মধ্যে বল ঠেকালেন হাতে। লেওনেল সানচেজ ৩-২ করলেন। খেলা আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। অপ্রতিরোধ্য জাগালো লেফ্‌ট উইং-এ এগিয়ে গেলেন। অতিক্রম করলেন বিপক্ষের রক্ষণব্যূহকে। তারপর দুলকি চালে ছোট একটি সেণ্টার করতেই ভাভা তাতে হেড করে ব্রাজিলকে ৪-২ গোলে এগিয়ে দিলেন। শেষ কটি মিনিট মাঠে খেলার আবহাওয়া রইল না। গ্যারিঞ্চাকে লাথি মারলেন রোজাস। তাঁর অভিযোগ, গ্যারিঞ্চা এর আগে তাঁকে লাথি মারবার চেষ্টা করেছিলেন। গ্যারিঞ্চা পাল্টা লাথি মারতেই তাঁকে মাঠের বাইরে পাঠানো হল। মাঠ থেকে বেরিয়ে ড্রেসিং-রুমে যাবার পথে তাঁকে শিষ দিয়ে ব্যঙ্গ করা হল। বোতল ছোঁড়া হল। আর তার মাথাও কেটে যায়।

চেকোশ্লোভাকিয়া : যুগোশ্লাভিয়া—ভিনা ডেল মার-এ মাত্র পাঁচ হাজার দর্শক গেলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার জয় দেখতে। এবার তারা হারাল যুগোশ্লাভিয়াকে। কিরিকের আশংকারই পরিণতি ঘটল। দুর্বল উইঙ্গারদের

দ্বারা তিনি চেকদের শক্ত ডিফেন্সকে ভেদ করতে পারেননি। ট্যাকটিক্সের জন্য সব কৃতিত্ব চেক ম্যানেজার অস্ট্রিয়ায় জাত সোনালী চুলের ও রূপোলী দাঁতের ভিটলাসিলের। প্রথমার্ধে একটিও গোল দিতে না পারলেও দ্বিতীয়ার্ধে ভিটলাসিল-এর সব আশা পূর্ণ হয়।

বিরতির তিন মিনিটের মধ্যেই কাদ্রাবা প্রথম গোলটি দেন। কিন্তু জারকোভিক উনসত্তর মিনিটের সময় ১-১ করলেন। যুগোশ্লাভরা তারপর আক্রমণ দ্বারা জয়ের পথও উন্মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়। যেমন চেকোশ্লোভাকিয়া-হাঙ্গেরি খেলা হয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালে, তেমনি আজও দেখা গেল যুগোশ্লাভরা চেকদের সকলকে অতিক্রম করছেন, কিন্তু গোলরক্ষক শ্রইফকে ভেদ করা দুঃসাধ্য। সমাপ্তির দশ মিনিট আগে শেরার একটি গোল দিলেন। এরপর যুগোশ্লাভিয়ার মারকোভিক হাস্যকরভাবে বল ঠেকালেন হাতে। পেনাল্টি পেয়ে চেকরা ৩-১ গোলে এগোলেন। ফাইনালে ব্রাজিলের মুখোমুখি হল চেকোশ্লোভাকিয়া।

ফাইনাল

ব্রাজিল ঃ চেকোশ্লোভাকিয়া—ব্রাজিল যে ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়াকে হারাবে তা নিয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালে জিতে হাঙ্গেরি বা যুগোশ্লোভরা ফাইনালে উঠলেও ব্রাজিল যে বিশ্বকাপ পাবে—এ নিয়েও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় এলাডিও রোজাদের শেষ মুহূর্তের গোলে চিলি বিজয়ী হয়। সর্সাকিকের মত গোলরক্ষকের অবশ্যই উচিত ছিল ওই বল ধরা। যুগোশ্লাভিয়া পরাস্ত হলেও সেকুলারাক আবার প্রশংসা কুড়োন দারুণ খেলে।

যে যাই বলুন, চেকরা এবারের বিশ্বকাপে হয়ত আবার বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারতেন। ম্যাচগুলোয় সৌভাগ্য তাদের সাফল্য এনে দিয়েছিল অনেকাংশে। গোলরক্ষক শ্রইফ প্রতিটি ম্যাচে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু ফাইনালে শ্রইফকে আর তেমনভাবে দেখা গেল না। বোধ হয় আগের ম্যাচগুলোয় আঘাতের পর আঘাত খেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন দুর্ভেদ্য শ্রইফ।

এদিকে গ্যারিঞ্চার খবর কি? তাঁকে কী খেলতে দেওয়া হবে? সেমি-ফাইনালে গ্যারিঞ্চার মত একই দোষে অভিযুক্ত হলেন চিলির লাণ্ডা। বিশ্বকাপ

শৃংখলা রক্ষা কমিটি এই দুজনের বিষয় নিয়ে বৈঠকের পর বৈঠক করলেন। ব্রাজিলের ফুটবল সভাপতি এই ম্যাচের (সেমিফাইনাল) সব খবর নেন এয়ারফোনে এবং গ্যারিঞ্চার ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ ব্যক্তিগতভাবে ত্রুটি স্বীকার করেন এই কমিটির কাছে। কিন্তু কমিটি তার নিজের পথে অটল থেকে বিচার চালায়। প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছেন 'কী হয়, কী হয়!' রায় বের হল দুজনের সম্পর্কে দুরকম। স্যার স্ট্যানলি রাউস টেলিফোনে ভাষ্যকারদের জানালেন, 'সেভেন ওয়াজ কশানড, নাইন ওয়াজ সাসপেনডেড্।' গ্যারিঞ্চার নম্বর সাত, লাণ্ডারেব নয়। গ্যারিঞ্চাকে সতর্ক করা হল, লাণ্ডা খেলতে পারবেন না। আর গ্যারিঞ্চা খেলবেন। লাণ্ডা সাসপেণ্ড।

এই রায়ের পর গ্যারিঞ্চার মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল জানা যায়নি। তবে তাঁর খেলায় অদ্ভুত রকমের পরিবর্তন দেখা দেয় ফাইনালে। তিনি মোটেই খেলতে পারলেন না। চেকোশ্লোভাকিয়ার লেফট ব্যাক লাডিশ্লাও নোভাক তৃতীয়বার বিশ্বকাপে খেলতে এসে সহজেই রুখে দিলেন গ্যারিঞ্চাকে। কিন্তু নোভাকই খেলা শেষে প্রশ্ন তোলেন : আসল গ্যারিঞ্চাকে কী রুখে রাখা যেত? খেলার প্রায় শেষ মুহূর্তে যখন শেষ গোলটি হল, গ্যারিঞ্চা বল নিয়ে খামোকা ছোটাছুটি করেছেন। একবার তো পপলাহারের সঙ্গে সংঘর্ষেও লিপ্ত হন। তাঁকে ভীষণ ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছিল।

বিশ্বকাপ ফাইনাল শুরু হল দর্শকদের বিস্মিত করে। পেলে বিহীন ব্রাজিল খেলছে। আর খেলার শুরুতেই চেকরা ১-০ গোলে এগিয়ে গেল। দর্শকরা বলতে লাগলেন : স্রইফ যদি আগের ম্যাচগুলোর মত খেলতে পারেন, তবে আজ আরও অঘটন ঘটবে। ষোল মিনিট পরে শেরার ও মাসোপাস্ট অদ্ভুত সমন্বয় দ্বারা ব্রাজিলের রক্ষণভাগকে তছনছ করে দিলেন। শেবার ডান দিক থেকে কোনাকুনি পাস দিলেন মাসোপাস্টকে। ফাঁকা জমিতে মাসোপাস্ট আপ্রাণ দৌড়ে বাঁ পায়ের জোরালো শটে জিলমারকে পরাস্ত করলেন। উপর্যুপরি দুটি বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্রাজিল প্রথম গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ল।

কিন্তু দ্বিতীয়বারেও তারা লড়াই করে এগিয়ে গেল। অবশ্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের বিরতি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তবে ১-১ করতে বেশিক্ষণ লাগেনি এবং ঐ গোলটি দেন আমারিল্ডো। শক্তিমান প্লুসকালকে কাটিয়ে বাঁদিকে মারতেই স্রইফ পরাস্ত হন। তখন তিনি কী করবেন?

কাছাকাছি পোস্টের গা ঘেঁষে অথবা দূরে মারতে হবে অথবা বল না মেরে কাছে রাখতে হবে। আমারিল্ডো ও শ্রইফ দুজনেই সমস্যায় পড়েছেন। কিন্তু শ্রইফের সিদ্ধান্তে ভুল হল। তিনি তাঁদের পোস্টটি আগলে রইলেন। আর আমারিল্ডোকে অনেক জায়গা দিলেন গোল করার জন্য। তাঁর শট উঁচু হয়ে কোণাকুণিভাবে জালে প্রবেশ করল।

কাসনিয়াক মাঝমাঠে দারুণ খেলতে থাকেন। মাসোপাস্টের সহযোগিতায় তিনি দলের শক্তি যোগাতে লাগলেন। ব্রাজিলের সেণ্টারগুলি ফলপ্রসূ হচ্ছিল না। তবুও এরই মাঝে নিলটন স্যাণ্টোস অভূতপূর্ব ক্ষমতা দেখাতে কার্পণ্য করলেন না। বার দুয়েক তিনিও পরাস্ত হলেন চেকদের কাছে।

শ্রইফ এতক্ষণ বেশ খেলছিলেন। ডিডি ও জাগালোর কয়েকটি জোরালো মার ঠেকালেনও। কিন্তু তাঁর সে কষ যেন চলে গেছে। তিনি তো মানুষ! কতদিন এবং কতক্ষণ একই খেলা বজায় রাখবেন!

দ্বিতীয়ার্ধে চেকরা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত রইল। এরই মাঝে কাভ্রাস একটি ভাল শট করলেন; জেলিনেকও একটি। তখন মনে হচ্ছিল ব্রাজিলের সব অস্ত্র নিঃশেষিত। কিন্তু উনসত্তর মিনিটের সময় ব্রাজিল জ্বলে উঠল। এবার আবার আমারিল্ডো মধ্যমণি। পেলের শূন্যস্থানে তাঁকে এনে বিজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। বাঁদিকে তিনি প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে বাঁ পা থেকে বল ডান পায়ে নিয়ে সেণ্টার করলেন। সেখানে ছিলেন জিটো। তিনি হেড করতেই বল প্রবেশ করল প্রায় ফাঁকা নেটে।

এখানেই হয়ত খেলা নিষ্পত্তি হয়ে যেত যদি শ্রইফ একটু কঠিন থাকতেন, কিন্তু সমাপ্তির তের মিনিট আগে আবার একটি গোল হল। ব্রাজিলের জয় হল ৩-১ গোলে। জালমা স্যাণ্টোস অনেকটা অন্যমনস্কভাবেই এগোচ্ছিলেন টাচ্ লাইনে বল বাউন্স হয়েছে দেখে। বাঁ পায়ে বলটি এত উঁচুতে মারলেন, যেন তা আকাশে পৌঁছে গেল। শ্রইফের কাছে বলটি পড়ল। বল ধরে তিনি ড্রপ দিচ্ছিলেন, হঠাৎ ভাভা তাতে পা ছোঁয়াতেই শেষ গোলটি হল।

১৯৫৮-র পর আবার সেই শুভ মুহূর্তটি এল। ব্রাজিল পেলেকে হারালেও খুঁজে পেল আমারিল্ডোকে। দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ে তাঁর অবদান অতুলনীয়। প্রবীণদের নিয়ে গড়া ব্রাজিল আবার বিশ্ব ফুটবলের সেরা শিরোপা পেল।

গ্রুপ—১

উরুগুয়ে ২ : কলম্বিয়া ০

(কুবিল্লা, সাশিয়া) (জালুয়াগা)

বিরতি ০—১

রাশিয়া ২ : যুগোশ্লাভিয়া ০

(ইভানভ, পোনেডেলনিক)

বিরতি ০—০

যুগোশ্লাভিয়া ৩ : উরুগুয়ে ১

(স্কবলার, গালিক, জারকভিক) (কাবরেরা)

বিরতি ২—১

রাশিয়া ৪ : কলম্বিয়া ৪

(ইভানভ ২, চিসলেঙ্কো, পোনেডেলনিক) (একেরস, কল, রাডা ক্লিঙ্গার)

বিরতি ৩—১

রাশিয়া ২ : উরুগুয়ে ১

(মামিকিন, ইভানভ) (সাশিয়া)

বিরতি ১—০

যুগোশ্লাভিয়া ৫ : কলম্বিয়া ০

(গালিক, জারকভিক ৩, মেলিক)

বিরতি ২—০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
রাশিয়া	৩	২	১	০	৮	৫	৫
যুগোশ্লাভিয়া	৩	২	০	১	৮	৩	৪
উরুগুয়ে	৩	১	০	২	৪	৬	২
কলম্বিয়া	৩	০	১	২	৫	১১	১

গ্রুপ—২

চিলি ৩ : সুইজারল্যাণ্ড ১

(এল সানচেজ ২, রামিরেজ) (উটরিচ)

বিরতি ১—১

পশ্চিম জার্মানী ০ : ইতালি ০

চিলি ২ : ইতালি ০
(রামিরেজ, টোরো)

বিরতি ০—০

পশ্চিম জার্মানী ২ : সুইজারল্যাণ্ড ১
(ব্রালস, জিলার) (স্নিটার)

বিরতি ১—০

পশ্চিম জার্মানী ২ : চিলি ০
(জিমানিয়াক-পেনাল্টি, জিলার)

বিরতি ১-০

ইতালি ৩ : সুইজারল্যাণ্ড ০
(মোরা, বালগারেলি ২)

বিরতি ১-০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
পশ্চিম জার্মানী	৩	২	১	০	৪	১	৫
চিলি	৩	২	০	১	৫	৩	৪
ইতালি	৩	১	১	১	৩	২	৩
সুইজারল্যাণ্ড	৩	০	০	৩	২	৮	০

গ্রুপ—৩

ব্রাজিল ২ : মেক্সিকো ০
(জাগালো, পেলে)

বিরতি ০-০

চেকোশ্লোভাকিয়া ১ : স্পেন ০
(স্টিব্রানি)

বিরতি ০-০

ব্রাজিল ০ : চেকোশ্লোভাকিয়া ০

স্পেন ১ : মেক্সিকো ০
(পিরো)

বিরতি ০-০

ব্রাজিল ২ : স্পেন ১
(আমারিল্ডো) (এডেলার্ডো)

বিরতি ০-১

মেক্সিকো ৩ : চেকোশ্লোভাকিয়া ১

(ডিয়াজ, ডেল আগুইলা, এইচ হারনাণ্ডেজ-পেনাল্টি) (মাসেক)

বিরতি ২-১

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
ব্রাজিল	৩	২	১	০	৪	১	৫
চেকোশ্লোভাকিয়া	৩	১	১	১	২	৩	৩
মেক্সিকো	৩	১	০	২	৩	৪	২
স্পেন	৩	১	০	২	২	৩	২

গ্রুপ—৪

আর্জেন্টিনা ১ : বালগেরিয়া ০

(ফাকাণ্ডো)

বিরতি ১-০

হাঙ্গেরি ২ : ইংল্যাণ্ড ১

(টিশি, অ্যালবার্ট) (ফ্লাওয়ার্স-পেনাল্টি)

বিরতি ২-০

ইংল্যাণ্ড ৩ : আর্জেন্টিনা ১

(ফ্লাওয়ার্স-পেনাল্টি, চার্লটন, গ্রিভস) (সানফিলিপ্পো)

বিরতি ২-০

হাঙ্গেরি ৬ : বালগেরিয়া ১

অ্যালবার্ট ৩, টিশি ২, সলিমসি) (সকোলভ)

বিরতি ৪-০

আর্জেন্টিনা ০ : হাঙ্গেরি ০

ইংল্যাণ্ড ০ : বালগেরিয়া

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
হাঙ্গেরি	৩	২	১	০	৮	২	৫
ইংল্যাণ্ড	৩	১	১	১	৪	৩	৩
আর্জেন্টিনা	৩	১	১	১	২	৩	৩
বালগেরিয়া	৩	০	১	২	১	৭	১

কোয়ার্টার ফাইনাল

সাণ্টিয়াগোয়

যুগোশ্লাভিয়া ১ : পশ্চিম জার্মানী ০
(রাডাকোভিক)
বিরতি ০—০

সসকিক ; ড়ুরকোভিক, জাস্কি ; রাডাকোভিক, মারকোভিক, পপোভিক ; কোভাসেভিক, সেকুলারাক, জারাকোভিক, গালিক, স্কবলার।

ফারিয়ান ; নোভাক, স্নেলিঙ্গার ; শুল্‌জ, এরহার্ড, গিজেম্যান ; হলার, জিমানিয়াক, জিলার, ব্রাঙ্কস, শেফার।

ভিনা ডেল মার-এ

ব্রাজিল ৩ : ইংল্যাণ্ড ১
(গ্যারিঞ্চা—২, ভাভা) (হিচেনস্)
বিরতি ১—১

জিলমার ; ডি স্যাণ্টোস, মাউরো, জোজিমো, এন স্যাণ্টোস ; জিটো, ডিডি ; গ্যারিঞ্চা, ভাভা, আমারিল্ডো, জাগালো।

স্প্রিংগেট ; আর্মফিল্ড, উইলসন ; মুর, নরম্যান, ফ্লাওয়ার্স ; ডগলাস, গ্রিভস, হিচেনস্, হেনেস, চার্লটন।

আরিকায়

চিলি ২ : রাশিয়া ১
(এল সানচেজ, রোজাস) (চিসলেঙ্কো)
বিরতি ২—১

এসকুইটি ; এজাগুইরে, কণ্টেরাস, আর সানচেজ, নাভারো ; টোরো, রোজাস ; রামিরেজ, লাণ্ডা, টোবার, এল সানচেজ।

লেভ ইয়াসিন ; টোকিলি, অস্ট্রোভস্কি ; ভরোনিন, মাসলেনকিন, নেটো ; চিসলেঙ্কো, ইভানভ, পোনেডেলনিক, মামিকিন, মেসকি।

রান্‌কাগুয়া-য়

চেকোশ্লোভাকিয়া ১ : হাঙ্গেরি ০

(শেরার) বিরতি ১—০

স্রইফ ; লালা, নোভাক ; প্লুসকাল, পপলাহার, মাসোপাস্ট ; পসপিকাল, শেরার, কাসনিয়াক, কাদ্রাবা ; জেলিনেক।

গ্রসিকস ; মাত্রাই, সারোশি ; সলিমসি, মেজলি, ফিপস ; স্যাণ্ডোর, রাকোসি, অ্যালবার্ট, টিশি, ফেলিভেসি।

সেমিফাইনাল

সান্টিয়াগোয়

ব্রাজিল ৪ : চিলি ২

(গ্যারিঞ্চা ২, ভাভা ২) (টোরো, এল সানচেজ-পেনাল্টি)

বিরতি ২—১

জিলমার ; ডি স্যাণ্টোস, মাউরো, জোজিমো, এন স্যাণ্টোস ; ডিডি, গ্যারিঞ্চা, ভাভা, আমারিল্ডো, জাগালো।

এসকুইটি ; এজাগুইরে, কণ্ট্রেরাস, আর সানচেজ, রডরিগুয়েজ ; টোরো, রোজাস ; রামিরেজ, লাণ্ডা, টোবার, এল সানচেজ।

ভিনা ডেল মার-এ

চেকোশ্লোভাকিয়া ৩ : যুগোশ্লাভিয়া ১

(কাদ্রাবা, শেরার ২) (জারকোভিক)

বিরতি ০—০

স্রইফ ; লালা, নোভাক, প্লুসকাল, পপলাহার, মাসোপাস্ট ; পসপিকাল, শেরার, কাসনিয়াক, কাদ্রাবা, জেলিনেক।

সসকিক ; ডুরকভিক, স্থিনজারেভিক ; রাডাকোভিক, মারকোভিক, পপোভিক ; কোভাসেভিক, সেকুলারাক, জারকোভিক, গালিক, স্কবলার।

তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলা

সান্টিয়াগোয়

চিলি ১ : যুগোশ্লাভিয়া ০

(রোজাস)

বিরতি ০—০

গডোয়; এন্সাগুইরে, ক্রুজ, আর সানচেজ, রডরিগুয়েজ; টোরো, রোজাস, রামিরেজ, ক্যাম্পস, টোবার, এল সানচেজ।

সসকিক; ডুরকভিক, স্বিনজারেভিক; রাজাকোভিক, মারকোভিক, পপোভিক কোভাসেভিক, সেকুলারাক, জারকোভিক, গালিক, স্কবলার।

ফাইনাল (সান্টিয়াগোয় ১৭ জুন, দর্শক ৬৯,০৬৮)

ব্রাজিল ৩ : চেকোশ্লোভাকিয়া ১

(আমারিল্ডো, জিটো, ভাভা) (মাসোপাস্ট)

বিরতি ১—১

জিলমার; ডি স্যান্টোস, মাউরো, জোজিমো, এন স্যান্টোস; জিটো, ডিডি, গ্যারিঞ্চা, ভাভা, আমারিল্ডো, জাগালো।

শ্রইফ; টিশি, নোভাক; প্লুসকাল, পপলাহার, মাসোপাস্ট; পসপিকাল, শেরার, কাসনিয়াক, কাদ্রাবা, জেলিনেক।

ইংল্যাণ্ড



বিজয়ী ইংল্যাণ্ডের ব্যাজ

বত্রিশ বছর পর আর একটি দেশ নিজেদের মাঠে খেলে বিশ্বকাপ ঘরে তুলল। ১৯৩৪ সালে সর্বশেষ অনুরূপ কৃতিত্ব দেখায় ইতালি। জিতল ইংল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ডের এই জয় আশাতীত। তবে সেমিফাইনালে তাদের খেলা দলমত-নির্বিশেষে সব দর্শককে আনন্দ দিল এবং আগের ম্যাচগুলির ক্লান্তিও দূর হয়ে গেল।

বিশ্বকাপ ফুটবল নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এবারের প্রতিযোগিতা যেমন আবেগ-প্রবণতায় তুঙ্গে উঠল, তেমনি বিতর্কমূলকও। নাটকে নাটকে ভরা। ফাইনালের পরে এবং ফাইনালে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও বিতর্কের শেষ হয়নি বেশ কিছুদিন। ইংল্যাণ্ডের সমর্থক সমালোচকরা ফাইনালে জিওফ হার্স্টের শট নিয়ে সোচ্চার হননি—যে শটটি অনেকের মতে 'বারে লেগে নিচে নেমে আসে, কিন্তু গোললাইন অতিক্রম করেনি।' রানার্স পশ্চিম জার্মানী তো ওই গোলের ফিল্ম তোলে এবং ইংল্যাণ্ড বিরোধীরাও বিশ্বময় ওই গোলের ফিল্ম দেখাতে লাগল। ধীরগতির ফিল্মে ওই গোলের সময় বড় বড় হরফে ভেসে ওঠে—ইজ ইট এ গোল?—এটা কী গোল? জার্মানীর প্রতিবাদ বা অন্যদের সমালোচনায় কোনো কাজ হয়নি। ফিফা বা রেফারির সিদ্ধান্তেও হেরফের ঘটেনি।

যাই হোক, ছেষট্টির বিশ্বকাপে নানা বিভ্রান্তির সমাবেশ ঘটে। এবারের জয় ইংল্যাণ্ডের হলেও, কৃতিত্ব ওদের ম্যানেজার আলফ রামসে-র। ব্রাজিল গ্রুপ

ম্যাচেই বিদায় নেয়। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম একটি এশীয় দেশ—উত্তর কোরিয়া সারা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়ে নিল কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠে এবং চমৎকার ফুটবল খেলে। 'ব্রাইট' ফুটবল খেলল আর্জেন্টিনা। আর উল্লেখ্য—এবারের বিশ্বকাপে ইউরোপীয় দেশসমূহ খর্ব করে দিল দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বহুকালের প্রাধান্য। তারা অভিযোগ করল, বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় খেলার চাইতে বেশি হয়েছে ষড়যন্ত্র। তারা হুমকি দিয়ে বলে, এমন চলতে থাকলে আমরা একযোগে নাম প্রত্যাহার করে নেব। বিশ্বের তাবৎ ফুটবলমোদীরা ব্যথিত হলেন উপর্যুপরি পেলে দুবার আহত হয়ে মাঠ থেকে বিদায় নেওয়ায়। তবে এবারের বিদায় অত্যন্ত বিতর্কমূলক। তাঁকে 'মেরে মেরে বের করে দেওয়া হয়'। বিশ্বকাপের ফাইনালে এবারই প্রথম হ্যাটট্রিক হল এবং করলেন ইংল্যাণ্ডের হার্স্ট। আবার ১৯৩৪ সালের পরে ফাইনালের নিষ্পত্তি হল অতিরিক্ত সময়ে।

সমালোচনার যত ঝড়ই বয়ে যাক, কিংবা কারুর কারুর অন্য ধারণা থাকলেও একথা স্বীকার করতেই হবে আলফ রামসে না থাকলে ইংল্যাণ্ডের ভাগ্যে বিশ্বকাপ জয় মরীচিকা হয়েই থাকত। জয়ের পর ইংল্যাণ্ড তাঁকে যোগ্য সম্মান দেয়। তাঁকে 'স্যার' খেতাবে ভূষিত করা হয়। কিন্তু বিশ্বকাপে ইংল্যাণ্ডের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্যও তাঁকেই দায়ী করা হয়েছিল। তবে একথাও সত্যি— বিশ্বকাপ ইংল্যাণ্ডে না হয়ে অন্য কোথাও হলে রামসের সফল হওয়ার তেমন সম্ভাবনা ছিল না।

ইংল্যাণ্ডের কাপ প্রাপ্তি নিয়ে যত সমালোচনাই হোক, প্রতিযোগিতার মান ও অন্যান্য নানা গুণের পরিচয় পাওয়া গেল এবার। বিশেষ করে ফাইনাল তো উত্তেজনার তুঙ্গে পৌঁছয়। -এর মত ব্রাজিলের একপেশে ফুটবল প্রদর্শনীর ফাইনাল হল না ১৯৫৪-র পর আর কোন ফাইনালে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়নি। একথাও অনস্বীকার্য, টেকনিক ও ফুটবল দক্ষতার দিক থেকে গত দুবারের বিজয়ী ব্রাজিলের সমকক্ষ তারা ছিল না, তবে সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছতে ইংল্যাণ্ডকে রীতিমত লড়তে হল এবং দারুণ পরিশ্রমে সফল হওয়ায় তাঁদের আনন্দে সারা ইংল্যাণ্ড অবগাহন করেছে। উপরন্তু ইংল্যাণ্ড দলে কয়েকজনের খেলা নিঃসন্দেহে বিশ্ব-শ্রেষ্ঠর সমকক্ষ ছিল। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ও লেফট হাফ ববি মুর যথার্থই ভোটে এই প্রতিযোগিতার 'শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়' নির্বাচিত হন। সর্বজনপ্রিয় ববি চার্লটন

হলেন সেবার 'ইউরোপের সেরা'। আর ইংল্যাণ্ডের গোলরক্ষক গর্ডন ব্যাঙ্কস, যিনি বলের বদলে কুকুরকে নিয়ে গোল প্র্যাকটিস করতেন—তিনি প্রবীণ ও সর্বকালের সেরা লেভ ইয়াসিনকেও অতিক্রম করলেন চমৎকার খেলার দ্বারা। ইয়াসিন এবারই বিশ্বকাপে শেষ ম্যাচ খেললেন। বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের সত্যিকারের তুই তারকা ছিলেন জিওফ হার্স্ট ও অ্যালান বল।

কেউ ভুলবেন না অদ্ভুত চেহারার নবি স্টাইলসকে। মোজায় শুধু গোড়ালি ঢেকেই তিনি মাঠে নামতেন। আর শার্ট কখনও গুঁজে পরতেন না। সব সময় প্যাণ্টের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতেন। জয়ের পরে ড্রেসিংরুমে রামসেকে বললেন আঙুল উঁচিয়ে, 'আপনি, হ্যাঁ আপনিই জিতিয়ে দিলেন। আপনাকে বাদ দিয়ে এমন ঐতিহাসিক কাজটি হতে পারত না।' স্টাইলস যথার্থই বলেছিলেন। কিন্তু তার চাইতে গুরুত্ব দিতে হয় নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকার সমালোচনাকে। খেলার আগের দিন এই সাপ্তাহিক পত্রিকায় বের হল, 'আগামী সপ্তাহে বিবরণ দেব ইংল্যাণ্ড কীভাবে বিশ্বকাপ ফাইনালে জিতেছে এবং ভবিষ্যতে তাদের কী কী করা উচিত।' নিউ স্টেটসম্যানের ভবিষ্যদ্বাণীতে সকলে অবাক হয়েছিলেন।

আলফ রামসে : ১৯৫০ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে পাঠকদের সঙ্গে আলফ রামসের পরিচয় হয়েছে, তবে তখন তিনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়। রাইট ব্যাক। যুক্তরাষ্ট্র সেবার এই ফুটবল-সিংহের লেজ মুচড়ে দেওয়ায়, তারা ফাইনাল পুল ম্যাচে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৫০-এর ক্ষত শুকোবার কয়েক বছরের মধ্যেই ১৯৫৩-র নবেম্বরে ওয়েম্বলিতে তাঁর দলকে হাঙ্গেরি হারাল ৬-৩ গোলে।

রামসের জন্ম ১৯২০ সালে লণ্ডনের কাছে ডাজেনহামের অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে। ছোটবেলায় আশা ছিল বড় হয়ে মস্ত একজন মুদী হবে। ফুটবলার হিসাবে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন অনেক দেরিতে। সাউদাম্পটন দল তাঁকে আবিষ্কার করে সামরিক বাহিনীতে চাকরির সময়। রামসে তখন ছিলেন ইনসাইড ফরওয়ার্ড। পরে হন ফুলব্যাক। নতুন পজিশনে তাঁকে বেশ সহজ মনে হল। ১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে সর্বপ্রথম জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পান। খেলা ছিল সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রথম এগার জনের মধ্যে রামসের নাম ছিল না। তাঁর ফুটবল জীবনের কঠিনতম পর্ব ১৯৪৯ এ। আর্থার রো

তাঁকে নিয়ে গেলেন টটেনহাম হসপার দলে খেলবার জন্য সই করাতে। এদিকে ওয়েলস্-এর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেফট উইঙ্গার আর্নি জোন্সকে নিয়েও টানাটানি চলছে। রামসের দল পরিবর্তনের মূল্য হল অসম্ভব রকম কমে—মাত্র একুশ হাজার পাউণ্ড।

রামসে নতুন দলে গিয়ে রো প্রদর্শিত পথে 'পুশ অ্যাণ্ড রান', 'দ্রুততা' এবং 'ওয়াল পাসিং ট্যাকটিকসে' রপ্ত হলেন বেশ অল্প সময়ের মধ্যে। রামসে যদিও অধিনায়ক ছিলেন না, তবুও সকলেই তাঁকে 'দ্য জেনারেল' বলে ডাকতেন এবং সকলেই তাঁকে মেনে চলতেন। শিরোধার্য করতেন তাঁর নির্দেশাবলী। তাঁর কথাবার্তা দলের মানসিকতা দৃঢ়করণে দারুণ সহায়ক ছিল। তাঁর পদ-ক্ষেপে হয়ত সামান্য ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু রামসের পজিশন জ্ঞানের তারিফ করতেন সকলেই। ট্যাকলিং-এ যেমন ওস্তাদ, তেমনি প্রতিটি বল নিখুঁতভাবে পাস দিতেন। তাঁর সময়ে 'ওভারল্যাপিং' ফুল-ব্যাকের যুগ আসেনি। কিন্তু রামসেকে দেখে ফুটবল সমালোচকরা স্বীকার করেছেন : তিনি 'কনস্ট্রাকটিভ' ফুল-ব্যাক। তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক ও মাথা খাটানো ফুটবল খেলা সমগ্র দলকে শক্তি যোগাত। ফরওয়ার্ডের তথা আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের নতুন নতুন আক্রমণ রচনার সন্ধান দিতেন পাস দ্বারা। পেনাল্টি কিকেও ছিলেন ওস্তাদদের ওস্তাদ। পেনাল্টির দ্বারাই ১৯৫৩-র অক্টোবরে ফিফা-র বিরুদ্ধে ওয়েমব্লিতে ইংল্যাণ্ডের 'অপরাজিত' রেকর্ড কোনোক্রমে রক্ষা করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পর যখন হাঙ্গেরি এদের নাস্তানাবুদ করে তখন গোলের ব্যবধান (৬-৩) কমে রামসের পেনাল্টিতেই।

শান্ত অথচ আবেগপূর্ণ এবং ফুটবলের প্রতি ভীষণ নিষ্ঠাবান। খেলার জ্ঞান লাভের জন্য সবচেয়ে কৃতজ্ঞ লণ্ডনের বাসিন্দা এবং স্পার্সের প্রাক্তন অধিনায়ক আর্থার রো-র কাছে। শুরু থেকে আর্থারের প্রতি রামসের গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং সেই শ্রদ্ধায় তাঁর কোনো দিন ভাঁটা পড়েনি। চারিত্রিক দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য তেমন বেশি কিছু পরিলক্ষিত হত না। পার্থক্য—রো দ্রুত কথা বলেন, যা বলেন তাতে গোপনীয় কিছুই থাকে না। বেশ রসিক। সবচেয়ে বড় কথা—তিনি ভীষণ আবেগপ্রবণ। রামসে সব ব্যাপারে বেশ সতর্ক, স্বল্পভাষী। কিন্তু যা বলেন, তা মর্মভেদী। উভয়ের গুণাবলী, আচরণ ইত্যাদি মিলিয়ে মনে হত একে অপরের চমৎকার পরিপূরক। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টাই টটেনহামকে উপর্যুপরি দুই মরশুমে দ্বিতীয় ও প্রথম ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন করে তোলে এবং

এরই মাঝে রামসে ইংল্যাণ্ড দলের মধ্যে নিজের স্থান পাকা করে নেন। তিনি টটেনহামে এসেছিলেন উনত্রিশ বছর বয়সে। সুতরাং সন্দেহ নেই ফুটবল শিখরে পৌঁছবার দিনগুলি পেছনে চলে গেছে।

তাঁর খেলার শুরু থেকে শেষ অবধি অদ্ভুত সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল, আসলে খেলার ধরনটাই আলাদা। পরবর্তীকালে তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য ম্যানেজারের কাজে সাফল্য এনে দিয়েছিল। রামসের এই সাফল্যের সূচনা হয় ইস্ট অ্যাঙ্গলিয়ান ক্লাব ইপসউইচ টাউনে থাকাকালে। ১৯৩৭ সালে ক্লাব তৃতীয় ডিভিশনে প্রবেশ করে যখন, তখন ওটি নিতান্তই অখ্যাত ছিল। কিন্তু দ্রুত ওই ক্লাব সাফল্য প্রদর্শন দ্বারা প্রথম ডিভিশনে প্রবেশ করে। যদিও রামসে ম্যানেজার হিসাবে তখন নিতান্তই 'অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত' ছিলেন, তবুও ইপসউইচ ক্লাবের চেয়ারম্যান অভিজাত 'সম্প্রদায়ভুক্ত' জন কবোল্ডের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা থাকায় ক্লাবের পক্ষে তা বেশ উপকারে আসে। রামসে যখন পোর্টম্যান রোডে তখন তিনি খুব অসুবিধায় পড়েন। ইপসউইচের সম্পাদক হয়েছেন তখন প্রাক্তন ম্যানেজার স্কট ডানকান। কিন্তু চেয়ারম্যান কবোল্ড সর্বদাই পরামর্শ করতেন রামসের সঙ্গে। ইপসউইচে রামসের ট্যাক্‌টিকস ভীষণ কার্যকর ছিল। উপরন্তু নতুন নতুন মুখ এনে শানিয়ে নিয়ে কাজে লাগাতেন। নতুন খেলোয়াড়রা এমনভাবে তৎকালে আর কারুর কাছে উৎসাহিত হতেন না।

১৯৬২-র বিশ্বকাপের পর স্থির হয় সবক্ষণের জন্য একজন ম্যানেজার চাই ইংল্যাণ্ডের। ওদিকে ওয়াল্টার উইণ্টারবটম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পদে ইস্তফা দিয়েছেন বিরক্ত হয়ে। ম্যানেজার হিসাবে রামসে প্রথম পছন্দ ছিলেন কর্তৃপক্ষের। তখন ইংল্যাণ্ডের জাতীয় দলের জন্য তাঁকে তিন বা চার নম্বর ম্যানেজার নিযুক্ত করাই সমীচীন মনে করা হত। প্রথম ছিলেন ১৯৬২-র দলকে কোচিং দিয়েছিলেন যিনি, সেই জিমি অ্যাডামসন। বিরক্ত হয়ে তিনি কোচিং ছেড়ে দেন।

রামসের ম্যানেজারশিপে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ইপসউইচের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই এবং তা আরও প্রকাশিত হয় তাঁর ইপসউইচ ছাড়ার কিছুদিনের মধ্যে ওই ক্লাবে গণ্ডগোল শুরু হওয়ায়। সকলেই বুঝলেন ক্লাবকে এতদিন ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছিলেন ওই রামসে। আসলে গোটা দল তাঁরই হাতে গড়া ছিল। তাঁর অবস্থানকালে এই ক্লাবে নির্বাচক কমিটি থাকলেও তাদের তেমন কোনো কাজ ছিল না। কেননা, রামসের ফুটবল ব্যক্তিত্বের সামনে ওদের

সবাইকে ম্লান দেখাত। ভিট্টরিও পোজো একবার মন্তব্য করলেন: নির্বাচকমণ্ডলীর সর্বদাই আপস করে চলাটাই রীতি।

অনেকেরই হয়ত জানা, অনেক সময় নির্বাচকমণ্ডলী দলের ম্যানেজারকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যান। আবার কখনও কখনও ম্যানেজার নিজের কাজ গোপন রাখেন নির্বাচকদের কাছে। রামসের আবার সময়ও ছিল না নির্বাচকদের কাছে নিজের সাফল্য জাহির করার। তবে আমেরিকা সফরকালে সিনিয়র ইন্টারন্যাশনাল কমিটির কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিছু অতিরিক্ত খেলোয়াড় দলের সঙ্গে দেওয়ার। ওই অতিরিক্তদের একটাই কাজ ছিল আমেরিকায়। মদের পার্টিগুলো এড়াতে রামসের ওঁরা খুব সহায়ক ছিলেন।

রামসের সাফল্যের চাবিকাঠি এবং ম্যানেজারের খ্যাতি নিহিত ছিল খেলোয়াড়দের সঙ্গে চমৎকার আচরণেই। তিনি প্লেয়ারদের আপনজন রূপে আখ্যাত হতেন। পরবর্তীকালে রামসে ওদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে ভাল-মন্দ জেনে মানসিকতা উপলব্ধি করে সুফল পেয়েছেন। ১৯৬৬ সালে বিশ্বকাপ জিতেছেন।

উইন্টারবটমও গুণের দিক থেকে রামসে অপেক্ষা কোনো অংশে কম ছিলেন না। উইন্টারবটম এসেছিলেন স্ট্যানলি রাউসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তাঁরই সুপারিশে। তিনি আবার চলতেনও স্যার স্ট্যানলির আদর্শে। তাঁরই মত থিওরিতে বিশ্বাসী। কিন্তু নিজেই স্বীকার করেছেন, খেলার উন্নতি উন্নত কোচিং-এর উপরই নির্ভরশীল। উইন্টারবটম যখন কোচিং-এর দায়িত্ব নেন, তখন তাঁকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। অবশ্য খেলোয়াড়রা ওঁকে বর্জন করেননি, যথাসাধ্য মেনেই চলতেন। কিন্তু সমগ্র ফুটবল জীবনে উইন্টারবটম ফুটবলারদের অতিক্রম তো দূরের কথা, তাঁদের সমকক্ষ হতে পারেননি। ম্যানেজার বা কোচ হয়েও তিনি ফুটবলারদের মতই জীবন যাপন করতেন, কথাবার্তা বলতেন ওঁদের মতই। রামসে অনেকটা ওইভাবে চললেও ফুটবলের বাইরের জগতে তাঁকে বড্ড বেমানান মনে হয়েছে। তাঁকে ভীষণ অসামাজিক বলা হত। সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গেও তাঁর তেমন পরিচয় ছিল না। আর এসবের দরুন তিনি সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের কাছে বেশ অবিশ্বাসী হয়ে পড়েন। তাঁর গুপ্তভাবে চলাফেরাটাই সকলের সন্দেহের উদ্রেক করে। এসব কিন্তু রামসের কাজের উৎসাহ হ্রাস করতে পারেনি। তবে সমসাময়িক নানান প্রতিকূল পরিবেশ তাঁর অনেক ক্ষতি করেছে।

অ্যালফ রামসে যতই কঠোর ও শৃংখলা রক্ষায় বদ্ধপরিকর হোন না—খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাটাতেন বন্ধুর মতই। তাদের সঙ্গে ফুর্তিতে সময় অতিবাহিত করতেন, কিন্তু সমাদর পেতেন পিতৃব্যের মত, হাসিতে হাসিতে মাঝে মাঝে ওদের দম বন্ধ করে দিতেন, ট্রেনিং গেমে অংশ নিতেন সহাস্যে। কখনও নিজের পদমর্যাদার কথা বিস্মৃত হতেন না। তাই বলে কদাচ দেখা যায়নি—ভিট্টরিও পোজো-র মত তিনি গুরুগম্ভীরভাবে বাবার মত আচরণ করছেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলি

ইংল্যাণ্ড—জাতীয় দলের দায়িত্ব নিয়ে রামসের প্রথম বিদেশ যাত্রা শুরুতে। প্যারিসে নেশনস্ কাপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম খেলাতেই ইংল্যাণ্ড হারল ৫-২ গোলে। গোলরক্ষকের ভুলেই যদিও ইংল্যাণ্ডের শোচনীয় পরিণতি ঘটে, তবুও তাদের সমগ্র দলের খেলা বোধহয় আরও খারাপ ছিল। রামসে খতিয়ে দেখলেন দেশে ফিরে তাঁর ঝুলিতে কী আছে, আর কী নেই। তারপর উঠে-পড়ে লাগলেন দলকে ঘষামাজার কাজে। অতি দ্রুত প্রস্তুত হয়ে ওই বছর গ্রীষ্মেই গেলেন ইউরোপ সফরে। রক্ষণ ও আক্রমণ সব মিলিয়ে এমন 'ব্যালান্স' দল হালফিলে ইংল্যাণ্ডে গঠিত হয়নি। ষোল বছরের মধ্যে উইণ্টারবটম যা পারেননি, রামসে স্বল্প সময়েই সে কাজে বেশ খানিকটা সফল হলেন। দলে একজন চিকিৎসক রাখলেন। এতকাল বিদেশ সফরে, বিশ্ব-কাপের খেলায় ও অন্যত্র কোনো প্রতিযোগিতায় দলের সঙ্গে গেছেন কর্মকর্তারা, নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা। কখনও চিকিৎসকের কথা ওঁরা ভাবেননি বা তার প্রয়োজনও মনে করেননি। তাঁরা কখনও ভাবতেন না খেলোয়াড়দের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা।

ইতিপূর্বে বিশ্বকাপে ভেনা ডেল মার-এ দেখা গেছে পিটার সোয়ানকে ভুল চিকিৎসা করায় তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তখন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সর্বক্ষণের জন্য চিকিৎসা উপদেষ্টা রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন।

ইংল্যাণ্ড ভাগ্যবান, হার্লি স্ট্রীট উপদেষ্টা ও আর্সেনাল টিমের ডাক্তার অ্যালান বাস-কে পেয়েছিল। রামসে ও তাঁর ট্রেনার হ্যারল্ড শেপার্ডসনকে লীডসের এই ব্যক্তি আপ্রাণ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখলেন প্রতিটি ফুটবলারকে। তাছাড়া ডাঃ বাস ছিলেন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ও ফুটবল দলের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী। যেমন হৃদয়বান ব্যক্তি, তেমনি তাঁর বুদ্ধির প্রখরতা ও শারীরিক সক্ষমতা। আবার অশেষ ধৈর্য গবেষণামূলক কাজে। বিশ্বকাপে তো তাঁরই নেতৃত্বে মেডিকেল ডিপার্টমেণ্ট চমৎকার কাজ করেছিল। 'ডোপিং' পরীক্ষায় তাঁর বাহিনী বেশ সাফল্য লাভ করে।

সফরে রামসের সঙ্গে যেমন মধুর হল সাংবাদিকদের সম্পর্ক, তেমনি খেলোয়াড়দের সঙ্গেও। নিজের রপ্ত করা সফল ট্যাকৃটিকসগুলি ব্যাখ্যা করলেন। বললেন: আমার খেলায় মুখ্য ভূমিকা উইঙ্গারদের। বিপক্ষের কড়া রক্ষণভাগে তারা দ্রুত বিচরণ করবে। তারা গোলমুখে পৌঁছে বল ঠেলে দেয় পিছনে।

এরপরে আমরা দেখেছি তিনি ওই ট্যাকৃটিকস পরিবর্তন করে চলে এসেছেন ৪-৩-৩ পদ্ধতিতে। আবার তারই পরিমার্জিত রূপ হয়েছে ৪-৪-২। আর উইঙ্গারদের সাবেকী খেলা অদৃশ্য করে তাদের যেমন শ্রমসাধ্য খেলায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে, তেমনি বেড়েছে রানের গতি। সারা মাঠে তাদের খেলে বেড়াতে হচ্ছে।

রামসে এই অপেক্ষাকৃত স্বল্প ভুলের স্ট্র্যাটেজিকে আঁকড়ে ধরে পরবর্তী গ্রীষ্মে ইংল্যাণ্ডকে নিয়ে চললেন ব্রাজিলে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলতে। রিও-তে মারাকানা স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী খেলায় ইংল্যাণ্ড বিধ্বস্ত হয়ে গেল। রামসেরই হিসাবে ভুল হয়েছিল ব্ল্যাকপুলের গোলরক্ষক টনি ওয়েটার্সকে নিয়ে। গর্ডন ব্যাঙ্কসকে বাদ রেখে তিনি টনিকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামাতে গিয়ে যে ভুল করলেন, সঙ্গে সঙ্গেই তার মাশুল দিতে হল এই পরাজয় দ্বারা। শুধু তাই নয়, আরও বোকামি করলেন পেলে-কে খুশিমত দৌড়তে দিয়ে ও মুক্ত রেখে। আর তারই ফল ৫-১ গোলে পরাজয়। পরাজয় হল এরপরেও উপর্যুপরি দুটি খেলায়। ব্রাজিলের পর খেলা ছিল আর্জেণ্টিনা ও পোর্তুগালের সঙ্গে। ব্রাজিলের সঙ্গে খেলা শুরুর আগে রামসেকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল—তাঁর মধ্যে স্পোর্টসম্যানশিপ কতটুকু আছে! সেদিন খেলার সময় নির্দিষ্ট করে ব্রাজিলই; অথচ তারা মাঠে এল একঘণ্টারও বেশি দেরি করে। এদিকে ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা বসে বসে অস্থির হয়ে উঠেছেন ড্রেসিংরুমে। রামসের অভিজ্ঞতা হল—ভবিষ্যতে তিনি

আর একাজ করবেন না। স্পোর্টসম্যানশিপ প্রমাণের জন্য আর এতক্ষণ অপেক্ষা করবেন না।

সফর ববি মূরের সঙ্গে গণ্ডগোলের জন্যই হয়তো রামসের স্মৃতিকে বহুকাল নাড়া দেবে। সফরটি সুপরিকল্পিত না হওয়ায় তেমন কাজে আসেনি। আর নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচটির কোনো হেতু ছিল কি? এর আগেই রিও-তে শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তারপর ইংল্যাণ্ড প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পায়নি। নিউইয়র্কে তখন কার্ফু চলছে। ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন খেলোয়াড় কার্ফু ভাঙলেন। কিন্তু তার চাইতেও বড় ঘটনা—ওদের কেউ কেউ এই সফরের সময়েই রামসে আয়োজিত ট্রেনিং সেশনেই অংশ নিলেন না এবং এঁদের অন্যতম ববি মূর। দ্রুত 'বিপ্লবে'র অবসান ঘটলেও এর রেশ রয়ে গেল। পরের অক্টোবরে বেলফাস্টে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ববি মূরকে উৎকণ্ঠায় কাটাতে হয়—ইংল্যাণ্ডের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হবে কিনা—এই নিয়ে।

মূরের সঙ্গে মিটমাটের আগে রামসে ওই ঘটনা নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ ছিলেন। ১৯৬৬-র বিশ্বকাপের আগে এমনও আশংকা হয় যে, ববি মূরের বদলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প যোগ্যতার লীডস ইউনাইটেডের নরম্যান হাণ্টার নেতৃত্ব পাবেন। হাণ্টারের বড় গুণ ছিল, তিনি মূর অপেক্ষা বেশি আক্রমণাত্মক। বিশ্বকাপের প্রাক্-সফরের সময় মূরের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন পূর্ব লণ্ডনেরই জিমি গ্রিভস। আশ্চর্য, টটেনহামের এই খেলোয়াড়ের সঙ্গেও রামসের তেমন বনিবনা ছিল না।

গ্রিভসের গুণাবলী রামসে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন গ্রিভসের ফুটবল প্রতিভার ধারে-কাছে পৌছনো অন্যদের আপ্রাণ চেষ্টাতেও সম্ভব নয়, এমন খেলোয়াড়ও 'বিপ্লবী'দের পক্ষে থাকাটা রামসেকে বেশ চিন্তিত করে তুলল। জিম গ্রিভস তাঁর বয়সীদের মধ্যে স্কোরাররূপে ছিলেন সবার উপরে। কিছুটা নার্ভাস হলেও তাঁর মত রসিক এবং শহুরে হয়েও পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী কমই মেলে। চেলসি দলে খেলার সময়েই শুরুতে সুনাম পেয়েছিলেন। মিলানে অল্পদিনের জন্যে থাকলেও তেমন গা লাগিয়ে খেলতেন না। মিলান থেকে লণ্ডনে ফিরে স্পার্সে যোগ দেন। এই গ্রিভস প্রকাশ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বললেন: আচ্ছা ঠিক আছে রামসে! ইংল্যাণ্ড দলের সর্বেসর্বা আপনি। আপনি তো আপনার বক্তব্য রেখেছেন, যুক্তি দেখিয়েছেন,

এবার আমাদের বাড়ি ফিরতে দিন! গ্রিভস কথাগুলি বলেন শিল্পনগরী কাটোইসে।

রামসে জানতেন, তাঁর কঠোর সমালোচক আছেন এবং সেসব নিয়ে নিজে রসিকতা করতেন, হেসে উড়িয়েও দিতেন। কিন্তু গ্রিভসের অশ্রদ্ধাকে তিনি সহজে হজম করতে পারেননি। ওদিকে সাংবাদিকদের সঙ্গে রামসের প্রথম কলহ শুরু হয় এর এক বছর আগে গেটেবার্গ সফরকালে। গ্রিভস দল থেকে বাদ পড়ায় সাংবাদিকরা সমালোচনা করলেন দল গঠনের। তাঁরা রামসেকে আগে জিজ্ঞাসা করেন: দলের কেউ কী আহত আছেন? রামসে বললেন: না, সকলেই সুস্থ। রামসে পরে সুযোগ না পান মিথ্যে অজুহাতের, তাই আগেভাগে ওই কথা বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তারপর সমালোচনা পড়ে তো রেগে আগুন। কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পেরে রামসের মত লোকের ক্ষমা চাওয়ার গুণ থাকা উচিত ছিল।

যাই হোক, গ্রীষ্মের সফরের আগেই জিমি গ্রিভস আগের মতই খেলতে লাগলেন, দীর্ঘদিন জণ্ডিসে ভুগেও। নরওয়েতে গিয়ে একরকম একাকীই চারটি গোল দিলেন। তখন তাঁর পেটটি ছিল ঠিক কোদালের মত চ্যাপ্টা। ডেনমার্কে গ্রিভস তেমন খেলতে পারলেন না। ইংল্যাণ্ড যে ২-০ গোলে জিতল, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ওয়েস্টহ্যাম স্ট্রাইকার জিওফ হার্স্টের।

আলফ রামসের আগমন এবং ১৯৩০-র বিশ্বকাপের পর ইংল্যাণ্ড দল ঢেলে সাজানো হয়, তাদের খেলারও প্রভূত পরিবর্তন ঘটে। গর্ডন ব্যাঙ্কস ১৯৬৩-র মে মাসে জাতীয় দলে প্রবেশ করেন ও ব্রাজিল গেলেন। কিন্তু তিনিও রামসের বিরাগভাজন হলেন পেলের একটি সোয়ার্ভিং ফ্রি-কিক্ ধরতে না পেরে। তবে তিনি প্রমাণ করেন শুধু বার্ট উইলিয়ামস নয়, ফ্রাংক সুইফটের পর তিনিই ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক।

শেফিল্ডের অধিবাসী গর্ডন ব্যাঙ্কস লেস্টার সিটি-র খেলোয়াড়। যেমন তাঁর শারীরিক সক্ষমতা, তেমনি শক্তি এবং এ দুটিরই দ্বিগুণ তাঁর উদ্দীপনা। তাঁর মুখের উঁচু হাড় ও ছোট ছোট চোখ দেখলে বোঝাই যেত না এর আদি নিবাস ইয়র্কশায়ারে। বরং কেউ কেউ ভুল করতেন রেড ইণ্ডিয়ান ভেবে। যেমন শান্ত, তেমনি বিনয়ী এবং পরিশ্রমী। বিশ্বকাপ ফাইনালের ঠিক আগে রামসে বললেন গোলরক্ষক ব্যাঙ্কসকে উদ্দেশ করে: তোমার খেলা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এনেছে এবং জানি আজ কোনো অঘটন ঘটবে না। ঘটেওনি।

রামসে ফুল-ব্যাকে রে উইলসনের সহযোগী নির্বাচিত করেন জর্জ কোহেনকে। লণ্ডনের এই তরুণ ফুলহামেই সারা জীবন পেশাদার ফুটবল খেলেছেন। যেমন শক্ত, তেমনি দ্রুত এবং বল নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে প্রতি-পক্ষকে অতিক্রমের পর নিমেষে ক্লিয়ার করতে সক্ষম।

রাইট হাফে নবি স্টাইলস। নবিকে সকলে 'খেলোয়াড়দের খেলোয়াড়' আখ্যা দিয়েছিলেন। বেঁটে। চেহারা দেখে মনে হত নিশ্চয়ই কোনো পেটের ব্যামোয় ভুগছেন। গ্রাম্য চেহারার এই খেলোয়াড়কে রেফারি ও প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়রা সর্বদাই কড়া নজরে রাখতেন। নিজের দলের খেলোয়াড়দের সব সময়ে ভৎর্সনা করতেন মাঠের মধ্যেই। নবির খেলায় টেকনিকাল তেমন কিছু ছিল না। বলও যা পাস দিতেন—তা নির্ভুল হত না। কিন্তু প্রতি-পক্ষকে প্রহরা দিতে তাঁর জুড়ি ছিল না। ১৯৭০-র বিশ্বকাপের পর ফুটবল-প্রেমিকরা কদাচিৎ ভুলেও তাঁর প্রশংসা করেননি। কিন্তু নবি আত্মসুখ অনুভব করতেন এই ভেবে যে, প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা এবং ভয়ঙ্কর ফরওয়ার্ড ইউসেবিও শুধু তাঁকেই ভয় পেতেন। অর্থাৎ নবিকে অতিক্রম করা যে কোনো ফরওয়ার্ডের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল।

ইংল্যাণ্ড দলের রক্ষণভাগ নিয়ে যত না চিন্তার ছিল, তার চাইতে রামসে বেশি ভাবতেন আক্রমণভাগ নিয়ে। ববি চার্লটনকে সংস্কার করা হল। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড একাজে কম সাহায্য করেনি। এই লেফট উইঙ্গার উভয় পায়ে অসাধারণ শটে রপ্ত হয়েছেন। সমগ্র দলের জন্য তাঁর এই কুশলতার প্রয়োজন ছিল। রামসে ঘোষণা করলেন : তোমাকে সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকতে হবে। তুমিই আমার প্রধান হাতিয়ার। চার্লটন সে-কাজ করেছিলেন বিভিন্নভাবে। তবে জনি হেনেসের পথে নয়। হেনেসের বল কণ্ট্রোলকে সমালোচকরা তেমন প্রশংসা না করলেও হেনেস ও ব্যাপারে ছিলেন বিশ্বের প্রথম সারিতে। কিন্তু টেকনিকের দিক থেকে চার্লটন অতুলনীয়। চার্লটনের খেলায় হেনেসের কোনো প্রভাবই ছিল না। তবে তাঁর খেলা দেখে চার্লটনের চোখ খুলে যায়। সন্ধান পান ফুটবলের নব নব স্ট্র্যাটেজির। চার্লটনের দীর্ঘ ক্রশফিল্ড-পাসগুলো ওয়েমব্লির হাজার হাজার দর্শকদের মধ্যে সমুদ্রগর্জন এনে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এই পাসগুলি শুধুই দর্শনীয় ছিল না, চোখের খোরাক মেটাতেও কার্যকর ছিল। কাজের কাজ তেমন কিছু হয় না। কিন্তু বিপক্ষকে কাটাতে তাঁর বিচক্ষণতা এবং সোয়ার্ভিং

শটগুলি তাদের রক্ষণভাগকে ক্ষণে ক্ষণেই বেগ দিত। এক-একজন ডিফেণ্ডারকে অতিক্রম করে যখন আরও এগোতেন, তখন গোলের সুসংবাদটি বহনের অগ্রদূত হয়ে উঠতেন। চার্লটনের পক্ষে তখন গোল দিতে না পারাটাই যেন কষ্টসাধ্য ছিল। ফাইনালের দিন তো তাঁর বল ধরার আগে প্রতিপক্ষ দল যেন তিলে তিলে পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তা না হলে হেলমুট শ্যোন কেন বেকেনবাউয়েরের মত প্রতিভাবানকে চার্লটনকে প্রহরা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ববির সহোদর জ্যাক চার্লটন লীডস ইউনাইটেডের মত ইংল্যাণ্ড দলেরও স্থায়ী সেণ্টার হাফ হয়ে যান। লীডস-ম্যানেজার ডন রিভি হয়ত 'প্রবীণ' জ্যাকির খেলায় সাম্প্রতিক অভূতপূর্ব উন্নতি লক্ষ্য করেননি। কিন্তু জাতীয় দলকে প্রভূত সাহায্য করলেন। যেমন লম্বা, তেমনি শক্ত। খনির কাজেই চার্লটন পরিবারের খ্যাতি। তাঁর শরীরও তেমনি, মনের দৃঢ়তাও। তবে এদিক থেকে দু-ভাইয়ের অমিল বেশ। ববির মত জ্যাকি মোটেই শান্ত প্রকৃতির ছিলেন না, যদিও ববিকে তিনি ভীষণ ভালবাসতেন। বাল্যে বা কৈশোরে তাদের দেখে মনে হত না কোনোরকম ঘনিষ্ঠতা আছে। ববির মত তাঁর খেলায় আভিজাত্য ছিল না। খেলার সহজাত গুণাবলীও কম ছিল ববির চাইতে। কিন্তু জ্যাকির দৈহিক ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার তারিফ না করে উপায় ছিল না।

একবার চার্লটন ও স্টাইলস ট্রেনিং গেমের সময় প্রচণ্ড ঝগড়ায় অবতীর্ণ হন। রামসে সব দেখে-শুনেও কোনো কথাই বললেন না। তাঁর ইচ্ছা—ঝগড়া চলুক এবং নিশ্চয়ই এক সময় সমাপ্তি ঘটবে। রামসে ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়েই এসব লক্ষ্য করতেন। কারুর ব্যক্তিগত ঝগড়া বা গণ্ডগোলে নাক না গলিয়ে শুরুতেই বললেন: তোমাদের মধ্যে কার কী সম্পর্ক জানি না, শুনতেও চাই না। আমার একমাত্র লক্ষ্য বিশ্বকাপ। ওই কাপ তোমাদের জিততেই হবে।

এটা রামসের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না, অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সুরেই প্রতিদিন কথাগুলো আওড়াতেন। র বিশ্বকাপ শেষে দেখা গেল রামসে তার অতি দুঃসাহসিকতাকে কাজে রূপায়িত করেছেনও।

ওয়াল্টার উইণ্টারবটমের চাইতে ইংল্যাণ্ড দলকে সংহত ও শক্তিমান করার অনেক সুযোগ ও সময় আলফ রামসের ছিল। বিচক্ষণতার দ্বারা তিনি দিনের

পর দিন প্রত্যেকের মানসিকতা লক্ষ্য করে ওদের মধ্যে সমন্বয় আনেন। আর এই সমন্বয় বা সংহতি শুধু প্রাক্-বিশ্বকাপ সফরের দ্বারাই গড়ে ওঠেনি। লিলেশহলের ফিজিক্যাল রিক্রিয়েশন সেণ্টারে তাঁরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত ছিলেন। যখন প্রতিযোগিতার দিন এগিয়ে এল, তখন তো প্রতিটি খেলোয়াড় রীতিমত ফিট, যদিও তখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। প্রতিটি খেলোয়াড়ের মানসিকতাও তুঙ্গে পৌঁছেছে।

জিওফ হার্স্ট দলভুক্ত হলেন অতিকষ্টে। অসলোয় এক সাংবাদিক চেলসির তরুণ ফরোয়ার্ড পিটার অসগুডকে না দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কী জিওফ! জিওফ একটু বিরক্তির সুরে বললেন: পিটার আসতে পারত, তবে আমার বিনিময়েই। ববি মূরের মত তিনিও ওয়েস্টহাম ম্যানেজার রণ গ্রীনউডের প্রশিক্ষণে বড় হয়েছিলেন এবং স্নেহভাজন ছিলেন। চমৎকার তাঁর শরীর, লম্বা, ইয়া মোটা উরুর পেশী। নিখুঁত শুটার ও হেডার। কিন্তু সাধারণ পর্যায়ের উইং হাফ বৈ নন এবং তাই গ্রীনউড ওঁকে দ্বিতীয় ডিভিশনের কোনো দলে খেলার সুপারিশ করেন। ওল্ডহাম অ্যাথলেটিকের হাফ ব্যাক-পুত্র হার্স্ট শুরুতে ছিলেন এসেক্সে; খেলতেন ক্রিকেট। বিপক্ষের কাছ থেকে হিংস্র আচরণ পেয়েও দার্শনিকের মত নির্লিপ্ত থাকতেন হার্স্ট। লেফট উইং-এ তাঁর মুভমেণ্টগুলি প্রতিভাবান খেলোয়াড়েরই পরিচয় বহন করে। বল ধরে কখনও কাছে রাখতেন না। সর্বদাই সতীর্থদের খেলাতে এমন নিঃস্বার্থ খেলোয়াড় কদাচিৎ মেলে।

দলে ওয়েস্টহামের তৃতীয় সদস্য মার্টিন পিটার্স। বাড়ি লণ্ডনে। ভীষণ শান্ত স্বভাবের। গ্রীনউডের মতে মার্টিনের যা বয়স, খেলায় তার চাইতে সে দশবছর এগিয়ে ছিল। সাধারণত রাইট হাফে খেলাই পছন্দ করতেন। টেকনিকের দিক থেকে তাঁকে প্রথম সারিতে স্থান দেওয়া হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে। মাত্র এর আগের মে মাসে তিনি ইংল্যাণ্ড দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। রামসে তাঁকে ওয়েমব্লিতে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে নামালেন। তবে অধিকাংশই বলেন, মার্টিন পিটার্সকে আরও আগে নামানো উচিত ছিল।

ব্ল্যাকপুলের ইনসাইড ফরওয়ার্ড একুশ বছর বয়সী লালচুলের অ্যালান বলের মত খেলোয়াড়কে রামসের ভীষণ পছন্দ ছিল। এর আগের বছর বলের বিংশতি জন্মতিথিতে রামসে বেলগ্রেডে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে নামান। বলের বাবাও প্রাক্তন পেশাদার ফুটবলার এবং

একই পজিশনে খেলতেন। চেহারাও ঠিক বাবার মতই। অ্যালান যেমন উদ্দীপনায় ভরপুর, তেমনি ফুটবলের প্রতি তাঁর গভীর মোহ। সমালোচকরা বলতেন: অ্যালান এত দ্রুত যে, তাঁকে মাছ বা পাখি যে কোনটির সঙ্গে তুলনা করা যায়। মিড-ফিল্ড প্লেয়ারের প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য দ্রুতগতি—অ্যালান বলের তা আছে ষোল আনা। গোলদাতার সব গুণেরও সমন্বয় তাঁর খেলায়। ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের জয়ে তাঁর মত আর কারুর অবদান ছিল না। তাঁর মত অত ভালও কেউ খেলেননি।

লিভারপুলের ইনসাইড ফরওয়ার্ড রজার হাণ্টও আলফ রামসের আর একজন স্নেহধন্য। শুধু সুন্দর চুল নয়, শরীরের গড়নেও ব্যায়ামীর প্রকাশ। মার্টিন পিটার্সের মত শান্ত, তবে অতটা প্রতিভাবান নন। অবশ্য মাঝে মাঝে অদ্ভুত খেলেন, বুদ্ধির পরিচয়ও মেলে। আদতে তিনি ভীষণ পরিশ্রমী। রজার হাণ্ট সম্পর্কে রামসের দুর্বলতার প্রকাশ প্রায় স্কটিশ সমর্থকরা একবার হাণ্টকে ঘেরাও করলে। কেউ কেউ হাণ্টকে লক্ষ্য করে বলেন: ও বেচারাকে আটকে লাভ কি? কী-ই বা গুণ আছে ওর! রামসে তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর না দিয়ে একটু নিস্তব্ধ রইলেন এবং বললেন: ও! রজার হাণ্ট! রজার এক মরশুমে অন্তত বিশটি গোল করে, কোনো মরশুমেই তার গোলের সংখ্যা এর কম হয় না। সত্যিই রজারের কোনো গুণ নেই।

ওয়েমব্লিতে এক নম্বর গ্রুপের একটি ম্যাচে ইংল্যাণ্ড ড্র করে। সেটি উরুগুয়ের সঙ্গে। ওই খেলাটি হোয়াইট সিটিতে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ওই ম্যাচ ও ফ্রান্সের সঙ্গের খেলাটিও তাদেরই অনুরোধে বিশ্বকাপের সদর কার্যালয় ওয়েমব্লিতেই হল। গ্রুপের চতুর্থ দল মেক্সিকো। তাদেরও হারাতে বেগ পাওয়ার কথা নয়। ইংল্যাণ্ডকে তাই কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার পথ মোটামুটি বাধাহীন ছিল।

প্রতিযোগিতার শুরুতেই অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটে গেল: ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন যে পুস্তিকা প্রকাশ করে বিশ্বকাপ উপলক্ষে, তাতে দেখা যায় আগেই তারা ইংল্যাণ্ডের সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে বে-আইনী তথ্য সরবরাহ করেছেন। খেলার সূচনা না হতেই বলে দেওয়া হল ইংল্যাণ্ড কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে ওয়েমব্লিতে। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া হয়েছে তারা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন। আরও বলা হল তারা সেমিফাইনাল খেলবে এভার্টনে। ফিফাও একথা জানত না—কোথায় কোয়ার্টার ফাইনাল বা কোথায় সেমি-

ফাইনাল হবে। ফিফার আইনেও পরিষ্কার কিছুই বলা হয়নি—উদ্যোক্তা দেশ যে তাদের পছন্দমত খেলার স্থান বেছে নেবে বা নিতে পারে। কেউ কেউ মনে করলেন এক নম্বর গ্রুপের বিজয়ীরা কোয়ার্টার ফাইনালে জিতলে ওয়েমব্লিতে সেমিফাইনাল খেলবে, আর যেহেতু গ্রুপের শক্তিশালী দল ইংল্যাণ্ড তাই অমন ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তবে বিশ্বকাপের খেলা কোথায় হবে সে সিদ্ধান্ত একান্তভাবেই বিশ্বকাপ কমিটি নেয়। এ নিয়ে তারা সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে আলোচনাও করে।

ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পুস্তিকা খোরাক দিল কিছু ইউরোপীয় ও দক্ষিণ আমেরিকান সাংবাদিকের। তাঁরা ফিফা সভাপতি স্যার স্ট্যানলি রাউসকে দোষারোপ করলেন খেলার স্থান নির্বাচন নিয়ে। এক সাংবাদিক তো বড় একটি ডেসপ্যাচ পাঠালেন। 'কন্‌স্‌পিরেসি থিওরি অফ ফুটবল' হেডিং-এ খবরটি প্রকাশিত হয়। বলা হল স্যার স্ট্যানলি এবার যা কিছু করছেন, তার সব কিছুর মূলে ইংল্যাণ্ডকে চ্যাম্পিয়ন করা।

এসবের সত্যতা কতদূর আজও জানা যায়নি। তবে যে দেশে খেলা হয়, তাদের দলের সামনে নানা অনুকূল পরিবেশ থাকে। ইংল্যাণ্ডের তেমন সুযোগ ছিল না—এমন কথা বলা যথার্থ হবে না। ফিফা কমিটিতেও একটি গ্রুপ জোরদার দাবি তোলে। তাদের যুক্তিও ছিল। ওরা বলে: ওয়েমব্লিতে ইংল্যাণ্ডের খেলা হলে আর্থিক দিক থেকে লাভ হবে। স্টেডিয়াম ভরে যাবে। ওখানে আসন নব্বই হাজার দর্শকের। ওয়েমব্লিতে রাশিয়া-জার্মানীর খেলায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি দর্শক আসবে না। কিন্তু লিভারপুলের যেখানেই খেলা হোক স্টেডিয়াম ভরে যাবে। ওখানে আসনও কম। স্ট্যানলি রাউস এসব যুক্তি মানতে রাজি হননি। কিন্তু অধিকাংশের ইচ্ছায় ফিফা সভাপতি সায় না দিয়ে পারেননি।

লিভারপুলের এভার্টন স্টেডিয়ামে ইংল্যাণ্ডের খেলা না ফেলায় দর্শকদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। রাশিয়া-জার্মানীর খেলার আগে তাই যথারীতি বিক্ষোভ হল ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে। তবে ওদের হঠাতে পুলিশকে তেমন বেগ পেতে হয়নি।

প্রতিযোগিতার আগে ইংল্যাণ্ডে বেশ গুজব ছড়িয়ে পড়ে জুল রিমে কাপের অবস্থা এফ এ কাপের মতই হতে পারে। এফ এ কাপ চুরি হয়েছিল বলেই কা সোনার পরীযুক্ত বিশ্বকাপও চুরি হবে? উদ্যোক্তারা একে নিছক গুজব

বলে মন্তব্য করলেন। এফ এ কাপ চুরি যায় বার্মিংহামের একটি দোকানের শো কেস থেকে। ওটি ওখানে জনসাধারণের দর্শনের জন্য রাখা হয়েছিল।

গুজব সত্যে পরিণত হল। এফ এ কাপ অপেক্ষা অনেক দামী বিশ্বকাপ চুরি গেল ওয়েস্টমিন্‌স্টারের প্রদর্শনী শো কেস থেকে। বিশ্বকাপ চুরি নিয়ে ইংল্যাণ্ডে হৈ চৈ পড়ে গেল। সারা বিশ্বের সংবাদপত্রেও হেড লাইন। তারপর রয়টার, এ পি, ইউ পি আই, এ এফ পি তো বটেই, নানা সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতারাও নানা খবর পাঠাতে লাগলেন। শোনা গেল, কাপ না পেলে ওই ডিজাইনের কাপ তৈরী করা হবে। এদিকে কাপ খুঁজতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা বিভাগও রীতিমত তৎপর। কোনো কিছুতেই কাপের সন্ধান মিলল না। অবশেষে সব আশংকার অবসান ঘটায় একটি গ্রাম্য কুকুর। শহরতলী অঞ্চলের চুণ, সুরকি ও ভাঙা ইটের স্তূপ থেকে 'পিকল্‌স' নামে ওই কুকুরটি কাপ খুঁজে বের করে। 'পিকল্‌সের' প্রভু ওকে নিয়ে এক সকালে গিয়েছিলেন বেড়াতে এবং ওই স্তূপের মধ্যে সে 'অদ্ভুত' বস্তুটির সন্ধান পায়।

ব্রাজিল—এভার্টন মাঠে ব্রাজিলের সব খেলা পড়লেও তারা ছিল তিন নম্বর গ্রুপে। বিশ্বকাপ ফুটবলে আবার 'ড্র' নিয়ে সমালোচনা হল। 'ড্র' করা হল কারুর কারুর 'স্বার্থে'। তবুও এসবে ভ্রূক্ষেপ না করে ডঃ হিল্টন গসলিং লিম-এর চমৎকার পরিবেশে দলকে রাখলেন। দলের ম্যানেজারের দায়িত্বে আবার দেখা গেল ভিসেণ্ট ফিওলাকে। ব্রাজিল দল নির্বাচনকালে মনে হল আগের বিশ্বকাপের খেলোয়াড়রা বুড়িয়ে গেছেন। কিন্তু নির্বাচনের পর যতই দিন যেতে থাকে, তাঁদের অনুশীলন অন্য ধারণা দিল—তাঁদের সব অস্ত্রই ধারালো আছে, সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করে ব্রাজিল এবারেও জুল রিমে জিততে পারবে। আর এ শুধু জয় নয়—উপর্যুপরি তিনবার তারা কাপ জয়ের রেকর্ডও করবে।

দেখি তো ওদের দলটা কেমন! আলফ রামসে ইংল্যাণ্ড দল নিয়ে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি সফরে গেলেন। পৌছলেন গেটেবার্গে এবং দেখলেন সুইডেনের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের ৩-২ গোলে জয়। রামসেও ব্রাজিলের খেলা দেখে তেমন খুশী হতে পারলেন না। তাদের রক্ষণভাগের মধ্যাঞ্চল এখনও দুর্বল। শুধু তাই নয়, বিস্ময়ের বিষয়—ব্রাজিলের দল ১৯৩০-র অধিকাংশ তারকাদের নিয়েই গঠিত তো বটেই, তারা ডেকে এনেছেন ১৯৫৮-র দুই সেণ্টার ব্যাক বেলিনি ও অরল্যাণ্ডোকেও।

গ্যারিঞ্চা গেটেবার্গে কেবলমাত্র দ্বিতীয়ার্ধে খেলেন এবং রাশিয়াকে ওই সময়টুকুতেই সন্ত্রস্ত করে ফেলেন। কিন্তু একবার বল নিয়ে ভীষণভাবে দৌড়ের পর হঠাৎ বসে পড়লেন। গ্যারিঞ্চা কিছুদিন আগে মোটর দুর্ঘটনায় আহত হন। মনে হয় ছুটতে গিয়ে পুরনো আঘাত চাড়া দিয়ে উঠেছে। ডঃ গসলিং বললেন: গ্যারিঞ্চার আগের আঘাত সেরে উঠলেও এখনও তা সম্পূর্ণ উপশম হয়নি।

ওই আঘাতের পর গ্যারিঞ্চা মাঝে মাঝে খেললেও, তাঁর আগের খেলা দেখা গেল না। অতি ধীরে ধীরে তিনি আরোগ্য লাভ করছিলেন। ব্রাজিলের ফুটবল নির্বাচকমণ্ডলীর উচিত ছিল গ্যারিঞ্চাকে বাদ রাখা। তা তাঁরা করেননি।

বয়সে ভারাক্রান্ত ডি স্যান্টোস ও অনেকটা স্মৃতির পাতায় চলে যাওয়া জিটো নির্বাচিত হলেন। ১৯৫৮-র তৃতীয় যে খেলোয়াড়টি দলভুক্ত হলেন, তিনি চৌত্রিশ বছর বয়সী ডিশে। ইতালি থেকে ডিশে চলে যান সাওপাওলোয় ফুটবল থেকে অবসরের ইচ্ছা নিয়েই। কিন্তু এখনও তাঁর খেলার এমনই গতি যে, অনায়াসে জাতীয় দলে নির্বাচন লাভ করতে পারেন। কোরিন্থিয়ানসে খেলছিলেনও বেশ দাপটে। অবশ্য চূড়ান্ত দলে তাঁকে নেওয়া হয়নি। দলে এলেন শক্তিমান হাফব্যাক লিমা এবং ১৯৬০-এর ওলিম্পিক দলের গারসন। কেউ কেউ বললেন, এ হল দ্বিতীয় ডিডি। গারসনের খেলা শুরু থেকে শেষ ডিডি প্রমুখ দিক্‌পালদের মত একই গতিতে না চললেও গেটেবার্গে তিনি ডিডি-র দ্বিতীয় সংস্করণ হলেন। দর্শনীয় ছিল একটি ফ্রি-কিকে বাঁ পায়ে ঠিক ডিডি-র মতই 'ফলিং লিফ্‌' মেরে গোল করা। দুটি দারুণ গোল দিয়ে দৃষ্টি কেড়ে নিলেন উনিশ বছর বয়সী স্ট্রাইকার বেলো হরিজণ্টের টোস্টাও।

ব্রাজিলের দল নিয়ে যে যাই বলুন, সর্বদাই বিরূপ মন্তব্য করার উর্ধ্বে ছিলেন অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের 'দ্য এক্স মেশিনা'—পেলে। শটে যেমন বুলেটের মত বেগ, তেমনি তাঁর ফুটবল দক্ষতা। যে কোনো ম্যাচ—তা গোটা ব্রাজিল যত খারাপই খেলুক, একা পেলেই মুহূর্তের মধ্যে খেলার আদল পাল্টে দিতে পারেন। কিন্তু তিনিও আঘাতে আঘাতে আহত, কিছুটা নিষ্প্রভ। তবুও এই পঁচিশে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন ফুটবল-জীবনের তুঙ্গে।

স্মরণ থাকতে পারে, ১৯৩০-র ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়া ব্রাজিলের

মুখোমুখী হয়েছিল, সেই চেক ম্যানেজার রুডলফ ভিটলাসিল এবার এলেন বালগেরিয়া দলের দায়িত্ব নিয়ে। বালগেরিয়া খেলল ব্রাজিলের গ্রুপে। ভিটলাসিল ব্রাজিলকে দেখে বললেন: শুরুতে বা আর কিছু পরে হোক ব্রাজিলের মনোবল ভেঙে পড়তে বাধ্য। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না, বরং তাঁকে অনেকে হেসেই উড়িয়ে দেন।

ভিটলাসিল বালগেরিয়াকে মোটামুটি দড় করে তোলেন। একটি প্লে-অফ্ ম্যাচে তো বেলজিয়ামকে পরাস্ত করল বালগেরিয়া। বালগেরিয়ায় ফুটবল মরশুমের শেষের মাসে তিনি ট্রেনিং ক্যাম্পে রীতিমত রূঢ় আচরণ করেছিলেন। স্থানীয় চ্যাম্পিয়ানশিপে তিনি খেলোয়াড় না ছাড়ায় বেশ সমালোচনাও হয়। অবশ্য সবই বালগেরিয়ার স্বার্থে। বালগেরিয়া দলে ভিটলাসিলের প্রধান অবলম্বন ছিলেন দীর্ঘকায়, শক্তিমান সেণ্টার ফরওয়ার্ড এবং বাঁ পায়ে থরহরি সৃষ্টিকারী গুণ্ডি অ্যাসপারুকোভ। গোড়ালির আঘাতে তাঁর তখন খেলায় ঘাটতি দেখা যায়। তবুও অ্যাসপারুকোভের খ্যাতি কমেনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বালগেরিয়ার এবং বিশ্ব ফুটবলেরও,— সালে মোটর দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হলেন।

হাঙ্গেরি: পোর্তুগাল ও হাঙ্গেরির মত শক্তিশালী দুটি দলকে একই গ্রুপে রাখা হল। আগেই জানিয়েছি, এই তিন নম্বর গ্রুপে ব্রাজিলও আছে। হাঙ্গেরির ম্যানেজার স্থির করলেন এবার ৪-২-৪ পদ্ধতিতে খেলা চলবে না। তিনি মাত্রাই-কে সুইপার নিযুক্ত করলেন। 'তা না হলে ব্রাজিল ও পোর্তুগালের সঙ্গে যুঝে পারা যাবে না' বললেন তিনি। গ্রুপের ম্যাচে তারা ভালই খেলল। হারল শুধু পোর্তুগালের কাছে। হাঙ্গেরি দলে এবার হিদেকুটির মতই আর একজন খেলোয়াড়কে সেণ্টার ফরওয়ার্ডে দেখা গেল, নাম তাঁর ফ্লোরিয়ান আলবার্ট। ফেরেঙ্ক বেনে ও আলবার্ট থাকলে হাঙ্গেরির আর ভয় কি? ওলিম্পিকসে বেনের সাফল্য ছেষট্টির বিশ্বকাপ দর্শকরা মনে রেখেছিলেন। খর্বকায়, কিন্তু ফুটবল পায়ে পড়লে বুদ্ধির প্রখরতায় বেনে বিপক্ষের বিপদের কারণ হন, তীরবেগে ছুটে যান ডানদিক দিয়ে। ছেষট্টির বিশ্বকাপে হাঙ্গেরির ট্যাকটিকস 'কাটানাকিও' অপেক্ষা অনেক কার্যকর হল।

পোর্তুগাল: রোমানিয়ায় পোর্তুগাল হারলেও অবশেষে গ্রুপের ম্যাচে সকলের ধারণাকে টলিয়ে দিল। ব্রাজিলের যেমন পেলে একাই একশ, তেমনি পোর্তুগালের ইউসেবিও। বিশ্বকাপ ফুটবলে আর এক উজ্জ্বল তারকা, ডান

পায়ে তিনি অঘটন ঘটান। এই স্ট্রাইকিং ইনসাইড ফরওয়ার্ডের যেমন বল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, তেমনি বল নিয়ে অদ্ভুত দক্ষতায় বিপক্ষকে কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। মোজাম্বিকের লুরেঙ্কো মার্কোসে জন্ম। উনিশ বছর বয়সে মণ্টিভিডিওয় বিশ্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে ইউসেবিও ছিলেন বেনফিকা দলে, তার আগে প্যারিসে একটি প্রীতি ম্যাচে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। চোখে-মুখে তাঁর সর্বদা শান্ত ভাব ও সৌম্যতা। এমন নিরীহ প্রকৃতির মানুষটি কোনো কারণে মেজাজ হারালেও কখনও কঠোর মনে হয় না। রাজকীয় ভঙ্গিতে বল নিয়ে চলাফেরা করেন। আর প্রতিটি মার যেন অ্যাটমের শক্তি মিশ্রিত। পেলের প্রতিদ্বন্দ্বী যদি কেউ থাকেন, অন্তত তাঁর মত দক্ষ ও সুন্দর ফুটবল প্রদর্শনে—তবে নিশ্চিতভাবে একটি নামই মনে পড়বে—তিনি ইউসেবিও।

গত পাঁচ বছর যাবৎ ইউরোপীয়ান কাপে বেনফিকার অনেক তারকাকে দেখা গেছে। তাঁরা খেলেছেনও চমৎকার, আর বেনফিকা দুবার কাপ জিতেছে, দুবার ফাইনালে হেরেছে সামান্যের জন্য। ফাইনালের নিষ্পত্তি হয় ইউসেবিওর বজ্রসম শটে। আমস্টার্ডামে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে শেষ গোলটি দেন। ফাইনালে সেদিন আগের তিনটি গোল দেন ফেরেঙ্ক পুসকাস। জোসে অগাস্টো আগে ছিলেন দলের দ্রুততম রাইট আউট, এবার মিড-ফিল্ডে খেললেও লেফট-ইনে তাঁর আক্রমণ রচনা হাঙ্গেরির পক্ষে মস্ত হাতিয়ার হল। লেফট ও রাইট ফ্লাঙ্কে সিমোসকে খুব কার্যকর দেখা যায়। শূন্যে বল এলে টোরেস বিপক্ষের সবচেয়ে ভীতির কারণ হন।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা, চূড়ান্ত দল গঠনের সময় তাঁদের দুই অতি নির্ভরযোগ্য ডিফেণ্ডারকে বাদ রাখেন। লম্বা ও শান্ত মেজাজের গোলরক্ষক কস্টা পেরিরা এবং দুর্ভেদ্য সেণ্টার হাফ জার্মানো বেনফিকার ডিফেন্সকে শক্তিশালীই শুধু করেননি, এঁদের বদলী খেলোয়াড় নামাবার কথা বেনফিকা ভাবতেই পারত না। কিন্তু হাঙ্গেরি দলে এঁদের স্থান হল না।

বিভিন্ন গ্রুপে: ইংল্যাণ্ডের গ্রুপে সবচেয়ে শক্তিশালী দল উরুগুয়ে। তাই উরুগুয়ের সঙ্গে যারা সহজে জিততে পারবে, কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছতে তাদের বেগ পাওয়ার হেতু ছিল না। ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে কেউ কেউ বললেন, উরুগুয়েকে হারানো মানেই ফাইনালেও জয়লাভ। বিদগ্ধরা একটু সংশোধন করেও বললেন, না, ঠিক তা নয়; বরং বলা যেতে পারে ফাইনালের

আগের কঠিনতম বাধা শুধু নয়, ফাইনালের আগের গুরুত্বপূর্ণ খেলা ওদের বিরুদ্ধেই। এই উরুগুয়ের ম্যানেজার হয়ে এলেন প্রবীণ, ফুটবলের জন্য জীবনপাতকারী সদালাপী ওনডিনো ভিয়েরা। দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের বহুদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি উরুগুয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নির্বাচকমণ্ডলী দলভুক্ত করলেন উজ্জ্বলতম ইনসাইড ফরওয়ার্ড পেড্রো রোশাকে। গোলে নেওয়া হল লাভিশ্লাও মাজুরকিউইজকে। কিন্তু ভিয়েরা সেইসব উরুগুইয়ান খেলোয়াড়দের পেলেন না, যাঁরা আর্জেন্টিনার নানা ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উরুগুয়ে তাই গঠিত হল কুশলী ও খ্যাতিমান সিলভিরা, পাভনি, ম্যাটোসাস, সাশিয়া ও কুবিল্লা ছাড়াই।

বিশ্বকাপের আগে ইউরোপ সফরে সুখী পরিবারের মত খেলে বেড়ালেন উরুগুয়ের তরুণ দল। ফলও বেশ ভাল হল। ভিয়েরা এই সময় ইংল্যাণ্ড দলকে নিরীক্ষণ করলেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। তিনি উত্তর খুঁজে পেলেন না— কেন তারা কনেলির মত ব্যূহ ভেদকারীকে বাদ রাখতে চায়। যদি তাঁকে বাদ দেওয়া হয়, তবে ধরে নিতে হবে, তারা রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলবে বিশ্বকাপে। না, কোনোমতেই অ্যাটাকিং ফুটবল নয়—বরং ভীষণ রকমের ডিফেনসিভ ফুটবল।

বার্মিংহাম—শেফিল্ড গ্রুপে রইল আর্জেন্টিনা, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানী। মিলানের ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাবের ইনসাইড ফরওয়ার্ড লুই সুয়ারেজের নামডাক ছিল গোলদাতা হিসাবে। ১৯৬২-র বিশ্বকাপেও তিনি স্পেন দলে খেলেছিলেন। আর খেলার গুণে তাঁর আগে কেউ অত দাম হাঁকতে পারেননি। সুয়ারেজের ট্রান্সফার ফি ছিল সর্বোচ্চ—তুলক্ষ পাউণ্ড। এই সুয়ারেজও যেন ইংল্যাণ্ডকে জেতাব পথ করে দিলেন। তাঁর নিজের দেশ প্যারিসে ছোট্ট আয়ারের বিরুদ্ধে অতিকষ্টে ১-০ গোলে জেতে আটলান্টিকে মাদ্রিদের রাইট উইঙ্গার ইউফার্টের কৃতিত্বে। এই ইউফার্টের ফুটবল-জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে ব্রাজিলের ফ্লেমেঙ্গোতে।

আর্জেন্টিনা '৯৫৮ থেকে সাধনায় ব্যাপৃত ছিল আন্তর্জাতিক ফুটবলে সুনাম কেনার জন্য। তারা ব্রাজিলের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীও হয়। ওই প্রতিযোগিতায় ইংল্যাণ্ড, পোর্তুগাল প্রভৃতি ফুটবলে শক্তিমানরাও এসেছিল অসম্ভব ডিফেন্সিভ ফুটবল নিয়ে। অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী ডেকে আনলেন সেণ্টার ফরওয়ার্ড লুইস আর্টাইম ও লেফট ইন

এরমিণ্ডো ওনেগাকে। এর কিছুদিন আগে উভয়েই রিভার প্লেটে রিজার্ভ খেলোয়াড় ছিলেন। আর্টাইমের চেহারা এত সুন্দর ছিল যে, মাঠে তিনি 'আল্ হারমোসো' নামেই খ্যাতি লাভ করেন। পরবর্তী ছয় বছর তিনি সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকায় গোলের বন্যা বইয়ে দেন। দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছিলেন অ্যান্টনিও র‍্যাটিন। র‍্যাটিন লুইসিটো মন্টির যোগ্য উত্তরাধিকারীও বটে, কাটানাকিও বা মেটোডো যেকোনো পদ্ধতিতেই রপ্ত ছিলেন লম্বা ও বলবান এই ফুটবলার।

সুইসরা ভাগ্যবানই ছিল, তা না হলে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে হারাতে পারে! এর আগে তারা কোনোক্রমে আলবানিয়ার সঙ্গে ড্র করে। পশ্চিম জার্মানী এল সুইডেনকে খরচের খাতায় রেখে। প্রত্যাবর্তন ঘটল সেই দুর্ধর্ষ উয়ে জিলারের। অস্ত্রোপচারের অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অদ্ভুতভাবে খেলার মাঠে ফিরে এলেন এবং স্টকহমে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জার্মানীর জিত হল। জিলার লণ্ডনে এক জার্মান সাংবাদিককে অনেকটা হতাশার স্বরে বললেন, আমার আর সেদিন নেই। অন্যের মত না পারি ছুটতে, না পারি ট্যাক্‌ল করতে। একজন ফুটবলারের এসব না থাকলে তার খেলার মানে হয় কি? কিন্তু জিলার যখন মাঠে নামলেন, দেখা গেল তাঁর সবই আছে। ইংল্যাণ্ডের ধারণা ছিল অন্যরকম। চার বছর পর উয়ে জিলারের আগের খেলায় ঘাটতি দেখা দেবেই। আসলে উয়ে জিলারই ছিলেন জার্মান দলের জীবন। তিনি থাকলে অন্যরাও জীবন্ত হয়ে ওঠেন। জার্মান সমর্থকরাও উয়ে জিলার মাঠে নামতেই চিৎকার করতে লাগলেন সমস্বরে 'উয়ে, উয়ে, উয়ে,' তাঁদের হাতে নানারকম ব্যানার। সেগুলো তো বটেই, প্রত্যেকের হাতের পতাকা দ্বারাও জিলারকে উৎসাহিত করা হতে থাকে গ্যালারি থেকে। জিলার ওদের মর্যাদা রাখলেন আপ্রাণ খেলে।

মিড-ফিল্ডে আনা হল ইতিপূর্বে বাদ পড়ে যাওয়া তরুণ প্রতিভা হেলমুট হলারকে। তিনি ছিলেন ইতালির বলোগনায়। উলফ্যাং ওভারাথ এলেন অসীম শক্তিসম্পন্ন বাঁ পা নিয়ে। সঙ্গে রয়েছেন লম্বা, ময়লা প্রতিভাবান অ্যাটাকিং রাইট হাফ ফ্রেঞ্জ বেকেনবাউয়ের, বেয়ার্ণ মিউনিখের এই খেলোয়াড়ের উপর ভীষণভাবে নির্ভর করল পশ্চিম জার্মানী।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চার নম্বর গ্রুপে ইতালির সঙ্গে রইল রাশিয়া, চিলি ও উত্তর কোরিয়া। এখানে আসার আগে ইতালি পরপর জিতে আত্মবিশ্বাস

বৃদ্ধি করেছিল। দলের পুরোধা বেঁটে খাটো এডমণ্ডো ফ্যাবরি অ্যাটাকিং ট্যাকটিকসে দলকে ক্ষুরধার করে তুলেছিলেন, আর তাঁর দ্বারাই রোমে পোল্যাণ্ডকে হারাল ৬-১ গোলে। নেপলসে বহুখ্যাত স্কটল্যাণ্ডকেও হারাল। অবশ্য ওই দলের অনেকে তখন বাড়িতে কেন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তার সদুত্তর মেলেনি। দলের ভারপ্রাপ্ত সেলটিক ম্যানেজার জক স্টেইন তাই বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করেন।

ইতালির কাছে ৩-০ গোলে যখন স্কটল্যাণ্ড হারল, তখন ড্র-র কথা জানা যায়। কোয়ার্টার ফাইনালে ইতালি যাবেই এমনও ধরে নিলেন কেউ কেউ। চিলিকেও ভয় পাওয়ার হেতু নেই বলেও মন্তব্য করলেন ওঁরা। এর পরেই সব আশা নির্মূল হতে থাকে। ফ্রান্সের সঙ্গে ০—০ হল। এই ম্যাচে ইণ্টারের মিড-ফিল্ড প্লেয়ার, প্রতিভাবান মারিও কর্সো শুধু খারাপই খেলেননি, খেলার আগে সহকারী ম্যানেজার ফেরাকিও ভ্যালকারেগিকে অবমাননাও করলেন। দুর্ভাগ্য মোরা-র। স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে চমৎকার একটি গোল দিলেন না শুধু, ইতালির অন্যতম সেরা উইঙ্গারের খ্যাতিও পেলেন। কিন্তু তাঁর একটি পা গেল ভেঙে।

ইতালির জাতীয় দল থেকে কর্সো বাদ পড়ায় ইণ্টার ক্ষুব্ধ হল। কর্সোর বদলে দলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেন গিয়ানি রিভেরা। ওঁরা আরও ক্ষেপে গেলেন—যখন দেখলেন ম্যানেজার ফ্যাবরি বাদ দিয়েছেন তাঁদের অধিনায়ক ও সুইপার দুর্দান্ত আরমাণ্ডো পিচ্ছিকে। বিশ্বকাপ চলাকালে একদিন পিচ্ছিকে দেখা যায় পাওয়ার স্টেশনের কাছে ব্যাটার্সি পার্কে তিনি আণ্ডার প্যাণ্ট পরে বল নিয়ে খেলছেন। ভাবটা—বিশ্বকাপ ফাইনালে ইতালির পক্ষে জয়সূচক গোলটি করলেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা, ১৯৭১ সালে পিচ্ছি ক্যান্সারে মারা যান। ফ্যাবরি অবাক করলেন অভিজ্ঞতম গোলরক্ষক গিউলিয়ানো সার্তিকে ও গোলদাতা কাগলিয়ারির লুইগি রিভাকে বাদ রেখে।

রুশ দল প্রাক্-বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলতে গেল দক্ষিণ আমেরিকায়! তাদের দলে তখনও বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গোলরক্ষক লেভ ইয়াসিন। চমৎকার উইঙ্গার চিসলেঙ্কো ও মিড-ফিল্ড হাফব্যাক ভয়নভের কথা তো বলাই বাহুল্য। অবশ্য এঁদের সম্পর্কে অভিযোগ ছিল বুড়িয়ে যাওয়ার ও খেলায় ধার কমার।

চিলির মিড-ফিল্ডে আর দেখা গেল না টোরো বা রোজাস জুড়িকে। দুজনেই বিদেশে চলে যান। সুতরাং উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে ফল যা হওয়ার,

তা হলই। কোয়ালিফাই করার জন্য উত্তর কোরিয়ার প্রয়োজন ছিল অবশ্য শুধু অস্ট্রেলিয়াকে হারানো। কারণ, আফ্রো-এশিয়ার বাকিরা প্রতিযোগিতা বয়কট করে কমিটিতে তাদের মাত্র একজন প্রতিনিধি নেওয়ার প্রতিবাদে। দুটি খেলার আয়োজন করা দরকার নিরপেক্ষ কোনো জায়গায় এবং তা হল কাম্বোডিয়ার নমপেনে। অস্ট্রেলিয়াকে দেখে মনে হচ্ছিল তারা খুব অভিজ্ঞ এবং সহজেই জিতবে। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার কাছে হারল যথাক্রমে ৬—১ ও ৩-১ গোলে। বেঁটে খাটো খেলোয়াড়গুলো চমৎকার মুভমেণ্ট তৈরি করে এমন সুন্দর খেলবে কেউ ভাবতেই পারেননি। তবে স্টেডিয়ামে উপস্থিত স্ট্যানলি রাউস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এদের হেলাফলা করা ঠিক হবে না। উত্তর কোরিয়ার এই খেলোয়াড়রা বিশ্ব ফুটবলকে নতুন কিছু দিতে এসেছে। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপের ফ্রান্সের লেফট উইঙ্গার ও বর্তমানে লাওসের কোচ জাঁ ভিন্সেণ্ট বললেন, উত্তর কোরীয়রা ফ্রান্সের সেই বিখ্যাত দল অপেক্ষা উন্নত ফুটবল খেলে।

বিশ্বকাপে খেলতে এলেও উত্তর কোরীয়দের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা সম্ভব ছিল না সাংবাদিকদের। তাদের ডেলিগেশন পৌছল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। তাঁরা ইংরেজি বলতে পারেন না। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে শুধুই হাসেন আর মাথা নাড়েন। সুতবাং কোনো প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে কেমন করে? খেলোয়াড়দের সাজ-পোশাক দেখে মনে হল প্রত্যেকেই সেনাবাহিনীর কমিশন্‌ড অফিসার। সকলেই সন্ন্যাসীদের মত জীবন যাপন করেন। প্রত্যেকেই ফুটবল-অন্ত প্রাণ। জরুরী প্রয়োজনের ভিত্তিতে কোচ নিয়োগ করে পিয়ং ইয়াং শহরের ব্যারাকে রেখে এঁদের কঠোর ও নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফুটবল নিয়ে তাদের কৌশল দেখে সকলেই অবাক হলেন। ওই রকম ক্ষুদে ক্ষুদে চেহারার প্রত্যেকের সে কী লং পাস ও বল নিয়ন্ত্রণ! রাশিয়ার চাইতে চীনের প্রতি তাদের আকর্ষণ অধিক। বিশ্বকাপে আসার আগে পূর্ব ইউরোপে কয়েকটি ম্যাচ খেলা নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতা অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অন্যান্যদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতায় তাঁরা কিন্তু মোটেই বিষণ্ন হননি, বরং প্রাণোচ্ছলই ছিলেন। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে তাবৎ দুনিয়ার ফুটবল প্রেমিকদের নজরে এলেন। সমালোচকরা বললেন, দেখা যাক ওরা আর কত অঘটন ঘটায়। তাঁরা তা করতে পারতেন, যদি শেষ অবধি খেলার প্রথম দিকের 'সৌরভ' বজায় থাকত, যদি তাঁরা তাঁদের দুর্জ্জেয় ক্রীড়াকৌশল প্রয়োগ করতে পারতেন।

উদ্বোধনী ম্যাচ : প্রথম রাউণ্ড—ওয়েমব্লি স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ এমন অনুত্তেজক হবে কেউ ভাবতেই পারেননি। ইংল্যাণ্ড-উরুগুয়ের খেলাটি শেষ হল গোলশূন্যভাবেই। উরুগুয়ের খেলা দেখে সকলেই বুঝলেন ওরা কোন্ ধরনের ফুটবল খেলছে। কাটানাকিও ডিফেন্স তো বটেই, কিন্তু কোনরকম ইচ্ছাই নেই গোল করার। এমতাবস্থায় আলফ রামসের নিজের ট্যাকৃটিকস এবং দল নির্বাচন মোটেই কার্যকর হয়নি। পিটার্সের বদলে কনেলি খেলতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে নেওয়া হল না অ্যাটাকিং ফুটবলে কতটুকু কার্যকর হবেন ভেবেই। নেওয়া হল ভিয়েরাকে। এদিকে ববি চার্লটনের খেলায় ধার নেই। হাণ্ট, গ্রিভসও তেমন খেলতে পারলেন না। উরুগুয়ের শক্ত ডিফেন্সে ইংল্যাণ্ডের ফরওয়ার্ডরা হুল ফোটাতে সক্ষম হলেন না। সুতরাং গোল হবে কেমন করে ?

এর আগে জিমি গ্রিভস জাতায় দলের সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমার মনে হয় ইংল্যাণ্ড দলের সকলেই অবাহত যে, আমরা ফুটবল ইতিহাসে চিরঞ্জীব হতে চলেছি এবং আমার ধারণা—এ সম্পর্কে তোমাদের দ্বিতীয় মতও নেই। আশা করব, ফুটবলের সেই দুর্লভ সম্মান তোমাদের এতদিনের সব কিছু গব, সমস্ত মলিনতাকে উত্তীর্ণ করে যাবে। ঈশ্বর এবার তোমাদের দিয়ে অমন কাজই করাতে চলেছেন। আশা করব, যথাসময়ে তোমরা কর্তব্য পালন করবে। হ্যাঁ, আমাদের প্রত্যেককে ওই সম্মান অর্জনের জন্য সততা থেকে একচুলও দূরে সরে গেলে চলবে না। আমাদের সামনে অবিশ্বাস্যভাবে স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। তোমরা প্রস্তুত হও।

উদ্বোধনী খেলার আগে এভমণ্ডো ফ্যাবরি শুধু নন, যাঁরা ইংল্যাণ্ডকে দেখেছিলেন, প্রত্যেকেরই ধারণা হয়েছিল, যেহেতু ইংল্যাণ্ড শক্তিশালী দল তাই তাদের জয় হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু উরুগুয়ে-ইংল্যাণ্ডের খেলা দেখে ইংল্যাণ্ডের অনেক গোঁড়া সমর্থকও নিরাশ হয়ে পড়েন।

এভার্টনে ব্রাজিলের সূচনা শুভ হল। হারাল ২-০ গোলে বালগেরিয়াকে। দুটি গোলই হয় বিদ্যুৎ গতির মত জোরালো ফ্রি-কিকে। বিরতির আগে প্রথম গোলটি দেন পেলে। দ্বিতীয়টি বিরতির পরে গ্যারিঞ্চা। বালগেরিয়া শুরু থেকেই পেলেকে ভীষণ রকম পাহারা দিতে থাকে। তারপর তাঁর সঙ্গে হিংস্র ব্যবহার করলেন জেকেভ। ইংল্যাণ্ডের জিম ফিনি-র বাঁশি কিন্তু তদনুযায়ী তৎপর হয়ে ওঠেনি। মার খেয়েও পেলের খেলায় ঘাটতি ছিল না। বরং

চমৎকার খেললেন সারাক্ষণ। প্রেস বক্স থেকে এক ফরাসী সাংবাদিক গভীর-ভাবে নিরীক্ষণ করলেন পেলের আঘাত। তিনি যে ডেসপাচ পাঠালেন তাঁর কাগজে, তাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হল, 'পেলে বিশ্বকাপে শেষ পর্যন্ত খেলতে পারবেন না।' তবে আশ্চর্যের কথা, পেলে মার খেয়েও একটুও মেজাজ হারাননি।

ওল্ড ট্রাফোর্ডে পোর্তুগাল-হাঙ্গেরির খেলায় হাঙ্গেরির গোলরক্ষক জেনৎ-মিহালি কিক্-অফের কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আহত হলেন। এর পরেই জোস অগাস্টো গোল দিলেন জেনৎমিহালি কর্ণার ধরতে ব্যর্থ হওয়ায়। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন হাঙ্গেরির সব আক্রমণ হঠাৎ থেমে গেল। অবশ্য তাঁরা চমৎকার বোঝাপড়া করে খেলে বেনে ফারকাসকে বল জোগাতে থাকেন সম্বিৎ পেয়ে। তাঁরা দুবার গোলে শট মারলে বারে লেগে তা ফিরে আসে। তারপর বেনে ১-১ করলেন ৬২ মিনিটের সময়। কিন্তু ছয় মিনিট পরে জেনৎমিহালি আবার ভুল করলে অগাস্টো পোর্তুগালকে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন। টোরেস তৃতীয় গোলটি করলেন অসম্ভব অ্যাঙ্গেলে। তবে ম্যাচটি তেমন দর্শনীয় হয়নি।

শেফিল্ডে পশ্চিম জার্মানীর কাছে সুইজারল্যাণ্ড ৫-০ গোলে পর্যুদস্ত হল। বেকেনবাউয়ের ঘন ঘন গোল করার সুযোগ পেলেন। হঠাৎ সুইজারল্যাণ্ড তাদের দুজন সেরা খেলোয়াড়কে বসিয়ে দিল। অভিযোগ—এই বাদপড়া লিয়েমগ্রুবার ও কোবি কুন সান্ধ্য-আইন লঙ্ঘন করেছিলেন। আরও অভিযোগ, ওঁদের দুজনকে একদিন ট্রেনিং ক্যাম্পের অনেক দূরে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় এবং সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন সুন্দরী তরুণী। অনেকে তাই ধরে নিলেন সুইজারল্যাণ্ড দল ও ওই খেলোয়াড় দুজনকে এর জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

ইংল্যাণ্ডে আগমনের পথে আর্জেন্টিনা ০-৩ গোলে হেরেছিল স্পেনের কাছে। আর্জেন্টিনা ভিলা পার্কে তাদেরই সঙ্গে জিতল ২-১ গোলে বিরক্তিকর ম্যাচে। শুরুর দিকে স্পেনের সুয়ারেজকে দুবার ভীষণভাবে মারা হল। আর্টাইম তৎক্ষণাৎ ওলেগার সুপরামর্শ শিরোধার্য করে আর্জেন্টিনার গোল দুটি দেন। স্পেনের পিরি প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেমে চমৎকার লুপিং হেড দ্বারা ২-১ করলেন। আর্জেন্টিনার প্রধান ভরসা ছিলেন দুজন—'ওভারল্যাপিং' ফুলব্যাকের অন্যতম সিলভিও মার্জোলিনি, আর প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত সুইপার রবার্টো পারফুমো।

মিডলবরোয় উত্তর কোরীয়রা আয়ারসাম পার্কে দর্শকদের হৃদয় কেড়ে নিয়েছিল। উত্তর কোরিয়ার খেলোয়াড়দের সারল্যে দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে তাঁদের 'নিজ' দলের মতই সমর্থন করতে থাকেন। তাঁদের খেলার সূচনাটা বেশ খারাপ হল। রাশিয়া শারীরিক দিক থেকে ওদের তুলনায় বেশ শক্তিশালী ছিল, তবুও সাবধানতা অবলম্বন করেই খেলল এবং ৩-০ গোলে জিতল। গোল তিনটি দেন স্ট্রাইকার মালাফিভ ও বানিসেভস্কি। উত্তর কোরিয়া হারলেও তাঁদের সম্পর্কে সকলেই আশাবাদী রইলেন। আসলে তাঁদের খেলার পদ্ধতিতে সকলেই চমৎকৃত হন।

সাণ্ডারল্যাণ্ডে ইতালি খুব খেটে ২-০ গোলে হারাল চিলিকে। একটি গোল হল শুরুতে, বাকিটি সমাপ্তির একটু আগে। ইতালির এই জয় নিয়ে ছিদ্রান্বেষীরা হাসাহাসি করলেন। বলা হল, 'চিলি ছেড়ে দিয়েছে ইতালিকে।' ইতালির খেলোয়াড়দের দেখে কেমন যেন মনে হল। মনে হচ্ছিল, প্রত্যেকেই অস্বাভাবিক একটা উত্তেজনায় ভুগছে। উত্তেজনা ফ্যাবরির মধ্যেও। এরই মধ্যে খবর এল ফ্যাবরির সঙ্গে চুক্তি ইতালীয় ফেডারেশন ১৯১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করেছেন। যাই হোক, ম্যাচের পর ম্যানেজার ওঁদের খারাপ খেলার জন্য ভীষণ বকলেন। তিনি ভুলে গেলেন পোজোর বাণী, 'ইতালীয়রা সর্বদা মনে করতে ভালবাসেন, তোমাদের পক্ষে তাঁরা আছেন।'

ফরাসীরা বেশ আরামে দিন কাটাচ্ছিলেন ওয়েলউইল গার্ডেন সিটিতে। তাঁদেরও শুরুটা অশুভ হল মেক্সিকোর বিরুদ্ধে। মেক্সিকোর পক্ষে গোলটি দেন সদাসতর্ক এনরিক বোর্জা। অভিজ্ঞ মিড-ফিল্ড খেলোয়াড় লুসিয়েঁ মুলাকে খেলানো হল না তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্যের জন্য। অথচ বার্সিলোনা দলে ক্রীড়ারত মুলাকে স্পেন থেকে আনা হয়েছিল ফ্রান্সের পক্ষে খেলতে। হোটেলে একদিন ফরাসী দলের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হলে সেখানেও দলের মধ্যে অনৈক্য প্রকট হয়ে পড়ে। ম্যানেজার হেনরি গুয়েরিঁ ও তাঁর সহকারী জাসেঁর ও এমনভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন একই সঙ্গে যে, এক প্রবীণ ফরাসী সাংবাদিক বাধ্য হয়ে বলতে থাকেন—একজনেই বলুন এবং মূল বক্তব্য গুছিয়ে বলুন। এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ফ্রান্স যখন ইংল্যাণ্ডের কাছে হারে। জাসেঁর আগ বাড়িয়ে সাংবাদিকের বলেন : আজ. বসকুইয়েরই ভাল খেলেছে। সাংবাদিকরা সেদিন বিরক্ত হয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন : কে কেমন খেলল সে কথা লেখার দায়িত্ব আমাদের উপরেই ছেড়ে দিন।

হাঙ্গেরি : ব্রাজিল—এভার্টনে দ্বিতীয় রাউণ্ডের ম্যাচে হাঙ্গেরি-ব্রাজিলের খেলা দর্শকদের চিত্তহরণ করল। বিশ্বকাপে এপর্যন্ত এধরনের খেলা হয়নি। যেমন উত্তেজনা, তেমনি নাটকীয়তায় ভরা। প্রত্যেকটি গোলই চমৎকার। সব মিলিয়ে উপভোগ্য ফুটবল হল দারুণ গতিতে। শুধু তাই নয়, ১৯৫৪-র বিশ্বকাপের পর ব্রাজিলের এই প্রথম পরাজয় ঘটল।

পেলে একটি ম্যাচেই খেলেছিলেন। আহত হওয়ায় তাঁর বদলে নামেন টোস্টাও। ডেনিলসনের জায়গায় গারসন এলেন হাফব্যাকে। প্রবীণ জালমা ও স্যান্টোস এবং গ্যারিঞ্চা কয়েকদিনের মধ্যে দ্বিতীয় ম্যাচে মোটেই খেলতে পারলেন না। হাঙ্গেরি দলেও একাধিক পরিবর্তন হল। গোলে জেনংমিহালির বদলে নামলেন গেলি।

হাঙ্গেরির আলবার্ট সারা মাঠে বিচরণ করলেন এদিন। ব্রাজিলিয়ানদের তিনি খুশিমত নাচিয়েছেন। হাঙ্গেরির উপর্যুপরি আক্রমণে বিধ্বস্ত হল ব্রাজিল। কখনও তারা ছুটছিল দ্রুত বল নিয়ে, কখনও দিচ্ছিল চমৎকার পাস। সর্বদা তাদের ইচ্ছা, প্রতিপক্ষকে অতিক্রম এবং তা কার্যকর হয়েছে ভীষণ রকমে। এই স্মরণীয় খেলা শেষে আলবার্ট যখন সুড়ঙ্গের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এভার্টনের হাজার দর্শক সমস্বরে ধ্বনি দিচ্ছিলেন 'আল-বার্ট, আল-বার্ট'। আজ যথার্থই তাঁর দিন। দর্শকরা যোগ্য ব্যক্তিকেই অভিনন্দিত করলেন। এক ফরাসী সমালোচক লিখলেন, 'আজকের ম্যাচ তো ফুটবল খেলা নয়, আজকের খেলা তুলিতে আঁকা মহৎ শিল্প হয়ে উঠেছিল।'

মাত্র তিন মিনিট পরে খর্বকায় বেনে বল নিয়ে প্রবেশ করলেন ডানদিক দিয়ে ব্রাজিলের দুর্ভেদ্য রক্ষণ-ব্যূহ ভেদ করে। সামান্য কোনাকুনি জোরালো শটে তিনি জিলমারকে পরাস্ত করেন। হাঙ্গেরির এই মুহূর্ত থেকেই মনোবল অসম্ভব বেড়ে যায়। রক্ষণভাগ ভেদ করা ব্রাজিলের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। স্পিন ও মেজলির পশ্চাতে মাত্রাইয়ের সুইপিং সকলকে মোহিত করল। হাঙ্গেরির আক্রমণের গতি অদ্ভুতভাবে বেড়ে ঘন ঘন কার্যকরী ভূমিকা নিতে লাগল। এরপর শুধু আক্রমণভাগই নয়, ডিফেণ্ডাররাও খালি জমি উন্মুক্ত করতে লাগলেন, তারপর দুই ধারের আক্রমণের ফ্রন্টেই বল পাঠাতে থাকেন।

ব্রাজিলের কিছুটা সম্বিৎ ফিরে আসে পঞ্চদশ মিনিটের পরে। লিমা'র ফ্রি কিক্ রিবাউণ্ড হয়ে টোস্টাও এর কাছে আসতেই তিনি দারুণ জোরে সেটিকে হাঙ্গেরির গোল ভেদ করতে পাঠালেন। বিরতি পর্যন্ত ১-১ ছিল। হাঙ্গেরির

দ্বিতীয় গোলটি আসে ফারকাসের পা থেকে। আলবার্টের বুদ্ধিদীপ্ত দৌড় এবং পাস ব্রাজিলের রক্ষণভাগের দুর্বলতায় আঘাত হানল। তিনি বল পাঠালেন বেনের কাছে। বেনে বল দ্রুত টেনে নিয়ে নিচু ক্রস শট করে পাঠালেন ফারকাসের কাছে। ফারকাস তাকে ডান পায়ের জোরালো ভঙ্গির দ্বারা (২-১) মারলেন গোলে। এই গোলের আগের মুহূর্তে দর্শকরা হতভম্ব ছিলেন। গোল হতেই গ্যালারিগুলো মুখর হয়ে উঠল হর্ষধ্বনিতে। এর দশ মিনিট পরে বেনেকে ফাউল করলে হাঙ্গেরি পেনাল্টি পেল। মেজোলি তখন ৩-১ গোলে এগিয়ে নিলেন হাঙ্গেরিকে।

পোর্তুগাল : ব্রাজিল ও ইতালি : রাশিয়া—পোর্তুগালের বিপক্ষেই পেলে এবারের বিশ্বকাপে নিজের শেষ ম্যাচে নামলেন। এই ম্যাচে নামলেও, তাঁর আঘাত পুরোপুরি সারেনি। ব্রাজিল শুধু হারল না, তারা পোর্তুগালের কাছে প্রহৃত হলেন নৃশংসভাবে। মোরেসের দুটি ফাউলেই পেলে ভীষণ আঘাত পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যান খেলা চলাকালে ডঃ গসলিং ও মারিও আমেরিকোর কাঁধে ভর দিয়ে। হাঙ্গেরির সঙ্গে খেলার পর ব্রাজিল দলে সাতটি পরিবর্তন হয়েছিল। বাদ পড়েন জিলমার, বেলিনি, জালিমা, স্যাণ্টোস ও গ্যারিঞ্চাও। কিন্তু ১৯৫৮-র পর নামানো হল প্রবীণ অরল্যাণ্ডোকে। দারুণ উৎসাহী গোলরক্ষক মাঙ্গা আসেন জিলমারের জায়গায়। মাঙ্গা তাঁর অদ্ভুত চালচলনে 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' নামে খ্যাত ছিলেন। বিশ্বকাপে আসার আগের বছর মাঙ্গা ইউরোপ সফরে কিন্তু বেশ খেলেছিলেন।

শুরুর চোদ্দ মিনিট পরে তিনি ইউসেবিওর একটি সেণ্টার ঘুষি মেরে বের করে দেন। কিন্তু সিমোস তাতে হেড দিয়েই ১-০ করেন। পঁচিশ মিনিট পরে হল ২-০। পোর্তুগালের অধিনায়ক ও লেফট হাফ কলুনার ফ্রি-কিক্ পৌঁছল টোরেসের কাছে। টোরেস উঁচু করে বলটি পৌঁছে দিলেন ইওসেবিওর মাথায়। ইউসেবিওর জোরালো হেডেই এই দ্বিতীয় গোলটি হল।

খেলা পোর্তুগালের মুঠোর মধ্যে চলে এসেছে। সুতরাং কোনো দরকার ছিল না মোরেসের নৃশংস হওয়ার। প্রয়োজন ছিল না পেলেকে ভূতলশায়ী করার। পেলে সেদিন ওই ঘটনা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি বুঝতেও পারেননি কেমন করে তাঁর ফুটবলের শেষ পরিণতি ঘটাবার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। কয়েকদিন পরে পেলে ফিল্মে যখন ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন, তখন আঁৎকে উঠলেন তিনি। বললেন, একজন খেলোয়াড় এত নৃশংস হতে পারে!

তিনি শপথ করলেন ঈশ্বরের নামে : 'না আর নয়, বিশ্বকাপে আমি আর খেলব না।' সবচেয়ে অবাক হতে হয় এই ঘটনার পরেও ইংল্যাণ্ডের রেফারি জর্জ ম্যাককাবের আচরণে। তিনি মোরেস সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থাই নিলেন না। মোরেস মাঠেই রইলেন। খুনীরাও বেকসুর খালাস হয়ে যেমনভাবে ঘোরাফেরা করে, তেমনিভাবে বুক ফুলিয়ে বেড়ালেন। অর্থাৎ পোর্তুগাল এখন খেলতে লাগল দশজনেরই বিপক্ষে। আর সেই বিপক্ষের সেরা খেলোয়াড়ই তখন মাঠের বাইরে। ব্রাজিলের নতুন সেণ্টার ফরওয়ার্ড সিলভাও আঘাত পেলেন। দল আরও দুর্বল হয়ে পড়ল। অথচ যখন তারা পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করছিলেন, তখনই ইউসেবিওকে রোখা অসম্ভব ছিল। তাঁর গতি, ভয়াবহ শট ওই সময়েও ব্রাজিলের রক্ষণভাগকে ঘন ঘন বিচলিত করছিল।

বিরতির পরে দারুণ খেলা হলেও কেউ গোল দিতে পারছিলেন না। চৌষট্টি মিনিট পরে তরুণ অ্যাটাকিং লেফট ব্যাক রিল্ডো ব্রাজিলের সমর্থকদের নিরাশার মধ্যে সামান্য আশার সঞ্চার করলেন দারুণ ছুটে একটি গোল করে। কিন্তু সে গোল মরীচিকার মত হল। সমাপ্তির পাঁচ মিনিট আগে ইউসেবিও খেলার মাঠে ইন্দ্রজাল দেখালেন পি সি সরকারের মতই। রাইট উইং কর্ণারের বলে পা লাগিয়ে সজোরে ব্রাজিলের গোলে ঢুকিয়ে দিলেন।

বিশ্বকাপ থেকে ব্রাজিল বিদায় নিল এই পরাজয়ের সঙ্গে। বিদায় নিল বালগেরিয়াও। আর এই গ্রুপ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে গেল হাঙ্গেরি ও পোর্তুগাল।

ইংল্যাণ্ডের গ্রুপেও বিরক্তিকর খেলার ভিড়। মেক্সিকো-ইংল্যাণ্ডের খেলা শুরুর আগে মেক্সিকোর গোলরক্ষক ক্যালডেরন ক্রস বারের নিচে নতজানু হয়ে প্রার্থনায় বসলেন। তারপর খেলার সূচনা থেকেই দেখা গেল ইংল্যাণ্ড যেই বল নিয়ে মেক্সিকোর দিকে এগোচ্ছে, তৎক্ষণাৎ মেক্সিকোর রক্ষণভাগে নয় বা দশজন সমবেত। অবশেষে ইংল্যাণ্ডের সমর্থকরা চিৎকার করতে লাগলেন বিরক্ত হয়ে, 'আমরা গোল চাই'। উইণ্টারবটমের সময়ের চিৎকারকেও এঁরা ছাড়িয়ে গেলেন। ববি চার্লটনই দর্শকদের ইচ্ছাপূরণ করলেন। বিরতির সাত মিনিট আগে পেনাল্টি-বক্সের অনেক দূর থেকেই ডান পায়ে কোনাকুনি শটে দর্শনীয় গোল করলেন। বিরতির পরে চার্লটনের পাসে গ্রিভস জোর লাগিয়ে পাঠালেন হাণ্টের কাছে। হাণ্ট গোল দিতে ভুল করেননি। ইংল্যাণ্ড আরও গোলের প্রয়াসে বিরত হল না। তবে স্টাইলসের চেষ্টা ফলপ্রসূ হল

না। রামসের উপদেশ থেকে দূরে সরে যাওয়ায় গোলের সংখ্যা আর বৃদ্ধি হল না।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও পরের খেলায় ইংল্যাণ্ডের আবার সেই একই সমস্যা। গোল কিছুতেই হচ্ছে না। ইংল্যাণ্ড অবশ্য অনেক পরিশ্রমে ২-০ গোলে জিতেছিল। ফ্রান্স খেলল তাদের আহত সেণ্টার ফরওয়ার্ড হারবিনকে নিয়ে। খেলা শেষে ইংল্যাণ্ড অভিযোগ করে, 'ওরা সারাক্ষণ আমাদের দিকে থুতু ছুঁড়েছে।' ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রাও সাধু-সন্ত ছিলেন না। স্টাইলস সমাপ্তির দিকে জ্যাকি সিমোনের উপর লাফিয়ে পড়ে এমন ফাউল করলেন যে, অনেকেই 'আহা-আহা' করে উঠলেন। ওই ঘটনার পরে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের দুজন সদস্য রামসেকে অনুরোধ করেন: এবারের বিশ্বকাপ থেকে স্টাইলসকে প্রত্যাহার করে নিন। রামসে ওঁদের কথায় সায় দিতে রাজি হলেন না। প্রত্যুত্তরে বললেন, স্টাইলস গেলে, তার সঙ্গে আমাকেও চলে যেতে হবে। রামসে সর্বদাই তাঁর খেলোয়াড়দের সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করতেন, তাদের ভীষণ ভালবাসতেন। স্টাইলস যথারীতি ফাইনালেও খেললেন।

এই একটিমাত্র ম্যাচের পর রামসে দলের প্রত্যেককে ভীষণ ভর্ৎসনা করেছিলেন। হেলডন হল হোটেলে প্রত্যেককে একে একে ডেকে দুর্বলতা ও অশোভনতা সম্পর্কে সচেতন করে দিলেন। রক্ষা পেয়েছিলেন শুধু রজার হাণ্ট। হাণ্ট এদিন শুধু দুটি গোলই দেননি, দেখিয়েছিলেন অপূর্ব ক্রীড়া-দক্ষতা। তবে রামসে যতই বকুন তাঁর শিষ্যদের, নিরপেক্ষ দর্শকরা বললেন, আগের দুটি ম্যাচের চাইতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধের খেলাটিতে ইংল্যাণ্ডকে বেশ উন্নত মনে হয়েছে। এই খেলাতে গ্রিভস ভীষণভাবে আহত হন এবং তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। রামসে তখন সচেষ্ট হলেন লিভারপুলের ইয়ান কালাঘানকে দলভুক্ত করতে। তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন বলের চাইতেও কালাঘান কার্যকর হবে।

মেক্সিকোর গোলরক্ষক ক্যালডেরণ প্রার্থনা করলেন নতজানু হয়ে, আর ফল উরুগুয়ের সঙ্গে ০-০ হওয়ার পর কারবাজাল গোলপোস্টে চুমু খেলেন। সাঁইত্রিশ বছর বয়সী গোলরক্ষকের এ হল পঞ্চম ও শেষ বিশ্বকাপের খেলা। মেক্সিকো কারবাজালের খেলা নিয়ে গর্ব করত। কেন না, এতদিন তিনি সংসার, আত্মীয়-পরিজন সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন নিজেকে দেশের স্বার্থেই। উরুগুয়ে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে এই ম্যাচে অত্যন্ত গা ছেড়ে দিয়েই খেলল। তবে কেন ঘন ঘন ফাউল করেছিল বোঝা গেল না। ঢিলেমি

খেলার মূলে ছিল বোধ হয়। 'ড্র করলেও তো কোয়ার্টার ফাইনালে যাচ্ছি' এই ধারণাও ছিল।

ভিলা পার্কে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে আর্জেন্টিনা ড্র করল অত্যন্ত বিরক্তিকর খেলে। এদিন জার্মানরাও কেন অত নিষ্প্রভ ফুটবল খেলেছিল বোঝা গেল না। অথচ সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কী দারুণ খেলাই না দেখিয়েছিল! বেকেন-বাউয়ের এদিন নিজের খেলার চাইতে বেশি ব্যস্ত ছিলেন আর্জেন্টিনার ওনেগাকে পাহারায়। আলব্রেশ্‌টের ট্যাকলিং দেখে অনেকেই মন্তব্য করেন, তিনি সম্ভবত রাগবি প্লেয়ার। হলারের সঙ্গে ওই ধরনের সংঘর্ষেও লিপ্ত হলেন। পঁয়ষট্টি মিনিট পরে ওয়েবেরকে গুরুতর ফাউল করায় তাঁকে মাঠের বাইরে পাঠানো হল। তবুও জার্মানদের যুঝতে হচ্ছিল আর্জেন্টিনার সঙ্গে। অবশ্য পারফুমো অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বারের ঠিক নিচ থেকে একটি অবধারিত গোল বাঁচান।

আর্জেন্টিনা ও পশ্চিম জার্মানী কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। আর্জেন্টিনা ২-০ গোলে হারাল সুইজারল্যাণ্ডকে আর্টাইম ও ওনেগা কর্তৃক এবং জার্মানী ২-১ গোলে বার্মিংহামে অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় স্পেনকে। অদ্ভুত অ্যাঙ্গুলার ও জোরালো শটে জার্মানীকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন ইমেরিশ। ফাস্টে কিছুক্ষণের মধ্যে ১-১ করেন। কিন্তু সমাপ্তির ছয় মিনিট আগে উয়ে জিলার জয়সূচক গোলটি দিয়ে জার্মানীকে এগিয়ে (২-১) নিলেন।

ওদিকে ইতালির খেলা ক্রমশই মন্দের দিকে যাচ্ছে, বিপক্ষরা গোলের সংখ্যাও বাড়িয়ে চলেছে। ফ্যাবরিকে বেশ চঞ্চল মনে হল এসব নিয়ে। তিনি শংকিত হয়ে পড়লেন দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। অস্থির হয়ে সাণ্ডারল্যাণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে বেশ রদবদল করেই দল গড়লেন। গিয়ানি রিভেরাকে বাদ দিলেন। পরিবর্তন হল দুই উইঙ্গারেও। আর দলভুক্ত করলেন হাঁটুতে বেশ আঘাত সত্ত্বেও বলোগনার বালগেরিলিকে।

খেলা শুরু হতে চোখে পড়ল রাশিয়ার বিচক্ষণ রাইট আউট চিসলেঙ্কোর কাছে ইতালির ইণ্টার ক্লাবের ফুল-ব্যাক গিয়াসিণ্টো ফ্যাচেত্তি নিতান্তই অসহায়। এই খেলায় ইতালি দলে কোনোরকম সমন্বয় গড়ে ওঠেনি। দু-একটি সুযোগ পেলেও তাদের প্রধান তূণ স্যাণ্ড্রো মাজোলা গোল করতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্ধে চিসলেঙ্কোর একটি গোলই খেলার নিষ্পত্তি এনে দেয়। এই ম্যাচের পরিচালক পশ্চিম জার্মানীর রেফারি হের ক্রিটলিনের রেফারিংকে কেউ কেউ

অনধিকার চর্চা বলে অভিহিত করলেন। ক্রিটলিন সেদিন বেশ কঠোর ছিলেন সন্দেহ নেই।

ইতালি : উত্তর কোরিয়া এবং রাশিয়া : চিলি—ইতালির আবার বিপর্যয় ঘটল, এবার উত্তর কোরিয়ার কাছে। খর্বকায় কোরীয়রা আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করে ইতালির বিরুদ্ধে বেশ খেলল এবং মিডলবরোর দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিল। তাদের এই ১-১ ফল প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের শিরোনামা হল। ফ্যাবরি তো বটেই, অন্যান্য ফুটবল বিশেষজ্ঞরাও মন্তব্য করলেন, উত্তর কোরিয়ার একমাত্র অস্ত্র তাদের দ্রুতগতি। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে প্রয়োজন ছিল অনুরূপ গতিসম্পন্ন নমনীয় দেহের কিছু খেলোয়াড়। কিন্তু ফ্যাবরি অত্যাশ্চর্যভাবে তাঁর রক্ষণভাগে দুজন ধীরগতির খেলোয়াড়—জেনিচ ও গুয়ার্নেরিকে নিযুক্ত করেছিলেন। সবচেয়ে অদূরদর্শিতা দেখান 'আনফিট' বালগেরিয়লকে এনে। এর আগে তিনি খেলতে খেলতে হাঁটুতে আঘাত পেয়ে আধঘন্টা মাঠের বাইরে ছিলেন। বিপক্ষকে ফাউল করতে গিয়ে তাঁর হাঁটুতে প্রচণ্ড আঘাত লাগে।

উত্তর কোরীয়রা দারুণ গতিতে খেলল, দেখাল স্পোর্টসম্যানশিপ। বিশ্বকাপে এসে তারা দেখল ফাউল কাকে বলে এবং তা এদের বেদনাহত করল। বিয়াল্লিশ মিনিট পরে পাক ডু ইক ট্যাক্‌ল করলেন রিভেরাকে এবং ক্রসশটে হারালেন অ্যালবের্ট্রশিকে। ম্যাচে এই একটি গোল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল উত্তর কোরিয়াকে।

ইতালিতে তাদের বিশ্বকাপের ফল তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দু-একজন ছাড়া বাকিদের কঠোর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। পরবর্তী বারের জন্য দল ঢেলে সাজাতে সোচ্চার হলেন সকলেই। ইংলাণ্ডে পরাহত এই দল সমস্ত খবরাখবর নিয়ে লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মাঝরাতে জেনোয়া বিমানবন্দরে পৌঁছল ফ্লাইট বেছে নিয়ে। কিন্তু স্বদেশের ফুটবলপ্রেমীরা এতই ক্ষিপ্ত ছিলেন যে, ওই রাত্রে শতশত লোককে বিমানবন্দরে হাজির করালেন। পচা টমাটো ছুঁড়লেন তাঁরা খেলোয়াড়দের লক্ষ্য করে, শ্লোগানও দিলেন অপমানসূচক। দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে ইতালির ফুটবল দর্শকদের মুখে সমস্বরে চিৎকার শোনা গেছে 'কো-রি-য়া'। ফ্যাবরি বা বিশ্বকাপের ইতালি দলের কাউকে দেখলেই ফুটবল প্রেমিকরা ওই শ্লোগান দিতেন। ইতালির শোচনীয় ফলের পরিণতিই তাঁর ম্যানেজারশিপের সমাপ্তি ডেকে আনল। তিনি চাকরি খোয়ালেন।

স্যাণ্ডারল্যাণ্ডে রাশিয়া ২-১ গোলে চিলিকে হারাল। রাশিয়ার দুটি গোলই পোর্কুজানের। লেফট উইঙ্গার এই পোর্কুজান চমৎকার খেললেন। রাশিয়া কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল, এবং একই মাঠে খেলা পড়ল হাঙ্গেরির বিপক্ষে।

কোয়ার্টার ফাইনাল

ইংল্যাণ্ড : আর্জেন্টিনা—কোয়ার্টার ফাইনালের খেলাগুলি হল নক-আউট পদ্ধতিতে। এই নক-আউটে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উত্তেজনামূলক খেলা হয় এভার্টনে পোর্তুগাল বনাম উত্তর কোরিয়া। কিন্তু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল কাদের খেলা? ওয়েমব্লিতে ইংল্যাণ্ড বনাম আর্জেন্টিনার, না—শেফিল্ডে পশ্চিম জার্মানী বনাম উরুগুয়ের? এ প্রশ্নের সহজে জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না।

ওয়েমব্লির ম্যাচ বা হট্টগোল বহুকাল আন্তর্জাতিক ফুটবলে স্মরণীয় হয়ে থাকবে যেমন, তেমনি ইউরোপীয়দের ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে তিক্ত ব্যবধানও রাখবে। ম্যাচের পরদিন আর্জেন্টিনায় এর দারুণ প্রতিক্রিয়াও হল। ব্রাজিল তো ইতিমধ্যে বিষণ্ণ কণ্ঠে ও বিরক্ত হয়ে ফিরে গেছে। তারা ট্রেণ থেকে নেমেই বলেছে, তাদের দ্রুত ফিরে আসতে হল অবিচারের শিকার হয়ে। ইংল্যাণ্ডের রেফারিরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বাঁশি বাজিয়েছেন। এই ম্যাচের পরিচালক ছিলেন জার্মানীর হের ক্রিটলিন। তাঁর বাঁশিতে গণ্ডগোল তো সৃষ্টি করলই, আর্জেন্টিনীয়রা ক্ষিপ্তও হলেন তাঁর অতি তৎপরতায়।

সবচেয়ে পরিতাপের, ওই সময়কার বিভিন্ন ম্যাচে আর্জেন্টিনা যেমন খেলেছিল, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তেমনই খেলল। কিন্তু এটি তো ফুটবল ম্যাচ ছিল না, তা হলে তারা জিততই। তারা প্রায় সারাক্ষণ খেলেছে দশজনে। এই দশজনেই ইংল্যাণ্ডকে বোকা ও হতবুদ্ধি বানিয়ে রেখেছিল। আর্জেন্টিনা খেলার সূচনা থেকে যে স্বর্ণ সুযোগগুলি পেয়েছিল, তা কাজে লাগাতে পারলে ভাল ব্যবধানে এগিয়ে যেতে পারত। অলরাউণ্ডার ও ভীষণ পরিশ্রমী র‍্যাটিন এবং আর্টাইম ও ওনেগার অদ্ভুত বোঝাপড়া, অ্যাক্রোবেটিক রোমার বুদ্ধিদীপ্ত খেলা, ওসকার মাসের আক্রমণের কাছে ইংল্যাণ্ড দাঁড়াতেই পারছিল না। অযথা সময় নষ্ট, ইংল্যাণ্ড কর্তৃক বাধাদান ইত্যাদিতে খেলা ড্র-র পথেই এগোচ্ছিল।

খেলার শুরু থেকেই আর্জেন্টিনীয়রা ঘন ঘন ইচ্ছাকৃত ফাউল করতে লাগল। এদিকে গ্রিভসের বদলে ইংল্যাণ্ড হার্স্টকে দিয়ে আসল কার্য-

সিদ্ধি করতে চাইলেও তা ব্যর্থ হতে থাকে ওদের ওই ফাউলে। তাঁর প্রত্যেকটি আক্রমণের পরিণতি হয় ওইভাবে। রেফারি হের ক্রিটলিন ঠাণ্ডা মাথায় খেলা পরিচালনার বদলে এদিক-ওদিক ভীষণভাবে ছোটাছুটি করতে ব্যস্ত শুধু নন, ঘন ঘন নোটবই খুলে নাম টুকতে লাগলেন। আর স্কুলছাত্ররা যেমন দারুণ উৎসাহে গাড়ির বা এঞ্জিনের নম্বর লিখে নেয়, তেমনি ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলেন। র‍্যাটিনের ধারে ক্রিটলিনকে নিঃসন্দেহে বামন মনে হচ্ছিল। র‍্যাটিন বেশ কয়েকবার তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালেন, করলেন তর্ক। এসবে যখন ক্রিটলিন ক্ষুব্ধ, র‍্যাটিন তখনই ফাউল করলেন ববি চার্লটনকে। সুতরাং ক্রিটলিনের কাছে শাস্তি পেতেই হল। এই ম্যাচে খেলোয়াড়রা যত দোষই করুন না, রেফারি যে ম্যাচ পরিচালনার যোগ্য ছিলেন না, তা বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে।

তর্কে নামলেও আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগে এই লম্বা র‍্যাটিন ছোট ছোট পাসে বিপক্ষকে বিপাকে ফেলছিলেন। তাঁর আক্রমণ একবার ইংল্যাণ্ডের গোলরক্ষক গর্ডন ব্যাঙ্কসকে রীতিমত বিপদে ফেলে। র‍্যাটিন তখন বল বাড়িয়েছিলেন মাস-কে।

বিরতির নয় মিনিট আগে র‍্যাটিনকে মাঠ থেকে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। কারণ, এক সতীর্থের ফাউল সম্পর্কে তিনি রেফারির কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ঘটনাটি হয়ত বিক্ষিপ্ত এবং তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু রেফারি ও খেলোয়াড়রা কেউই একে সুনজরে দেখলেন না। ঘটনাটির জের টেনে নানা গোলমাল দেখা দেয়। ক্রিটলিনের কেশহীন মাথায় রোদ পড়ে চিকচিক করছিল। ঘটনার পর তিনি বলেন, যদিও আমি স্প্যানিশ বুঝি না, তবুও র‍্যাটিনের মুখ দেখে উপলব্ধি করেছিলাম সে কী বলছে।

দশ মিনিট ধরে তর্ক-বিতর্ক চলল র‍্যাটিনের বাইরে যাওয়া নিয়ে। পরে দেওয়া হল দরখাস্ত, করা হল আবেদন। আলব্রেশ্‌ট একসময় তাঁর দল নিয়ে মাঠের বাইরে যেতে উদ্যত হলেন। ঠিক এই সময় ছুটে আসেন বিশ্বকাপ রেফারিদের প্রধান—ভদ্র গল চেহারার কেন অস্টেন। তাঁর মধ্যস্থতায় অবশেষে র‍্যাটিন মাঠের বাইরে গেলেন নিতান্ত নির্লিপ্তভাবেই। টাচ্‌-লাইনের অনেক দূরে গিয়ে বসলেন ট্রেনারের সঙ্গে। কিন্তু দর্শকরা তাঁকে ব্যঙ্গ করতে লাগলেন। র‍্যাটিন এবার মুখ খোলেননি। এমন ভাব যেন, তিনি একমনে খেলাই দেখছেন। দলে এখন দশজন। তবুও আর্জেন্টিনার খেলায় ঘাটতি নেই। মাঝমাঠে

ঘন ঘন ইংল্যাণ্ডের রক্ষে তারা আঘাত করে চলল। ওনেগার সামনে দাঁড়াবার মত ইংল্যাণ্ডের একজনকেও পাওয়া গেল না। কোপেনহেগেনের পর হার্স্ট এই প্রথম টুর্ণামেণ্টে নেমেছেন। শুরুতে তাঁকে একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। ধারণা হচ্ছিল তিনি ঠিক মানিয়ে নিতে পারছেন না। কিন্তু আর্জেন্টিনার বিপক্ষে প্রথম বিপজ্জনক শটটি আসে তাঁর পা থেকে। সেই শটে যেমন শক্তি, তেমনি গতি। বিরতির চার মিনিট পরে মূরের কাছ থেকে বল পেলেন উইলসন এবং বিপক্ষের ডিফেন্সে ড্রপ ফেললেন। হার্স্ট সকলকে প্রায় নিরাশ করেছিলেন। কেননা বলটি পায়ের নিচ দিয়ে গলে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে বল ধরে জোরালো শট করলেন। রোমাও ঝাঁপিয়ে পড়লেন দ্রুত। তাঁর হাতে লেগে বল বাইরে গেল।

আর্জেন্টিনা যখনই ইংল্যাণ্ডকে ভেদ করেছে, তখনই তা ভীষণ বিপজ্জনক হয়েছে। আর্টাইম ও মাস যেমন দ্রুত গতি পরিবর্তন করেছেন, তেমনি ফুল-ব্যাকরাও ওঁদের কাছে বল যুগিয়েছেন। আক্রমণের ধারা রচনার মূলে ছিলেন ওনেগা। সমাপ্তির তের মিনিট আগে উইলসন বল বাড়ালেন পিটার্সকে। তাঁর উঁচু ক্রসপাস পৌঁছল হার্স্টের কাছে। তিনি ছিলেন পোস্টের ধারেই; চমৎকার লাফে বলে মাথা ছুঁইয়ে দিলেন। বল দক্ষিণ কোণ দিয়ে গোলে প্রবেশ করল। ইংল্যাণ্ড এই একমাত্র গোলে সেমিফাইনালে পৌঁছল।

ইংল্যাণ্ডের জয়ের পর আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের আক্রমণের লক্ষ্য হলেন হের ক্রেটলিন। তাঁরা লাইসম্যানদের গায়ে থুতু দিলেন। ইংল্যাণ্ডের দরজায় ধাক্কা দিলেন। বেগতিক বুঝে জর্জ কোহেন এক আর্জেন্টিনীয়র সঙ্গে জামা বদল করছিলেন। রামসের চোখে ব্যাপারটি দৃষ্টিকটু ঠেকায় কোহেনকে বাধা দিলেন। ঠিক ওই সময় রামসেকে ইণ্টারভ্যু করা হল। তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমাদের সেরা খেলা তাদেরই বিরুদ্ধে হতে পারে, যারা ফুটবল খেলতে আসে। কিন্তু যারা জন্তু-জানোয়ারের মত ব্যবহার করে, কদাচ তাদের সঙ্গে খেলব না।'

রামসের উক্তি অগ্নিতে ঘি ঢালার সমান হল। একে আর্জেন্টিনা পরাজয়ে ভারাক্রান্ত, তদুপরি রামসের এই মন্তব্য। তারা আরও ক্ষুব্ধ হল। স্টেডিয়ামের সুড়ঙ্গপথে তখন খণ্ডযুদ্ধ চলছে। রামসের উক্তি তাতে ইন্ধন যোগাল। পরবর্তী তিনবছর আর্জেন্টিনার ক্লাব দলগুলি ইণ্টার কন্টিনেণ্টাল চ্যাম্পিয়নশিপে আরও অশোভন আচরণ করল। সেই আচরণ ল্যাটিন ও

১৯৬৬-র বিশ্বকাপে তাঁর সতীর্থগণকেও অতিক্রম করে কেলটিক, মিলান, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও ফেন্সুর্ডের সঙ্গে খেলায়।

উরুগুয়ে : পশ্চিম জার্মানী—শেফিল্ডের হিলসবরোয় উরুগুয়ের দুজন খেলোয়াড়কে বহিষ্কার করা হয়। পশ্চিম জার্মানী ওদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হল ৪-০ গোলে। তবে কোনো পক্ষই নিষ্পাপ ছিল না। উরুগুয়ের শুরুটা চমৎকার হয়। তাদের তখন গোল করাও উচিত ছিল। কোথায় তারা এগিয়ে যাবে, তার বদলে পশ্চিম জার্মানীর হলারের পাস থেকে হেল্ড গোল করলেন। গণ্ডগোল শুরু হয় যখন উরুগুয়ের মনে হল বিপক্ষের স্নেলিঞ্জার চপেটাঘাত করেছেন। তারপর জার্মানীর এমারিশ যখন উরুগুয়ের অধিনায়ক ট্রোশেকে প্রচণ্ড লাথি মারলেন, ট্রোশে এমারিশের পেটে পাল্টা লাথি কষলেন। উরুগুয়ের অধিনায়ককে বহিষ্কার করা হল। বাইরে যাওয়ার পথে তিনি জিলারের মুখে থাপ্পড় দিলেন।

মারামারিতে সর্বাধিক আঘাত পান জার্মানীর হলার। এক সময়ে তো তিনি মৃত্যুর দুয়ারেই পৌঁছে যান। উরুগুয়ের খেলোয়াড়রা তাঁর অণ্ডকোষে আঘাত করেছিলেন এবং সারারাত ধরে রক্তপাত হতে থাকে।

বিরতির পাঁচ মিনিট পরে ট্রোশে বহিষ্কৃত হলেন। এর পাঁচ মিনিট পরে ইংল্যাণ্ডের রেফারি জিম ফিনি বহিষ্কৃত করলেন উরুগুয়ের ইনসাইড ফরওয়ার্ড সিলভাকে। সিলভার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি হলারকে কষাইয়ের মত আঘাত করেছিলেন।

নয় জনের দল নিয়েই দৃঢ়তার সঙ্গে উরুগুয়ে প্রতিহত করতে থাকে পশ্চিম জার্মানীকে। উরুগুয়ে তাদের পূর্বখ্যাতি বজায় রাখলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি। সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলার পর বেকেনবাউয়ের যা করতে পেরেছিলেন, এদিন তা করলেন। জিলারের কাছ থেকে বল পেয়ে তিনি ২-০ করলেন সমাপ্তির কুড়ি মিনিট আগে বেশ সহজ ড্রিবলিং দ্বারাই। বাকি দুটি গোল জিলার ও হলারের।

রাশিয়া : হাঙ্গেরি ও পোর্তুগাল : উত্তর কোরিয়া—ব্রাজিলের বিরুদ্ধে চমকদার ফুটবল খেললেও রাশিয়ার তোপের মুখে হাঙ্গেরি যেন উড়ে গেল। তারা হারল প্রধানতঃ রাশিয়ার শারীরিক দক্ষতার কাছে। সারাক্ষণ অ্যালবার্টকে পাহারা দিয়ে রইলেন ভরোনিন। দলের আক্রমণ রচনার চাইতে ভরোনিন ব্যাপৃত ছিলেন বিপক্ষের খেলোয়াড়দের পাহারাতেই। রুশ দলে

খেললেও সাবো ছিলেন মূলত হাঙ্গেরিয়ান। তাঁর লক্ষ্য ছিলেন অ্যালবার্ট। এদিকে চিসলেঙ্কো সর্বদাই সাবোকে সাহায্য করে গেলেন। কিন্তু চিসলেঙ্কো যে উদ্দীপনা নিয়ে বিশ্বকাপে খেলা শুরু করেছিলেন, শেষের দিকে তা বজায় রইল না। যদিও এই ম্যাচেও তিনি গোল করলেন হাঙ্গেরিয়ান গোলরক্ষক গেলির ভুলের সুযোগ নিয়েই। সপ্তম মিনিটে গেলি চিসলেঙ্কোর মারা সহজ বল ধরতে পারলেন না।

বিরতির দু মিনিট পরে পোর্কুজান ২-০ করলেন কর্ণার থেকে। গেলি লাফিয়ে উঠে বলটি ধরতে পারলেন না। পরক্ষণে হাঙ্গেরির খর্বকায় বেনে চেষ্টা করলেন গোল শোধের এবং সে পরিকল্পনা রূপায়িতও হল। তবে সমাপ্তির দশ মিনিট আগে রাকোশি ড্র করা থেকে বঞ্চিত হলেন। সিপসের একটি দুরন্ত গতির ফ্রি-কিক্ লেভ ইয়াসিন রুখে দিলেন। অতএব রাশিয়া চলে গেল সেমিফাইনালে।

এভার্টনে পোর্তুগাল-উত্তর কোরিয়ার ম্যাচে দারুণ উত্তেজনা। নেমেই প্রথম মিনিটে গোল দিল উত্তর কোরিয়া। তারপর উপর্যুপরি আরও দুটি। অদ্ভুত গতিতে তারা খেলা শুরু করে। পাক স্যুং জিন রাইট-উইং মুভমেণ্ট থেকে গোলের উদ্বোধন করলেন।

সম্বিৎ ফিরে পেতে পোর্তুগালকে কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু তবুও পেরে উঠল না এশিয়ার এই খর্বকায় খেলোয়াড়দের সঙ্গে। লি ডং য়ুন দেন দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয় গোলটি দিলেন লেফট আউট ইয়ং স্যুং বুক। ব্রাজিল-বিজয়ী পোর্তুগীজদের হতমান মনে হচ্ছিল, অথচ দল মোটেই দুর্বল ছিল না। এমতাবস্থায় চাই এমন একজনকে, যিনি গোটা দলকে উদ্দীপিত করতে পারেন। পোর্তুগালে তেমন একজনই ছিলেন—তিনি ইউসেবিও। বল নিয়ে দ্রুত গতিতে দৌড়, নিখুঁত শট এবং বিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করলেন, অতিক্রমও করলেন কোরীয় রক্ষণভাগকে।

আঠাশ মিনিট পরে সিমোসের পাস থেকে ইউসেবিও প্রথম গোলটি করলেন। বিরতির তিন মিনিট আগে এক কোরীয় খেলোয়াড় পোর্তুগালের টোরেসের গায়ে দৈত্যের মত লাফিয়ে পড়ল এবং পেনাল্টি থেকে ইউসেবিও ২-৩ করেন। গোল খেয়ে কোরীয়রা মেজাজ হারাল এবং ছুটে বল নিয়ে সেণ্টার স্পটে বসাল। পিয়াং ইয়াং থেকে আগত খেলোয়াড় লিভার-পুলের মাঠে দাঁড়িয়ে মোজাম্বিকের খেলোয়াড়ের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হল।

তর্কের উপযুক্ত জবাব দিলেন ইউসেবিও বিরতির পনের মিনিট পরে। দ্রুত ছুটে বল নিয়ে তিনি ৩-৩ করে ফেললেন। একটু বাদেই লেফট উইং বরাবর আবার অনুরূপ দৌড় তাঁর। এবার আর তাঁর পক্ষে গোল করা হল না। এক কোরীয় ডিফেণ্ডার এমনভাবে তাঁকে ট্যাক্‌ল করলেন যে, তিনি পড়ে গেলেন। পেনাল্টি সীমানার মধ্যে ফাউল। সুতরাং···। এই পেনাল্টি থেকে তিনিই ৪-৩ করলেন। পঞ্চম গোলটি কর্ণার-কিক্‌ থেকে অগাস্টো কর্তৃক। কোরীয়রা ৩-০ গোলে এগিয়ে থেকেও এমনভাবে হারবে, কারুরই এমন ধারণা ছিল না। কোরীয়রা হারলেও তারা বিশ্বকাপ ফুটবলে রীতিমত কীর্তি রেখে গেল। তাদের অসীম সাহস, তাদের প্রতিভা ও স্বার্থত্যাগ সকলকে চমৎকৃত করল।

সেমিফাইনাল

সেমিফাইনাল দুটির একটি হল এভার্টনে, অন্যটি ওয়েমব্লিতে। এভার্টনে খেলল পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়া এবং ওয়েমব্লিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে পোর্তুগাল। প্রথম ম্যাচটি হল একদিন আগে এবং ফুটবলের চরম পরাকাষ্ঠা দেখা গেল এভার্টনে। কিন্তু ওয়েমব্লিতে হল প্রকৃত ফুটবল।

পশ্চিম জার্মানী : রাশিয়া—জার্মান ও রুশ উভয় দলই উগ্র মেজাজের ফুটবল প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ফলে ম্যাচটিও বিরক্তিকর হতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে। উপরন্তু ওদের ঠাণ্ডা করতে সিসিলীয় রেফারি কনসেটো লো বেলোকে তেমন কঠোর হতে দেখা যায়নি। সানো বারে বারে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন বেকেনবাউয়েরকে ফাউল করে। কিন্তু ফল হয় উল্টো, খোঁড়াতে থাকেন নিজেই। গোলরক্ষণে অপূর্ব দৃঢ়তা ও কুশলতা দেখালেন লেভ ইয়াসিন। স্মরণীয় ফুটবল খেললেন তিনি। অথচ দলের ম্যানেজার মোরোজো রাশিয়ার পরাজয়ের জন্য ইয়াসিনকেই দায়ী করেন।

বিরতির এক মিনিট আগে রাশিয়া খুব খারাপ খেলে। এই সময় স্নেলিঙ্গারের দুর্ধর্ষ ট্যাক্‌লে চিসলেঙ্কো আঘাত পেলেন। জার্মানীর লেফট ব্যাক চমৎকার ক্রসপাস দিলেন হলারকে। হলার দ্রুত ছুটে ১-০ করলেন। চিসলেঙ্কো আহত, খোঁড়া, তবুও তাঁকে খেলতে ডাকা হল। তিনি মোটেই খেলতে পারছিলেন না। বল পেয়ে হেল্ডের কাছে জমা দিলেন। কিন্তু ব্যথা ও হতাশায় অখেলোয়াড়চিত আচরণ করলেন। হেল্ডকে মারলেন লাথি।

লো বেলো তৎক্ষণাৎ তাঁকে বহিষ্কৃত করেন। আগে বাইরে যান সাবো, এবার চিসলেঙ্কো। অর্থাৎ রুশরা এখন ন' জনকে নিয়ে খেলছে।

কিন্তু এই ন' জনকেও জার্মানরা অত্যন্ত সমীহ করতে লাগল। তারা বেশ সতর্কতার সঙ্গে খেলছে। জার্মানরা আর একটি গোল দিতে সক্ষম হল। এটির কৃতিত্ব বেকেনবাউয়েরের। দারুণ বাঁ পায়ের শটে তিনি রাশিয়ার রক্ষণ প্রাচীর ভেঙে দেন। ন'জন হলে কী হবে, ভরোনিন ও খুসাইনভ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গেই যুঝতে থাকেন। উভয়ের কুশলতার সম্মিলিত ফলে ২-১ হয়। জার্মান গোলরক্ষক টিল্কেয়োস্কি শূন্যের বল ধরায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু সমাপ্তির কয়েক মিনিট আগে তাঁর হাত থেকে একটি বল পড়ে যায়, পোর্কুজান তৎক্ষণাৎ ২-১ করতে ব্যর্থ হননি।

ইংল্যাণ্ড : পোর্তুগাল—জার্মানী ও রাশিয়ার মতই ফল হল অপর সেমিফাইনালে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের জয় বেশ গৌরবের। খেলা শেষে হাজার হাজার দর্শক সমস্বরে উল্লম্ফন করতে থাকেন—'আমরাই কাপ জিতব, আমরাই কাপ জিতব, আমরাই কাপ জিতব' বলে।

কোয়ার্টার ফাইনালে রামসে বলেছিলেন, 'আমরা জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে ফুটবল খেলতে চাই না।' সেমিফাইনালে পোর্তুগাল দেখাল, তারা ওই দলে পড়ে না। ইংল্যাণ্ডও চমৎকার ফুটবল খেলল। ফিফাও এদিকে নির্দেশ পাঠিয়েছে, 'রামসে, তোমার উক্তি প্রত্যাহার কর।' তিনি ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু দুঃখের কথা, আর্জেন্টিনীয়রা তাদের আচরণের জন্য ক্ষমা চায়নি।

পোর্তুগীজরা পেলেকে মেরে মেরে বাইরে পাঠিয়েছিল, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে দেবদূতের মত আচরণ করল। শুধু কি তাই? দিনের মধ্যমণি ববি চার্লটন যখন দ্বিতীয় গোলটি করেন, পোর্তুগীজ খেলোয়াড়রা তখন তাঁর সঙ্গে করমর্দনও করলেন।

এই খেলায় ইংল্যাণ্ডের জয় সম্পর্কে কোনোরকম দ্বিধা থাকতে পারে না। তবুও জয় তাদের হাত থেকে এড়িয়ে যাওয়াও অসম্ভব ছিল না। প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলদাতা ইউসেবিওকে সারাক্ষণ ইংল্যাণ্ডের স্টাইলস পাহারা দিয়ে রাখেন। তাঁর পক্ষে তাই গোল দেওয়া এদিন সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ববি চার্লটন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এতদিন যত ম্যাচ খেলেছিলেন, নিঃসন্দেহে এটিই শ্রেষ্ঠ। কেবল অন্যকে যোগানো নয়, যেমন দৌড়, তেমনি তাঁর শুটিং। আধঘণ্টা পরে যখন রে উইলসন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা হাণ্টকে পাস দেন,

তখন পেরিরাই সে শট আটকাতে পারতেন। কিন্তু চার্লটন ঠাণ্ডা মাথায় সেটিকে গোলে ঠেলে দেন। বিরতির আগে ইংল্যাণ্ড আর একবার সুযোগ পায়। চার্লটন তখন জ্যাটোপেক বা জাগালোর মূর্তিতে। ফল ১-০ রইল। তবে তারা একাধিক সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

বিরতির মিনিট পনের পরে পোর্তুগালের দুর্ধর্ষ ফরওয়ার্ড লাইন চাপ সৃষ্টি করে। ইংল্যাণ্ডের ডিফেন্সে মূর, জ্যাকি চার্লটন ও দুর্ভেদ্য গর্ডন ব্যাঙ্কস এবং সর্বোপরি স্টাইলস। সুতরাং সহজে প্রবেশ কি সম্ভব?

ইংল্যাণ্ডকে দাবানো গেল না। সমাপ্তির এগার মিনিট আগে তারা আবার গোল দিল। হার্স্ট অদম্য শক্তিদ্বারা কার্লসকে কাটিয়ে গোলের ডানদিকে এগিয়ে আবার বল টেনে নিলেন। এবার ববি চার্লটনের ডান পায়ের জোরালো শটে পোর্তুগালকে ২-০ গোলে পিছিয়ে দিল।

তবুও তারা দমল না। অক্লান্ত কলুনা আত্মবিশ্বাস ও শক্তিতে ভর দিয়ে এগিয়ে চললেন। ডানদিকে ধাবমান বল সিমোস ধরে নিয়ে টোরেসকে দিলেন। টোরেস সেটি হেড করে ব্যাঙ্কসকে পরাস্ত করলেন, এমনি সময়ে চার্লটন বলে ঘুষি মারলেন। পেনাল্টি থেকে ইউসেবিও একটি গোল শোধ দিলেন (২-১)।

এবার পোর্তুগীজরা আক্রমণ অব্যাহত রাখল। কিন্তু একা স্টাইলসের জমি আগলানোই সব আক্রমণ ব্যাহত করে। ববি চার্লটন আর একবার পোর্তুগালের গোলরক্ষক পেরিরাকে বাঁ পায়ে পরাস্ত করতে প্রয়াসী হন, কিন্তু তা সফল হয়নি। কলুনার ডান পায়ের জোরালো শটও ব্যাঙ্কসকে ধরতে হয়। এর পরেই রেফারি সমাপ্তির বাঁশি বাজালেন। ইংল্যাণ্ড পৌঁছে গেল ফাইনালে।

ফাইনাল

ইংল্যাণ্ড : পশ্চিম জার্মানী—ইংল্যাণ্ড ফাইনালে পৌঁছল গ্রিভস ছাড়াই। এবার প্রশ্ন জাগল—ফাইনালে কি তিনি খেলবেন? গ্রিভসের কাছে এই ম্যাচে খেলা নিঃসন্দেহে বহু-আকাঙ্ক্ষিত। তাঁর হৃদয়ও উদ্বেলিত। গত ক'টি ম্যাচে গ্রিভসের বদলে নামানো হয়েছিল হার্স্টকে। তিনি খেলেনও চমৎকার। অর্থাৎ গ্রিভস দলে এলে হার্স্টেরই বাদ পড়ার কথা। আর নাম ওঠে রজার হান্টের। হান্ট পরিশ্রমী, কিন্তু মাঝারি ধরনের খেলোয়াড়।

নিজের দিকে নজর না রেখে গোটা দলের স্বার্থ দেখেন তিনি। বল নিয়ে চমৎকার ছুটতে পারেন। তাঁর 'ফিনিশ'ও উত্তম। কিন্তু তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ফরওয়ার্ডের স্বীকৃতি দিতে অনেকেই কুন্ঠিত।

জার্মানদের সমস্যা দেখা দিল গোলরক্ষক ও লেফট আউটকে ঘিরে। কেননা, ওরা টিল্কেয়োস্কির রক্ষণ নিয়ে খুশি ছিল না। সর্বোপরি রাশিয়ার সঙ্গে খেলার দিনে তিনি কাঁধে আঘাত পেয়েছিলেন। ম্যানেজার হেলমুট শোন চেয়েছিলেন বেয়ার্ণ মিউনিখের গোলরক্ষক শেপ মেয়ার খেলুক। কিন্তু মেয়ারও আহত ছিলেন।

লেফট আউট তথা বাণ্ডেস্লিগার সবচেয়ে সফল স্কোরার লম্বাটে লোথার এমারিশকে ঘিরেও সমস্যা। সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বাঁ পায়ে তাঁর তীব্র শটের গোল ভোলার নয়। এমারিশকে বাদ দিলে জার্মানকে হারতে হবে—শোন বাধ্য হয়ে তাঁকে দলে রাখলেন।

ইংল্যাণ্ডের ম্যানেজার আলফ রামসে রোহামটনে ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের মাঠে প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করলেন, ইংল্যাণ্ড এবার বিশ্বকাপ জিতছে এবং হাণ্ট খেলবে।

ওদিকে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় পোর্তুগাল আর একটি পেনাল্টি পেল এবং ইউসেবিও তা কাজে লাগালেন। তারা ২-১ গোলে রাশিয়াকে পরাস্ত করল।

বিশ্বকাপের বিজয়মাল্য এবার ইংল্যাণ্ডেরই অনুকূলে। সমালোচকরা বললেন: ইংল্যাণ্ড যদি হারে পশ্চিম জার্মানীর কাছে, তবে ইতিহাস নতুন ধারায় বইবে। পঁয়ষট্টি বছর পরে জার্মানীর নিকট পরাজয় ঘটবে ইংল্যাণ্ডের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯০১ সালে অপেশাদার ফুটবলে দুই দেশের যে প্রথম দেখা হয়েছিল টটেনহামে, তারপর থেকে ইংল্যাণ্ড কখনও হারেনি। টটেনহামের প্রথম খেলাতেই ইংল্যাণ্ডের জয় হয়েছিল ১২-০ গোলে।

জার্মানরা ফাইনালের আগে অনেকটা আত্মগোপন করে রইল ওয়েলউইন গার্ডেন সিটিতে। ইংল্যাণ্ডকে পরাস্ত করার নানা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে ওরা সলা পরামর্শ করছিল। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ঠাণ্ডা মাথায় অনুশীলনেরও প্রয়োজন ছিল। অন্যত্র খেলা হলে শোন সম্ভবত এত ভাবতেন না। তিনি বেকেন-বাউয়েরকে সব সময় ববি চার্লটনের পিছনে পাহারার কাজে নিযুক্ত করতেন না। জার্মানরা এবারও কাটানাকিও পদ্ধতির ইতর-বিশেষ করেই স্বাস্থ্যবান

বিলি শুল্‌জকে সুইপার, ওয়েবেরকে সেণ্টার ব্যাক, হলার ও ওভারাথকে মিড-ফিল্ডে এবং সামনের সারিতে রাখল হল জিলার, এমারিশ ও হেল্ড-কে।

রামসের মনে অন্য ফন্দী। তিনি ঠিক করলেন স্নেলিঙ্গারের মন্থর গতির সুযোগ গ্রহণ করতে হবে মাঝমাঠে অ্যালান বলকে পাঠিয়ে। উইং-এ এইভাবে সুযোগ নেওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। আর বল তো স্নেলিঙ্গারকে কাটিয়ে এগোবারও ক্ষমতা রাখেন।

তবে ইংল্যাণ্ডের সূচনাটা মোটেই সন্তোষজনক হল না। তখনও ত্রয়োদশ মিনিট খেলা হয়নি—রে উইলসন বোকার মত হেল্ডের লেফট-উইং ক্রস হলারের পায়ে পৌঁছে দিলেন। হলার ছিলেন ইংল্যাণ্ডেরই গোলের কাছাকাছি। তিনি বলটি ধরে সামান্য নিচু করে সজোরে মারলেন। বল ব্যাঙ্কসকে অতিক্রম করে বাঁ কোণ দিয়ে গোলে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে স্টেডিয়ামে উড়ল পতাকা, উঁচু হয়ে দাঁড়াল পশ্চিম জার্মানীর অনুকূলের ব্যানারগুলি।

০-১ গোলে পিছিয়ে থাকলেও ইংল্যাণ্ডের মানসিকতায় দুর্বলতা প্রবেশ করেনি। ছয় মিনিট না কাটতেই তারা ১-১ করল। টিল্কোয়োস্কি ইংল্যাণ্ডের ক্রসগুলি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া হার্স্টের সঙ্গে ধাক্কার পর তাঁর চিকিৎসারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যবান হলে কী হবে, তাঁকে বেশ চঞ্চল মনে হল, গোললাইনের উপর দাঁড়ান টিল্কোয়োস্কি অত অস্থির হবেন, ভাবাই যায় না।

ওভারাথ যখন ববি মূরকে ফাউল করলেন, বাঁ পায়ে দীর্ঘ ওই শটটি এমন নিখুঁতভাবে মারলেন যে, জার্মান রক্ষণভাগ ত্রস্ত হয়ে পড়ল। হার্স্ট দ্রুত ছুটে ওই বলে মাথা ঠেকিয়ে দিতে টিল্কোয়োস্কি পরাস্ত হলেন। কারণও ছিল, টিল্কোয়োস্কি যে তখন সতীর্থের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত।

খেলার মেজাজ আবার পূর্বাবস্থায় ফিরেছে। কে জিতবে, কেউ আঁচ করতে পারছেন না। উভয় দলের জন্যই যেন বিশ্বকাপের জয়মাল্য প্রস্তুত। যদিও বেকেনবাউয়েরের মাঝমাঠে পৌঁছে ওভারাথের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা সীমিত, তবুও তাঁরা শুধু প্রতিপক্ষকে বাধা দিয়েই ক্ষান্ত রইলেন না। হেল্ড যেমন দ্রুত বাঁদিকে ধেয়ে যান, তেমনি ডাইনে জিলার রন্ধ্র তৈরী করেন, হলার থাকেন স্ট্রাইকারের সামান্য পেছনে। ক্ষণে ক্ষণে তাঁরা খেলার ধারা বদল করছিলেন, আর তা ইংল্যাণ্ডের কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। জার্মানীকে

এদিন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মনে হচ্ছিল। রাশিয়ার সঙ্গে যে জার্মানী খেলেছিল, তার তুলনায় আজকের জার্মানীকে অনেক অনেক ফারাক ও উন্নত মনে হল।

টিল্কোয়েস্কির দুর্বলতা আবার দৃষ্ট হল হার্স্টের সহজ হেড যখন তিনি ঠেকাতে অক্ষম হন। জার্মানী এরপর উপর্যুপরি দুটি সুযোগ পায়। ইংল্যাণ্ডের গোললাইনে হেল্ডকে দারুণভাবে ট্যাক্‌ল করলেন জ্যাকি চার্লটন। হেল্ড কর্ণার করলেন। কিন্তু ওভারাথের হেডটি জোরালো না হওয়ায় ব্যাঙ্কস সহজে বলটি আটকালেন। কাজেই ছিলেন এমারিশ, তিনি বার দুয়েক গোলে শট করলেন। ব্যাঙ্কস তা ঠেকাতে ভুল করেননি। আসলে তাঁর মন তো বিক্ষিপ্ত ছিল না।

বিরতির তিন মিনিট আগে হঠাৎ হাণ্ট ও গ্রিভস প্রসঙ্গ প্রবলভাবে উদিত হল। উইলসন আবার একটি চমৎকার ক্রসপাস দিলেন। হার্স্ট জার্মান রক্ষণভাগকে অত্যন্ত অবহেলা করে বাঁদিকের পোস্টের কাছে অপেক্ষমান হাণ্টের কাছে বল বাড়ালেন। গ্রিভস থাকলে সুযোগ কিছুতেই কাজে লাগাতে পারতেন না। কিন্তু হাণ্টের বাঁ পা তো পা নয়—'গইঙ্গার'। টিল্কোয়েস্কি ওই বল ধরতে দুহাত তুললেন প্রার্থনার ভঙ্গিতে। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুরও হল। বল তাঁর গায়ে লেগে ফিরে গেল। ওই সময় জিলারের সুযোগ আসে ব্যাঙ্কসকে পরাস্তের। কিন্তু বিরতির আগে আর কোনো অঘটন ঘটেনি, ১-১ রইল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হল। ইংল্যাণ্ডের অ্যালান বল দু-দুবার দারুণ বল কণ্ট্রোল দেখালেন। প্রথমার্ধে তো স্নেলিঞ্জারকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরুর কিছু পরে ম্যাচ ঝিমিয়ে পড়ে। কেউ কোনো সুযোগ পেল না, তৈরিও করল না তেমন কিছু। দুটি দলের ডিফেন্স যেন মাপ-জোক করছিল, কীভাবে বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করবে। সুযোগ বেশি পাওয়ার কথা ইংল্যাণ্ডেরই। কারণ ববি চার্লটনের দৌড়ের গতি অব্যাহত রয়েছে। তবে লেফট-উইং-এ ভয় ছিল, যদি উইলসন রন্ধ্র বন্ধ করতে না পারেন!

সমাপ্তির বাকি মাত্র সাড়ে বারো মিনিট। ইংল্যাণ্ড ঘুম ভাঙালো ওয়েমব্লির। লেফট-উইং কর্ণার থেকে বল আসতেই টিল্কোয়েস্কি ধরলেন, কিন্তু ছুঁড়লেন আস্তে আস্তে। হার্স্ট তাতে শট দিতেই ওয়েবেরের গায়ে লেগে আচমকা শূন্যে উঠল। ওই বল মাটিতে পড়ার আগেই পিটার্স শট দিয়ে ২-১ গোলে ইংল্যাণ্ডকে এগিয়ে দিলেন।

পিটার্সকে অভিনন্দন জানিয়ে স্টাইলস ও উইলসন টাচলাইনে চলে

এলেন। আনন্দে স্বভাবতই ওরা উদ্বেল। চোখগুলো চক-চক করছে। সমাপ্তির চার মিনিট আগে ইংল্যাণ্ড আবার সুযোগ পেল। জার্মানরাও আপ্রাণ লড়ছে ড্র করার জন্য। এরই মাঝে বলের থ্রু পাস পৌছল হাণ্টের কাছে। তাঁর ডাইনে তখন শুধু ববি চার্লটন নন, রয়েছেন জিওফ হার্স্ট'ও। আর টিল্কেয়োস্কির সামনে শুধু শুল্জ। অর্থাৎ অবস্থা ৩ঃ১। অতএব গোল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু হাণ্ট এই ম্যাচে দ্বিতীয়বার মারাত্মক ভুল করলেন। তিনি অপেক্ষা না করে দ্রুত পাস দিলেন চার্লটনকে। ততক্ষণে শুল্জ সামনে এসে গেছেন। চার্লটনও ইতস্ততঃ বল মারলেন উঁচুতে এবং তা ক্রসবারে লাগে।

এই ভুলের জন্য ইংল্যাণ্ডকে অনেক মাশুল গুনতে হল। খেলার বাকি এক মিনিটও নেই। হেল্ড ছিলেন চার্লটনের পিছনে। কিন্তু সুইস রেফারি হের ডিয়েন্সের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি চার্লটনের বিরুদ্ধে ফাউলের বাঁশি বাজালেন। পেনাল্টি সীমানার ঠিক বাইরে জার্মানী ফ্রি-কিক্ পেল। এমারিশ কিক্ করলেন। তাঁর বাঁ পায়ের তীব্র শট স্নেলিঙ্গারের পিছনে লেগে গোল মুখে হেল্ডের কাছে পৌছল। হেল্ড বলটি বাড়ালেন ওয়েবেরকে। তিনি ২-২ করলেন। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত। খেলা ড্র। অতএব অতিরিক্ত সময় খেলতে হবে।

নাটকের পর নাটক। গ্যালারিতে উত্তেজনাও বেড়ে চলেছে। খেলোয়াড়রা ঘাসের উপর শুয়ে ঘাস ছিঁড়ছে। রামসে উজ্জ্বল নীল ট্রাক-শুট পরে মাঠে ঢুকে ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের বললেন: তোমরা একবার বিশ্বকাপ জিতেছ। এবার দ্বিতীয়বার জিততে হবে। তিনি জার্মান খেলোয়াড়দের দেখিয়ে বললেন: ওই দেখ, ওরা চিন্তিত, ওরা নিঃশেষিত।

ইংল্যাণ্ডেরও অ্যালান বলকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কিন্তু নব্বই সেকেণ্ডের মধ্যে রাইট-উইং-এ তিনি থরহরি আনলেন। দেখাতে লাগলেন যাদুর পর যাদু। মন্থর গতির স্নেলিঙ্গারকে কাটিয়ে জোরালো শট মারলেন। ভাগ্যিস বারের উপর দিয়ে গেল, তা না হলে টিল্কেয়োস্কির সাধ্য ছিল না আটকানোর।

খেলা ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে চলে এসেছে। জ্যাকি চার্লটন একটু এগিয়ে সহোদর ববিকে বল দিলেন। তাঁর বাঁ পায়ের বিদ্যুৎগতির শট আশ্চর্যরকমে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরলেন টিল্কেয়োস্কি। খেলার একশ' মিনিট অতিক্রান্ত। স্টাইলসের লং পাস পৌছল বলের কাছে। অ্যালান বল এই পাস সম্পর্কে পরে

জানান, আমার ধারণা ছিল ওই পাস আমি ধরতেই পারব না। তখন বলেছিলাম বল দেখে—না, আমি পারব না, ধরতে পারব না ওই বল। আর ভাবলাম, এবার আমাকে শেষ করে ফেলবে ইংল্যাণ্ডের সমর্থকরা। তাছাড়া এর আগেই তিনি দুবার দারুণ দুটি সুযোগ নষ্ট করেছেন।

অ্যালান বল এবার বল ধরে স্নেলিঙ্গারকে সহজে কাটালেন। জার্মানীর গোলের কাছাকাছি ছিলেন জিওফ হার্স্ট, ডান পায়ে মারা তাঁর জোরালো শট আটকাবার কোনো সুযোগই ছিল না টিল্কোয়েস্কির। বারের নিচের দিকে বল লেগে মাটিতে পড়ল। কাছে দাঁড়ানো রজার হাণ্ট দুবাহু তুলে নাচতে লাগলেন আনন্দে। তিনি নিশ্চিত যে, বল গোললাইন অতিক্রম করেছে।

কিন্তু সত্যিই এটি গোল কিনা তা নিয়ে আজও তর্কের অবসান হয়নি। বিভিন্ন মোশানের যে ফিল্ম তোলা হয়েছিল, তাতে কিন্তু গোল বলে মনে হয়নি। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তোলা ছবি দেখিয়ে জার্মানরা আজও জিজ্ঞাসা করেন : ইজ ইট এ গোল ?

সুইস রেফারি হের ডিয়েন্স কিন্তু এই গোল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেননি সঙ্গে সঙ্গে। জার্মান খেলোয়াড়রা প্রবলভাবে প্রতিবাদ করতে থাকেন—না, গোল হয়নি। রেফারি এগিয়ে গেলেন ডাইনের টাচ্‌লাইনের দিকে রুশ লাইন্সম্যান বাখরামোভের সঙ্গে আলোচনার জন্য। রুপোলী চুলের লম্বা চওড়া চেহারার এই রুশ নাগরিক হাতের পতাকা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নাড়িয়ে সংকেত দিয়ে বল সেণ্টার-স্পটে নিতে বললেন। ইংল্যাণ্ডের সমর্থকরা, খেলোয়াড়রা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। মুহূর্ত মধ্যে সমগ্র ওয়েমব্লি স্টেডিয়ামের চেহারা পাল্টে গেল। রজার হাণ্টের গোলের দাবিই বহাল রইল। ইংল্যাণ্ডের বিশ্বকাপ জয়ের পথ অনেকটা পরিষ্কার।

এর পরেও জার্মানরা একবার সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালায়। আবার তাদের ডিফেন্সও একবার ছত্রখানও হল। শেষ মুহূর্তে মূরের লং পাসে হার্স্ট অদ্ভুত সংযোগ স্থাপন করে বল পাঠালেন জার্মানীর গোলে। এবার ভুল হয়নি। জালে প্রবেশের আগেই ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়েরা বালখিল্যের মত ডিগবাজি খেলেন। হার্স্টের বাঁ পায়ের তীব্র শট টিল্কোয়েস্কি ধরতে পারলেন না। বিশ্বকাপ ফাইনালে হার্স্টই প্রথম খেলোয়াড়, যিনি তিনটি গোল দিলেন।

বিশ্বকাপ অবশেষে সেই দেশ পেল, যেখানে ফুটবলের সূচনা হয়েছিল।

গ্রুপ—১

ইংল্যাণ্ড ০ : উরুগুয়ে ০

ফ্রান্স ১ : মেক্সিকো ১
(হাসার) (বোর্জা)

বিরতি ০—০

উরুগুয়ে ২ : ফ্রান্স ১
(রোশা, কর্টেস) (দ্য বরগোইন্স-পেনাল্টি)

বিরতি ২—১

ইংল্যাণ্ড ২ : মেক্সিকো ০
(চার্লটন, হার্ণ্ট)

বিরতি ১—০

উরুগুয়ে ০ : মেক্সিকো ০

ইংল্যাণ্ড ২ : ফ্রান্স ০
(হার্ণ্ট)

বিরতি ১—০

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
ইংল্যাণ্ড	৩	২	১	০	৪	০	৫
উরুগুয়ে	৩	১	২	০	২	১	৪
মেক্সিকো	৩	০	২	১	১	৩	২
ফ্রান্স	৩	০	১	২	২	৫	১

গ্রুপ—২

পশ্চিম জার্মানী ৫ : সুইজারল্যাণ্ড ০
(হেল্ড, হলার ২-১ পেনাল্টি,
বেকেনবাউয়ের ২)

বিরতি ৩—০

আর্জেন্টিনা ২ : **স্পেন ১**
(আর্টাইম) (পিরি)
বিরতি ০—০

স্পেন ২ : **সুইজারল্যাণ্ড ১**
(সানচিস, আমানিকো) (কোয়েনটিন)
বিরতি ০—১

আর্জেন্টিনা ০ : **পশ্চিম জার্মানী ০**

আর্জেন্টিনা ২ : **সুইজারল্যাণ্ড ০**
(আর্টাইম, ওনেগা)
বিরতি ০—০

পশ্চিম জার্মানী ২ : **স্পেন ১**
(এমারিশ, জিলার) (ফাস্টে)
বিরতি ১—১

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
পশ্চিম জার্মানী	৩	২	১	০	৭	১	৫
আর্জেন্টিনা	৩	২	১	০	৪	১	৫
স্পেন	৩	১	০	২	৪	৫	২
সুইজারল্যাণ্ড	৩	০	০	৩	১	৯	০

গ্রুপ—৩

ব্রাজিল ২ : **বালগেরিয়া ০**
(পেলে, গ্যারিঞ্চা)
বিরতি ১—০

পোর্তুগাল ৩ : **হাঙ্গেরি ১**
(অগাস্টো, টোরেস ২) (বেনে)
বিরতি ১—০

হাঙ্গেরি ৩ : **ব্রাজিল ১**
(বেনে, ফারকাস, মেজলি পেনাল্টি) (টোস্টাও)
বিরতি ১—১

পোর্তুগাল ৩ : বালগেরিয়া
(ভুতজব-আত্মঘাতী,
ইউসেবিও, টোরেস)

বিরতি ২—০

পোর্তুগাল ৩ : ব্রাজিল ১
(সিমোস, ইউসেবিও ২) (রিল্ডো)

বিরতি ২—০

হাঙ্গেরি ৩ : বালগেরিয়া ১
(ডেভিডভ-আত্মঘাতী, (অ্যাসপারুকোভ)
মেজলি, বেনে)

বিরতি ২—১

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
পোর্তুগাল	৩	৩	০	০	৯	২	৬
হাঙ্গেরি	৩	২	০	১	৭	৫	৪
ব্রাজিল	৩	১	০	২	৪	৬	২
বালগেরিয়া	৩	০	০	৩	১	৮	০

গ্রুপ—৪

রাশিয়া ৩ : উত্তর কোরিয়া ১
(মালাফিভ ২, বানিসেভস্কি)

বিরতি ২—০

ইতালি ২ : চিলি ১
(মাজলা, ব্যারিসন)

বিরতি ১—০

চিলি ১ : উত্তর কোরিয়া ১
(মারকস-পেনাল্টি) (পাক স্যুং জিন)

বিরতি ১—০

রাশিয়া ১ : ইতালি ০
(চিসলেঙ্কো)

বিরতি ০—০

উত্তর কোরিয়া ১ : ইতালি
(পাক ডু ইক)

বিরতি ১—০

রাশিয়া ২ : চিলি ১
(পোর্কুজান) (মারকস)

বিরতি ১—১

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
রাশিয়া	৩	৩	০	০	৬	১	৬
উত্তর কোরিয়া	৩	১	১	১	২	৪	৩
ইতালি	৩	১	০	২	২	২	২
চিলি	৩	০	১	২	২	৫	১

কোয়ার্টার ফাইনাল

ওয়েমব্লিতে

ইংল্যাণ্ড ১ : আর্জেন্টিনা ০
(হার্স্ট)

বিরতি ০—০

ব্যাঙ্কস ; কোহেন, উইলসন ; স্টাইলস, জে চার্লটন, মূর ; বল, হার্স্ট, আর চার্লটন, হাণ্ট, পিটার্স।

রোমা ; ফেরেরিও, পারফুমো, আলব্রেশ্‌ট, মার্জোলিনি ; গঞ্জালেজ, র‍্যাটিন, ওনেসা ; সোলারি, আর্টাইম, মাস।

শেফিল্ড-এ

পশ্চিম জার্মানী ৪ : উরুগুয়ে ০
(হেল্ড, বেকেনবাউয়ের, জিলার, হলার)

বিরতি ১—০

টিল্কোয়োস্কি ; হ্‌জেস, ওয়েবের, শুল্‌জ, স্নেলিঙ্গার ; বেকেন-বাউয়ের, হলার, ওভারাথ ; জিলার, হেল্ড, এমারিশ।

মাজুরকিউইজ ; ট্রোশে, উবিনাস, গনকালভেস, মানিসেরা, কেটানো ; সালভা, রোশা ; সিলভা, কর্টেস, পেরেজ।

এভারটন-এ

পোর্তুগাল ৫ : উত্তর কোরিয়া ৩

(ইউসেবিও ৪-২ পেনাল্টি, অগাস্টো) (পাক স্যুং জিন, ইয়াং স্যুং কুক, লি ডং য়ুন)

বিরতি ২—৩

জোসে পেরিরা ; মোরাইস, ব্যাপটিস্টা, ভিসেণ্টে, হিলারিও ; গ্রাকা, কলুনা ; জোসে অগাস্টো, ইউসেবিও, টোরেস, সিমোন।

লি চান ম্যুং ; রিম য়ুং সাম, সিন য়ুং কু, হা য়ুং ওন, ও য়ুন কুং ; পাক স্যুং জিন, জন স্যুং হুই ; হান বং জিন, পাক ডু ইক, লি ডং য়ুন, ইয়াং সাং কুক।

সাণ্ডারল্যাণ্ড-এ

রাশিয়া ২ : হাঙ্গেরি ১

(চিসলেঙ্কো, পোর্কুজান) (বেনে)

বিরতি ১—০

লেভ ইয়াসিন ; পোনোমারেভ, চেস্টারনিজেভ ; ভরোনিন, ডানিলভ , সাবো, খুসাইনভ, চিসলেঙ্কো, বানিসেভস্কি, মালাফিভ, পোর্কুজান।

গেলি ; মাত্রাই, ক্যাপোজটা, মেজলি, সিপস, জেপেসি ; নেগি, অ্যালবার্ট, রাকোশি ; বেনে, ফারকাস।

সেমিফাইনাল

এভারটন—এ

পশ্চিম জার্মানী ২ : রাশিয়া ১

(হলার, বেকেনবাউয়ের) (পোর্কুজান)

বিরতি ১—০

টিল্কেয়োস্কি ; হজেস, ওয়েবের, স্নুল্জ, স্নেলিঙ্গার ; বেকেনবাউয়ের, হলার, ওভারাথ ; জিলার, হেল্ড, এমারিশ।

লেভ ইয়াসিন ; পোনোমারেভ, চেস্টারনিজেভ ; ভরোনিন, ডানিলভ ; সাবো, খুসাইনভ, চিসলেঙ্কো, বানিসেভস্কি, মালাফিভ, পোর্কুজান।

ওয়েমব্লি-তে

ইংল্যাণ্ড ২ : **পোর্তুগাল ১**
(আর চার্লটন) (ইউসেবিও-পেনাল্টি)

বিরতি ১—০

ব্যাঙ্কস ; কোহেন, উইলসন ; স্টাইলস, জে চার্লটন, মুর ; বল, হার্স্ট, আর চার্লটন, হাণ্ট, পিটার্স।

জোসে পেরিরা ; ফেস্টা, ব্যাপটিস্টা, জোসে কার্লস, হিলারিও ; গ্রাকা, কলুনা, জোসে অগাস্টো ; ইউসেবিও, টোরেস, সিমোস।

তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলা

ওয়েমব্লি-তে

পোর্তুগাল ২ : **রাশিয়া ১**
(ইউসেবিও-পেনাল্টি, টোরেস) (মালাফিভ)

বিরতি ১—১

জোসে পেরিরা ; ফেস্টা, ব্যাপটিস্টা, জোসে কার্লস, হিলারিও ; গ্রাকা, কলুনা, জোসে অগাস্টো, ইউসোবিও, টোরেস, সিমোস।

লেভ ইয়াসিন ; পোনোমারেভ, খুর্তসিলাভা, কর্নিভ, ডানিলভ ; ভরোনিন, সিসিনাভা ; মেত্রেভেলি, মালাফিভ, বানিসেভস্কি, সেরেব্রিয়ানিকভ।

ফাইনাল (ওয়েমব্লি, ৩০ জুলাই, দর্শক—৯৩ হাজার)

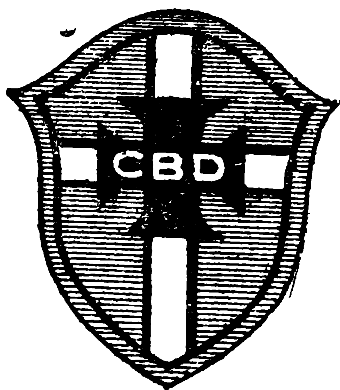
ইংল্যাণ্ড ৪ : **পশ্চিম জার্মানী ২**
(হার্স্ট ৩, পিটার্স) (হলার, ওয়েবের)
(অতিরিক্ত সময়ের পরে)

বিরতি ১—১

ব্যাঙ্কস , কোহেন, উইলসন , স্টাইলস, জে চার্লটন, মুর ; বল, হার্স্ট, হাণ্ট, আর চার্লটন, পিটার্স।

টিল্কোয়োস্কি ; হজেস, শুল্জ, ওয়েবের, স্নেলিঙ্গার ; হলার, বেকেনবাউয়ের ; ওভারাথ, জিলার, হেল্ড, এমারিশ।

মেক্সিকো



বিজয়ী ব্রাজিলের ব্যাজ

এর বিশ্বকাপ ফুটবল কেন মেক্সিকোয় হল—তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে মেক্সিকোয় ব্রাজিলের জয় বিশ্বকাপ ফুটবল ইতিহাসে নিঃসন্দেহে গৌরবের। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৯—এই দীর্ঘ চল্লিশ বছরে এমন সাফল্য কারুর ভাগ্যে ঘটেনি। তিনবার বিশ্বকাপ জয়ের সুবাদে তারা সোনার তৈরি জুল রিমে কাপ চিরতরের জন্য পেল।

১৯৩০-এ বিশ্বকাপ ফুটবলের দু বছর আগে ১৯৩০-তে ওলিম্পিকসের সময় দেখেছি মেক্সিকোর প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট উচ্চতা বহু দেশের খেলোয়াড়দের সমস্যায় ফেলেছে। ১৯৩০-এ বিশ্বকাপ ফুটবলের সময়ও তাপ ও উচ্চতার পরিপ্রেক্ষিতেই কঠোর সমালোচনা হল স্থান নির্বাচনের। আশঙ্কা হল—ফুটবলের শুরু থেকে কোনো হিংসাত্মক ঘটনা না ঘটে! ফুটবল বিশেষজ্ঞরা বললেন: ওখানে হবে নেগেটিভ ফুটবল। কিন্তু বিজয়ী ব্রাজিল সব আশঙ্কা, সব ধারণা নস্যাৎ করে প্রতিটি ম্যাচে যে উদ্দামতা দেখাল, তাতে সকলেই বিস্মিত। নানা প্রতিকূল পরিবেশেও ব্রাজিল যে খেলা খেলল তা বিশ্বের অ্যাটাকিং ফুটবলের দিগ্‌দর্শক বৈ নয়। আর ফাইনালে? অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্রাজিলের সব কৌশল ব্যর্থ করার ফন্দী এঁটেও অন্যরা সুবিধা করতে পারল না, বরং ব্রাজিলেরই কাছে ইতালি নাস্তানাবুদ হল।

আর্জেন্টিনায় নয়, তার বদলে মেক্সিকোয় বিশ্বকাপ আয়োজনের ব্যবস্থা হয় ১৯৩০-তে টোকিও ওলিম্পিক গেমসের সময় ফিফা কংগ্রেসে। ওলিম্পিক

কমিটিও আগেই মেক্সিকো সিটিকে ঠিক করে রেখেছিলেন ১৯৩৯-র গেমসের জন্য। কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির প্ররোচনাতেই নাকি গেমস ও ফুটবলের জন্য মেক্সিকোকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সহ অনেক কর্তাব্যক্তি মেক্সিকো সিটির পরিবেশ সম্পর্কে আপত্তি জানান। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সর্বাধিক আপত্তি আসে ওই ফুটবল সম্পাদকের তরফ থেকে। মেক্সিকোর আগে সকলের পছন্দ ছিল আর্জেন্টিনা। কিন্তু বাধা আসে আর্জেন্টিনা থেকেই। তখন ওখানকার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

মেক্সিকোয় যাতে বিশ্বকাপ না হতে পারে, তাই নিয়ে কিছু কিছু ব্যর্থ ষড়যন্ত্রও চলে। টোকিও ওলিম্পিকসে আগত এক ডেলিগেট স্বীকার করলেন, তাঁর যাতায়াত ভাড়া দিয়েছেন উদ্যোক্তারা। মেক্সিকোর উদ্যোক্তারাও নিশ্চয়ই টোকিওর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। তাঁর কানাঘুষা আলোচনা শুধু হোটেল কর্ণার বা করিডরে সীমিত রইল না। চলে গেল ফিফা সভাপতি স্যার স্ট্যানলি রাউসের কানেও। ওই কথা শুনে তিনি চিৎকার করে বললেন : হয়েছে, হয়েছে! মেক্সিকোয় বিশ্বকাপ ফুটবল পাকা। ভোটেই ওই সিদ্ধান্ত হয়েছে, ছাপ্পান্ন ভোট পক্ষে এবং বত্রিশ ভোট বিপক্ষে পড়েছে। সাতজন সদস্য ভোট দানে বিরত ছিলেন। স্যার স্ট্যানলি পরিষ্কার ঘোষণা করলেন : কোনো কিছু নিয়ে প্রভাব বিস্তার বরদাস্ত করা হবে না।

ফিফা-র অর্ডার পেপারে প্রস্তাব ঘোষিত হল : অতঃপর কার্যকরী কমিটি কংগ্রেসের উপরই দায়িত্ব দিতে চায় বিশ্বকাপের স্থান নির্ণয় সম্পর্কে। স্থির হল কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় সংস্থাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। তাদের নির্দেশ দেওয়া হবে, বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার যথাযথ ব্যবস্থা করার।

সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করা হল—বিশ্বকাপ স্থান নির্ণয় সম্পর্কে বর্তমান বিরোধিতার। বলা হল, এই ধরনের বিরোধিতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংস্থাকে নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। অযথা ব্যয় বেড়ে যায় ভোট আদায়ের জন্য। যে সব বন্ধু রাষ্ট্র বা জাতীয় সংস্থা আছে, যারা কোনো বিরোধিতাই পছন্দ করে না, তারা বেশ অসুবিধায় পড়ে পক্ষ সমর্থন নিয়ে। কমিটি স্পষ্ট বলে দিল, বিশ্বকাপের উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছুক এমন আবেদনকারী বিভিন্ন দেশের সুযোগ-সুবিধা যথার্থ বিচার-বিবেচনা ছাড়াই ভোট দেন ডেলিগেটরা এবং এই ভোট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুলভাবে প্রদত্ত হয়।

যাই হোক, মেক্সিকোর গ্রীষ্ম এবং নব্বই ডিগ্রির উপর তাপ বেশ কষ্টদায়ক। আরও সমস্যা সৃষ্টি করে সাত হাজার ফুটেরও অধিক উচ্চতার পুয়েবলা, তলুকা, মেক্সিকো সিটি ও অন্যান্য শহর। এই সব শহরে সবচেয়ে সমস্যা হয়—অত উঁচুতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারে। একে প্রচণ্ড গরম, তায় উচ্চতায় নানা সমস্যা—এর উপর মড়ার পরে খাঁড়ার ঘা রূপে দেখা দিল বিশ্বকাপ কমিটির খেলার সময় নির্ধারণ। তাঁরা আন্তর্জাতিক টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এমন চুক্তি করলেন যে, রবিবারের খেলাগুলি এবং ফাইনাল শুরু করতে হয় দুপুর বারোটায়। প্রচণ্ড গরমের জন্য ওই সব শহরে দুপুরে কেউ বাইরেই বের হন না, আর এঁরা দিলেন খেলা। ওই সময়ে ফুটবলের যে কোনো ম্যাচ তো বটেই, বিশ্বকাপের মত গুরুত্বপূর্ণ খেলায় মাঠে নামা যে শুধু হাস্যকর নয়, বিপজ্জনকও, তা কর্তৃপক্ষের কেন বোধগম্য হয়নি বোঝা গেল না। এই প্রচণ্ড গরমে সবচেয়ে অসুবিধায় পড়ে উত্তর-ইউরোপের দেশগুলি। ১৯৩৯-র চ্যাম্পিয়ন ইংল্যাণ্ডকে গুয়াদালাজারায় ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলতে হল আটানব্বই ডিগ্রি গরমে। তখন তারা গলে যাওয়ার উপক্রম। লিঁয়-র তাপে তো তাদের 'মৃত্যুই' ঘটল পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে এবারের বিশ্বকাপে।

মেক্সিকোয় প্রায়শ দুপুরে খেলা হলেও এবং তা নিয়ে পত্র-পত্রিকার সমালোচনায় কর্তৃপক্ষ টললেন না। এক কর্মকর্তা কিছুতেই ধৈর্য রাখতে পারেননি শেষ অবধি। তিনি বললেন: আপনারা যে গরম-গরম বলে চিৎকার করছেন, কই, কেউ তো মারা যাননি! তাঁর মন্তব্যের জবাব কেউ দিতে পারেননি, প্রমাণিতও হয়নি—ওই গরম সত্যিই কোনো ফুটবলারকে ভবিষ্যতে খেলার ক্ষতি করেছে। কিন্তু এমন পরিবেশে খেলার জন্য কর্তৃপক্ষের উন্নাসিকতা, অপদার্থতাকে ফুটবলাররা ক্ষমা করতে পারেননি। ১৯৩৯-এর বিশ্বকাপ ভালোয় ভালোয় শেষ হলেও সংশ্লিষ্টরা উপলব্ধি করলেন, এমনভাবে এতবড় অনুষ্ঠান হওয়া উচিত নয়।

১৯৩৯-তে ওলিম্পিকসের সময় মেক্সিকোয় দেখা যায়, অধিকাংশ দেশ এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে অনেক আগে দল পাঠিয়েছে। সেজন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলি ব্যয়ও করে বহুল পরিমাণে। চিকিৎসকরা স্বল্প সময়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো নিয়ে নানা কথা বললেও আগে এসে অনুশীলন সম্পর্কে কেউই দ্বিমত ছিলেন না। ১৯৩৯-র ওলিম্পিক ফুটবলে যারা এসেছিল, তারা মেক্সিকো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়েই ফেরে। এদের মধ্যে ইংল্যাণ্ড,

রাশিয়া ও ইতালি ছিল। তবে স্বল্পকালীন সফরে ওরা অধিকাংশই তখন বেশ সমস্যাতেই কাটায়। সমস্যা শুরুতে যতটা না দেখা দিয়েছিল, তার চাইতে বেশি প্রকট হয় এক সপ্তাহ কাটতেই। কিন্তু ওলিম্পিক ফুটবলে মেক্সিকো দল ফ্রান্স ও জাপানের কাছে হেরে গেল। জাপান ও ফ্রান্স দেখাল সমতল ভূমির খেলোয়াড়রা তিন সপ্তাহ বা তার বেশিদিন পাহাড়ী অঞ্চলে থেকে নিজেদের বেশ মানিয়ে নিতে পারে। ফাইনালও হয়েছিল হাঙ্গেরি ও বালগেরিয়ার মধ্যে।

প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলি

ব্রাজিল—ব্রাজিল এর বিশ্বকাপের জন্য দারুণভাবে প্রস্তুত হয়ে এল। ব্রাজিল স্পোর্টস কনফেডারেশনের সভাপতি জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ তাঁদের ফুটবল দলকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন : তোমাদের যা প্রয়োজন, সব পাবে, বদলে আমি চাই বিশ্বকাপ। তিনমাস আগে তারা মেক্সিকোয় হাজির হল পরিবেশ আয়ত্ত করতে। ম্যাচও খেলল কয়েকটি। কিন্তু এর আগে প্রস্তুতিতে হঠাৎ ছেদ ঘটে ১৯৩৯-এর মার্চে। প্রস্তুতি যখন জোর কদমে এগিয়ে চলেছে, অমনি দলের ম্যানেজার জোয়াও সালধানাকে বদলে জাগালোকে আনা হল। বিশ্বের ফুটবল বিশেষজ্ঞরা অবাক হয়ে গেলেন, বিস্মিত ব্রাজিলেরও অনেকে। ব্রাজিলের প্রাক্তন লেফট-উইঙ্গার জাগালো ১৯৫৮ ও বিশ্বকাপ বিজয়ী দলেই শুধু ছিলেন না—সালধানা যখন বোটাফোগোর ম্যানেজার, জাগালো তখন ওই দলেই খেলতেন।

সালধানা শুধু ব্যক্তিত্বে বা সুন্দর চেহারায় নয়, ফুটবলেও তাঁর যথেষ্ট অবদান। হ্রস্বকায়, মাজা চেহারার সালধানা বহু ভাষায় কথা বলতে পারেন, চমৎকার তাঁর বাচনভঙ্গী, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। রিও গ্রাণ্ডে ডু সুলের এক বিত্তশালী পরিবারে তাঁর জন্ম। ফুটবলে তাঁর অসীম নেশা। আর এই নেশার বশে নিজের চেষ্টায় ফ্রান্সে ১৯৩৮-এর বিশ্বকাপে উপস্থিত ছিলেন। সালধানার ফুটবল-আদর্শ তখন ভিট্টরিও পোজ্জো। পোজ্জোর অটোগ্রাফও নিয়ে আসেন সালধানা। রিওতে তিনি সাংবাদিকতায় বেশ খ্যাতি লাভ করেন তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী লেখনীর দ্বারা। বোটাফোগো ক্লাব তাঁকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। আমাদের দেশে যেমন কারুর দেবতা ইস্টবেঙ্গল, কারুর মোহনবাগান এবং কারুর বা মহমেডান স্পোর্টিং, তেমনি সালধানার ছিল বোটাফোগো। তাঁর ক্লাব-প্রীতি ১৯৫৭-য় এই ক্লাবের ম্যানেজারের দায়িত্ব দেয়। তখন বোটাফোগোর

ভীষণ দুর্দিন। পরিচালকমণ্ডলী একস্বরে বললেন: এই সময় বোটাফোগোর হাল ধরার মত একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি জোয়াও সালধানা। সালধানার ম্যানেজারশিপে বোটাফোগো ১৯৪৮-এর পর প্রথম চ্যাম্পিয়ান হল, পরের বছর স্থান দ্বিতীয়। সালধানা তারপর ফিরে এলেন আগের কাজে—সাংবাদিকতায়।

১৯৩৯ সালে ব্রাজিল দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জিতলেও যাঁরা এই দলের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন, সালধানা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সালধানা বললেন: দল শুধু বুড়োদের নিয়েই গঠিত হয়নি, অনেকেই ছিলেন আহত বা ঘুণধরা। তারপর যখন ইংল্যাণ্ডের বিশ্বকাপে ব্রাজিল কোয়ার্টার ফাইনালের আগেই বিদায় নিল, তখন সালধানার আগের কথাগুলি আরও সোচ্চার হল এবং তার রেশ চলল যতদিন না ব্রাজিল বোটাফোগোর কাছে আত্মসমর্পণ করল। ব্রাজিল সালধানাকে ম্যানেজারশিপের দায়িত্ব নিতে আমন্ত্রণ জানালো। ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি ওই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তোপ দাগলেন। তিনি 'এ' ও 'বি' দুটি দল নির্বাচন করে সকলকে তা জানালেন। তাঁর দল একবছরের মধ্যে শুধু কোয়ালিফাইং গ্রুপ পর্যন্ত উপনীত নয়—খেলোয়াড়দের খামোকা আহত হওয়া থেকে বাঁচাল, রক্ষা করল শৃংখলাহীনতা থেকেও। তাঁরা মেক্সিকোয় খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। বিস্ময়ের কথা ফাইনালে ইতালিকে যে ব্রাজিল দল পরাস্ত করল, সালধানা মনোনীত বাইশজনের বাইরে তাদের কেউ ছিলেন না। সাতজন ছিলেন 'এ' দলে ও চারজন 'বি' দলে।

সন্দেহ নেই সালধানার প্রখর বুদ্ধি, অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা ব্রাজিলের জাতীয় দলকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। কিন্তু এর জুনে মারাকানায় ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জয় খুব একটা দুর্জয়ের চিহ্ন নয়। টোস্টাও ও জেয়ারজিনোর দেরিতে দেওয়া গোলে ব্রাজিল মারাকানায় জেতে। কিন্তু আগস্টের বিভিন্ন ম্যাচে টোস্টাওয়ের গোলের বন্যার দ্বারা কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে ও ভেনেজুয়েলা পর্যুদস্ত হল এবং ব্রাজিল পৌঁছল কোয়ালিফাইং গ্রুপে।

সালধানা বুদ্ধিমান, বিপ্লবী, বিচক্ষণ এবং সুবক্তাও। ঢাল, তরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দারের মত বাক্সটি গেলেন ইউরোপে। গেলেন বিভিন্ন দেশের ফুটবল সন্দর্শনে। দেখলেন ওইসব দেশের হতমান সাতটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে অবতীর্ণ হলেন একগুঁয়ে আলফ রামসের সঙ্গে। তারপর ব্রাজিলে ফিরলেন একেবারে ভিন্ন ধরনের মানুষ হয়ে। তাঁকে দেখে

মনে হল নিশ্চয়ই বড় রকমের কোনো ঘটনা ঘটেছে। তা না হলে এমন আমূল পরিবর্তন হবে কেন সালধানার! তাঁকে দেখে কেউ কেউ ধাঁধায় পড়লেন। ফুটবল সম্পর্কে, ব্রাজিলের দল গঠন সম্পর্কে সালধানার নীতি বা পদ্ধতি নিয়ে কারুর আর ভবিষ্যৎবাণী করার জো রইল না। সবই কেমন যেন চিন্তার বাইরে। এর নবেম্বরে অঘটন ঘটিয়ে বসলেন তিনি। দীর্ঘ চারমাস নানা ম্যাচে অংশ নিয়েছেন, কিন্তু কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি। সুতরাং খেলোয়াড়দের যোগ্যতা যাচাই হবে কেমন করে! তবুও সালধানা হঠাৎ দল থেকে চারজন ডিফেণ্ডারকে বাদ দিলেন। বাদ দিলেন দুজন গোলরক্ষককেই এবং নতুন পাঁচজনকে দলে নিলেন।

সালধানার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ প্রতিবাদ ধ্বনি উচ্চারিত হল। তারও ফল ফলল ফেব্রুয়ারিতে। শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে ব্রাজিল দলের চিকিৎসা উপদেষ্টা ড্যাঃ টলেডো ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে টনিলো ও স্কালাকে নিজ নিজ ক্লাবে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। ওই শুনে ক্লাবগুলোও রেগে আগুন। ৪ মার্চ ব্রাজিল পোর্টো আলেগ্রেতে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে গেল। অথচ এই আর্জেন্টিনা পেরুর কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছাঁটাই হয়েছে কিছুদিন আগে। চারদিন পরে সালধানা আরও গুরুতর এবং ক্ষমাহীন কাজ করতে উদ্যত হলেন। ক্ষমতালোভী হয়ে পেলেকেও বসিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, পেলেকে বাদ দিতে পারলে দলে তাঁর কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাবে। পেলে সম্পর্কে বলা হল, তাঁর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। সালধানাকেই বিদায় নিতে হল, তাঁর জায়গায় ম্যানেজারশিপের দায়িত্ব বর্তাল জাগালোর উপর।

জাগালো দায়িত্ব পেয়ে ছোট হলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করলেন। এর মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বাঁ পায়ের দারুণ ক্ষমতাসম্পন্ন লেফট ইন রিভেলিনোকে কাজে লাগানো এবং তাঁরই সমগুণসম্পন্ন লেফট-উইঙ্গার গারসনকে ব্যবহার। এই পরিবর্তনেই দলের শক্তি বেড়ে গেল অনেক পরিমাণে। রিভেলিনো নব্বই মিনিট লড়াকু শক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। রিভেলিনো এর আগে নামলেও এবং তাঁর খেলা দর্শকদের চোখ জয় করলেও তাঁর স্বরূপ পুরোপুরি প্রকাশ পায়নি। শুধু একটি অর্ধেই তিনি যেন আলো বিকিরণ করতেন এতদিন।

সালধানার কাছ থেকে হঠাৎ দায়িত্ব পেয়ে জাগালোর হাতে বেশি সময়ও

ছিল না। কিন্তু তাঁর ভাগ্য ছিল অত্যন্ত সুপ্রসন্ন। তাঁর এই ভাগ্যের জোরেই যেন টোস্টাওয়ের চোখের কঠিন আঘাত সেরে গেল। ট্রেনিং-এর সময়েই একদিন টোস্টাওয়ের চোখে বল লাগে ও চোখের মণি বেরিয়ে যায়। তারপর টেক্সাসের হিউস্টনে গিয়ে তাঁকে দুবার বড় ধরনের অপারেশন করতে হয়। বিশ্বকাপে তাঁর খেলা তেমন দেখা যায়নি। কিন্তু পরে তিনি নিজেকে কঠোর অনুশীলনে অনুশীলনে তৈরি করে নেন। তাঁর অদ্ভুত টেকনিক্যাল স্কিল, ধৈর্য এবং অসীম সাহস প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ে পরিণত করে। সন্দেহ নেই টোস্টাওবিহীন সালধানার ব্রাজিলের উইঙ্গারকে হীনবল করে রেখেছিল। এবার তিনি ফিরলেন। ফিরিয়ে আনা হল ফ্লুমিনেন্সের গোলরক্ষক ফেলিক্সকে। ফেলিক্সকে একবার ডেকে সালধানা আবার বসিয়ে দেন। এই ফেলিক্স মেক্সিকোয় প্রত্যেকটি ম্যাচে খেললেন। বার ঘেঁষা প্রতিটি শট ধরতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তবুও গোটা ব্রাজিলের রক্ষণ ও আক্রমণ-ভাগের খেলা দেখে তাঁর সম্পর্কে বলা হল: 'মুটাটিস মুটাণ্ডিস'। অর্থাৎ হ্যারি ট্রুম্যানের সেই রসিকাতা—যিনি দাঁড়াবেন, তিনিই সভাপতি হবেন। গত কয়েকবছর ধরে কলকাতায় ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক অরুণ ব্যানার্জি সম্পর্কে যেমন দর্শকের মন্তব্য শোনা গিয়েছিল, তেমনি বলা হল ফেলিক্সকে নিয়েও—যেই গোলরক্ষক হোক, ব্রাজিলের তাতে আসে যায় না। বিশ্বকাপ তো এবার ওদের দরজায় বাঁধা। তবে ১৯৫৮-র বিশ্বকাপ গোলরক্ষক পবিত্র ও প্রশান্ত জিলমার সম্পর্কে কেউ এই ধরনের মন্তব্য করতে সাহস পেতেন না।

প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্যের পর চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্রাজিল ও ইংল্যাণ্ড একই গ্রুপে রইল। ওদের সঙ্গে আর দেওয়া হয় গুয়াদালাজারায় রোমানিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে। ব্রাজিল মেক্সিকোয় এল নিশ্চিতই স্থির লক্ষ্য নিয়ে। সে লক্ষ্য ব্রাজিলিয়ানদের মানসিকতাকে মনে রেখেই। অর্থাৎ জিততে হবে। তারা মেক্সিকানদের সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। মেক্সিকোয় এসে ওরা বিতরণ করলেন পতাকা, ব্যাজ ইত্যাদি। প্রাণ খুলে মিশলেন স্থানীয় লোকদের সঙ্গে। প্রতিদানে মেক্সিকানরাও ব্রাজিলিয়ানদের আপন করে নিলেন। এতে সুবিধাই হল। মেক্সিকানরা পুরোপুরি সমর্থক হয়ে গেলেন ব্রাজিলের। ওদিকে গুয়ানাজুয়াটোয় ট্রেনিং নিয়ে ব্রাজিলের যে আশঙ্কা ছিল, এই মেলামেশার সুযোগে তার নিরসন ঘটল। শুধু তাই নয়, দুর্গের মধ্যে যেমন বাইরের প্রভাব আসে না, তেমনি নির্বিঘ্নে ব্রাজিল দলের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হল

গুয়াদালাজারায় স্থইট ডে ক্যারিবে-তে। সাংবাদিকদের তাবে রাখার জন্য তাঁরা পৃথক পরিচয়পত্র দিলেন তাদের চাহিদা অনুযায়ী এবং বিশ্বকাপ কমিটি ওগুলি বণ্টনের দায়িত্ব নেন। প্রতিদানে সাংবাদিকরাও ব্রাজিলের জন্য অনেক করলেন। ব্রাজিলের এই সব 'শুভেচ্ছা-বিনিময়' ইংল্যাণ্ডের পক্ষে মোটেই স্থখকর ছিল না।

ইংল্যাণ্ড তেমন হিসাব-নিকাশ করেই এসেছিল। হয়ত তারা জয়ের স্থবাদে বেশ আত্মবিশ্বাসীই ছিল। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এবার এটাই ছিল দুর্ভাগ্যের। তাছাড়া কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে স্যার আলফ রামসের উক্তি ('ওরা জন্তু-জানোয়ারের মত আচরণ করেছে') সঙ্গত কারণেই হয়তো ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু তা নিয়ে ইংল্যাণ্ড ও লাতিন আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কের কোনোরকম উন্নতি হয়নি। সম্পর্ক উন্নয়নের কোনো ব্যবস্থাও হয়নি। তাই 'ঘৃণিত' উত্তর আমেরিকার নাগরিকরা, বিশেষত মেক্সিকানরা প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

ইংল্যাণ্ড—মেক্সিকোয় আসার আগেই ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে মেক্সিকানদের মনোভাব কিছুটা বোঝা গিয়েছিল, ইংল্যাণ্ড পৌঁছতেই ওই চিত্র আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। সংঘাত লাগল রামসের সঙ্গে মেক্সিকানদের। এই সংঘাত গোটা ইংল্যাণ্ড দলের কাছে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। রামসের কিন্তু উচিত ছিল ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা। ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে লাতিন আমেরিকার এই মনোভাব সালে ইংল্যাণ্ডের প্রাক্-বিশ্বকাপ সফরের সময়েই প্রতিভাত হয়েছিল। তখনই স্যার আলফের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল সাফল্যের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে রামসের পক্ষ থেকে তেমন কোনো প্রয়াস দেখা যায়নি।

মে মাসে অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে মেক্সিকো-ইংল্যাণ্ডের খেলার পরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন ড্রেসিংরুমের বাইরে। তাঁকে বলা হয়, 'আপনার কিছু বক্তব্য থাকলে মেক্সিকান সাংবাদিকদের জানাতে পারেন।' জবাবে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলব।' তিনি সাংবাদিকদের বললেন: 'আজ ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আমাদের হোটেলের বাইরে ব্যাণ্ড বেজেছে। বলা হয়েছিল, স্টেডিয়াম পর্যন্ত একটি মোটর সাইকেল আমাদের পথ দেখিয়ে আনবে, কিন্তু সে ব্যবস্থা করা হয়নি। আমাদের খেলোয়াড়রা যখন মাঠ পরিদর্শনে গেল তখন দর্শকরা তাদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি

ছুঁড়ে দিয়েছেন, গালমন্দ করেছেন। অথচ আমার ধারণা ছিল মেক্সিকোর দর্শকরা ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের দেখে উল্লসিত হবেন ও সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন। তারপর যখন খেলা শুরু হল, মেক্সিকান দর্শকরা তো নিজেদের দলকে পছন্দমত উৎসাহিত করতে পারতেন।' রামসে এবার 'কিন্তু' বলে থামলেন এবং একটু খুশি খুশি ভাব দেখিয়ে চিন্তা করে বললেন: 'আমরা মেক্সিকোয় আসতে পেরে আনন্দিত এবং মেক্সিকানরা সত্যিই অদ্ভুত প্রকৃতির।'

এর কয়েকদিন পরে গুয়াদালাজারায় ইংল্যাণ্ড একাদশ ৪-০ গোলে হারায় এক মেক্সিকান একাদশকে। এখানেও রামসের কথায় অসঙ্গতি দৃষ্ট হল। খেলা শেষে জালিস্কো রাজ্যের গভর্ণর রামসেকে একটি পুরস্কার দিলেন। তারপর তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বিশ্বকাপ স্টেডিয়ামের তলাকার ড্রেসিং রুমে। ওদের পিছনেই ছিলেন একদল মেক্সিকান সাংবাদিক। আলফ রামসে ওদের দেখে ভীষণ বিরক্ত হলেন, তারপর চিৎকার করে বলে উঠলেন: 'বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে। আপনাদের এখানে প্রবেশের কোনো অধিকার নেই।' সত্যিই সাংবাদিকদের ওখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু রামসের কী অমন আচরণ উচিত হয়েছিল? পরের দিন সকালে গুয়াদালাজারার এক সংবাদপত্রে প্রশ্ন করা হল: 'রামসে, আপনি কেমন আচরণ প্রত্যাশা করেন? আপনি জানোয়ারদের কাছে নিশ্চয়ই সু-আচরণ আশা করেন না!' তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হল তিনি আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের জানোয়ার বলেছিলেন।

সন্দেহ নেই রামসের অনেক সদ্‌গুণ ছিল। কিন্তু কূটনৈতিক দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ ছিলেন। অথচ অনেক সংকট মুহূর্তে এই কূটনৈতিক বিচক্ষণতাই পরিত্রাণ করে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রতি তাঁর অশিষ্ট আচরণ এবং অনীহা ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রতি সকলের বিরক্তিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং ইংল্যাণ্ড দলের অনিষ্ট ডেকে আনে। অথচ একটু নমনীয়তার দ্বারাই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারতেন। মেক্সিকান সাংবাদিকদের কাছে আর ব্যাখ্যা করার বা অজুহাত দেখাবার হেতু রইল না রামসের যে, তিনি তাঁদের প্রতি কেন অশিষ্ট আচরণ করেছিলেন, কেন তাঁদের গালিগালাজ করেছিলেন। আরও দৃষ্টিকটু হল—ইংল্যাণ্ডের সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি সদাচরণ করেন, নিষিদ্ধ ড্রেসিংরুমে তাঁদের প্রবেশাধিকারও ছিল। অর্থাৎ

মেক্সিকান সাংবাদিকরা রামসের কাছে ঘৃণিত এই খবর সকলেই জেনে গেল। রামসে যে ঘৃণার বীজ বপন করলেন, বিপজ্জনক অথচ উর্বরা জমিতে তা পড়ে তাড়াতাড়ি সে গাছ বড় হয়ে উঠতে লাগল।

এই অবস্থার অবসান ঘটাতে পারতেন কোনো মধ্যপন্থী বা জনসংযোগ রক্ষায় অভিজ্ঞ কেউ। এখানে সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। তারাই পাঠাতে পারত প্রবীণ অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তিকে। কিংবা সিনিয়র ইণ্টারন্যাশনাল কমিটির কাউকে, অর্থাৎ যাঁরা ছিলেন ইংল্যাণ্ডের নির্বাচক কমিটিতে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কেননা, রামসে তাঁদের সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। ওঁরা মেক্সিকোয় এলেও, এসেছিলেন অনেকটা পর্যটকদের মতই। মেক্সিকোয় তাঁদের করণীয় কিছুই ছিল না। তাঁদের দেখে মনে হত অন্যান্যদের : They Also Serve, Who Only Eat and Drink.

ইংল্যাণ্ড মেক্সিকানদের কাছে ভীষণ পরিচিত হয়ে উঠল। কিন্তু সে পরিচয় অন্যভাবে। তাঁরা ইংল্যাণ্ডকে ঘৃণা করতেই ভালবাসতেন। স্থানীয় একটি সংবাদপত্র তো সুন্দরভাবে হেড-লাইন করল একদিন: 'ওটা চোর ও মদ্যপদের দল ব্যতীত আর কিছু নয়। ওরা ফুটবলের কলঙ্ক।' সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রতি রামসের অনীহাই কলম্বিয়ায় ববি মূরকে হেনস্থা করে ছাড়ে। জেফ অ্যাসলের সমগ্র বিমানভ্রমণই ছিল দুঃসহ। যখন তিনি মেক্সিকো সিটি এয়ারপোর্টে নামলেন তখন তো রীতিমত বিশৃংখল অবস্থা। ববি মূরের মত অদ্ভুত ধরনের শান্ত প্রকৃতির ফুটবালর তো বটেই অমন লোভহীন মানুষও বিরল। ইংল্যাণ্ডের রক্ষণভাগে তাঁর মত দুর্ভেদ্য খেলোয়াড় কমই দেখা গেছে। এই মানুষটিও কলম্বিয়ায় পৌছে কম মানসিক যন্ত্রণায় ভোগেননি। ইংল্যাণ্ড দল যখন চোর, ডাকাত ও খঞ্জ, অন্ধ ইত্যাদিতে ভরা বগোটা শহরে ছিল, তখন একদিন ববি মূর ও ববি চার্লটন তাঁদেরই হোটেল 'টেকোয়েনডামা'র মধ্যেকার গ্রিণ-ফায়ার জুয়েলারি দোকানে গেলেন। সব দেখাশোনার পর যখন বাইরে বসে গল্প-গুজব করছিলেন, ঠিক তখনই তাঁদের ঘিরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে থাকে ওই দোকানের ব্রেসলেট চুরি সম্পর্কে। এমনভাবে ওদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হতে থাকে যেন, ওঁরাই ওটি চুরি করেছেন। দুজনেই অবাক হলেন। পরদিন সংবাদপত্রগুলি উভয়ের কথা এমনভাবে ছাপল যে, ওরা চোর বৈ নন। মূরকে গ্রেপ্তার করে হাজতেও পাঠানো হয়।

সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে আট হাজার ফুট উঁচুতে হলেও বগোটায় কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড সহজেই জিতল, একই রাত্রে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় দলটিও একই-ভাবে জেতে। এর পরে ইংল্যাণ্ড অনুরূপ দুটি ম্যাচ খেলতে কুইটোর ইকোয়েডরে গেল। নয় শ' ফুট উঁচুতে আবার তাদের জয় হল। সারা সফরে ববি মূরকে নিস্পৃহ মনে হল। দল যখন পুনরায় বগোটায় ফেরে মেক্সিকো সিটিতে যাওয়ার পথে, মূরকে তখন কলম্বিয়া পুলিশ গৃহবন্দী করে রাখে মিলনারিও ফুটবল ক্লাবের সভাপতির হেফাজতে।

ববি মূরের বিরুদ্ধে দোকান মালিক ও কাউন্টারের এক মহিলা-কর্মী চুরির অভিযোগ করলেন। সাক্ষী মানা হল এক রহস্যজনক ব্যক্তিকে, যাঁকে পরে আর আদালতে সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত করা সম্ভব হয়নি। কূটনৈতিক পর্যায়ে তদ্বিরের পরে মূর জামিন পেলেন বিশ্বকাপে খেলার জন্য এবং প্রতিটি ম্যাচে চমৎকার খেললেন। দোকান মালিকের পক্ষ থেকে এর পরেও তাঁকে কয়েক মাস জ্বালাতন করা হয় এবং বলা হয় মূরের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আছে; অথচ তাঁর বিরুদ্ধে মামলাটি ধোপে টেকেনি: উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে অভিযোগকারীরাই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। পুরো ব্যাপারটাই ছিল সাজানো (তাঁদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে ইংল্যাণ্ড তবুও মূরের অদ্ভুত শান্ত স্বভাব কোনোদিন মুহূর্তের জন্য অশান্ত হয়ে ওঠেনি। আর এর বিশ্বকাপে তাঁর খেলা বহুগুণে ১৯৬৬-কে ছাড়িয়ে গেল।

নানান প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডের বিশ্বকাপ জয়ের যথেষ্ট আশা রইল। দুই ফুল-ব্যাক উইলসন ও কোহেন এবং নবি স্টাইলস, হাণ্ট ও জ্যাকি চার্লটনকে বাদ (স্টাইলস ও চার্লটন ১৯৭৯ এর দলে থাকলেও খেলানো হয়নি) দেওয়া হলেও দলের মনোবল হ্রাস পায়নি। বরং ওঁদের বদলে ইংল্যাণ্ড নতুন নতুন তারকা আবিষ্কার করে। আর পুরানো বাহিনীর ববি মূর, গর্ডন ব্যাঙ্কস ও জিওফ হার্স্টকে এমনভাবে সঞ্জীবিত করা হল যে, তাঁরা জীবনের সেরা খেলা খেলেন। হ্রস্বকায় লেফটব্যাক টেরি কুপারের (লিডসে ছিলেন লেফট উইংগার) যেমন নিখুঁত বল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, তেমনি বল নিয়ে ছুটতেও ওস্তাদ। স্টাইলসের ক্ষতিপূরণ করলেন লণ্ডনের উৎফুল্ল মূলারি। মুলারি শুধু অল-রাউণ্ডারই নন, স্টাইলস অপেক্ষা টেকনিকে অনেক গুণবান। তিনি এবং ম্যাঞ্চেস্টার সিটির দোহারা রাইট ইন কলিন

বেল -এর লাতিন আমেরিকা সফরে চমৎকার খেলেছিলেন। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির স্বাস্থ্যবান স্ট্রাইকার ফ্রান্সিস লি ছিলেন রাইট আউট এবং নির্বাচক কমিটির দৃষ্টি কেড়ে নেন। যেমন তাঁর শটে জোর, তেমনি অ্যাথলেটিকসের স্প্রিন্টারের মত দ্রুত দৌড়তে সক্ষম। লেফট ফ্ল্যাঙ্কে তাঁকে পেয়ে হার্স্ট তো আরও অজেয় হয়ে উঠলেন।

সম্ভবত ইংল্যাণ্ড দলে আগের সেই সৌরভ অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে যুগোশ্লোভিয়ার সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর হারলেও তাদের লড়াকু মনোভাবে ভাঁটা দেখা যায়নি। বরং সকলেই ইংল্যাণ্ডকে সমীহ করত, ভয়ও পেত।

মেক্সিকোয় কয়েকটি বিশ্বকাপ দল অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে; ইংল্যাণ্ডও ছিল তাদের অন্যতম এবং বিশিষ্ট। ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা মেক্সিকোয় এলেন মে মাসের গোড়ার দিকে—তাঁদের খেলার বেশ আগে। যে পশ্চিম জার্মানীর কাছে হেরে ইংল্যাণ্ড বিদায় নেয় এর বিশ্বকাপ থেকে, তারা এল ইংল্যাণ্ডের আসার কয়েক সপ্তাহ পরে।

পশ্চিম জার্মানী—গুয়াদালাজারার উত্তর-পশ্চিম দিকে লিঁয় গ্রুপে পশ্চিম জার্মানীর খেলা পড়ল। ছোট্ট শহর এই লিঁয়, কিন্তু গরম একই রকম। দারিদ্র্যপীড়িত হলেও বিদেশীদের তা নিয়ে সমালোচনা করতে দেখা যায়নি, কিন্তু নোংরা পরিবেশ অনেককেই বিরক্ত করল। আবার পশ্চিম জার্মানী দলে নব নব আক্রমণ রচনাকারী বেকেনবাউয়েরকে দেখা গেল। মিড-ফিল্ডে উলফ্যাঙ্গ ওভারাথ। চতুর্থবার বিশ্বকাপ খেলতে এলেন উয়ে জিলার। উপরন্তু নতুনদের মধ্যে গারড মূলার এলেন প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে। বেয়ার্ণ মিউনিখের এই সেণ্টার ফরোয়ার্ড মূলার বেঁটে হলে কী হবে, কালো চুলের এই ফুটবলারের উরু দেখলেই মালুম হওয়া যায় তাঁর কষ আছে। চমৎকার তাঁর ফিনিশিং, পেনাল্টি-সীমানার মধ্যে বল পেলেই বিপক্ষের হৃৎকম্প শুরু হয়, দুর্দান্ত ভলি মারেন।

সমস্যা হল এখানেই। মূলার কেমন করে তাঁর সম-প্রতিভার প্রবীন জিলারের সঙ্গে মানিয়ে নেবেন? হেলমুট শ্যোনকে এই নিয়ে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল তাঁরই বামহস্ত ডেটমার ক্র্যামারের। কিন্তু শ্যোন সহজেই মূলার-জিলার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটালেন দারুণ বিচক্ষণতায়। পোজোর অনুকরণে তিনি জিলার ও মূলারকে হোটেলের একই ঘরে থাকার

ব্যবস্থা করলেন। তারপর তিনি ভিলারকে মিড-ফিল্ডে নিয়োগ করলেন। সব সমস্যা মিটে গেল।

পেরুতে পশ্চিম জার্মানীকে শক্ত বিপক্ষের মুখোমুখী হতে হয়। উদ্দীপনাময় এবং ফুটবলের নতুন নতুন টেকনিক উদ্ভাবক একগুঁয়ে আর্জেন্টিনাকে পেরু পর্যুদস্ত করে ছেড়েছিল।
সেরা তারকা ডিডিকে ম্যানেজারের দায়িত্ব দিয়েছিল পেরু। তারা রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে শেষ পর্যন্ত বুয়েনস আয়ার্সেও চূড়ান্ত পর্যায়ে আসে। ওই শেষ খেলায় পেরু ৪-২-৪ পদ্ধতিতে খেলে এবং দুই উইঙ্গারকে ভীষণ সক্রিয় করে তোলে। ফল অবশ্য ড্র হয়েছিল। যদিও পেরুর কয়েকজন সেরা খেলোয়াড় প্রাথমিক পর্যায়ে খেলার সময় হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য সাসপেণ্ড হয়েছিলেন, তবুও তাদের দলে তারকার অভাব ছিল না। কৃষ্ণকায় এবং যে কোনো সময় দারুণ খেলতে সক্ষম কুড়ি বছর বয়সী ইনসাইড ফরোয়ার্ড টিওফিলো কুবিল্লাস, ডানপায়ে থরহরি সৃষ্টিকারী দারুণ শক্তিমান চুম্পিতাজ এবং অভিজ্ঞ কালো স্ট্রাইকার গ্যালার্ডো হলেন দলের মধ্যমণি।

ইতালি—পুয়েবলা-তলুকা গ্রুপে অত উঁচুতে ইতালিয়ানরা ইজরায়েল ও উরুগুয়ের সঙ্গে ড্র করল এবং জিতল সুইডেনের সঙ্গে শুধু লুইগি রিভার উপর ভরসা রেখেই। প্রতিযোগিতা শুরুর অনেক আগেই তারা মেক্সিকো এল। যে কোনো বিদেশীর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল কাগলিয়ারি দলের এই ফরওয়ার্ডের উপরই ইতালি ভীষণ নির্ভর করছে।

তাই মে মাসে মিলানে যখন বিখ্যাত প্রাক্তন খেলোয়াড়, ম্যানেজার ও সাংবাদিকদের নিয়ে একটি বিতর্ক সম্মেলন হল তখন রিভা অনুপস্থিত রইলেন। বিতর্কের প্রাক্কালে একজন বেশ চড়া গলায় ঘোষণার সুরে বললেন

এই বিতর্ক সম্মেলনের ফারাক হল—এবার রিভা নেই। অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করে সকলেই তৎক্ষণাৎ হাসিতে ফেটে পড়েন।

সন্দেহ নেই গোল দেওয়ার প্রতিভায় রিভা অদ্বিতীয়। তাঁর বল নিয়ন্ত্রণ, সাহস এবং শক্তিশালী বাঁ পা সম্পর্কেও কোনো সন্দেহই ছিল না। তাঁর উপস্থিতিই যেন ইতালির শক্তি শতগুণ বাড়িয়ে দেয়, তা কাটানাকিও পদ্ধতি যতই তাদের কাছে নিষ্ফলা হোক। বিপক্ষদল তাঁকে দেখলেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। রিভা যদি মাঝমাঠ থেকে কিছুটা এগিয়ে থাকেন, তা ইতালি দশজনে খেললেও গোলের গ্যারান্টি মিলবেই তাঁর পা থেকে। তাঁর খেলা যখন তুঙ্গে

তখনই অঘটন ঘটল। উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে খেলায় মেক্সিকোয় রিভেরা ও মাজোলা এক অশুভ ঘটনার শিকার হয়ে পড়েন এবং ইতালি দলে বিচ্ছেদের উপক্রম হয়।

গিয়ানি রিভেরার পরিচয় গত বিশ্বকাপে পাওয়া গিয়েছে। তিনি মিলানের শুধু অধিনায়কই নন, স্কিম রচনায়ও পথিকৃৎ, এখন বয়স ছাব্বিশ। ইউরোপীয়ান 'ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' হয়েছেন এবং খেলতে এসেছেন তৃতীয়বার বিশ্বকাপে। ১৯৩৯ সালে রোমে নেশন্‌স কাপ ফাইনালে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে সাণ্ড্রি ও মাজোলাকে নামানো হয় রিভেরা আহত হওয়ায়। ওই খেলাতেই মাজোলার খ্যাতি হল স্কোরিং সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে। প্রমাণ করলেন, তিনি একজন উঁচুদরের মিড-ফিল্ড প্লেয়ার। মেক্সিকোতে মাজোলা বীরের মত খেলেছিলেন।

ইতিমধ্যে মেক্সিকো সিটির যে হোটেল ডে লা ভিলেতে ইতালি দল ছিল রিভেরা সেখানেই গুঞ্জন শুনতে পেলেন, তাঁকে বাদ দেওয়া হবে। উদ্বোধনী ম্যাচে সুইডেনের বিরুদ্ধে তাঁর বদলে খেলবেন মাজোলা। সঙ্গে সঙ্গে রিভেরা ক্রোধে ফেটে পড়লেন। জনসমক্ষে তিনি ইতালির ম্যানেজার শান্ত প্রকৃতির ফেরুক্কিও ভালকারেগিকে অপমানিত করলেন, হেয় করলেন ফ্লোরেন্সের ফেডারেল টেকনিক্যাল সেণ্টারের প্রধান ওয়াল্ডার ম্যাণ্ডেল্লিকেও। রিভেরার এই আচরণ ওঁরা বরদাস্ত করতে পারলেন না। সতর্ক করে বললেন, রিভেরা, তুমি যদি ক্ষমা না চাও এই আচরণের জন্য, তবে তোমাকে দেশে ফেরত পাঠানো হবে। গোলমাল মিটল হঠাৎ ইতালি থেকে এফ আই জি সি-র সভাপতি আর্টমিওফ্রাঙ্কি এবং মিলানের তরুণ সভাপতি ফ্রাঙ্কো কারারো ও ম্যানেজার নিরিও রেকোর আগমনে। রিভেরার আচরণ নিয়ে আপত্তি তুললেন ম্যাণ্ডেল্লি। তারপর দলের সকলকে ডেকে জোরালো বক্তৃতা দিয়ে উৎসাহিত করলেন। রিভেরা নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা চাইলেন না। কিন্তু ম্যাণ্ডেল্লি ও ভালকারেগির সঙ্গে শান্তি স্থাপন করলেন একটি শর্তে। রিভেরা বললেন, তিনি বাদ পড়লে তা যেন তাঁকে সাংবাদিকদের মারফৎ শুনতে না হয়। গণ্ডগোল কিছুটা মিটল।

ইতালীয়দের এবার আর উত্তর কোরিয়ার বিভীষিকায় ভুগতে হল না। উত্তর কোরীয়রা ১৯৩৯-এর বিশ্বকাপে খেলতেই আসেনি। তারা ইংল্যাণ্ডে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বিশ্ব-ফুটবলে নিজেদের উপস্থিতির ছাপ রেখে

গেলেও এ তারা নাম প্রত্যাহার করে নেয়। সম্ভবত রাজনৈতিক কারণেই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কোয়ালিফাইং ম্যাচে তারা নামতে গররাজি হয়। উত্তর কোরিয়ার অনুপস্থিতিই সুযোগ করে দিল ইজরায়েলকে জিততে। তারা হারাল দক্ষিণ কোরিয়াকে, এই গ্রুপে রানার্স আপ হল অস্ট্রেলিয়া। মেক্সিকো সিটি ইজরায়েলের কাছে নতুন জায়গা নয়। ওলিম্পিকসে তারা ওখানে ভাল ফুটবল খেলে গিয়েছে। তখন দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন রাশিয়ায় ভূমিষ্ঠ ইজরায়েলের লেফট-ইন মর্ডেকাই স্পিগলার।

এইবারই বিশ্বকাপে এশীয় ও আফ্রিকার দেশ খেলতে এল। এল উভয় মহাদেশ থেকে একটি করে দল এবং তাদের গ্রুপও পৃথক রাখা হয়। কিন্তু তাতে অসন্তোষ দেখা দিল। ভাগাভাগি হলেও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, ইউরোপ থেকে যেন যোগ্য প্রতিনিধিত্ব হয়। কিন্তু ফল হল উল্টো। মরক্কো ও ইজরায়েল চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় এলেও স্কটল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া ও স্পেনের মত দলকে দেখা গেল না।

বেলজিয়াম—মেক্সিকো সিটিতে এক নম্বর গ্রুপে মেক্সিকানরা তো রয়েছেই, আর রইল রাশিয়া, এল সালভেডর এবং ব্রাজিল। হণ্ডুরাসে তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা ঘিরে রক্তাক্ত লড়াই হয়ে যায়। এবার বেলজিয়ম সম্পর্কে অনেককেই আশাবাদী মনে হল। বেলজিয়মকে নিয়ে মাতামাতির কারণও ছিল। মিড-ফিল্ডে ওডিলন পলেনিসের সুন্দর খেলা এবং পল ভ্যান হিমসের প্রতিভা নিয়ে দ্বিমত ছিল না। কোচ রেমণ্ড গোয়েথালসের প্রশিক্ষণে যুগোশ্লাভিয়া এবং স্পেনের মত শক্তিশালী দলকেও ঘায়েল করে।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা মেক্সিকোয় তারা ঘুণধরা ফুটবল খেলল। এই ফলের জন্য তাদের মধ্যে আগের অসন্তোষও অনেকটা দায়ী। চেকদের মত এরাও ফুটবল বুট সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ছিল। ওলিম্পিকসের সময় দুটি জার্মান বুট প্রস্তুতকারক সংস্থা নিম্নমানের বুট তৈরি করে বাজারে চালায় অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে। তাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থার পত্তন হল। এদিকে বেলজিয়ম দলে তিনটি উপদল ছিল। জুতো ব্যবহার নিয়ে দুটি উপদলকে বিরোধী জুতো প্রস্তুতকারকরা পুরস্কৃত করলেন। তৃতীয় দল অর্থ পেল না। তারা বেশ ক্ষুব্ধ।

উদ্বোধনী খেলা—মেক্সিকো সিটিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার উদ্বোধন হল প্রচণ্ড গরমে দুপুর বেলায়। আজটেক স্টেডিয়ামে মেক্সিকো-রাশিয়ার এই

বিরক্তিকর খেলায় কেউই গোল দিতে পারল না। তবে সামান্য কিছু নাটক ছিল। মেক্সিকো দলে দেখা গেল না তাদের জনপ্রিয় স্ট্রাইকার এনরিক বোর্জাকে। আসলে তিনিও মেক্সিকোর ফুটবল-রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। তার ফলে ইউনিভার্সিডাড থেকে আমেরিকায় বদলী হন, আর এই খেলার সময় অদ্ভুতভাবে তাঁকে সাইড-লাইনে বসে থাকতে দেখা যায়। রাশিয়া তার খ্যাতনামা অধিনায়ক অ্যালবার্ট চেস্টারনিজেভকে নিয়ে দ্রুতলয়ে ফুটবল খেলল। কিন্তু তা বেশিক্ষণ নয়। গরমে নেতিয়ে পড়ায় তারা ফুটবল দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হল সামান্যই। উদ্বোধনী খেলার শুরুর আগে কুচকাওয়াজের সময় ইউনিয়ন জ্যাকের আবির্ভাব বেশ হৈ-চৈ ফেলে দেয়। প্রবল আপত্তিতে কিছুক্ষণের মধ্যে ওই পতাকাটি অদৃশ্য হয়।

মেক্সিকো-রাশিয়ার খেলা অন্য নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম জার্মানীর রেফারি হের সেন্‌চারের ব্যতিব্যস্ততাই ছিল দেখার মতন। ওলিম্পিক টুর্ণামেণ্টের অভিজ্ঞতা যাঁদের ছিল, তাঁরা আবার দেখলেন উদ্যোক্তাদের নির্দেশেই ফিফা রেফারি কমিটিও কেমনভাবে পরিচালিত হয়, কেমনভাবে আগ বাড়িয়ে অতি তৎপরতা দেখান। কমিটির যেন পরোক্ষ নির্দেশ ছিল, যিনি যত রঙীন কার্ড দেখাতে পারবেন, তিনিই তত কুশলী রেফারি। ১৯৬৮-র ফাইনালে দেখা গিয়েছিল ডিয়েগো ডে লিও-র অতি তৎপরতায় খেলাটিই মাটি। সন্দেহ নেই ভাল ও মন্দ দুই ধরনের রেফারি আছেন। রয়েছেন নমনীয় ও কর্তব্যপরায়ণ বা কঠোর রেফারি। তবে হের সেন্‌চার যেন এদিন অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তাঁর কঠোরতা দেখা যায় বেশি মাত্রায় রুশদের প্রতি। তাদের ছোটখাটো দোষও তাঁর চোখ এড়ায়নি। আর মেক্সিকানরা গুরু পাপ করেও লঘু দণ্ড পাননি। আর এজন্য খেলাটিও জৌলুসহীন হয়ে পড়ে। অবশ্য দুই অর্ধেই রুশ গোলরক্ষক কাভাজাসভিলির চমৎকার বল রুখে দেওয়া মেক্সিকানদের আনন্দে বাধা দেয়। খেলা শেষে মেক্সিকো উপলব্ধি করে তাদের মিড-ফিল্ড প্লেয়ার ওনোফ্রে-র অনুপস্থিতি কতটা ক্ষতি করেছে। ওনোফ্রে এই ম্যাচের কয়েকদিন আগে ট্রেনিং-এর সময় পা ভেঙেছিলেন।

পরের মঙ্গলবার অর্থাৎ যেদিন গুয়াদালাজারায় ইংল্যাণ্ড-রোমানিয়ার ম্যাচ ছিল, জার্মান রেফারি হের সেন্‌চার সেদিন নতুন রেফারিং সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন। অবশ্য সে ব্যাখ্যা ছিল তাঁরই মনগড়া। রোমানিয়ার লেফটব্যাক

মোকান্থ ওইদিন অত্যন্ত তিনটি ক্ষমাহীন ও এমন নৃশংস ফাউল করলেন যে, বিপক্ষের খেলোয়াড় পঙ্গু হতে বাধ্য। হাঁটু পর্যন্ত লাফিয়ে ওঠা তাঁর ওই শটে ইংল্যাণ্ডের দুজন খেলোয়াড় খোঁড়াতেও থাকেন। কিন্তু বেলজিয়মের রেফারি এম লোরাক্স ওসব দেখেও দেখলেন না শুধু নয়, ওই খেলোয়াড়ের নামটাও পর্যন্ত টুকলেন না।

দ্বিতীয়ার্ধে জিওফ হার্স্টের বাঁ পায়ে মারা জোরালো শটের গোলে ইংল্যাণ্ড জিতল। মাত্র এক গোল হলেও ইংল্যাণ্ডের জয় নিয়ে কারুর দ্বিমত ছিল না। এদিন দুপুরের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন নিঃসন্দেহে টেরি কুপার। রোমানিয়ার রক্ষণাত্মক খেলাকে তিনি ছিন্নভিন্ন করে দেন দুই ফ্লাঙ্কেই অত্যন্ত সক্রিয়তার সঙ্গে দ্রুত বল নিয়ে।

বিশ্বকাপ ফুটবলের অন্যতম তারকা অ্যালান বল এবারও আপ্রাণ খেললেন। মেক্সিকোর পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিলেও খুশি হতে পারেননি নিজেদের খেলা সম্পর্কে। রোমানিয়ার সঙ্গে খেলা শেষে বললেন, আমি জীবনে কখনও এমন ভয় পাইনি। তা ছাড়া কোনো দল তো আমাদের এত বিপর্যস্ত করেওনি। দুপুরের খেলা নিয়ে আমি প্রতিদিন নানা আশাঙ্কার কথা জানিয়ে বাড়িতে স্ত্রী ও বাবা-মাকে চিঠি লিখেছি। জানিয়েছি, দুপুর বেলাটা আমাদের কাছে মোটেই পয়মন্ত নয়। বাবাকে তো একদিন লিখি : 'আমি সর্বদা জয় সম্পর্কে আশাবাদী হলেও, কেবলই ভয় হচ্ছে এই বুঝি গরমে আমার মৃত্যু হল।' ইংল্যাণ্ড থেকে আগত সাংবাদিকদের জানালেন তিনি—'আমি ওরকম ভয় পাওয়ার ছেলে নই সে তো আপনারা জানেন। কিন্তু সত্যিই সেদিন ভয় পেয়েছিলাম। যখন জিতলাম, মনে হল—এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছি। এ মনোভাব শুধু আমার নয়। শিবিরে ফিরে দেখি সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। কেউ কেউ বললেন, আমরা বড় বাধাটি অতিক্রম করেছি, বাকিগুলো জিততে বেগ পেতে হবে না।'

ব্রাজিলের শুরুটা বেশ ভাল হল। চমৎকার ও দর্শনীয় ফুটবল খেলে তারা জিতল ৪-১ গোলে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে। কৃতিত্ব দেখালেন পেলে, জেয়ারজিনো, গার্সন ও রিভেলিনো। তবে অতীতের মত এবার ব্রাজিলের আক্রমণভাগের মত রক্ষণভাগকে তেমন শক্তিশালী মনে হল না। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার রক্ষণভাগ সে সুযোগ নিতে পারল না। তাই ব্রাজিলের অপেক্ষাকৃত দুর্বল রক্ষণভাগ নিয়ে সেদিন চিন্তার কিছু ছিল না। চেকরা খেলল

'বাস্কেটবল ফুটবল'—একথা বলেন ব্যঙ্গের সুরে অ্যালান বল। ব্রাজিলিয়ানদের পায়ে যে-ই বল পড়েছে, অমনি চেকরা পিছিয়ে গিয়েছে। পিছিয়েছে অন্তত সাতজন। ফলে মাঝমাঠ শূন্য হয়ে যায় এবং সুবিধা হয় ব্রাজিলেরই।

চেক সেণ্টার ফরওয়ার্ড পেত্রাস দ্রুত বল নিয়ে ব্রাজিলের ব্রিটোকে কাটিয়ে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন প্রথমার্ধে। বিরতির আগে তারা আরও একটি সুযোগ পায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রিভেলিনো চমৎকার সোয়ার্ভিং ফ্রি-কিকে ১-১ করলেন। বিরতির ঠিক পরেই পঞ্চাশ গজ দূর থেকে অত্যাশ্চর্য উঁচু শটে পেলে ব্রাজিলের দ্বিতীয় গোলটি করলেন। পেলে বলটি পেয়েছিলেন গার্সনের পাস থেকে। পেলে বুকে বলটি ঠেকিয়েই পরমুহূর্তে ভলিটি মারেন।

চেকদলের বিশ্বকাপ ফাইনালের অন্যতম সেরা তারকা লম্বা কাসনিয়াক বদলী খেলোয়াড় হিসাবে নামলেন। আট বছরের ব্যবধানে তাঁর গতি হ্রাস পেয়েছে। আর এই কারণেই কর্ণার-কিক্ থেকে চমৎকার সুযোগ পেয়েও চেকোশ্লোভাকিয়াকে একটি গোল থেকে বঞ্চিত করলেন। তাঁর ভুলের মাশুল দিতে হল পরক্ষণেই। জেয়ারজিনো বল পেয়ে দ্রুত ছুটে গেলেন ও ৩-১ করলেন। কেউ কেউ বললেন, এটি অফসাইড ছিল। কিন্তু রেফারি, লাইসম্যানরা বললেন: না, গোল সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাদের চতুর্থ ও শেষ গোলটি সম্পর্কে কারুর দ্বিধা ছিল না। শেষ গোলে জেয়ারজিনোর তৎপরতার তুলনা হয় না। দ্রুত দৌড়ের সময় তাঁর অপূর্ব বল নিয়ন্ত্রণ এবং তিনজন ডিফেণ্ডারকে কাটানো বিশ্ব ফুটবলে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। ওঁরা তো একবার মরীয়া হয়ে জেয়ারজিনোকে ফাউলের চেষ্টাও করেন। কিন্তু জেয়ারজিনো অদ্ভুত দক্ষতায় সে বাধাও অতিক্রম করেন।

এবার পেলে যেমন তাঁর খেলার তুঙ্গে, তেমনি মিড-ফিল্ডে গার্সনও। এই গার্সনই যেন প্রথম খেলায় সমগ্র দলকে পরিচালনা করলেন। যেমন তাঁর সময়োচিত পাস বা বল দেওয়া-নেওয়া, তেমনি তাঁর পরিকল্পনা রচনা। সবচেয়ে বড় কথা গার্সন অযথা শক্তিক্ষয় করেন না। অকারণে ছোটাছুটি করেন না। মাঠের ভিতরে যিনি এমন বিচক্ষণ, বাইরে তাঁকে দেখলে খেলোয়াড়ই মনে হয় না। উরু শীর্ণকায়, লোমে ভরা। খেলোয়াড়দের পক্ষে সবচেয়ে নিষিদ্ধ ধূমপান; কিন্তু গার্সনের দিনে অন্তত চল্লিশটি সিগারেট না হলে চলে না।

ব্রাজিলের খেলায় টোস্টাওর অবদান কম ছিল না। তাঁর বল ধরার বিশেষ ক্ষমতা, কিংবা তা নিয়ে গোলের দিকে যাওয়ার সচরাচর তুলনা মেলে না।

কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল, চোখে অস্ত্রোপচার টোস্টাওর খেলার আগের কুশলতা অনেকটা হরণ করে নিয়েছে। আগের সেই শূন্যে বল ধরা এখন আর দেখা যাচ্ছে না। তা হলেও তাঁকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ইংল্যাণ্ডের নেই। ব্রাজিল তাদের দুজনকে দুই ফ্লাঙ্কে মোতায়েন করেছিল একটু বেশি গুরুত্বসহকারে, তবুও ৪-২-৪ পদ্ধতি তেমনভাবে অনুসরণ করছিল না। অন্ততঃ রিভেলিনো ও পেলে মিড-ফিল্ডে যেভাবে সব সময় ব্যস্ত ছিলেন, তা দেখে ওই কথাই স্পষ্ট হল।

এদিকে ডিফেন্সকে বেশ রন্ধ্রযুক্ত দেখা গেল। ফেলিক্স সর্বদাই উঁচু শট করছিলেন। ব্রিটো বেশ ধীর গতির, পিয়াজ্জাও তাই। পিয়াজ্জার উপর ভরসাই রাখা যাচ্ছিল না। জোয়াও সালধানাও ব্রাজিলে এসেছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের মত রইলেন গুয়াদালাজারার হিল্টন হোটেলে। তিনি অভিযুক্ত করলেন ব্রাজিলের মিড-ফিল্ড খেলোয়াড়দের। বললেন, ডিফেণ্ডারদের দোষ দেব কেন? কিন্তু পরের খেলাগুলিতে ব্রাজিল সমালোচনার ঊর্ধ্বে ওঠে। শুরুর দিকে তাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে বা যেসব সমালোচনা হয়েছিল তার অধিকাংশই তাত্ত্বিক। ব্রাজিল সফল হয়েছিল তাদের মিড-ফিল্ড খেলোয়াড়দের নতুন নতুন পরিকল্পনা রচনা দ্বারা। আর ওই সব পরিকল্পনাকে কাজে রূপায়িত করেন আশ্চর্য প্রতিভাধর ফরওয়ার্ড-লাইন।

দুটি বিশ্বকাপে ব্রাজিলের স্ট্রাটেজির মূলে ছিলেন ডিডি। এবার তিনি পেরুর খেলোয়াড়দের সক্রিয় করতে ব্যস্ত। শুরুটা তাদের হতাশা এনে দিল। ব্যথিত করল স্বদেশের দুঃখবহ ঘটনা। কেননা, ক'দিন আগেই ভূমিকম্পে পেরুতে অসংখ্য জীবনহানি ঘটেছে, সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। সুতরাং সন্দেহ নেই প্রত্যেকটি খেলোয়াড় মানসিক বিষাদগ্রস্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই বালগেরিয়ার কাছে তারা দু' গোলে পিছিয়ে পড়ল। বালগেরিয়া ফ্রি-কিকগুলিকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায়। একবার পেরু খেলোয়াড় বদল করে। ডিফেন্সে ক্যাম্পস শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। আক্রমণ-ভাগে আনা হল কৃষ্ণকায় হুগো সটিলকে। পেরু পাল্টা-আক্রমণ শুরু করল। খেলার গতি পরিবর্তন করল কুবিল্লাসের চমৎকার ড্রিবলিং, হেক্টর চুম্পিতাজের পাস এবং সটিল গ্যালার্ডোর দ্রুততা। মিলানের অসফল খেলোয়াড় গ্যালার্ডো এদিন একটি গোল শোধ করলেন ক্রস শটে। চুম্পিতাজ ডান পায়ের ফ্রি-কিকে আর একটি গোল দিলেন। জয়সূচক গোলটি করলেন মিফির্নের পাস থেকে কুবিল্লাস।

পরদিন একই মাঠে মরক্কানরা যেন দারুণ ভয় পাইয়ে দিল পশ্চিম

জার্মানীকে। মরক্কোর খেলোয়াড়রা শুরুর পরে কুড়ি মিনিট আক্রমণের ঝড় বইয়ে দিল। এতে কাটানাকিও পদ্ধতি অবলম্বন করা জার্মানরা কিন্তু ঘাবড়ে যায়নি। শুল্‌জ আবার স্বমূর্তি ধারণ করলেন। তবে হুমেন মরক্কোর গোলটি করতে সমর্থ হন জার্মান খেলোয়াড়দের ভুলেই। হুজেস যখন দুর্বল হেডটি করলেন, তাঁদের গোলরক্ষক শেপ মেয়ার ধরতে পারলেন না, হুমেন ছোঁ দিয়ে বলটি ধরে মেরে দিলেন গোলে।

এই প্রতিযোগিতায় গ্রাবোস্কি প্রথম ও শেষ পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসাবে নামলেন। বলা বাহুল্য ১৯৩৯-এর বিশ্বকাপেই উভয় দল দুজন করে পরিবর্ত খেলোয়াড় নামাবার অনুমতি পেল এবং সেই পরিবর্তন করার সুযোগ মেলে যে কোনো সময়ে। তবে বিধি-নিষেধ ছিল—কেবল আহতদের ক্ষেত্রেই খেলোয়াড় বদল চলবে। উল্লেখ্য, পরে জার্মানরা এই পরিবর্তনের লোভে নিজেরাই নিজেদের 'মৃত্যু' ডেকে আনে। এই খেলায় অর্থাৎ মরক্কোর বিরুদ্ধে হেলমুট শ্যোন প্রথম গ্রাবোস্কিকে কাজে লাগালেন। তাঁর খেটে খেলা ও চমৎকার বল কন্ট্রোল জয়সূচক গোলটির সুযোগ করে দেয়। বোঝা গেল হেলমুট হলারের বদলে তাঁকে নামিয়ে লাভই হয়েছে।

বিরতির পর এগার মিনিট পর্যন্ত জার্মানরা, বিশেষ করে ম্যানেজার শ্যোন প্রতীক্ষায় ছিলেন জিলার ও মূলারের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গোল শোধ দেবে। হলও তাই, মূলারের পাস থেকে জিলার ১-১ করলেন। সমাপ্তির বারো মিনিট আগে গ্রাবোস্কি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ একটি দৌড় দেখালেন বল নিয়ে। অপর উইঙ্গার লোহারের হেড বারে লেগে ফিরে এল। এই বলটি বাড়িয়েছিলেন গ্রাবোস্কিই। কাছেই ছিলেন মূলার। বারের ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা বলে মূলার জোরালো শট করলেন। এবারের বিশ্বকাপে তাঁর দেওয়া দশটি গোলের প্রথমটি হল প্রথম খেলাতেই।

এক নম্বর গ্রুপের দ্বিতীয় খেলায় বেলজিয়মের প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা সহজেই ৩-০ গোলে এল সালভেডরকে হারিয়ে দিল। প্রথম খেলাতেই বোঝা গেল সালভেডর বিশ্বকাপে এসেছে যেন 'পর্যটক' হিসাবেই। ধন্যবাদ মেক্সিকোর উদ্যোক্তাদের, তাঁরা চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলার জন্য সালভেডরকে আপ্যায়নের ক্রটি দেখাননি কখনও। এই খেলায় স্ট্যাণ্ডার্ড লীগে দলের মিড-ফিল্ড খেলোয়াড় শক্ত ও সারা মাঠ বিচরণকারী উইলফ্রায়েড ভ্যান মোয়ই বেলজিয়মের দুটি গোল দিলেন। বাকিটি দেন বার্জেসের শক্তিমান স্ট্রাইকার রাউল লাম্বার্ট।

দুই নম্বরে অর্থাৎ পুয়েবলা-তলুকা গ্রুপে কয়েকটি ভীষণ বিরক্তিকর ম্যাচ হল। উরুগুয়ে ২-০ গোলে জিতল দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বী ইজরায়েলের সঙ্গে। উরুগুয়ের ক্ষতি হল তাদের বেশ ভাল মিড-ফিল্ড ইনসাইড ফরওয়ার্ড পেড্রো রোশা দ্বাদশ মিনিটের সময় নিজের দোষে আহত হওয়ায়। রোশা এই প্রতিযোগিতায় আর খেলতে পারলেন না। শিয়াফিনোর উত্তরাধিকারী এই রোশা থাকলে, হলফ করে বলা যায় উরুগুয়ের স্থান চতুর্থের উপরে থাকত। তিনি ব্রাজিলকে, এমন কি তাদের নড়বড়ে ডিফেন্সেও নাড়া দিতে পারতেন।

ইতালি তিনটি ম্যাচই এমনভাবে সতর্কতার সঙ্গে খেলল যে, গুজবটা সত্যে পরিণত হয়। কারণ শুরুর খেলাগুলোয় হারলে, তাদের জন্য নাকি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। লক্ষ্য ছিল : যেন গোল না খাই। তলুকায় প্রথম ম্যাচে সুইডেনের বিরুদ্ধে একাদশ মিনিটে ডোমেনঘিনির গোলেই তাদের জয় এল। সুইডেনের গোলরক্ষকের উচিত ছিল এই সহজ মারটি ঠেকানো। সুইডিশ-দেরও এই ম্যাচে জেতার পক্ষে তেমন পরিশ্রম করতে হত না। তাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রাইট আউট রজার মাগ্‌নুসনকে তাঁর ক্লাব ওলিম্পিক মার্সাইল দাবি-করা অর্থ না পাওয়ায় ছাড়ল না। তবুও ভরসা ছিল তাঁর চাইতে কুশলী খেলোয়াড় সেণ্টার ফরওয়ার্ড ওভ কিণ্ডভনের উপর। বিশ্বকাপের কিছুদিন আগে এই কিণ্ডভন রটারডামে ইউরোপীয় কাপ ফাইনালে সেলটিকের বিরুদ্ধে দারুণ খেলেন ও তারকা বনে যান। বিশ্বকাপে এসে তিনি একটিও গোল করতে পারলেন না।

রিভাও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। গ্রুপ মাচে ডোমেনঘিনির একটি গোল নিয়েই ইতালিকে সন্তুষ্ট থাকতে হল। উরুগুয়ে ও ইজরায়েলের সঙ্গে বাকি দুটি খেলা আরও নীরস হয় এবং দুটিই গোলশূন্য ড্র। কেন বোঝা গেল না, চার কোটি লিরা (ইতালীয় মুদ্রা) দামের তারকা রিভা তাঁর জাতীয় দলকে সক্রিয় করে তুলতে বাধা দিলেন। সেণ্টার ফরওয়ার্ড রবার্টো বনিন-সেগনা পুরনো ক্লাব ইণ্টারে ফিরে যান বলেই কি ? অত্যন্ত পরিশ্রমী, উৎসাহী এবং বুলেটের মত বাঁ পায়ের শক্তিসম্পন্ন বনিনসেগনার ওই সিরিজে সুযোগ পাওয়াটাও স্ববিরোধী ঘটনা মনে হয়। কেননা, তাঁরই পজিশানে ছিলেন ইতালির সবচেয়ে দামী (৬৬ কোটি ৬০ লক্ষ লিরা) পিয়েত্রো আনাস্তাসি। তবে আশংকা ছিল, আনাস্তাসি যে কোনো সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে পারেন অস্ত্রোপচারের জন্য। কিন্তু মেক্সিকোতে এলেন। তিনি তো আবার

অন্য পজিশনে অপারগ। ডান পায়ে শক্তিমান হলেও লেফট ফ্ল্যাঙ্কে একবার তাঁকে পাঠানো হয়েছিল এবং তাতে মাঝে মাঝে দলের বিপদই বাড়ে। রিভার পরামর্শে তাঁকে মিড-ফিল্ডে স্থান দেওয়া হল। সকলকে রেখে দলের মনোবল বৃদ্ধির নানা প্রয়াস হলেও ইতালির তাতে লাভ হয়নি। গ্রুপের খেলায় রিভেরার আবির্ভাব ঘটল একবারই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে, তাও ডোমেনঘিনির পরিবর্তে।

উরুগুয়ে ভাগ্যের জোরে কোয়ার্টার ফাইনালে উপনীত হল। গ্রুপের শেষ খেলায় সুইডেনের কাছে তারা হারে ১-০ গোলে গ্রানের হেডে। এর আগে ইজরায়েলের সঙ্গে ড্র করে অতিকষ্টে। এমন অসহ্য ফুটবল আর কোনো গ্রুপে দেখা যায়নি। এমন গোলমালও হয়নি কোনো গ্রুপে।

উরুগুয়ে-সুইডেনের খেলার দিন সকালে স্যার স্ট্যানলি রাউসকে পুয়েবলায় দেখা গেল। একটি গুজব শুনে তিনি ব্রাজিলিয়ান রেফারি ডে মোরেসকে বদল করলেন। শোনা গিয়েছিল উরুগুয়েয়ানরা রেফারিকে 'ম্যানেজ' করেছেন ম্যাচ জেতার জন্য। উরুগুয়েয়ানরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। আসলে অমন কিছু হয়নি। তবুও প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে চালাতেই স্যার স্ট্যানলি দ্রুত ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। উপরন্তু ফিফা সভাপতির চাইতে আর কারুরই তো অমন মাথাব্যথা থাকতে পারে না।

এই গুজব সম্পর্কে পরে রেফারিজ কমিটির সভাপতি জানান, তিনি যখন রেফারিদের বিভিন্ন ম্যাচের দায়িত্ব ভাগ করছিলেন, তখনই শুনেছিলেন ব্রাজিলের ডে মোরেসকে নানাভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা হচ্ছে। তাঁকে আরও বলা হয়, মোরেসকে যে দল টাকা দেবে, তিনি তাদের পক্ষ নেবেন। রেফারিজ সভাপতি এসব শুনে বলেন : মোরেস সম্পর্কে ওইসব অভিযোগ বা গুজবে আমি কর্ণপাতই করিনি।

যাইহোক, ম্যাচের দিন সুইডিশ দল পুয়েবলায় পৌছলে গুজব তুঙ্গে ওঠে। সুইডিশ ডেলিগেটের সঙ্গে আলোচনার পর রেফারিজ সভাপতি দেখা করলেন মোরেসের সঙ্গে। খেলার দিন সকাল নটায় এই সাক্ষাৎকার হল। মোরেস তাঁকে জানান, সবচেয়ে ভাল হয় তিনি ম্যাচ পরিচালনা না করলে। কারণ তিনি কঠোরভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে সংশ্লিষ্ট সমর্থকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠতে পারে। এদিকে উরুগুয়ের ডেলিগেটদের প্রধান—সেনর ফার্নাণ্ডেজের অভিযোগের উত্তরে স্যার স্ট্যানলিকে বললেন, তিনি অবাক

হয়েছেন গুজব শুনে যে, তাঁদের স্বার্থের সঙ্গে একজন রেফারিকে জড়ানো হয়েছে।

স্যার স্ট্যানলি উরুগুয়ের নেতাকে বললেন, এই মুহূর্তে রেফারি নিয়োগ-কারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কারণ সকলেই বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যাচ নিয়ে ব্যস্ত। তবুও গুজবের সূত্র অনুসন্ধানের ত্রুটি রইল না।

অনুসন্ধানে রহস্যের উদ্ঘাটন হল না। কেউ কেউ বললেন, ব্রাজিলিয়ান রেফারি ডে মোরেসের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এই গুজব ছড়ানো হয়েছে এবং তা করেছেন তাঁরই কোনো সহকর্মী। বিশ্বকাপ কমিটি অনুসন্ধানের পর দেখলেন রেফারিদের তালিকায় এক ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিকও আছেন। গুজব প্রথম কানে আসে সুইডিশ ব্যবসায়ী বোর লাঁজের কাছে এবং খবরটি দেন অচেনা এক ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিক। পরে সকলেই স্বীকার করেন এই ঘটনার সঙ্গে ডে মোরেসের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি নির্দোষ।

দুই চ্যাম্পিয়ন

ব্রাজিল : ইংল্যাণ্ড— চ্যাম্পিয়ন ইংল্যাণ্ড এবং ১৯৫৮ ও চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে একই গ্রুপে খেলতে হল। ব্রাজিলের লক্ষ্য আর একবার কাপ জিতে সোনার পরী চিরতরে দখল করা। ইংল্যাণ্ড চাইল স্বদেশে জেতায় তাদের সম্পর্কে যে সব বিরূপ সমালোচনা হয়েছে, তার যোগ্য জবাব দেওয়া। মেক্সিকোর পরিবেশ, আবহাওয়া ব্রাজিলের অনুকূলেই ছিল। শুধু আশংকা দেখা দিল তাদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য গার্সনের উরুর আঘাত। অনেকেই ধরে নিলেন, গার্সনের পক্ষে এবার হয়ত কোনো ম্যাচেই খেলা সম্ভব হবে না।

এর আগের দুপুরে রোমানিয়া ২-১ গোলে বিমর্ষ চেকোশ্লোভাকিয়াকে হারায়। চেকদলের পেত্রাসই শুরুতে চমৎকার হেডে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে রোমানিয়া নিজেদের সামলে নিয়ে দ্রুত আক্রমণে ব্যস্ত হয় এবং বিরতির পরে নিগু ১-১ করেন। তারা ২-১ গোলে জেতে সেণ্টার ফরওয়ার্ড ডুমিত্রাশের পেনাল্টিতে। সমর্থ, প্রতিভাবান এই ফ্লোরিয়া ডুমিত্রাশকে তাঁর ম্যানেজার কখনও সুনজরে দেখতেন না, মাঠে সতীর্থদের না খেলিয়ে সর্বদা বল নিজে আঁকড়ে রাখতেন বলে। অনুরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার দায়ে রোমানিয়ার অন্যতম সেরা ফরওয়ার্ড ডবরিণকেও বাদ রাখা হয়।

হাস্যরসিক দৈত্যকায় গোলরক্ষক রাডুকামু বাদ পড়েন শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে। তিনি নাকি হোটেলের সুইমিং-পুলে ক্রোধবশত একজনকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন।

১৯৫৮ সালের মত এবারও ইংল্যাণ্ড শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রচুর অর্থব্যয়ে একটি হোটেল বেছে নিল। গত বছর সফরের সময় গুয়াদালাজারা হিণ্টনে সুইমিং-পুলসহ ইংল্যাণ্ড অনেকটা স্বর্গসুখে ছিল। কিন্তু এখন যে বিভিন্ন দলের সমর্থকরা দলে দলে এসে এই হোটেলে আস্তানা নেবেন বোঝাই গেল না আগেভাগে। আর একদলের সমর্থক মানে তো অন্যদলের বিরোধী।

খেলা যতই এগিয়ে আসতে লাগল, হোটেলে ভিড়ও তার সঙ্গে বাড়ছে। তারপর দিনের পর দিন সুইমিং-পুলের চতুর্দিকে অর্ধনগ্ন নারীপুরুষের ভিড়। তার মাঝে ট্র্যাকসুট পরা ইংল্যাণ্ড খেলোয়াড়দের দেখে মনে হত প্যারোলে মুক্তি-পাওয়া কয়েদীর দল। হোটেলে সব রকম-সুবিধা থাকলেও অত ভিড়ে খেলোয়াড়রা সুইমিং-পুলের সুযোগ নিতে পারলেন না। ব্রাজিলের সঙ্গে খেলার আগের দিন তো ভিড় আরও বাড়ল।

আগের সন্ধ্যায় সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে ইংল্যাণ্ড-বিরোধী 'অগ্রবর্তী বাহিনী' এল হেঁটে, মোটরে ও মোটর সাইকেলে কাতারে কাতারে। তারা নেচে কুদে গান করল, শ্লোগান দিল। শ্লোগান শত শত কণ্ঠে 'ব্রা-জি-ল', 'ব্রা-জি-ল'। এই শ্লোগান যতটা না ব্রাজিলকে উৎসাহিত করার জন্য, তার চাইতে বেশি ইংল্যাণ্ডকে রাগাতে। কেননা, ওই হোটেলে তো ব্রাজিল দলের কেউ ছিলেন না। মোটর ও মোটর সাইকেলগুলি অকারণে হোটেল ঘিরে চক্কর দিতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বাজাতে লাগল ভেঁপু ও গাড়ির হর্ণ। হোটেলের সম্মুখটা ক্রমশ লোকারণ্য হতে থাকে।

ভিড়, চিৎকার, শ্লোগান কমার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত এগোতেও না। বরং ভিড় বেড়েই চলল, তার সঙ্গে গোলমালও। স্পষ্ট বোঝা গেল, তারা ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের বিরক্ত করতে চায়। এতে ওরা সফলও হল। মাঝরাতে খেলোয়াড়দের কেউ কেউ ঘর বদল করলেন; কেউ বা খবর দিলেন পুলিশকে। পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিল না। অথচ এর আগে দেখা গেছে মেক্সিকোর পুলিশ জনতা হঠাতে বা ছত্রভঙ্গ করতে বেশ নিষ্ঠুর হয়। এবার শুধু হোটেলের প্রধান ফটকে কয়েকজন রক্ষী মোতায়েনের দ্বারাই কর্তব্য শেষ করল। এই রক্ষীদের প্রতি যখন জনতা

ইষ্টক বর্ষণ শুরু করে, তখন তারা চুপ করে থেকে থানায় ফিরে যায়। তারা বলে গেল, 'আমরা থাকতেই এই গোলমাল হচ্ছে। চলে গেলে সব থেমে যাবে।' কোনো খেলোয়াড়ই সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। দিনে কঠোর অনুশীলন, রাত্রে জাগা এবং পরদিন প্রচণ্ড গরমে খেলা। ক্লান্ত ইংল্যাণ্ড হাতে-নাতে ফল পেল। তাদের হার হল ব্রাজিলের কাছে।

রামসে এই ম্যাচে একটিই পরিবর্তন ঘটালেন। মুলারির উপর আবার দায়িত্ব বর্তাল, তিনি শুধু গোলের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। এভার্টনের পরাক্রমশালী ডিফেণ্ডার ব্রায়ান লেবনে স্টপার। রাইট-ব্যাকে কিথ নিউটনকে রাখা হলেও পরে এভার্টনের টোমি রাইটকে আনা হয়। রামসে রাইটকে সতর্ক করে বললেন, তোমার কাজ ব্রাজিলের পাউলো সিজারকে পাহারা দেওয়া। সে তোমাকে যে কোনো সময়ে অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে। গার্সনের বদলী হিসাবে তাকে নামানো হয়েছিল ডিপ পজিশন থেকে এগিয়ে খেলার জন্য। এতে সুবিধা হয় মিড-ফিল্ডে রিভেলিনো ও রাইট হাফ ক্লোডোয়াল্ডোর।

ববি চার্লটন ব্রাজিলিয়ানদের সম্পর্কে সতর্ক করলেন সতীর্থদের, কিছুতেই আঠার গজ বক্সের মধ্যে আসতে দিও না। ওরা ওর মধ্যে ঢুকলেই গোল দেবে। অবশ্য চার্লটন নিজেও ওই এলাকায় ঢুকলে ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে পড়েন। তিনি রোমানিয়ার বিরুদ্ধে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেনও। মাঝমাঠের এই 'রাজার' জায়গায় এক বছর আগে কলিন বেলের আসার আশা করেছিলেন অনেকে। এবার বেল দুটি ম্যাচে চার্লটনের পরিবর্ত হয়ে নামলেও আগের খেলা দেখা গেল না। দর্শন মিলল না তাঁর সারা মাঠ বিচরণের ও স্ট্যামিনার। বেলের প্রতিভা সম্পর্কে দ্বিমত নেই, কিন্তু তরুণ চার্লটনের মত তিনি লাজুক স্বভাবের। তাঁর মেজাজ, বড় ম্যাচে দুঃসাহস নিয়ে খেলা বড় খেলোয়াড়েরই পরিচয় বহন করছিল। তবে মেক্সিকোয় তিনি ও ফ্রান্সিস লি সকলকে হতাশ করলেন।

গ্রুপে ব্রাজিল-ইংল্যাণ্ডের খেলা সম্পর্কে অনেকেই মন্তব্য করলেন, এটাই আসল ফাইনাল। ইংল্যাণ্ড খেলেছে প্রকৃত রানার্স আপের মত এবং নিঃসন্দেহে বলতে হবে সাহসিকতা, লড়াই করার ক্ষমতা ইত্যাদিতে ইতালি অপেক্ষা ব্রাজিল অনেক অনেক উঁচুতে ছিল। সন্দেহ নেই গার্সনের অনুপস্থিতি ব্রাজিলকে দাগা দিয়েছে ক্ষণে ক্ষণে, আবার ইংল্যাণ্ড কয়েকটি চমৎকার সুযোগ পেয়েছে। দশম মিনিটে পেলে যে চমৎকার হেডটি করেন, গর্ডন ব্যাঙ্কস ছাড়া

কারুর পক্ষে তা রোখা সম্ভব ছিল না। এদিকে জেয়ারজিনো বল নিয়ে যেভাবে পদচারণা করছিলেন, তা কুপারের পক্ষে আটকানো সম্ভব ছিল না। জেয়ারজিনো রোমানিয়াকেও ছত্রখান করেছিলেন। গ্যারিঞ্চা, জুলিনোর মতই লাইন বরাবর এগিয়ে একটি চমৎকার সেণ্টার করেন ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে এই ম্যাচে। পেলে ওই বলে হেড দিয়ে বাঁদিকের পোস্ট ঘেঁষে বল নিখুঁত ভাবে গোলে পাঠালেন তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে 'গোল' চিৎকার করে উঠলেন। কিন্তু ব্যাঙ্কস রয়েছেন ওখানে। জিমন্যাস্টের মত লাফিয়ে উঠে বলটি বারের উপর দিয়ে বাইরে পাঠালেন অপূর্ব তৎপরতায়। তাঁর ওই লাফকে কেউ কেউ তুলনা করলেন মাছ যেমন জলের উপর হঠাৎ লাফ দেয়, তার সঙ্গেই। পেলে, এই গোলটি না হওয়ায়, পরে আফশোস করে বলেন: আমি ব্যর্থ হয়েছি।

শুষ্ক, আটানব্বই ডিগ্রি গরমে খেলোয়াড়দের সসেমিরা অবস্থা। সোডিয়াম ট্যাবলেটও কোনো কাজে লাগছে না। ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি খেলোয়াড়ের ওজন কমল অন্তত দশ পাউণ্ড করে। দলের চিকিৎসক বললেন: আমেরিকান আর্মি ডাক্তারদের ম্যানুয়ালে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে, খবরদার তাপ থার্মোমিটারে পঁচাশি ডিগ্রির উপরে উঠলে যেন কাউকে ট্রেনিং দেওয়া না হয়। বিশ্বকাপ কমিটিকে এসব কিছুই বোঝানো গেল না। ইউরোপীয় টেলিভিশনের স্বার্থে ভরদুপুরে খেলা অব্যাহত রইল।

ইংল্যাণ্ড উভয় অর্ধেই কতকগুলি ভাল সুযোগ নষ্ট করে। প্রথমার্ধে জিওফ হার্স্ট ব্রাজিলের রক্ষণভাগকে কাটিয়েও গোলে শট মারেননি, তিনি অফ-সাইডে রয়েছেন এই আশঙ্কায়। টোমি রাইটের রাইট ক্রসপাস ফ্রান্সিস লি ধরে মারলেই গোল হত। কিন্তু তাঁর হেড সোজা গিয়ে পড়ল ব্রাজিলের গোলরক্ষক ফেলিক্সের হাতে। ফেলিক্সকে বেশ নড়বড়ে মনে হলেও ইংল্যাণ্ড সে সুযোগ নিতে পারেনি। তারা ওঁর প্রতি চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। শেষের দিকে রামসে জেফ অ্যাসলে-কে নামালেন শূন্যের বলগুলিতে তাঁর শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য। চার্লটনের বদলে নামলেন বেল। অ্যাসলে বারংবার ব্যর্থ হলেন, কিন্তু এক সময় তিনি ব্রাজিলকে বেশ সমস্যায় ফেলেন। তবে ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ড ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়েছে। এই গোলটি আসে বিরতির পরে চতুর্দশ মিনিটে টোস্টাও-এর পরিকল্পনা থেকে। বাঁদিক থেকে দারুণ ড্রিবলিং করে এগিয়ে ইংল্যাণ্ডের রক্ষণভাগ অতিক্রম করেন। ববি মুর

তাঁকে ধাক্কা দিলেও টোস্টাও দমেননি। গোলমুখে বল বাড়ালেন পেলেকে। পেলে দেখলেন সামনে প্রহরা, প্রহরা তাঁর বামেও। ডাইনে একটু মুক্ত জেয়ারজিনো। জেয়ারজিনো সঙ্গে সঙ্গে ১-০ করলেন।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে অ্যাসলে একটি বল হেড করে পাঠালেন অ্যালান বলকে, কিন্তু গোলের কাছে দাঁড়িয়েও তিনি সুযোগ নিতে পারলেন না। ব্যর্থ হলেন অ্যাসলে নিজেও। ব্রাজিলের ঘাবড়ে যাওয়া এক ডিফেণ্ডার সোজা বল পাঠালেন অ্যাসলের পায়ে। অ্যাসলে সেটি মারলেন বারের উপর দিয়ে। অ্যালান বলও একবার ওঁর পুনরাবৃত্তি করলেন। ইংল্যাণ্ড আর ব্রাজিলকে আটকাতে পারল না। তবে দর্শকরা মুগ্ধ হলেন তুল্যমূল্য খেলায়, তাঁরা প্রতিমুহূর্তে দেখেছেন উভয় দলের উত্থান ও পতন। চমৎকার রেফারিং করলেন ইজরায়েলের আব্রাহাম ক্লিন। ইংল্যাণ্ডের রক্ষণভাগে এদিন মুলারি চমৎকার-ভাবে যোঝেন পেলের সঙ্গে। মুলারি একবছর আগে রিও-তে এমনিই খেলেছিলেন। পরদিন সকালে হোটেলের সুইমিং-পুলের ধারে অ্যালান বল আলোচনাকালে সতীর্থদের জিজ্ঞাসা করলেন : অন্য সকলের কথা বাদই দিচ্ছি, কিন্তু জেফ (জিওফ হার্স্ট) কি করে ভাবল সে অফসাইড হয়ে আছে ?

কোয়ার্টার ফাইনালের দিকে—এক নম্বর গ্রুপে রাশিয়া হঠাৎ জ্বলে উঠল যেন এবং সকলকে অবাক করে বেলজিয়মের বিরুদ্ধে ৪-১ গোলে জিতল। দুটি করে গোল করলেন ডায়নামো কিয়েভ—স্ট্রাইকার বাইশোভেটস। এদিন রুশদের মাঝমাঠে চমৎকার খেললেন আর এক কিয়েভ খেলোয়াড়—মুন্তিজান। মুন্তিজান পরিশ্রমী তো বটেই, এদিন তাঁকে বেশ খুশি-খুশিও মনে হচ্ছিল খেলার আগে।

এর পরে মেক্সিকো ৪-০ গোলে এল সালভেডরকে হারায়। তবে মেক্সিকোর প্রথম গোলটি এসেছিল রেফারির অমার্জনীয় ভুলে। কেউ কেউ তাই বেলজিয়মের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর ১-০ জয় দেখে মন্তব্য করলেন, এটিও রেফারির অবদান বলার হেতুও ছিল। মেক্সিকোর সঙ্গে এল সালভেডর সূচনাটা ভালই করেছিল। নবম মিনিটে তাদের রডরিগুয়েজের একটি শট পোস্টে ধাক্কা খায়। একই ভাবে ব্যর্থ হন কালডেরন উপর্যুপরি। বিরতির কয়েক মিনিট আগে মিশরীর রেফারি হোসেন কানডিল সালভেডরের বিরুদ্ধে ফ্রি-কিক্ দিলেন। পেরেজ কিক্‌টি আলতো করে পাঠালেন পাডিল্লার কাছে। পাডিল্লা সেণ্টার করতেই ভালডিভিয়া গোল দেন। সালভেডর খেলোয়াড়রা এই

ফ্রি-কিক্ নিয়ে তর্ক করলেন, কাঁদলেন, মাঠে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি ফ্রি-কিকের সিদ্ধান্তে অদ্ভুতভাবে অটল রইলেন। হতাশ সালভেডরের বিরুদ্ধে মেক্সিকো আরও তিনটি গোল দিল। একজন দর্শক মেক্সিকোর এই জয় নিয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এর আগে এখানে দু'বছর আগে ওলিম্পিক ফুটবলের সময় এই ধরনের একটি ঘটনা হয়েছিল। দুজন দর্শক বলেছিলেন, তাদের দেশ (মেক্সিকো) চ্যাম্পিয়ান হতে পারবে না। ওঁদের দুজনকেই ছুরিকাঘাতে খুন করা হয়েছিল। আসামী ছিলেন বিশ্বকাপের সময়ের মতই এক উগ্র দেশপ্রেমী মেক্সিকান। ওদের মৃত্যুর পর খুনীটি অনুশোচনা করে বলে: ওরা ঠিকই বলেছিল। খামোকাই মারলাম ওদের। মেক্সিকো হেরেছিল।

অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে মেক্সিকো-বেলজিয়াম খেলায় এক লক্ষ বারো হাজার দর্শক এলেন। এদিনও একটি 'গোলমেলে' গোল হল এবং খেলার নিষ্পত্তিও হয় এই গোলেই। মেক্সিকোর ভালডিভিয়া ছুটতে গিয়ে বেলজিয়মের এক ডিফেণ্ডারের পায়ের উপর পড়তেই আর্জেন্টিনার রেফারি সেনোর কোয়েরেজ্জা পেনাল্টির নির্দেশ দিলেন। বেলজিয়মের খেলোয়াড়রা দু' মিনিট ধরে প্রতিবাদ জানালেন। পেনাল্টি কিক্ করলেন ও গোল হল। তারপর মেক্সিকো এদিন অতিকষ্টে ম্যাচ বাঁচায়। বেলজিয়মের ম্যানেজার গেঠালস্ পরে পেনাল্টি সম্পর্কে বললেন: রেফারির এমন সিদ্ধান্ত আমি কখনও দেখিনি, দেখিনি এমন ধরনের অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ দর্শক।

দীর্ঘকালের বিশ্বকাপ ইতিহাসে মেক্সিকো এই প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে গেল। এই গ্রুপের আর একটি খেলায় রাশিয়া ২-০ গোলে হারাল এল সালভেডরকে।

লিঁয় গ্রুপে পেরু কুবিল্লাসের পা থেকে একাধিক গোল পেয়ে ৩-০ গোলে হারাল মরক্কোকে। পশ্চিম জার্মানীও ৫-২ গোলে নাস্তানাবুদ করল বাল-গেরিয়াকে। মুলার দিলেন তিনটি এবং এর একটি পেনাল্টি থেকে। চতুর্থবার বিশ্বকাপে এসে কার্ল হৈঞ্জ স্নেলিঞ্জার উয়ে জিলারের মতই খেললেন।

তিন নম্বর গ্রুপে ব্রাজিলের জয় সম্পর্কে দ্বিধা ছিল না। তেমনি বোঝা গেল, ইংল্যাণ্ডকেও বিরত রাখা যাবে না কোয়ার্টার ফাইনালে উপনীত হওয়া থেকে। রোমানিয়ার বিরুদ্ধে ব্রাজিল দুর্বল দল পাঠাল। পিয়াজ্জাকে দেওয়া হল মাঝমাঠে। ব্রাজিল জিতল ৩-২ গোলে। পেলে দুটি সুযোগ কাজে লাগান।

বাকিটি জেয়ারজিনোর। পাওলো সিজার দেখালেন উইঙ্গারহীন ইংল্যাণ্ড যা পারে না, ব্রাজিল তা পারে। তিনি বল নিয়ে সোজা লাইন বরাবর ছুটে বল পিছনে পাঠাতে থাকেন। রোমানিয়াকে শুরুতে নিষ্প্রভ মনে হলেও তারা 'ব্রাইট ফুটবল' খেলল। বিরতির আগে ডুমিত্রাশের গোল ব্রাজিল রক্ষণভাগের মধ্যাঞ্চলকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। সমাপ্তির সামান্য আগে ডেমব্রভ্স্কির হেড থেকে তাদের দ্বিতীয় গোলটি হল। ব্রাজিলের ফেলিক্সকে আবার নড়বড়ে মনে হয়, তারা কোনোক্রমে ম্যাচ বাঁচালো।

আশ্চর্য, পরদিন ইংল্যাণ্ড আরও দুর্বল। কেন তারা একদল 'রিজার্ভ'কে নামালো বোঝা গেল না। আর এই ভুলের জন্য চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে বাঁচার জন্য সারাক্ষণ সংগ্রাম করতে হল। কিথ নিউটন লক্ষ্য করলেন, চেকরা পুরো ম্যাচটাতেই প্রচণ্ড পরিশ্রম করছে, ক্ষণিকের জন্যও তাদের দৌড় থামেনি। চেকরা এদিন যা খেলল, তাতে আগের দুর্বলতা ঢাকা পড়ে গেল। বিরতির সামান্য পরে অ্যালান ক্লার্কের পেনাল্টি শটে খেলার নিষ্পত্তি হল। কিন্তু এখানেও রেফারির ওই পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনার অন্ত রইল না। এই ফরাসী রেফারি এম মাচিঁ অবশ্য রহস্যপূর্ণ একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন পরে। চেকদলের কুনা যখন ইংল্যাণ্ডের বেলকে ট্যাক্ল করেন, তখন বেল বলের উপর পড়ে গিয়ে বলে হাত দেন। এটাই ছিল ঘটনা। রেফারি মাচিঁ বলেন, তিনি পেনাল্টি দিয়েছিলেন 'ট্রিপিং'-এর অভিযোগে। এদিন ডিফেন্সে জ্যাকি চার্লটন মোটেই সক্রিয়তা দেখাতে পারেননি। সন্দেহ নেই অ্যাসলে শূন্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু গ্রাউণ্ডে ব্যর্থ। ভুল করেছিলেন রামসে। তাঁর বোঝা উচিত ছিল চেকোশ্লোভাকিয়া ও ব্রাজিলের একই ধরনের রক্ষণভাগ নয়। ইংল্যাণ্ডের খেলা দেখে তাঁদের গোঁড়া সমর্থকরাও বিরক্ত হলেন। একবার তো চেকরা ড্র-র আয়োজনও করে ফেলেছিল। তাদের রাইট ব্যাক ডোবিয়াসের একটি শট ব্যাঙ্কসকে পরাস্ত করে বারে ধাক্কা খায়। ইংল্যাণ্ডের অ্যালান বলও অনুরূপভাবে গোল থেকে বঞ্চিত হন।

কোয়ার্টার ফাইনাল

কোয়ার্টার ফাইনালের ড্র হওয়ার পর দেখা গেল, খেলা পড়েছে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের লিঁয়তে। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে পেরুর গুয়াদালাজারায়। ইতালির সঙ্গে মেক্সিকোর তলুকার উঁচু অঞ্চলে। আর মেক্সিকো সিটিতে খেলা

পড়ল উরুগুয়ে বনাম রাশিয়ার। মেক্সিকো সিটিতে উদ্যোক্তা দেশের খেলা দেওয়া হল না। আনন্দের আতিশয্যে তারা অঘটন ঘটাতে পারে—এই আশঙ্কায়। মনে আছে, আট বছর আগে সান্টিয়াগোয় সমর্থকদের আনন্দের কথা ?

ইতালি ঃ মেক্সিকো—মেক্সিকানদের অতি আশা দ্রুত বিলীন হয়ে গেল। ইতালি ও রিভার মূর্তরূপ প্রকাশ পেল এবার। ইতালির প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা এদিন তাঁদের তূণ থেকে বজ্রসম শরগুলি নিক্ষেপ করে করে অবিন্যস্ত ও দুর্বল মেক্সিকান বাহিনীকে পরাস্ত করলেন। রিভা দুটি গোল দিলেও, দিনটি ছিল গিয়ানি রিভেরার। ভালকারেগি অনেক চিন্তার পর মাজোলা ও রিভেরার মধ্যে সমঝোতা করে প্রথমার্ধে মাজোলাকে ও দ্বিতীয়ার্ধে রিভেরাকে নামালেন। রিভেরার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ইতালির খেলার আদল পাল্টে যায়। বিরতি পর্যন্ত ফল ছিল ১-১। গঞ্জালেজ মেক্সিকোকে মরীচিকা দেখান দ্বাদশ মিনিটে একটি গোল দিয়ে। ওটি শোধ হয় ডোমেনঘিনির শটে। বিরতির পর ম্যাচটি রিভেরা নিজের মুঠোয় নিয়ে গেলেন। হ্রস্বকায় পিচ্ছিও ডে সিষ্টির কাছ থেকে চমৎকার পাস পেয়ে রিভেরা সেটি ক্রশ করে পাঠান রিভাকে। রিভা দুজন ডিফেণ্ডারকে অতিক্রমের পর গোলে মারলে কালডেরণ সেটি ধরতে পারেননি। পরের শটটি ডোমেনঘিনির। মেক্সিকান গোলরক্ষক ওটি আটকালেও রিভেরার রিবাউণ্ড কালডেরণ ধরতে পারলেন না। এর পর রিভেরা দারুণভাবে বল বাড়ালেন রিভার কাছে, তিনি চতুর্থ গোলটি দিলেন। সুতরাং মেক্সিকো সিটিতে জনতার 'দাঙ্গা' বা আনন্দের আতিশয্যের সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল।

উরুগুয়ে ঃ রাশিয়া—অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে 'গোলমেলে' গোলের জন্য উরুগুয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল, যখন উরুগুয়ে ১-০ গোলে রাশিয়াকে হারাল অতিরিক্ত সময়ের অন্তিম মুহূর্তে। হ্রস্বকায় ও কৃষ্ণকায় উরুগুয়েয়ান রাইট উইঙ্গার কুবিল্লা বলটি টেনে এনেছিলেন পিছনে, তখনই মনে হয়েছিল বল গোল-লাইন অতিক্রম করেছে। কিন্তু রেফারি বা লাইন্সম্যানের কেউ রা কাড়লেন না। তাই এস্পারাগোর গোল দেওয়া পর্যন্ত উরুগুয়ের জয় অপেক্ষা করল। রুশ দল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে পরাজয় বরণ করল। 'জিতবই' এই প্রতিশ্রুতি তারা রাখতে পারল না। বিদায় নিল বিশ্বকাপ থেকে। এদিন আবার তাদের আক্রমণভাগে দুর্বলতা প্রকাশিত হয়। তাদের গোটা খেলায় ঝিমুনি পরিলক্ষিত হল। নিশ্চয়ই পরাজয়ের অন্যতম কারণ এটি।

বরং কৃতিত্ব উরুগুয়েয়ানদের। আজ তারা শুধু জিতেছে বলেই নয়, জিতল রোশা ছাড়াই। সুতরাং ওদের সাবাশ জানাতে হয় বৈকি! তবে অভিজ্ঞ কুবিল্লা ছিলেন। তরুণ সেণ্টার হাফ আনচেটা এবং মাজুরকিউইজ তৃতীয়বার বিশ্বকাপে খেলতে এসে দারুণভাবে গোলরক্ষা করলেন।

ব্রাজিল : পেরু—গুয়াদালাজারায় ব্রাজিলই দর্শকদের কাছে ফেভারিট তো বটেই, এ যেন তাদের নিজেদের দল। ব্রাজিলকে ঘিরে খেলার আগে তাদের হুল্লোড় তো তাই প্রমাণ করল। ব্রাজিলের কাছে পেরু হারলেও দর্শনীয় ম্যাচ হল, দুই দলই চমৎকার খেলল। উভয়ের আক্রমণভাগের খেলা সকলকে মুগ্ধ করল, কিন্তু গোল দিচ্ছিল দুটি দল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। গ্রুপের শেষ খেলার পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে পেরুর ডিফেন্স যেমন অ্যাটাকের চাইতে দুর্বল ছিল, এদিন তেমনটি দেখা গেল না। কাটানাকিও পদ্ধতি অবলম্বিত হলেও জার্মানদের মত পেরু কোয়ার্টার ফাইনালে দুই উইঙ্গারের খেলায় ভীষণ গুরুত্ব দিল। ওরা লুবিডা, গ্রাবোস্কি এবং লোহারকে ফ্লাঙ্কে ছড়িয়ে রেখেছিল। আর মূলারকে মাঝে মাঝে মাঝমাঠে কাজে লাগিয়েছিল। কিন্তু তাঁকে সুযোগ করে দেয় শুধু গোল করার। মূলার পেরুর বিরুদ্ধে গ্রুপের ওই খেলায় তিনটি গোল দিয়ে সতীর্থদের সহযোগিতার যোগ্য মর্যাদা দেন। অথচ কম উচ্চতার জন্য তাঁকে বিপক্ষের রক্ষণভাগে গিয়ে বহু অসুবিধায় পড়া স্বাভাবিক। তবুও মূলারকে উঁচু বলগুলি সুন্দরভাবে খেলতে পারদর্শী মনে হয়েছে। আবার এই মূলারই, যখন ০-০ ছিল পেরু ও জার্মানীর ফল, তখনই বেকেনবাউয়েরের কাছ থেকে বল পেয়ে গোল দিতে অসমর্থ হন। বেকেন-বাউয়ের ফ্রি-কিক্ লব করে অরক্ষিত মূলারকে পাঠিয়েছিলেন। পেরু সেদিন গোল দিয়েছিল বিরতির ঠিক আগের মুহূর্তে। দ্বিতীয়ার্ধে তারা বেশ খেলে, যখন জার্মানরা উচ্চতা ও উত্তাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। পেরুভিয়ানরা স্বদেশীয় অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে জার্মানদের রুখে দিলেও গোলের ব্যবধান আর কমাতে পারেনি অর্থাৎ জার্মানদের জয় হয় ৩-১ গোলে।

কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে পেরু যেমন কুশলতা, তেমনি গতির আধিক্য দেখাল। কিন্তু জয়ের আলোর সন্ধান মিলল না ওই খেলায়। ব্রাজিলে পুনরায় এলেন গার্সন। রিভেলিনো রইলেন তীব্র বাঁ-পায়ী শট ও ভারতের প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ ম্যানেকশর মত গোঁফ নিয়ে। মাঝমাঠে গার্সন আর রিভেলিনো নিজের জমিতে তো বটেই, প্রয়োজনে গার্সনের জায়গাও

দখল করতে লাগলেন। পেরু কৃষ্ণকায় উইঙ্গার বেলনকে নামালো। শুরুতে তাঁর সম্পর্কে অনেক আশা ছিল। এদিকে ব্রাজিল আহত এভারাল্ডোর জায়গায় আনল মার্কো অ্যান্টানিয়োকে। বেলনকে তিনি পদে পদে রুখতে লাগলেন। ব্রাজিলের রাইট উইং-এ সুদেহী জেয়ারজিনো অসুস্থ থাকলেও টোস্টাও-এর পাস থেকে দলের চতুর্থ ও শেষ গোলটি আসে তাঁরই পা থেকে। তবে গ্রুপ ম্যাচের মত তেমন শক্তির পরিচয় এদিন তাঁর খেলায় মেলেনি।

শুরুর দ্বাদশ মিনিটে ব্রাজিল অতি দ্রুত এগিয়ে প্রথম গোলটি করে। পেরুর ক্যাম্পস বুকে বল ঠেকিয়ে মাটিতে ফেলতে গেলে বল পিছনে চলে যায় টোস্টাওর কাছে। তিনি রিভেলিনোকে বাড়াতেই, রিভেলিনো বাঁ পায়ের জোরালো শটে ২-০ করেন। এবার টোস্টাও তাঁর খেলার সব কৌশল প্রয়োগের জন্য বিচরণে ব্যস্ত। বিপক্ষকে নড়বড়ে দেখে এবার তিনিও বাঁ পায়ে পেরুর গোলরক্ষক রুবিনোসকে পরাস্ত করলেন।

পেরু গোল খেয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও আধঘণ্টার মধ্যে সামলে ওঠে ব্রাজিল-গোলরক্ষক ফেলিক্সের ভুলে। বাঁদিক থেকে মারা গ্যালার্ডোর লং স্পিনিং ক্রস শটটি ফেলিক্স বুঝতেই পারেননি। এতে কিছু ইতরবিশেষ হল না। বিরতির ঠিক পরেই পেলের লম্বা শট টোস্টাওর কাছে পৌঁছতেই আর একটি গোল দিলেন তিনি। পেরুও যেন জবাব দিতে প্রস্তুত। বেলনের বদলী সটিল এমন সট মারলেন যে, ব্রিটো ক্লিয়ার করতে অসমর্থ হলেন। কুবিল্লাস কুড়ি গজ দূর থেকে ড্রাইভিং দ্বারা ফেলিক্সকে পরাস্ত (৩-২) করলেন। তারপর ব্রাজিলের চতুর্থ গোলটি করলেন জেয়ারজিনো।

পশ্চিম জার্মানী ঃ ইংল্যাণ্ড—লিঁয়তে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের পরাজয় সম্পর্কে দুষ্টলোকেরা রটান, গর্ডন ব্যাঙ্কস যখনই এক বোতল বীয়ার পান করলেন, অমনি ইংল্যাণ্ডের পরাজয় এগিয়ে এল। সারা সফরে ব্যাঙ্কসের সতীর্থেরা রসিকতা করে তাঁকে বলতেন, 'বিশ্বের সেরা গোলরক্ষক তুই।' আসলে তাঁদের রসিকতায় একটুও ভুল ছিল না। ম্যাচের আগের দিন অর্থাৎ শনিবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরদিন—রবিবার সকালে দেখা গেল লিঁয় হোটেলের উঠোনে তিনি রোদ পোহাচ্ছেন। তারপর তিনি ইংল্যাণ্ড দলের চিকিৎসক ডাঃ নিল ফিলিপসের কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটে হোটেলের ভিতরে এলেন। সুতরাং গর্ডন ব্যাঙ্কসের খেলার কোনো আশাই রইল না। বলতে

হয়, তাঁর বদলে যেই এলেন পিটার বনেট্টি, অমনি ম্যাচও চলে গেল পশ্চিম জার্মানীর দখলে। ইংল্যাণ্ড হারল কেন? আগের আগের বিশ্বকাপে জিওফ হার্স্টের গোল বাতিল নিয়ে গোলমেলে কোনো ব্যাপার তো ছিল না! না, এবার পরাজয়ের জন্য দায়ী রামসে নির্দেশিত ট্যাকটিক্স? কিংবা বনেট্টির চঞ্চলতা? আলফ, রামসে কী নিজেকে দায়িত্বমুক্ত করতে পারেন এই কথা বলে যে, গর্ডন ব্যাঙ্কস থাকলেই ইংল্যাণ্ড জিতত? না, বদলী খেলোয়াড় বাছাইয়ে তাঁর মারাত্মক ভুল হয়েছিল? যে সমালোচনা বা যে প্রশ্নই উঠুক, এটা স্বীকার করতেই হবে, সমাপ্তির চল্লিশ মিনিট আগে ইংল্যাণ্ড ২-০ গোলে এগিয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে তারা হারে ৩-২ গোলে।

এই ম্যাচটি নানাকারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশ্বকাপ ফাইনালে এই দু'দল ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী। এই প্রথম ইংল্যাণ্ডকে তারা হারাল। ১৯০১ সালে যখন প্রথম একটি জার্মান দল ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়েছিল, তাদের পরাজয় শুরু হয় তখন এবং তা এবারের বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অবশ্য এর আগে মাত্র একবার মে মাসে হ্যানোভারে পশ্চিম জার্মানী ১-০ গোলে ইংল্যাণ্ডকে হারালেও জার্মানরা সেই জয়কে জয় বলে মনে করতেন না। সন্দেহ নেই ইংল্যাণ্ড তুলনামূলকভাবে তখন হীনবল ছিল, তাদের মান নেমে গিয়েছিল এবং খেলে অত্যন্ত হতাশকর ফুটবল। সাতষট্টি বছর পর এই জয়কে জার্মানীর নিশ্চয়ই জয় বলেই গণ্য করা উচিত।

এর বিশ্বকাপে পশ্চিম জার্মানীকে ফেভারিট মনে করার পক্ষে অনেক যুক্তি ছিল। যদিও মরক্কোর সঙ্গে তাঁদের সূচনাটা তেমন শুভ হয়নি, তবুও বালগেরিয়া ও পেরুকে তারা বিপর্যস্ত করেছিল। বাঁ পায়ের দারুণ পাসে উলফ্যাঙ্গ ওভারাথ যেমন, তেমনি জিলার ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বেকেনবাউয়েরের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, তদুপরি মুলার—এসব নিয়ে জার্মানরা তো দুর্ধর্ষ। উইঙ্গাররাও যেমন দ্রুত, তেমনি বিপজ্জনক। প্রত্যেকের মাথায় আবার নব নব পরিকল্পনা। জার্মানদের সূচনায় ইংল্যাণ্ড এক জোড়া গোল দিয়েছিল। আর হীনবল হলেও চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে দারুণ খেলে। ইংল্যাণ্ডের ৪-৪-২ খেলাকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ম্যানেজার ও ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন লেফট-হাফ জো মার্সার 'ক্রুয়েল্টি টু সেণ্টার ফরওয়ার্ডস' আখ্যাত করেন। এই প্রকরণে ইংল্যাণ্ড দল না ছিল সক্রিয়, না পেয়েছিল উৎসাহ। রোমানিয়ার অধিনায়ক মির্সি লুসেসকু আজীবন ইংল্যাণ্ডের ভীষণ সমর্থক। ব্রিটিশ ফুটবল খারাপ—

একথা তাঁর চিন্তায় স্থান পেত না। ঠিক এদেশে 'বাঙাল' ও 'ঘটি'দের ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে সমর্থনের মত। এমনি ধরনের মিসি লুসেসকুও ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে মন্তব্য করলেন : ওরা ভাল ফুটবল খেলতে আসেনি। এসেছিল—যেন-তেন প্রকারে বিশ্বকাপ দখলে রাখা যায় কিনা এই উদ্দেশ্যে।

ইংল্যাণ্ডের সিনিয়র খেলোয়াড়দের মধ্যে সলাপরামর্শের অন্ত ছিল না। কেউ কেউ বললেন, ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আমাদের আরও সক্রিয় নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল। লি-কে পিছনে নিয়ে তার ধারে হার্স্টকে রাখা হল। তবে রামসের উচিত হয়নি ৪-৪-২ পদ্ধতি অবলম্বন করা। এতে উইঙ্গারদের এগিয়ে যাওয়ার শূন্যস্থান পূরণ করবেন ফুলব্যাকরা। মার্টিন পিটার্সকে অবশেষে ফর্মে দেখা গেল মিড-ফিল্ডে ও গোল সীমানার চতুর্দিকে। ববি চার্লটন ১০৬ বার জাতীয় দলের পক্ষে খেলে রেকর্ড করলেন।

ব্যাঙ্কসের জায়গায় বনেট্টি এলেও তাঁকে নবাগতদের মধ্যে ফেলা যায় না। যেমন উৎসাহী, চেহারাও দোহারা। সুন্দর বল ধরেন। বিশ্বকাপের ঠিক আগে জাতীয় দলে তাঁকে নেওয়া হয়। আর তখন তাঁর চমৎকার গোল রক্ষা বেশ সুনাম কুড়িয়েছিল। অথচ তার আগে তিনি অমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কখনও খেলেননি। নামেননি একমাস যাবৎ কোনো প্রতিযোগিতামূলক খেলায়ও।

কোয়ার্টার ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড একঘণ্টা প্রভাব বিস্তার করে খেলল। যেমন তাদের শক্তি, তেমনি তাতে গতি এবং সুযোগ সৃষ্টি। আর সবশেষে যা দরকার—'ফিনিশিং', তাও দেখাল। এবার বিশ্বকাপে ইংল্যাণ্ড এমন খেলা আর খেলেনি। গুয়াদালাজারায় ববি মুর যেমন প্রাধান্য বজায় রেখে রাজকীয় ভঙ্গীতে ফুটবল খেলেছিলেন, এদিন আবার সেই খেলা। তাঁর ওয়েস্ট-হাম ক্লাবের সতীর্থ জিওফ হার্স্ট দেখালেন ইংল্যাণ্ডের ফুটবল মহিমা। টেরি কুপার তো পশ্চিম জার্মানীর লিবুডাকে খেলতেই দিলেন না। বরং বল নিয়ে বিপক্ষের বিপজ্জনক সীমানায় হানা দিতে লাগলেন। একই কাজ করলেন কিথ নিউটন। ববি চার্লটনের এই খেলা বিশ্বকাপ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। লি ও পিটার্স সিরিজের সেরা ম্যাচ খেললেন। আর মুলারির বোধ হয় এটি জীবনের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ। এসব থেকে দুটি গোল হল। তবে এই সংখ্যা যথেষ্ট নয়।

প্রথম গোলটি আসে আধঘণ্টা পরে। আর এই গোলের জন্য সব

কৃতিত্বই মূলারির। তিনি নিজ এলাকা থেকে বল নিয়ে বিপক্ষকে কাটিয়ে গোল দিয়েছেন। শুরুতে লি-র সঙ্গে মূলারি বল দেওয়া-নেওয়া করে খানিক এগোন, তারপর ক্রস ফিল্ড শটে পাঠালেন ডাইনে নিউটনের কাছে। নিউটন মাটি ঘেঁষে বলটি সোজা মারলেন। কিন্তু বল ধরবে কে? কেউ তো নেই ওখানে! মূলারি কোণাকুনি ছুটলেন বিদ্যুৎগতিতে। অবিশ্বাস্যভাবে বলটি ধরে সেণ্টারের ভঙ্গি করলেন, কিন্তু তা প্রবেশ করল মেয়ারকে বোকা বানিয়ে পশ্চিম জার্মানীর গোলে। বিরতির পাঁচ মিনিট পরে জিওফ হার্স্ট অক্লান্ত পরিশ্রমে বল বাড়ালেন নিউটনের কাছে। নিউটন ছুটে চমৎকার ক্রস দিলেন, এবার ধরলেন মার্টিন পিটার্স এবং মত দর্শনীয়ভাবে গোল করলেন।

এর পরমুহূর্তে জার্মান ম্যানেজার হেলমুট শ্যোন প্রত্যাহার করে নিলেন লিবুডাকে ও তাঁর জায়গায় আনলেন গ্রাবোস্কিকে। খেলার চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। গ্রাবোস্কি তখন ট্যাকল করছেন, পায়ে দৌড়ও ভীষণ রকমের। ওদিকে ইংল্যাণ্ডের কুপার প্রচণ্ড গরমে ও উচ্চতা জনিত প্রতিকূল পরিবেশে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ইংল্যাণ্ডের অন্যতম সক্রিয় খেলোয়াড় সবচেয়ে অকেজো হয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁকে বদল করা হল না। এদিকে জার্মান দলে দ্বিতীয় বদল হল। হজেসের বদলে শুল্জ নেমেছেন বিরতিকালে। তাঁর লক্ষ্য হার্স্ট, কারণ ফিচেলের পক্ষে তাঁকে সামলানো সহজ ছিল না।

গ্রাবোস্কির দ্রুত বল নিয়ে দৌড়ান এবং পরিশ্রম জার্মান দলকে নতুন জীবন দিল। সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল, যখন চার্লটন বাইরে গেলেন। ওদিকে বেকেন-বাউয়ের উঠে আসছেন অগ্রবর্তী অঞ্চলে, এই বেকেনবাউয়েরই গুরুত্বপূর্ণ গোলটি দিলেন, চার্লটন তারপরই বদলী হন। বেকেনবাউয়ের যখন এগিয়ে, তখনই একটি রিবাউণ্ড তাঁর কাছে আসে। বেকেনবাউয়ের বলটি নিয়ে ডান পায়ে কোণাকুণি শট মারলেন। বনেট্টি ধরার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাঁর ডাইভের আগেই বল গোলে প্রবেশ করেছে (২-১)।

চার্লটনের বদলে এলেন বেল। চার্লটনও কুপারের মতই অনেকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এর পরেই ইংল্যাণ্ড দলে আর একটি পরিবর্তন হল। পিটার্সের জায়গায় কেন লিডসের নরম্যান হাণ্টারকে আনা হল বোঝা গেল না। 'হার্ড-ট্যাকলার' হাণ্টারকে দেখে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা অবাক হলেন। হয়ত ধারণা করা হয়েছিল হাণ্টার এলে ডিফেন্স শক্ত হবে, কিন্তু তা হল না।

তিনি অকারণে যত্রতত্র ছোটাছুটি করলেন। কেবল একবার তাঁকে একটি কর্ণার-কিকের সুযোগ দেওয়া হল।

ইংল্যাণ্ডের খেলায় যে ঘাটতি দেখা দিল, তা থেকে প্রত্যাবর্তনের কোনো হদিশ মিলল না। অ্যালান বলের পাস ধরতে পারলেন না বেল। ভাগ্যিস হার্স্ট ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সক্রিয়তার সঙ্গে বলটি ছোঁ মেরে সজোরে শট করলেন। এটিতেও মেয়ার পরাস্ত হলেন, তবে শটটি পোস্টের বাইরে চলে যায়।

জার্মানী ২-২ করল উয়ে জিলারের চমৎকার হেড থেকে। ম্যাচের সারাক্ষণ ধরে এই জিলার ভীষণ রকমের চাপ সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতি মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন ইংল্যাণ্ডকে। তাঁর শূন্যের বলগুলির দিকে ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা হতাশভাবে লক্ষ্যই করেছেন শুধু। ইংল্যাণ্ডের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লেবনে গোলমুখের একটি বল ক্লিয়ার করতেই তা পড়ল জার্মানীর স্নেলিঙ্গারের পায়ে। তিনি সেটিকে লব করলেন। ইংল্যাণ্ডের ডিফেণ্ডাররা জিলারকে এই সময়ে অফসাইডে রাখতে পারতেন, কিন্তু তেমন প্রয়াস দেখা গেল না। জিলার বল নিয়ে এগিয়ে তাতে প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করলেন। বনেট্টির মাথার উপর দিয়ে তাঁকে হতভম্ব করে বল প্রবেশ করল গোলে।

নির্দিষ্ট সময়ের খেলা শেষ। ফল ২-২। তাই নিষ্পত্তি করতে অতিরিক্ত সময়ের নির্দেশ। এবারও জার্মানরা আগের গতি বজায় রাখলেন। তবুও এরই মাঝে ইংল্যাণ্ড একটি সুযোগ পেয়েছিল। লি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে স্নেলিঙ্গারকে কাটিয়ে ডান দিকে ফেললেন বল। হার্স্ট কাছেই ছিলেন, ভুল করলেন না ওটি গোলের ভিতরে পাঠাতে। কিন্তু রেফারির বাঁশিতে গোলের সংকেত বাজল না। অথচ ইংল্যাণ্ডের কেউ তো অফসাইড হননি। লি-ও ফাউল করেননি স্নেলিঙ্গারকে। মূলার শেষ হাতিয়ার প্রয়োগ করলেন ইংল্যাণ্ডের ডিফেন্সে ব্রহ্মাস্ত্রের মত এক ভলি মেরে। অবশ্য এর জন্য গ্রাবোস্কির ভূমিকা অনস্বীকার্য। কুপারকে পরাস্ত করে তিনি ক্রস পাস দিলেন লোহারকে। লোহারের হেডই মূলারের কাছে বলটি পৌঁছে দেয়। বনেট্টি আবার হেরে গেলেন। জার্মানীর এই পুনরুত্থান যথার্থই অভাবনীয়, ইংল্যাণ্ড বড় রকমের ধাক্কা খেল পর। অপরাহ্নের রোদে হোটেল প্রাঙ্গণে ইংল্যাণ্ড খেলোয়াড়দের যুদ্ধে আহত সৈনিকদের মত মনে হল। এই নিষ্ঠুরতম আবহাওয়ায় তাদের ফুল ব্যাকদের উপর প্রচণ্ড রকমের বোঝা সৃষ্টি করে এবং

তাই-ই এবারের বিশ্বকাপ থেকে কাপ বিজয়ীকে কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় করেছিল। তবে একথাও সত্যি, জিওফ হার্স্ট ছাড়া আর কাউকে এ দিন আপ্রাণ লড়তে দেখা যায়নি। অথচ গুয়াদালাজারাতেই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সোডিয়াম ট্যাবলেটও ইংল্যাণ্ডকে ১২০ মিনিট খেলার মত শক্তি দিতে পারল না। হার্স্ট দলের প্রধান শক্তি হলেও, তাঁকে ভীষণ বিষাদগ্রস্ত মনে হল। তিনি আরও লড়তে পারতেন যদি সল্ট ট্যাবলেট পেতেন, অবশ্য ওই ট্যাবলেটের কিছু ক্ষয়পূরণ করে লেমনেড। ববি মূরের মতই তিনি খেলেছেন। খেলেন গতবারের ফাইনাল অপেক্ষা অনেক ভাল। মেক্সিকো তাঁর কাছ থেকে অনেক বেশি নিংড়ে নিয়েছিল। যে শক্তি তিনি এখানে ক্ষয় করলেন, হার্স্টের পক্ষে তা সহজে ফিরে পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে, বললেন স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা। জিওফ হার্স্ট বিশ্বকাপ কমিটির একগুঁয়েমীর বলি হলেন।

সেমিফাইনাল

সেমিফাইনালে দুই পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল ও উরুগুয়ে আবার মুখোমুখী হল। এদের খেলা পড়ল গুয়াদালাজারায়। মেক্সিকো সিটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল ইতালি ও পশ্চিম জার্মানী। উরুগুয়েয়ানরা ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিল গুয়াদালাজারায় খেলা পড়ায়। তাদের অভিযোগ, এতে তো ব্রাজিলেরই সুবিধা হবে। তারা খেলবে 'নিজেদের মাঠে'। কোনোরকম যুক্তি না দেখিয়ে তারা দাবি জানাতে থাকে, মেক্সিকো সিটিতে খেলা হোক। কর্তৃপক্ষ অবশ্য টলেননি। তবে উরুগুয়ে গুয়াদালাজারায় পৌছল অনেক দেরিতে। গভর্ণর আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানও বর্জন করল তারা।

ব্রাজিল ঃ উরুগুয়ে—ব্রাজিলের গোলরক্ষক ফেলিক্সের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উরুগুয়ে এগিয়ে গেল। হ্রস্ব ও কৃষ্ণকায় কুবিল্লা বল ধরে এগিয়ে ডান দিকের গোল-লাইনের লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা করলে পিয়াজ্জার কাছে বাধা পেতেই অসম্ভব এক অ্যাঙ্গেল থেকে গোল বরাবর শট করলেন। অভাবনীয়-ভাবে বল লাফিয়ে ফেলিক্সকে অতিক্রম করে গোলে ঢুকল (১-০)। প্রথমার্ধের সমাপ্তির কিছু আগেও উরুগুয়ে এগিয়ে রইল। বিরতির সামান্য আগে ব্রাজিলের ক্লোডোয়াল্ডো প্রচণ্ড বেগে বল নিয়ে ১-১ করেন। কুড়ি বছর বয়সী সুদেহী এই রাইট হাফ গ্রুপ ম্যাচে ও কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় যে

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, সেমিফাইনালে তা কাজে লাগান। মূলতঃ ডিফেণ্ডার হলেও এদিন তিনি ঘন ঘন বল জুগিয়েছেন দলের প্রবীণ ও অভিজ্ঞদের। শুধু তাই নয়, তিনি প্রমাণ করলেন ফুটবলে তাঁর অধিকার কতখানি।

ক্লোডোয়াল্ডোর আদর্শ ও স্যান্টোসের মহানায়ক পেলে উদ্বোধনী খেলার মত সেমিফাইনালেও দুর্দান্ত ফর্মে। এদিন তিনি দর্শনীয় একটি গোল থেকে বঞ্চিত হন। মাজুরকিউইজের বল কিক্ তাঁর জানা। তিনি ধরেই সাধারণত ডিফেণ্ডারদের কাছে পাঠান। পেলে এমনই একটি বল ধরে চমৎকার ভলি মারলেন। কিন্তু উরুগুয়ে গোলরক্ষক অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে এটি ঠেকিয়ে দেন।

উরুগুয়েয়ানরা প্রথমার্ধে বেশ কিছুটা হিংসাত্মক ফুটবল খেললেন। জাগালো ওদের প্রথম গোল দেখে কিছুটা সন্ত্রস্ত হন। তারপর একটু ভেবে ওদের সব ফন্দি ধ্বংস করলেন। মুজিকার তুলনায় জেয়ারজিনো গতিতে ও শক্তিতে এগিয়ে থাকলেও আনচেটা ও মাটোসাস চমৎকারভাবে জেয়ারজিনোকে বাধা দিতে লাগলেন। মেজাজ হারিয়ে ওরা ফাউল করলেন, তবুও একাধিক ফ্রি-কিক্ রুখে দিলেন ডিফেণ্ডাররা। এক ফাউলে ক্লোডোয়াল্ডো আহত হলেও টোস্টাও-এর সুন্দর পাস থেকে গোলটি দিতে ভুল করেননি।

দ্বিতীয়ার্ধে তো পুরো খেলাটাই ব্রাজিলের করায়ত্ত হল। এবার উরুগুয়ের শারীরিক শক্তি প্রয়োগ আরও বৃদ্ধি পেল, আর তা বেশ দৃষ্টিকটুও হয়। কোয়ার্টার ফাইনালের মত এবারও বদলী হিসাবে নামানো হল এস্পারাগোকে। তিনি নামলেন মানিরোর পজিশনে। ব্রাজিলের দ্বিতীয় গোলটি হল অত্যন্ত দ্রুত। এবারও পরিকল্পনা রচনা টোস্টাও-এর। জেয়ারজিনোকে বল বাড়াতেই তিনি ২-১ করলেন। মুজিকার দৌড়ের গতি বা তেমন শক্তি ছিল না ব্রাজিলের ওই উইঙ্গারকে বাধা দেওয়ার। সুতরাং জেয়ারজিনোর মার মাজুরকিউইজের পক্ষে আটকানো সম্ভব হয়নি। উরুগুয়ে দ্বিতীয় গোলটি খেয়ে ক্ষণিকের জন্য জ্বলে উঠেছিল। কুবিল্লা ব্রাজিলের গোলে বেশ জোরালো শটই মেরেছিলেন। কিন্তু ফেলিক্স এবার সেটি তৎপরতার সঙ্গে ধরে ফেলেন। আবার বল ব্রাজিলের দখলে এবং তা পেলের পায়ে। তিনি গড়িয়ে পাস দিলেন রিভেলিনোকে শেষ কাজটি করার জন্য। মুহূর্তমধ্যে ব্রাজিল ৩-১ গোলে এগোল। শেষ মুহূর্তেও পেলে অদ্ভুতভাবে বল নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। প্রতি মুহূর্তে যাদু সৃষ্টি করছিলেন। দূর থেকে প্রচণ্ড

শটে মাজুরকিউইজকে কাবু করার প্রয়াস অবশ্য ব্যর্থ হল। আর একবার মাজুরকিউইজ পেলের পা থেকে বল কাড়ার জন্য ধাবমান হলে পেলে দ্রুত গতি পরিবর্তন করে ফাঁকা গোলে বল মারেন। সামান্য উঁচু দিয়ে বল চলে যাওয়ায় উরুগুয়ে আর একটি নিশ্চিত গোল থেকে অব্যাহতি পেল।

ইতালি ঃ পশ্চিম জার্মানী—মেক্সিকো সিটিতে উন্নতমানের ফুটবল প্রদর্শনী হল। উভয় দলেরই যেন লক্ষ্য ছিল খেলাটিকে বিশ্ব ফুটবলের অঙ্গনে মহিমান্বিত করার। সত্যি বলতে কী এমন এ্যাটাকিং খেলা সচরাচর দেখা যায় না। আর আক্রমণ করেছে দুটি দলই সমানভাবে। এই ম্যাচ দেখার জন্য শত শত সাংবাদিক উপস্থিত থাকলেও এক ইতালীয় সাংবাদিক চমৎকার বর্ণনা দিয়ে নিজের কাগজে ডেসপাচ পাঠালেন। অতিরিক্ত সময়ের গোলটি যেভাবে হয়েছে, তাকে তিনি তুলনা করলেন বাস্কেটবলের সঙ্গে। এবার ভাগ্যলক্ষ্মী জার্মানীর বদলে ইতালির দিকে সদয়া হলেন। জার্মান ম্যানেজার হেলমুট শ্চোনের খেলোয়াড় বদলও এজন্য কম দায়ী নয়।

কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে কোনোক্রমে জয়ের পর নানান্ চিন্তা মাথায় নিয়ে পশ্চিম জার্মানী এই প্রথম অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে খেলতে নামল। এল তাদের সেই ধীর গতি নিয়েই। এদিকে ইতালিকে সাহস যোগালেন অত্যন্ত পরিশ্রমী বনিনসেগনা প্রথমার্ধে একটি গোল করে। অষ্টম মিনিটেই তিনি জার্মান ডিফেণ্ডারদের কাছ থেকে দুটি রিবাউণ্ড পেয়ে শেষেরটি কাজে লাগালেন পেনাল্টি সীমানার ধার থেকে বাঁ পায়ে। জার্মান গোলরক্ষক মেয়ারের পক্ষে ওই বল ধরা সম্ভবও ছিল না। বিরতির পর মাজোলাকে প্রত্যাহার করে নামানো হল রিভেরাকে। এতে খেলার কোনো পরিবর্তন তথা উন্নতি দেখা গেল না। তারা অত্যন্ত সতর্কতা সত্ত্বেও প্রথমার্ধের অগ্রগতিটুকুও অব্যাহত রাখতে অপারগ হল। জার্মানরা ইতিমধ্যে শনৈঃ শনৈঃ খেলার উন্নতি করলেন মাঝমাঠ দখল করে, তারপর তা ফরওয়ার্ডদের সাহায্যে আসতে থাকে। ইতালীয়রা ভুল করলেন বেকেনবাউয়ের ও ওভারাথের মত খেলোয়াড়দের প্রতি তেমন লক্ষ্য না রেখে, বরং তাঁদের এগিয়ে আসতে দেওয়া হল। এই দুইজনের ফুটবল-কুশলতা কিছুক্ষণের মধ্যে ইতালির উপর বোমা বর্ষণ শুরু করল। জিলার একবার ইতালীয় ডিফেণ্ডার সেরাকেও অতিক্রম করলেন। গ্রাবোস্কি আজই প্রথম পুরো সময় একটি ম্যাচ খেললেন। তিনি এবং ওভারাথ বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করলেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে লোহারের বদলে নামেন লিবুডা। কুড়ি মিনিট পরে শ্যোন ঝুঁকি নিয়ে দ্বিতীয় বদলী নামালেন। মূলতঃ আক্রমণ ভাগের হলেও হেল্ডকে আনা হল ফুল ব্যাক পাৎকের জায়গায়।

পরিশ্রমী ও সুদেহী হেল্ডের আগমন সূচনায় জার্মানীকে উদ্দীপিত করল। ১৯৬৬-র ফাইনালে তাঁর খেলার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। এই হেল্ড তখন জার্মানীর বাঁ দিকের আক্রমণে রসদ তো জুগিয়েছিলেনই, একাধিকবার গোলেরও সুযোগ করে দেন। তাঁর পায়ে প্রচণ্ড 'ড্রাইভ কিক্'। এদিনও তাঁর পাস থেকে জিলার বল পেয়ে হেড দিলেন। আলবেত্রশি এদিন তৃতীয়বার গোল রক্ষা করলেন। কিন্তু তাঁর দিনের প্রথম পরাজয় তখনও মনে উঁকি দিচ্ছিল। গ্রাবোস্কি বাঁদিকে ক্রস দিতেই গোলমুখে অপেক্ষমান সুইপার কার্ল হেঁজ স্নেলিঞ্জার ১-১ করলেন।

এবার অতিরিক্ত সময়ের খেলা। ফুটবল তো নয়। একেবারে বাস্কেটবলের মত দ্রুতগতির খেলা। বল একবার এ প্রান্তে, পরমুহূর্তে অন্যপ্রান্তে। প্রতি মুহূর্তে, ফুটবলে এমন নাটকের পর নাটক বড় কমই হয়। ইতালি এবার দ্বিতীয় বদলটি করল। রোসাতোর জায়গায় এলেন পলেত্তি। সব থেকে উল্লেখ্য, এই সময় জার্মানীর পরম নির্ভরযোগ্য বেকেনবাউয়ের গুরুতর আহত হলেন। তাঁর এক হাত একেবারে অকেজো হওয়ার উপক্রম। এই খেলায় এবারই প্রথম তাঁর উপর এই আঘাত নয়। নির্দিষ্ট সময়েও একবার তাঁকে 'খুন' করার চেষ্টা হয়েছিল ইতালির গোলমুখে পৌছলে। কারণ বারংবার বিপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে হানা দিচ্ছিলেন যে! এবারের আঘাতটি আইনত পেনাল্টি হয়নি। কেন না, ফাউলকারী তাঁর বিচক্ষণতাকে কাজে লাগান পেনাল্টি সীমানার একটু বাইরে। তা না হলে নীতিগতভাবে একে পেনাল্টি না দিলে গুরুতর অন্যায় হত। ফ্রি-কিক্ থেকে জার্মানীর কোনো উপকার হল না। তবে দোষীর দণ্ড তখনই হয়ে গেল। ইতালির আখেরে জয় হলেও মুহূর্তের জন্য জার্মানরা হৃদয় কেড়ে নিল। ইতালীয় সমালোচকরা জার্মানীর পরাজয়ের জন্য ম্যানেজার শ্যোনকে দায়ী করেন তাঁর খেলোয়াড় বদল ও ট্যাকটিকসের জন্য। ইতালির একটি কাগজে হেড লাইনও হয় 'ডাঙ্কে শ্যোন'। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য—বেকেনবাউয়েরের ফাউলই খেলার গতি পরিবর্তন করেছিল।

অতিরিক্ত সময়ের শুরুতে জার্মানীরই প্রাধান্য ছিল আক্রমণে। পঞ্চম

মিনিটে আলবেত্রেশির জায়গায় অকারণে ছুটে গেলেন পলেত্তি। মূলার সেই সুযোগ ছাড়েননি। জার্মানী ২-১ এগোল।

এবার গোলগুলি হতে শুরু করে বাস্কেটবলের স্কোরের মতই। ইতালির টারসিশিও বার্গনিশ হঠাৎ সেণ্টার হাফে এগিয়ে স্নেলিঙ্গারকে কাটিয়ে জার্মানীর গোলমুখে পৌঁছে আর নামলেন না। ইতিমধ্যে ইতালি ফ্রি-কিক্ পেল। রিভেরা শট্ করে গোলের কাছে পাঠাতেই বার্গনিশ তাতে পা ঠেকিয়ে মেয়ারকে পরাস্ত (২-২) করলেন। এবার রিভা কাটালেন স্নেলিঙ্গারকে। তারপর বাঁ পায়ে নিচু ক্রস শট মারলেন পেনাল্টি সীমানার কাছ থেকে। ৩-২ হল। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধ শেষ। ইতালি আবার এগিয়ে। জার্মানী তখন সুইপারহীন। এবং বেকেনবাউয়ের রীতিমত পঙ্গু।

তবুও জার্মানী লড়াইয়ে ক্ষান্ত হল না। উয়ে জিলার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। একই ভাবে তাঁর হেড আলবেত্রেশি আবার রুখে দেন। তবে পরক্ষণেই কর্ণার-কিকের সময় তিনি ছিলেন বাঁদিকের পোস্টের খানিকটা দূরে। বল পেয়েই ফেলে দিলেন মূলারের মাথায়। মূলার ৩-৩ করলেন। ফুটবল নাটক আবার জমজমাট। এই টুর্ণামেণ্টে মূলারের এটি দশম গোল তো বটেই, তিনি হলেন টপ্ স্কোরার।

অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন। দ্বিতীয় অতিরিক্ত সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে বনিনসেগনা বল নিয়ে দৌড়তে শুরু করলেন বাঁ প্রান্ত বরাবর। তারপর সেটি বাড়ালেন রিভেরার কাছে। হ্রস্বকায় রিভেরা সহজেই মেয়ারকে পরাস্ত করলেন (৪-৩)। পরাজিত হল পশ্চিম জার্মানী, ইতালি উঠল ফাইনালে।

তৃতীয় স্থান—মেক্সিকো সিটিতে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলা হল পশ্চিম জার্মানী ও উরুগুয়ের মধ্যে। জার্মানরা এই ম্যাচে ১-০ গোলে উরুগুয়েয়ানদের পরাস্ত করে। এদিন অপরাহ্নে উলফ্যাঙ্গ ওভারাথের বাঁ পায়ের চমৎকার গোলটি ছাড়া আর কিছুই দেখার ছিল না। কুশলী গোলরক্ষক মেয়ারের আগের খেলায় অসন্তুষ্ট হয়ে শ্যোন এদিন গোলে মোতায়েন করলেন ওলটারকে। ওলটার আরও হাস্যকর খেললেন। যেগুলি আটকেছেন, তার অধিকাংশই কপাল গুণে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে আনচেটার একটি হেড এক হাতে ধরে দলকে এ যাত্রা রক্ষা করেন।

ফাইনাল

ব্রাজিল ঃ ইতালি—এবার বিশ্বকাপ ফাইনালে এমন দুটি দেশ মুখোমুখী হল যাদের প্রত্যেকেই দুবার করে কাপ জিতেছে। ব্রাজিল কাপ জিতেছে সম্প্রতি। কিন্তু ইতালির 'আজুরি' বাহিনী শেষ জিতেছিল বত্রিশ বছর আগে ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সে।

প্রতিযোগিতার শুরুতেই ব্রাজিলকে বিশ্বকাপে ফেভারিট ধরা হয়েছিল, প্রতিযোগিতা যখন মাঝপথে বা তারও পরে—তখন ওই ধারণা আরও দৃঢ় হল। সন্দেহ নেই ইতালি-জার্মানী সেমিফাইনালের ফল ঘিরে বাদানুবাদের অবকাশ ছিল, তবুও ইতালির 'কাটানাকিও' ডিফেন্স যে বেশ শক্ত, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ছিল না। ইণ্টারের ফুলব্যাক বার্গনিশ এবং ফ্যাচেত্তির অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও কোনো কথাই বলা যায় না। নিজের ক্লাব ও দেশের পক্ষে প্রতিটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাঁরা সর্বদাই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু ফ্যাচেত্তির আগের খেলায় বেশ ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তবুও ব্রাজিলের জেয়ারজিনোকে তিনি বেগ দিলেন, কিন্তু যতটা আশা করা হয়েছিল, ততখানি নয়। কোয়ার্টার ও সেমিফাইনালে ইতালি সম্পর্কে যত সমালোচনাই করা হোক, তারা গঠনমূলক ফুটবল খেলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল। মিড-ফিল্ড ও অগ্রবর্তী অঞ্চলে তারা যথেষ্ট কৃতিত্বও দেখায়। রিভা ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর গোল দেওয়ার মানসিকতা ও কুশলতা। বনিনসেগনাও তুঙ্গে ছিলেন। উপরন্তু মাজোলা ও রিভেরার মত অমন দুজন কুশলী খেলোয়াড় কোন্ দেশের অ্যাটাকিং-এ আছে? এঁরাই ব্রাজিলের ডিফেন্সকে ছত্রখান করবেন। তাছাড়া ইতিপূর্বে প্রমাণ মিলেছে ব্রাজিলের ডিফেন্সকে বার বার ভেদ করেছে পেরুও। ব্রাজিলের গোলরক্ষক ফেলিক্সের দুর্বলতার কথা কারুর অজানা নয়। অধিনায়ক ও রাইট ব্যাক কার্লস আলবার্টো যখন অগ্রবর্তী এলাকায় যান, ফরওয়ার্ডদের মত আক্রমণে উদ্যত হন, তখন তাঁর ক্ষমতার জুড়ি মেলা ভার, কিন্তু বিপক্ষের কোনো উইঙ্গার তাঁর মুখোমুখী হলে, তখন আর তাঁকে ক্ষমতাবান মনে হয় না, ব্রিটো ও পিয়াজ্জাকে বেগ দিতে বনিনসেগনা ও রিভাই যথেষ্ট। তবে মাজোলার ড্রিবলিং প্রয়োজন, চাই রিভেরার সময়োচিত পাস। ইতালির সাফল্যের জন্য আর চাই রেফারিং-এর কিছুটা সহযোগিতা। যেমনটি করেছিলেন মেক্সিকোর সেনর ইয়ামাস্কি। প্রসঙ্গত বলা দরকার, বিশ্বকাপের মত এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় রেফারিং উন্নতমানের হয়নি। বরং

বিশ্বকাপের আশঙ্কা অনুযায়ী খেলা 'রাফ' হয়নি, হলেও এই ধরনের রেফারিং বিশ্বকাপের ভাবমূর্তি নষ্ট করতই।

ইতালি দল আস্তানা নিয়েছিল মেক্সিকো সিটি-র 'হোটেল ডেলা ভিল'-এ। তারা স্থির করল, আমরা যেমন খেলি, তেমনিই খেলব। এই মুহূর্তে পদ্ধতি বা কৌশলের কোনো পরিবর্তন যথার্থ হবে না। অধিনায়ক ফ্যাচেত্তি বললেন : ইতালি যেভাবে খেলে, ঠিক তেমনি সরল ফুটবল খেলতে হবে। এই একটি ম্যাচের জন্য নতুন কোনো পদ্ধতির প্রয়োজন নেই, উচিতও নয়। তাতে বিপত্তি বাড়বে। তবে এই ম্যাচে পঁয়ত্রিশ গজ দূর থেকে গোলে শট কার্যকর হবে। সুফল দেবে। সম্ভব হয়ত হবে না, তবুও এখানে স্পিড বাড়াতে হবে আরও পঞ্চাশ ভাগ। ট্যাকটিক্‌স একই থাকবে। আর হ্যাঁ, প্রত্যেকে যেন নিজের নিজের 'ম্যান'-কে সব সময় লক্ষ্য রাখে। আমাদের আক্রমণ যেন ক্ষুরধার হয়। কারণ, ওদের ডিফেন্সটা একটু নড়বড়ে। ব্রাজিলিয়ানদের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের জেতা উচিত ছিল, কিন্তু তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। আমরা ব্রাজিলের তিন-চারটি খেলা দেখেছি। আমি মোকাবিলা করব জেয়ারজিনোকে, ওই কারণে আগের আগের ম্যাচগুলোর চাইতে একটু কম এগোব।

ইতালির লুসিয়ানো আলবেত্রেশি শুধু শান্ত মেজাজের নন, বেশ শক্ত এবং অভিজ্ঞ গোলরক্ষক। তিনি বললেন : ব্রাজিলের ডিফেন্সকে শক্তিমানদের মধ্যে গণ্য করা যায় না। তবে তাদের অ্যাটাকিং লাইন অনায়াসে তিনটি বা চারটি গোল করতে সমর্থ। সুতরাং ব্রাজিলের ডিফেণ্ডারদের ভেদ করে দুটি বা তিনটি গোল হতে পারে। আমাদের ডিফেন্স খুব শক্ত। এদের ভেদ করে মাত্র একটি গোল হতে পারে আর আমরা দিতে পারি দুটি।

ফ্রান্সিস লি-র চাইতে আর কেউ ব্রাজিলকে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করেননি, তাঁদের খেলার চুলচেরা বিচার করতেও সক্ষম হননি। গুয়াদালাজারায় ব্রাজিলের খেলা দেখে তিনি বললেন : ব্রাজিলের সঙ্গে খেলার সময় সর্বদা চাপ সৃষ্টি করতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে বল যেন কখনও তোমাদের সীমানায় না আসে, যদি একবার ব্রাজিলিয়ানদের তোমাদের এলাকায় আসার সুযোগ দাও, অমনি বিপদ দেখা দেবে।

লি-র সাবধান বাণীই ফলে গেল, ইতালি নিজেদের দিকে ব্রাজিলকে আসতে সুযোগ দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিপদও উপস্থিত।

তবুও বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালে আক্রমণাত্মক খেলারই প্রাধান্য ছিল। দর্শকরা বিরক্তিকর ও নেতিবাচক ফুটবলের জন্য সময় ও অর্থব্যয় থেকে রেহাই পেলেন। ব্রাজিল চমৎকার পরিকল্পনাপ্রসূত ফুটবল খেলে। সারাক্ষণ যেন নতুন কিছু প্রাপ্তির আশায় তারা খেলল, লড়াই করল। তারা জিতল, কিন্তু ইতালি যে গোলটি দিয়ে ১-১ করেছিল, সেটি ব্রাজিলের মত দলের পক্ষে রোখা উচিত ছিল। অবশ্য এজন্য তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি, তাদের মানসিকতায় চিড় ধরেনি ক্ষণিকের জন্যও।

যে পেলে বিশ্বকাপের পর ঘোষণা করেছিলেন, তিনি আর বিশ্বকাপে খেলবেন না, অংশ নেবেন না কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়, এই ফাইনালে সেই পেলে চমক দেখালেন। বিশ্বকাপ ফাইনাল তাঁর স্কিল, সারা মাঠে প্রভুত্ব ও সক্রিয়তার দ্বারা মহিমান্বিত হল। পেলে দারুণ একটি গোল করলেন, দুটি গোলের সুযোগ করে দিলেন। বারো বছর আগে ১৯৫৮-য় তিনি প্রথম ফাইনাল খেলেছিলেন, এবার খেললেন দ্বিতীয়বার। এক যুগ আগে সুইডেনে গোলের মধ্যে যে প্রতিভার উন্মেষ দেখেছিলেন বিশ্বকাপের দর্শকরা, এবার তার পূর্ণরূপ দেখা গেল মেক্সিকোয়।

ইতালির ট্যাকটিক্স শুধু অতিশয় নেতিবাচকই ছিল না, তাদের খেলায় গঠনমূলক ফুটবলের বিন্দুমাত্র হদিশ মেলেনি। যে ডিফেন্স নিয়ে ইতালি গর্ব করত, তাকেও মৃত মনে হল। তারা দ্রুত বার্গনিশকে সেণ্টার ব্যাকের দায়িত্ব দিল, কিন্তু তিনি গার্সন বা কার্লস অ্যালবার্টোকে মোকাবিলা করতে পারলেন না। গার্সন খুশিমত মুক্ত জমি তৈরী করে মাঝমাঠে যখন খুশি বিচরণ করেছেন, আর এই কাজেই তো তাঁর কৃতিত্ব ও বিচক্ষণতা। জেয়ারজিনো তাঁর চতুরতাকে কাজে লাগান ফ্যাচেত্তিকে মাঝমাঠে আবদ্ধ রেখে। ইতালির জন-পিছু প্রহরার পরিকল্পনা কার্যত ভেস্তে গেল। সুযোগ পেয়ে কার্লস অ্যালাবার্টো ফাঁকা রাইট উইং দিয়ে দিয়ে বারে বারে এগোলেন; ইতালি খেলছিল লেফট উইঙ্গার ব্যতিরেকেই।

আঠার মিনিট পরে ব্রাজিল একটি গোল করল। বাঁদিক থেকে রিভেলিনো উঁচু করে সুন্দর একটি অভাবনীয় ক্রস পাস দিলেন। বল পৌঁছবার আগেই পেলে ইতালীয় রক্ষণব্যূহে পৌঁছে গেলেন বলটি পাওয়ার জন্য। রিভেলিনোর ওই পাস নিয়ে আর কোনো চিন্তা নয়, সরাসরি জোরালো হেড দিতেই ১-০ হয়ে গেল ঠিক ১৯৫৮-র স্টকহমের মতই।

ইতালির মাজোলা দারুণ ছুটছিলেন ও ড্রিবল করছিলেন। ইতালির রক্ষণভাগের মধ্যমণিও তিনি। মাজোলার পাসগুলোকে কাজে রূপায়ণের চেষ্টা যা কিছু করেন, তার সব কৃতিত্ব বনিনসেগনার। তবে খেলা দেখে অনেকেই উপলব্ধি করলেন, তারা খেলা রাখতে পারবে না। তাদের প্রয়োজন দৈবাৎ কিছু ঘটে যাওয়া। বিরতির সাত মিনিট আগে তেমনি সুযোগও এল। ব্রাজিলের ক্লোডোয়াল্ডো নেশা-টেশা করেছিলেন কিনা কে জানে—ব্যাক হিল করে তিনি বল পাঠালেন নিজের হাফে। বনিনসেগনা সুযোগ পেয়ে এগিয়ে চললেন। ব্রাজিলের ডিফেন্স তো তখন অন্যদিকে। বনিনসেগনা গোলের ডান দিকে বল মারার চেষ্টা করতেই গোলরক্ষক ফেলিক্স দ্রুত ছুটে এলেন মরীয়া হয়ে। বনিনসেগনা একটু টেনে নিয়ে যখন শট করলেন, ফেলিক্স তখন দিশেহারা, ফাঁকা গোল (১-১)।

এটিই ইতালির পক্ষে স্বর্ণ সুযোগ। ইচ্ছা করলে তারা খেলার গতি পরিবর্তন করতে পারত। শুধু প্রয়োজন ছিল সাহস ও চারিত্রিক দৃঢ়তার। এই দিনের ওই ঘটনা প্রসঙ্গে কয়েকবছর পর পেলে রোমে গিয়ে ইতালীয় খেলোয়াড়দের বলেন: মেক্সিকোয় তোমরা ভুল করেছিলে। ১-১ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাপ সৃষ্টি করা উচিত ছিল। আমরা ক্ষণিকের জন্য মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ইতালি সত্যিই ব্রাজিলের মনোবলে আঘাত করার কোনো প্রয়াস দেখায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে মাজোলার দৃঢ়তার মোকাবিলা করে ব্রাজিল ক্রমশ প্রাধান্য ফিরে পেতে থাকে। ছেষট্টি মিনিটের সময় গার্সনের পা থেকে বোমাবর্ষণ হচ্ছিল। পেনাল্টি-বক্সের বাইরের থেকে বাঁ পায়ে দুর্দান্ত ক্রস শটে তিনি ব্রাজিলকে ২-১ গোলে এগিয়ে দিলেন।

এখানেই ইতালির পরাজয় হল। এর পাঁচ মিনিট পরে গার্সনের ফ্রি-কিকে পেলে দ্রুত পা ঠেকিয়ে কুশলতার সঙ্গে পাঠালেন জেয়ারজিনোর কাছে। তিনি সেটি নিয়ে একটু ছুটে গোলমুখে পৌঁছে বাঁ দিকের পোস্ট ঘেঁষে বলটি মারলেন (৩-১)। এবার ইতালি খেলোয়াড় বদল করল। বার্তিনির বদলে এলেন জুলিয়ানো। সমাপ্তির ছয় মিনিট আগে বনিনসেগনার বদলে নামলেন রিভেরা। এই প্রতিযোগিতায় এমন অর্থহীন বদলি সম্ভবত আর কেউ করেননি। হাতে সময় অল্প। গোলের ব্যবধানও কম হয়নি। সুতরাং ইতালির পক্ষে ম্যাচ বাঁচানো অসম্ভব। ভ্যালকারেগ্গির মাথায় তখনও রিভেরা-মাজোলা সমস্যা

দগ্‌দগ্‌ করছে। বিরতির সময় মাজোলাকে প্রত্যাহারের প্রশ্নই ছিল না। তিনি এদিন দারুণ খেলছিলেন। তাছাড়া রিভেরার অনুপস্থিতি তাঁকে আরও বেশি উৎসাহিত করছিল, তিনি সক্রিয়ও ছিলেন। কিন্তু ভ্যালকারেগ্‌গির সমঝোতা স্থত্র বনিনসেগনার বদলে রিভেরাকে এনে দিল, আর সেই সঙ্গে করল ইতালীয় ফরওয়ার্ড লাইনের সক্রিয়তাটুকুরও ধ্বংস সাধন। এই স্থযোগে সমাপ্তির তিন মিনিট আগে ব্রাজিল চতুর্থ গোলটি করল। খেলোয়াড় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই আশঙ্কাই করছিলেন ইতালির সমর্থকরা। জেয়ারজিনোর পাসটি ধরে পেলে চমৎকারভাবে বল বাড়ালেন ডাইনে কার্লস অ্যালবার্টোর সামনে। অ্যালবার্টো তাতে বজ্র-শক্তি প্রয়োগ করতেই ৪-১ হয়।

জয়ের পর ব্রাজিলিয়ানরা অভূতপূর্ব বিজয় উৎসবে মাতলেন। সেদিন যাঁরা মাঠে ছিলেন, তাঁরা ছাড়া আর কাউকে সেই মহানন্দের দৃশ্যাবলী ভাষায় বোঝান অসম্ভব। টেলিভিশন দর্শকরাও সামান্য দেখেছিলেন ওই ঘটনা। দর্শকরা নাচতে নাচতে মাঠে ঢুকে বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের ঘিরে ধরলেন। তাঁদের উজ্জ্বল হলুদ শার্টগুলো খুলে আন্দোলিত করতে লাগলেন। মাথায় তুললেন খেলোয়াড়দের। আসলে ব্রাজিল এদিন যেভাবে জিতল বীরের মত, খেলার পর তারই প্রতিচ্ছবি দেখা গেল দর্শকদের উল্লাসের মাধ্যমে। তাদের বহুদিনের সাধনা, আগ্রহ এতদিন পরে আবার সাফল্য বহন করে আনল। সবচেয়ে উল্লেখ্য, ব্রাজিল দেখাল বিশ্ববাসীকে, তারা এমন খেলা নিয়ে সাধনা করে, যাকে সত্যিকারের খেলার মর্যাদা দেওয়া যায় এবং সেই খেলা মানুষকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে।

এই নিয়ে ব্রাজিল তিনবার জুল রিমে ট্রফি জিতল। আর তিনবার জয়ের স্থবাদে ফুটবলের সোনার পরীটি তারা চিরকালের জন্যই দখল করল। তিনবার জয়ের প্রত্যাশা তাদের ছিল, কিন্তু তার জন্য যে কঠোর সাধনা, অধ্যবসায় প্রয়োজন তাতে কোনো ঘাটতি ছিল না। তবে হ্যাঁ, ব্রাজিলে ফুটবল-প্রতিভা আছে, তাদের দেশ তার স্ফুরণ ঘটিয়েছে। এখনকার ফুটবলে প্রতিভাবানের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। প্রসঙ্গত বলা দরকার ১৯৬৬-র বিশ্বকাপ বিজয়ী ইংল্যাণ্ডের সাহসিকতারও তুলনা নেই। তবে তারা খেলেছিল 'অ্যাথলেটিক ফুটবল'। তারা কঠোর পরিশ্রমে অস্ত্রে শান দিয়েছিল দিনের পর দিন। ব্রাজিল ও ইংল্যাণ্ডের ফারাক এখানেই। ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের যদি শিল্পী আখ্যা দেওয়া হয়, তবে ইংল্যাণ্ডের ওরা শ্রমিক।

বিশ্বকাপ সমাপ্তির কয়েকদিনের মধ্যেই চেকোশ্লোভাকিয়া ও বেলজিয়মে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল। চেকরা তাঁদের ম্যানেজার মার্কোকে বরখাস্ত করলেন। বিশ্বকাপ দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়কে জাতীয় দল থেকে বাদ দেওয়া হল। বেলজিয়মের পল ভ্যান হিম ও লেফট উইঙ্গার উইলফ্রাইয়েড পুইস বললেন, আমাদের অকারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, আর কখনও জাতীয় দলে খেলব না। ভ্যান হিম অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে মত পাল্টান।

এসব ছোটখাটো ঘটনা ঘটলেও এবং মেক্সিকোর উত্তপ্ত আবহাওয়া ও নানা প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও   এর বিশ্বকাপ ফুটবল সমস্ত নেতিবাচক চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রেখে সু-অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে। ব্রাজিল-ইতালির সুসম্পন্ন ফাইনাল গোটা প্রতিযোগিতাকে আরও সুষমামণ্ডিত করল।

প্রাথমিক পর্যায়ের ফল

গ্রুপ—১

সুইজারল্যাণ্ড ১	:	গ্রীস ০
সুইজারল্যাণ্ড ২	:	পোর্তুগাল ০
গ্রীস ৪	:	সুইজারল্যাণ্ড ১
গ্রীস ২	:	রোমানিয়া ২
পোর্তুগাল ২	:	গ্রীস ২
পোর্তুগাল ৩	:	রোমানিয়া ০
রোমানিয়া ২	:	সুইজারল্যাণ্ড ০
রোমানিয়া ১	:	সুইজারল্যাণ্ড ০
সুইজারল্যাণ্ড ১	:	পোর্তুগাল ১
গ্রীস ৪	:	পোর্তুগাল ২
রোমানিয়া ১	:	পোর্তুগাল ১
রোমানিয়া ১	:	গ্রীস ১

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
রোমানিয়া	৬	৩	২	১	৭	৬	৮
গ্রীস	৬	২	৩	১	১৩	৯	৭
সুইজারল্যাণ্ড	৬	২	১	৩	৫	৮	৫
পোর্তুগাল	৬	১	২	৩	৮	১০	৪

গ্রুপ—২

হাঙ্গেরি ২ : চেকোশ্লোভাকিয়া ০
হাঙ্গেরি ২ : আয়ারল্যাণ্ড ০
ডেনমার্ক ৩ : হাঙ্গেরি ২
চেকোশ্লোভাকিয়া ২ : আয়ারল্যাণ্ড ১
চেকোশ্লোভাকিয়া ৩ : ডেনমার্ক ০
ডেনমার্ক ২ : আয়ারল্যাণ্ড ০
চেকোশ্লোভাকিয়া ৩ : হাঙ্গেরি ৩
হাঙ্গেরি ৩ : ডেনমার্ক ০
চেকোশ্লোভাকিয়া ৩ : আয়ারল্যাণ্ড ০
চোকোশ্লোভাকিয়া ১ : ডেনমার্ক ০
আয়ারল্যাণ্ড ১ : ডেনমার্ক ১
হাঙ্গেরি ৪ : আয়ারল্যাণ্ড ০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
হাঙ্গেরি	৬	৪	১	১	১৬	৬	৯
চেকোশ্লোভাকিয়া	৬	৪	১	১	১২	৬	৯
ডেনমার্ক	৬	২	১	৩	৬	১০	৫
আয়ারল্যাণ্ড	৬	০	১	৫	৪	১৩	১

প্লে-অফ্ চেকোশ্লোভাকিয়া ৪ : হাঙ্গেরি ১

গ্রুপ—৩

পূর্ব জার্মানী ২ : ইতালি ২
ইতালি ১ : ওয়েলস ০
পূর্ব জার্মানী ৩ : ওয়েলস ১
ইতালি ৪ : ওয়েলস ১
পূর্ব জার্মানী ২ : ওয়েলস ১
ইতালি ৩ : পূর্ব জার্মানী ০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ইতালি	৪	৩	১	০	১০	৩	৭
পূর্ব জার্মানী	৪	২	১	১	৭	৪	৫
ওয়েলস	৪	০	০	৪	৩	১০	০

গ্রুপ—৪

রাশিয়া ২	:	উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ০
উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ০	:	রাশিয়া ০
উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ৪	:	তুরস্ক ১
রাশিয়া ৩	:	তুরস্ক ০
উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ৩	:	তুরস্ক ০
রাশিয়া ৩	:	তুরস্ক ১

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
রাশিয়া	৪	৩	১	০	৮	১	৭
উত্তর আয়ারল্যাণ্ড	৪	২	১	১	৭	৪	৫
তুরস্ক	৪	০	০	৪	২	১৩	০

গ্রুপ—৫

ফ্রান্স ৩	:	সুইডেন ০
সুইডেন ২	:	ফ্রান্স ০
নরওয়ে ১	:	ফ্রান্স ০
ফ্রান্স ৩	:	নরওয়ে ১
সুইডেন ৫	:	নরওয়ে ০
সুইডেন ৫	:	নরওয়ে ২

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
সুইডেন	৪	৩	০	১	১২	৫	৬
ফ্রান্স	৪	২	০	২	৬	৪	৪
নরওয়ে	৪	১	০	৩	৪	১৩	২

গ্রুপ—৬

স্পেন ২	:	যুগোশ্লাভিয়া ১
যুগোশ্লাভিয়া ০	:	স্পেন ০
স্পেন ১	:	বেলজিয়ম ১
বেলজিয়ম ২	:	স্পেন ১
স্পেন ৬	:	ফিনল্যাণ্ড ০

ফিনল্যাণ্ড ২	:	**স্পেন ০**
যুগোশ্লাভিয়া ৪	:	**বেলজিয়ম ০**
বেলজিয়ম ৩	:	**যুগোশ্লাভিয়া ০**
যুগোশ্লাভিয়া ৯	:	**ফিনল্যাণ্ড ১**
যুগোশ্লাভিয়া ৫	:	**ফিনল্যাণ্ড ১**
বেলজিয়ম ৬	:	**ফিনল্যাণ্ড ১**
বেলজিয়ম ২	:	**ফিনল্যাণ্ড ১**

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
বেলজিয়ম	৬	৪	১	১	১৪	৮	৯
যুগোশ্লাভিয়া	৬	৩	১	২	১৯	৭	৭
স্পেন	৬	২	২	২	১০	৬	৬
ফিনল্যাণ্ড	৬	১	০	৫	৬	২৮	২

গ্রুপ—৭

পশ্চিম জার্মানী ৩	:	**স্কটল্যাণ্ড ২**
স্কটল্যাণ্ড ১	:	**পশ্চিম জার্মানী ১**
পশ্চিম জার্মানী ১	:	**অস্ট্রিয়া ০**
পশ্চিম জার্মানী ২	:	**অস্ট্রিয়া ০**
পশ্চিম জার্মানী ১২	:	**সাইপ্রাস ০**
পশ্চিম জার্মানী ১	:	**সাইপ্রাস ০**
স্কটল্যাণ্ড ২	:	**অস্ট্রিয়া ১**
অস্ট্রিয়া ২	:	**স্কটল্যাণ্ড ০**
স্কটল্যাণ্ড ৮	:	**সাইপ্রাস ০**
স্কটল্যাণ্ড ৫	:	**সাইপ্রাস ০**
অস্ট্রিয়া ৭	:	**সাইপ্রাস ১**
অস্ট্রিয়া ২	:	**সাইপ্রাস ১**

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
পশ্চিম জার্মানী	৬	৫	১	০	২০	৩	১১
স্কটল্যাণ্ড	৬	৩	১	২	১৮	৭	৭
অষ্ট্রিয়া	৬	৩	০	৩	১২	৭	৬
সাইপ্রাস	৬	০	০	৬	২	৩৫	০

গ্রুপ—৮

নেদারল্যাণ্ডস ২	:	লুক্সেমবার্গ ০
নেদারল্যাণ্ডস ৪	:	লুক্সেমবার্গ ০
বালগেরিয়া ২	:	লুক্সেমবার্গ ১
পোল্যাণ্ড ৮	:	লুক্সেমবার্গ ১
পোল্যাণ্ড ৫	:	লুক্সেমবার্গ ১
নেদারল্যাণ্ডস ১	:	বালগেরিয়া ১
বালগেরিয়া ২	:	নেদারল্যাণ্ডস ০
বালগেরিয়া ৪	:	পোল্যাণ্ড ১
নেদারল্যাণ্ডস ১	:	পোল্যাণ্ড ০
পোল্যাণ্ড ২	:	নেদারল্যাণ্ডস ১
পোল্যাণ্ড ৩	:	বালগেরিয়া ০
বালগেরিয়া ৩	:	লুক্সেমবার্গ ১

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
বালগেরিয়া	৬	৪	১	১	১২	৭	৯
পোল্যাণ্ড	৬	৪	০	২	১৯	৮	৮
নেদারল্যাণ্ডস	৬	৩	১	২	৯	৫	৭
লুক্সেমবার্গ	৬	০	০	৬	৬	২৪	০

গ্রুপ—৯

১৯৬৬-র চ্যাম্পিয়ন ইংল্যাণ্ড সরাসরি চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলে।

গ্রুপ—১০

পেরু ২	:	আর্জেণ্টিনা ২
পেরু ১	:	আর্জেণ্টিনা ০
আর্জেণ্টিনা ১	:	বলিভিয়া ০
বলিভিয়া ৩	:	আর্জেণ্টিনা ১
পেরু ৩	:	বলিভিয়া ১
বলিভিয়া ২	:	পেরু ১

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
পেরু	৪	২	১	১	৭	৫	৫
বলিভিয়া	৪	২	০	২	৬	৬	৪
আর্জেণ্টিনা	৪	১	১	২	৪	৬	৩

গ্রুপ—১১

ব্রাজিল ৬	:	ভেনেজুয়েলা ০
ব্রাজিল ৫	:	ভেনেজুয়েলা ০
ব্রাজিল ৬	:	কলম্বিয়া ২
ব্রাজিল ২	:	কলম্বিয়া ০
ব্রাজিল ১	:	প্যারাগুয়ে ০
ব্রাজিল ৩	:	প্যারাগুয়ে ০
ভেনেজুয়েলা ১	:	কলম্বিয়া ১
কলম্বিয়া ৩	:	ভেনেজুয়েলা ০
প্যারাগুয়ে ২	:	ভেনেজুয়েলা ০
প্যারাগুয়ে ১	:	ভেনেজুয়েলা ০
প্যারাগুয়ে ২	:	কলম্বিয়া ০
প্যারাগুয়ে ২	:	কলম্বিয়া ১

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
ব্রাজিল	৬	৬	০	০	২৩	২	১২
প্যারাগুয়ে	৬	৪	০	২	৬	৫	৮
কলম্বিয়া	৬	১	১	৪	৭	১২	৩
ভেনেজুয়েলা	৬	০	১	৫	১	১৮	১

গ্রুপ—১২

উরুগুয়ে ২	:	চিলি ০
চিলি ০	:	উরুগুয়ে ০
উরুগুয়ে ১	:	ইকোয়েডর ০
উরুগুয়ে ২	:	ইকোয়েডর ১
চিলি ৪	:	ইকোয়েডর ১
ইকোয়েডর ১	:	চিলি ১

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
উরুগুয়ে	৪	৩	১	০	৫	০	৭
চিলি	৪	১	২	১	৫	৪	৪
ইকোয়েডর	৪	০	১	৩	২	৮	১

গ্রুপ—১৩

(সাব-গ্রুপ—১)

হণ্ডুরাস ১	:	**কস্টারিকা ১**
হণ্ডুরাস ১	:	**কস্টারিকা ০**
কস্টারিকা ৩	:	**জামাইকা ০**
কস্টারিকা ৩	:	**জামাইকা ১**
হণ্ডুরাস ৩	:	**জামাইকা ১**
হণ্ডুরাস ২	:	**জামাইকা ০**

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
হণ্ডুরাস	৪	৩	১	০	৭	২	৭
কস্টারিকা	৪	২	১	১	৭	৩	৫
জামাইকা	৪	০	০	৪	২	১১	০

(সাব-গ্রুপ—২)

এল সালভেডর ৬	:	**সুরিনাম ০**
সুরিনাম ৪	:	**এল সালভেডর ১**
এল সালভেডর ১	:	**নেদারল্যাণ্ডস অ্যাণ্টিলেস ০**
এল সালভেডর ২	:	**নেদারল্যাণ্ডস অ্যাণ্টিলেস ১**
সুরিনাম ৬	:	**এল সালভেডর ২**
নেদারল্যাণ্ডস অ্যাণ্টিলেস ২	:	**সুরিনাম ০**

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
এল সালভেডর	৪	৩	০	১	১০	৫	৬
সুরিনাম	৪	২	০	২	১০	৯	৪
নেদারল্যাণ্ডস অ্যাণ্টিলেস	৪	১	০	৩	৩	৯	২

(সাব-গ্রুপ—৩)

গুয়াতামালা ৪	:	**ত্রিনিদাদ ০**
ত্রিনিদাদ ০	:	**গুয়াতামালা ০**
গুয়াতামালা ১	:	**হাইতি ১**
হাইতি ২	:	**গুয়াতামালা ০**

হাইতি ৪	:	**ত্রিনিদাদ ০**
ত্রিনিদাদ ৪	:	**হাইতি ২**

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
হাইতি	৪	২	১	১	৯	৫	৫
গুয়াতামালা	৪	১	২	১	৫	২	৪
ত্রিনিদাদ	৪	১	১	১	২	১২	৩

(সাব-গ্রুপ—৪)

যুক্তরাষ্ট্র ৬	:	**বার্মুডা ২**
যুক্তরাষ্ট্র ২	:	**বার্মুডা ০**
যুক্তরাষ্ট্র ১	:	**কানাডা ০**
কানাডা ৪	:	**যুক্তরাষ্ট্র ২**
কানাডা ৪	:	**বার্মুডা ০**
বার্মুডা ০	:	**কানাডা ০**

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
যুক্তরাষ্ট্র	৪	৩	•	১	১১	৬	৬
কানাডা	৪	২	১	১	৮	৩	৫
বার্মুডা	৪	০	১	৩	২	২	১

চারটি সাব-গ্রুপের প্লে-অফ্ ম্যাচ

হণ্ডুরাস ১	:	**এল সালভেডর ০**
এল সালভেডর ৩	:	**হণ্ডুরাস •**
এল সালভেডর ৩	:	**হণ্ডুরাস ২** (অতিরিক্ত সময়ে)
হাইতি ২	:	**যুক্তরাষ্ট্র ০**
যুক্তরাষ্ট্র ১	:	**হাইতি ০**
হাইতি ৩	:	**এল সালভেডর ০**
এল সালভেডর ২	:	**হাইতি ১**
এল সালভেডর ১	:	**হাইতি ০** (অতিরিক্ত সময়ে)

এল সালভেডর সর্বাধিক ৬ পয়েণ্ট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে।

গ্রুপ—১৪

উদ্যোক্তা মেক্সিকো সরাসরি চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলে।

গ্রুপ—১৫

সিওলে সাব-গ্রুপ প্রতিযোগিতায় :

অস্ট্রেলিয়া ৩	:	**জাপান ১**
দক্ষিণ কোরিয়া ২	:	**জাপান ২**
অস্ট্রেলিয়া ২	:	**দক্ষিণ কোরিয়া ২**
অস্ট্রেলিয়া ১	:	**জাপান ১**
দক্ষিণ কোরিয়া ২	:	**জাপান ০**
দক্ষিণ কোরিয়া ১	:	**অস্ট্রেলিয়া ১**

অস্ট্রেলিয়া চারটি খেলায় ৬ পয়েন্ট পেয়ে বিজয়ী।

ইজরায়েলের সাব-গ্রুপ প্রতিযোগিতায় :

ইজরায়েল ৪	:	**নিউজিল্যাণ্ড ০**
ইজরায়েল ২	:	**নিউজিল্যাণ্ড ০**

ইজরায়েল দুটি খেলায় ৪ পয়েন্ট পেয়ে বিজয়ী।

দ্বিতীয় দফায় :

অস্ট্রেলিয়া ০	:	**রোডেশিয়া ০**
অস্ট্রেলিয়া ৩	:	**রোডেশিয়া ১**

অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী

প্লে-অফ্

ইজরায়েল ১	:	**অস্ট্রেলিয়া ০**
অস্ট্রেলিয়া ১	:	**ইজরায়েল ১**

ইজরায়েল বিজয়ী

গ্রুপ—১৬

(সাব-গ্রুপ—১)

টিউনিসিয়া ২	:	**আলজিরিয়া ১**
টিউনিসিয়া ০	:	**আলজিরিয়া ০**

(সাব-গ্রুপ—২)

মরক্কো ১	:	**সেনেগাল ০**
সেনেগাল ২	:	**মরক্কো ১**

প্লে-অফ্

মরক্কো ২	:	**সেনেগাল ০**

(সাব-গ্রুপ—৩)

ইথিওপিয়া ৫	:	**লিবিয়া ১**
লিবিয়া ২	:	**ইথিওপিয়া ০**

(সাব-গ্রুপ—৪)

জাম্বিয়া ২	:	**সুদান ২**
সুদান ৪	:	**জাম্বিয়া ২**

অতিরিক্ত সময়ে গোলের গড়ে সুদান বিজয়ী।

(সাব-গ্রুপ—৫)

ক্যামেরুন ২	:	**নাইজিরিয়া ১**
নাইজিরিয়া ১	:	**ক্যামেরুন ১**

সাব-গ্রুপ—৬ এ ঘানা বাই পায়।

দ্বিতীয় রাউণ্ড :

টিউনিসিয়া ০	:	**মরক্কো ০**
মরক্কো ২	:	**টিউনিসিয়া ২**

অতিরিক্ত সময়ে ড্র হওয়ার পর লটারিতে মরক্কো জেতে।

ইথিওপিয়া ১	:	**সুদান ১**
সুদান ৩	:	**ইথিওপিয়া ১**
নাইজিরিয়া ২	:	**ঘানা ১**
ঘানা ১	:	**নাইজিরিয়া ১**

তৃতীয় রাউণ্ড :

নাইজিরিয়া ২	:	**সুদান ২**
মরক্কো ২	:	**নাইজিরিয়া ১**
সুদান ৩	:	**নাইজিরিয়া ৩**
সুদান ০	:	**মরক্কো ০**
মরক্কো ৩	:	**সুদান ০**
নাইজিরিয়া ১	:	**মরক্কো ০**

মরক্কো চারটি খেলায় ৫ পয়েণ্ট পেয়ে বিজয়ী

গ্রুপ—১

মেক্সিকো ০ : রাশিয়া ০

বেলজিয়াম ৩ : এল সালভেডর ০

(ভ্যান মোর ২, লাম্বার্ট-পেনাল্টি)

বিরতি ১-০

রাশিয়া ৪ : বেলজিয়াম ১

(বাইশেভেজ ২, আসাটিয়ানি, কেমেলনিস্কি) (লাম্বার্ট)

বিরতি ১-০

মেক্সিকো ৪ : এল সালভেডর ০

(ভালডিভিয়া, ফ্রাগোসো, বাসাগুরেন)

বিরতি ১-০

রাশিয়া ২ : এল সালভেডর ০

(বাইশেভেজ)

বিরতি ০-০

মেক্সিকো ১ : বেলজিয়াম ০

(পেনা-পেনাল্টি)

বিরতি ১-০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
রাশিয়া	৩	২	১	০	৬	১	৫
মেক্সিকো	৩	২	১	০	৫	০	৫
বেলজিয়াম	৩	১	০	২	৪	৫	২
এল সালভেডর	৩	০	০	৩	০	৯	০

গ্রুপ—২

উরুগুয়ে ২ : ইজরায়েল ০

(ম্যানিরো, মুজিকা)

বিরতি ১-০

ইতালি ১ : সুইডেন ০

(ডোমেনঘিনি)

বিরতি ১-০

উরুগুয়ে ০	:	**ইতালি ০**
সুইডেন ১	:	**ইজরায়েল ১**
(টুরেসন)		(স্পিগলার)

বিরতি ০-০

সুইডেন ১	:	**উরুগুয়ে ০**
(গ্রান)		

বিরতি ০-০

ইতালি ০	:	**ইজরায়েল ০**

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ইতালি	৩	১	২	০	১	০	৪
উরুগুয়ে	৩	১	১	১	২	১	৩
সুইডেন	৩	১	১	১	২	২	৩
ইজরায়েল	৩	০	২	১	১	৩	২

গ্রুপ—৩

ইংল্যাণ্ড ১	:	**রোমানিয়া ০**
(হার্স্ট)		

বিরতি ০-০

ব্রাজিল ৪	:	**চেকোশ্লোভাকিয়া ১**
(রিভেলিনো, পেলে, জেয়ারজিনো ২)		(পেত্রাস)

বিরতি ১-১

রোমানিয়া ২	:	**চেকোশ্লোভাকিয়া ১**
(নিগু, ডুমিত্রাশ-পেনাল্টি)		(পেত্রাস)

বিরতি ০-১

ব্রাজিল ১	:	**ইংল্যাণ্ড ০**
(জেয়ারজিনো)		

বিরতি ০-০

ব্রাজিল ৩	:	**রোমানিয়া ২**
(পেলে ২, জেয়ারজিনো)		(ডুমিত্রাশ, ডেমব্রভস্কি)

বিরতি ২-১

ইংল্যাণ্ড ১ : **চেকোশ্লোভাকিয়া ০**
(ক্লার্ক-পেনাল্টি)

বিরতি ০-০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
ব্রাজিল	৩	৩	০	০	৮	৩	৬
ইংল্যাণ্ড	৩	২	০	১	২	১	৪
রোমানিয়া	৩	১	০	২	৪	৫	২
চেকোশ্লোভাকিয়া	৩	০	০	৩	২	৭	০

গ্রুপ—৪

পেরু ৩ : **বালগেরিয়া ২**
(গ্যালার্ডো, চুম্পিতাজ, কুবিল্লাস) (ডারমানজিয়েভ, বোনেভ)

বিরতি ০-১

পশ্চিম জার্মানী ২ : **মরক্কো ১**
(জিলার, মূলার) (হুমেন)

বিরতি ০-১

পেরু ৩ : **মরক্কো ০**
(কুবিল্লাস ২, চালে)

বিরতি ০-০

পশ্চিম জার্মানী ৫ : **বালগেরিয়া ২**
[লিবুডা, মূলার ৩ (১ পেনাল্টি)] (নিকোডিমভ, কোলেভ)

বিরতি ২-১

পশ্চিম জার্মানী ৩ : **পেরু ১**
(মূলার) (কুবিল্লাস)

বিরতি ৩-১

মরক্কো ১ : **বালগেরিয়া ১**
(জেচেভ)

বিরতি ১-০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
পশ্চিম জার্মানী	৩	৩	০	০	১০	৪	৬
পেরু	৩	২	০	১	৭	৫	৪
বালগেরিয়া	৩	০	১	২	৫	৯	১
মরক্কো	৩	০	১	২	২	৬	১

কোয়ার্টার ফাইনাল

লিয়ঁতে

পশ্চিম জার্মানী ৩ : ইংল্যাণ্ড ২

(অতিরিক্ত সময়ের পরে বেকেনবাউয়ের, জিলার, মূলার) (মূলারি, পিটার্স)

বিরতি ০-১

মেয়ার ; স্লেলিঙ্গার, ফোগ্‌টস, হজেস (শুল্‌জ) ; বেকেনবাউয়ের, ফিচেল, ওভারাথ, জিলার ; লিবুডা (গ্রাবোস্কি), মূলার, লোহার।

বনেট্টি ; নিউটন, কুপার ; মূলারি, লেবনে, মুর ; লি, বল, হার্স্ট, চাল´টন (বেল), পিটার্স (হাণ্টার)।

গুয়াদালাজারায়

ব্রাজিল ৪ : পেরু ২

(রিভেলিনো, টোস্টাও ২, জেয়ারজিনো) (গ্যালার্ডো, কুবিল্লাস)

বিরতি ২-১

ফেলিক্স ; কার্লস অ্যালবার্টো, ব্রিটো, পিয়াজ্জা, মার্কো অ্যাণ্টানিয়ো ; ক্লোডোয়াল্ডো, গার্সন (পাওলো সিজার) ; জেয়ারজিনো (রবার্টো), টোস্টাও, পেলে, রিভেলিনো।

রুবিনোস ; ক্যাম্পস, ফার্নাণ্ডেজ, চুম্পিতাজ, ফুয়েন্টেস ; মিফ্লিন, চালে ; বেলন (সটিল), পেরিকো লিয়ঁ (এলডিও রেয়েস), কুবিল্লাস, গ্যালার্ডো।

তলুকায়

ইতালি ৪ : মেক্সিকো ১

(ডোমেনঘিনি, রিভা ২, রিভেরা) (গঞ্জালেজ)

বিরতি ১-১

আলবেত্রশি ; বার্গনিশ, সেরা, রোসাতো, ফ্যাচেত্তি ; বার্তিনি, মাজোলা (রিভেরা), ডে সিস্টি ; ডোমেনঘিনি (গোরি), বনিনসেগনা, রিভা।

কালডেরন ; ভ্যাস্তোলরা, পেনা, গুজম্যান, পেরেজ ; গঞ্জালেজ (বোর্জা), পুলিডো, মাঙ্গুইয়া (ডিয়াজ) ; ভালডিভিয়া, ফ্রাগোসো, পাদিল্লা।

মেক্সিকো সিটিতে

উরুগুয়ে ১ : **রাশিয়া ০**

(অতিরিক্ত সময়ের পরে এসারাগো)

মাজুরকিউইজ ; উবিনাস, আনচেটা, মাটোসাস, মুজিকা ; মানিরো, কোর্টেস, মন্তেরো কাস্টিলো ; কুবিল্লা, ফন্টেস (গোমেজ), মোরালেস (এসপারাগো)।

কাভাজাসভিলি ; জজুয়াসভিলি, অ্যাফনিন, খুর্তশিলাভো (লোগোফেট), চেস্তারনিজেভ ; মুস্তিজান, আসাতিয়ানি (কিসেলেভ), কাপলিচনি ; এভরিয়ুঝকিনঝিন, বাইশেভেজ, খেমেলনিঝকি।

সেমিফাইনাল

মেক্সিকো সিটিতে

ইতালি ৪ : **পশ্চিম জার্মানী ৩**

(অতিরিক্ত সময়ের পরে বনিনসেগনা, বার্গানিশ, রিভা, রিভেরা)

(শ্নেলিঙ্গার, মুলার ২)

বিরতি ০-১

আলবেত্রশি ; সেরা, বার্গনিশ, রোসাতো (পলেত্তি), ফ্যাচেত্তি ; ডোমেনঘিনি, মাজোলা (রিভেরা), ডে সিস্টি ; বনিনসেগনা, রিভা।

মেয়ার ; শ্নেলিঙ্গার, ফোগটস, শুল্জ, বেকেনবাউয়ের ; প্যাৎকে (হেল্ড), জিলার, ওভারাথ ; গ্রাবোস্কি, মূলার, লোহের (লিবুডা)।

গুয়াদালাজারায়

ব্রাজিল ৩ : **উরুগুয়ে ১**

(ক্লোডোয়াল্ডো, জেয়ারজিনো, রিভেলিনো)

(কুবিল্লা)

বিরতি ১-১

ফেলিক্স ; কার্লস অ্যালবার্টো, ব্রিটো, পিয়াজ্জা, এভারাল্ডো ; ক্লোডোয়াল্ডো, গার্সন ; জেয়ারজিনো, টোস্টাও, পেলে, রিভেলিনো।

মাজুরকিউইজ ; উবিনাস, আনচেটা, মাটোসাস, মুজিকা ; মস্তেরো কাস্টিলো, কোর্টেস, ফন্টেস ; কুবিল্লা, মানিরো (এসপারাগো), মোরালেস।

তৃতীয় স্থান নির্ণয়

মেক্সিকো সিটিতে

পশ্চিম জার্মানী ১ : উরুগুয়ে ০

(ওভারাথ)

বিরতি ১-০

ওল্টার ; স্নেলিঙ্গার (লোরেঞ্জ) ; পাৎকে, ফিচেল, ওয়েবের, ফোগট্‌স ; জিলার, ওভারাথ ; লিবুডা (লোহের), মূলার, হেল্ড।

মাজুরকিউইজ ; উবিনাস, আনচেটা, মাটোসাস, মুজিকা ; মস্তেরো কাস্টিলো, কোর্টেস, ফন্টেস (স্যাণ্ডেভাল) ; কুবিল্লা, (মানিরো (এসপারাগো), মোরালেস।

ফাইনাল (মেক্সিকো সিটিতে ২১.৬.৭০—দর্শক ১ লক্ষ ১০ হাজার)

ব্রাজিল ৪ : ইতালি ১

(পেলে, গার্সন, জেয়ারজিনো, কার্লস অ্যালবার্টো)

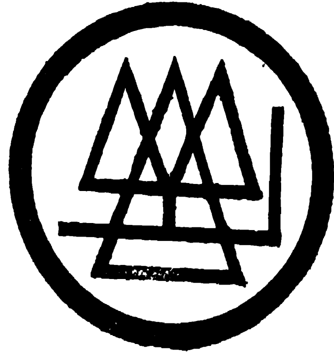
(বনিনসেগনা)

বিরতি ১-১

ফেলিক্স ; কার্লস অ্যালবার্টো, ব্রিটো, পিয়াজ্জা, এভারাল্ডো ; ক্লোডোয়াল্ডো, গার্সন ; জেয়ারজিনো, টোস্টাও, পেলে, রিভেলিনো।

আলবেত্রশি ; সেরা, বার্গনিশ, বার্টিনি (জুলিয়ানো), রোসাতো, ফ্যাচেত্তি ; ডোমেনঘিনি, মাজোলা, ডে সিস্টি ; বনিনসেগনা (রিভেরা), রিভা।

পশ্চিম জার্মানী



বিজয়ী পশ্চিম জার্মানীর ব্যাজ

মিউনিখে অলিম্পিক গেমসের আয়োজন ও সফল সমাপ্তির জন্য যেমন পশ্চিম জার্মানী বিশ্ব-ক্রীড়া ইতিহাসে স্মরণীয় হয়েছে, তেমনি নয়া নজির সৃষ্টি করল এই দেশ এর বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজন দ্বারাও। চুয়াল্লিশ বছরের বিশ্বকাপ ফুটবলে এমন রাজসূয় আয়োজন, এমন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কখনও দেখা যায়নি। ফিফা সাংগঠনিক কমিটি মেক্সিকোয় বিশ্বকাপের স্থান নির্দিষ্ট করে যত বদনামের ভাগী হয়েছিলেন, পশ্চিম জার্মানীকে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের দায়িত্ব দিয়ে তার দ্বিগুণেরও বেশি প্রশংসা কুড়োলেন। জার্মানীর এই আয়োজনকে ফুটবলের মহোৎসব আখ্যা দেওয়া হল। কিন্তু এবারের চূড়ান্ত পর্যায়ে দেখা মিলল না চ্যাম্পিয়ন ইংল্যাণ্ডের। তারা প্রাথমিক পর্যায়েই বিদায় নেয়। 'তিনবারের চ্যাম্পিয়ন পেলে-বিহীন ব্রাজিলের স্থান হল চতুর্থ। আর সত্তর বছর পরে ফিফার কর্তৃত্ব ইউরোপ থেকে অন্য মহাদেশে চলে গেল। স্যার স্ট্যানলি রাউসের বদলে সভাপতি হলেন ব্রাজিলের জোয়াও হাভেলানজ। হারম্যান মুবের্জারের নেতৃত্বে বিশ্বকাপের সংগঠক কমিটি এখানে কাজ আরম্ভ করেন ছ'বছর আগে

বলাবাহুল্য জার্মানীতে বিশ্বকাপ ফুটবলের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু এই । এতদিন বিশ্বের সেরা ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের দেওয়া হত সোনার পরী—জুল রিমে কাপ। ব্রাজিল তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনার পরী চিরতরের জন্য দখল করে মেক্সিকোয়। জুল রিমে

ট্রফি-র বদলে এবার তাই প্রবর্তন হল ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের। চূড়ান্ত পর্যায়েও খেলা হল লীগ পদ্ধতিতে, তুলে দেওয়া হল কোয়ার্টার ও সেমিফাইনাল।

১৯৫৮জুন ও জুলাই মাসে পশ্চিম জার্মানীতে এই প্রতিযোগিতার জন্য নতুন স্টেডিয়াম তৈরী হল। পুরনো স্টেডিয়ামগুলির সংস্কার হল, করা হল সর্বাধুনিক। ফিফার প্রতিনিধিরূপে একাজ করল পশ্চিম জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কমিটি। স্থির হল মিউনিখে হবে ফাইনাল ও তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলা। আর অন্যান্য ম্যাচ হামবুর্গ, পশ্চিম বার্লিন, হ্যানোভার, ডর্টমুণ্ড, গেলসেনকিরখেন, মিউনিখ ডুসেলডর্ফে'র। সাতটি শহরের ন'টি স্টেডিয়ামে এমনভাবে খেলাগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হল যাতে বিশ্বের সেরা ষোলটি ফুটবল দলের খেলায় দর্শক সংকুলানে অসুবিধা না হয়; প্রতিটি শহরে বিদেশীদের আহার ও থাকারও সুবন্দোবস্ত হল।

ফুটবলে প্রীতি এদেশে আগেই ছিল, বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে এই প্রতিযোগিতার এক বছরের মধ্যে দেশের প্রায় সাড়ে ষোল হাজার ক্লাবে সদস্য বাড়ল দেড লক্ষ অর্থাৎ মোট সদস্য দাঁড়াল পনের লক্ষ। জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদিত প্রথম শ্রেণীর দল ৯৪টি এবং ৯০০টি জুনিয়র ও স্কুল দল রয়েছে। এরা সারা বছর নিয়মিতভাবে নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তাই বিশ্বকাপ নানা শহরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এদের কথাও বিবেচনা করে।

১৯৫৮-য় সুইডেনের মত অত বেশি জায়গায় বিশ্বকাপের খেলা হয়নি। এরা বারোটি কেন্দ্রে বিশ্বকাপের আয়োজন করেছিল। চিলিতে চারটি শহরে, ১৯৫৮-তে ইংল্যাণ্ডে সাতটি শহরের আটটি স্টেডিয়ামে এবং ১৯৫৮-এ মেক্সিকোয় পাঁচটি কেন্দ্রে। জার্মানীতে ন'টি শহরে খেলার ব্যবস্থা হলেও দর্শক বা বিভিন্ন দলের এক শহর থেকে আর এক শহরে যেতে কোন অসুবিধা ছিল না, চমৎকার যানবাহনের দরুন। সুবিধা হল উদ্যোক্তাদেরও, ৪৮টি ম্যাচ তাঁরা সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করলেন। ফ্রাঙ্কফুর্টে রইল প্রতিযোগিতার প্রধান কার্যালয়। এগারজন সদস্যের সাংগঠনিক কমিটির পুরোধা বা চেয়ারম্যান হারম্যান নুবের্জার। ওলিম্পিক গেমসের সময় তাঁরা মিউনিখ ওলিম্পিক স্টেডিয়ামটি পরীক্ষা করলেন—বিশ্বকাপ ফাইনাল করা সম্ভব কিনা। ডুসেলডর্ফে'র রাইন স্টেডিয়াম সংস্কার করা হল, তার কলেবরও বৃদ্ধি পেল। হামবুর্গে নতুন ফোগসপার্ক স্টেডিয়াম তৈরি হল। গেলসেনকিরখেন ও ডর্টমুণ্ডেও নতুন স্টেডিয়াম হল। নতুন আদল নিল হ্যানোভারের লোয়ার

স্যাক্সনি স্টেডিয়াম। বার্লিনের ওলিম্পিয়া স্টেডিয়ামে নতুন ছাদ তৈরি হল। সরকারের সহযোগিতায় মিউনিখ বাদে এই বিশ্বকাপের জন্য ২৫ কোটি জার্মান মার্ক বরাদ্দ হল ঘর-বাড়ি নির্মাণ বাবদ। স্টেডিয়ামগুলির মধ্যে সর্বাধিক আসন রইল পঁচাশি হাজার পশ্চিম বার্লিনে এবং সর্বনিম্ন ডর্টমুণ্ডে সাড়ে তিপ্পান্ন হাজার।

দীর্ঘ পরিকল্পনার পর সাংগঠনিক কমিটি অগ্রিম টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে আটত্রিশটি ম্যাচের জন্য মোট টিকিট ২১,২৯,০০০। প্রথম দফার টিকিট বিক্রি শুরু হয় ১৯৫৮-এর ২ এপ্রিল জার্মানীতে। সাড়ে বারো লক্ষ টিকিট অগ্রিম বিক্রির ব্যবস্থা হলেও অন্যান্য দেশের জন্য চার লক্ষ সত্তর হাজার টিকিট সংরক্ষিত রাখা হয়। এছাড়াও বেশ কিছু টিকিট সংরক্ষিত রাখা হয় জরুরী প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের জাতীয় ও জার্মানীর রাজ্য সংস্থাগুলির জন্য।

৬ জুলাই যে মিউনিখ ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে ফাইনাল হল, সেখানে মোট আসন ৭৪,২২৮-এর মধ্যে ১,২০০ টিকিট শুধু সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের জন্য। রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির জন্য বরাদ্দের পর সত্তর হাজার রইল সাধারণ দর্শকদের জন্য। এর ত্রিশ হাজার অগ্রিম বিক্রি করা হয়। ২০৮টি অগ্রিম বিক্রি কেন্দ্র থেকে এর ২ এপ্রিল ভাউচার বণ্টন শুরু হয়। ১৬ এপ্রিল থেকে ওই ভাউচার দেখাবার পর টিকিট দেওয়া হয়। টিকিট জাল থেকে অব্যাহতির জন্য এই ব্যবস্থা। বিদেশে টিকিট বিক্রি হয় জার্মান বিমান সংস্থা লুফৎহানসা মারফৎ। উদ্যোক্তারা নজর রাখেন যাতে টিকিট ক্রেতাদের দূরের শহরে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে না হয়। টিকিট মজুত ও কালোবাজারে তা বিক্রির ব্যাপারেও কঠোরতা অবলম্বিত হল। কিন্তু কালোবাজারে টিকিট বিক্রি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। পশ্চিম জার্মানী-নেদারল্যাণ্ডসের ফাইনালের দিনের টিকিটের দামও ছিল আকাশ-ছোঁয়া।

ব্যাপক আয়োজন হল সাংবাদিকদের জন্য। প্রথম রাউণ্ডের খেলাগুলির জন্য প্রতিটি স্টেডিয়ামে চারশ' সাংবাদিকের পৃথক আসন ও দ্বিতীয় রাউণ্ডের জন্য ছয়শ' পৃথক আসন রইল। মিউনিখে তৃতীয় স্থান ও ফাইনালের দিনে আসন ছিল বারোশ'। এছাড়া রেডিও এবং টেলিভিশনের জন্য পঞ্চাশ থেকে একশ'টি আসন বিভিন্ন পরিশনে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য প্রেসরুমে প্রায় একশ' টেলিফোন, পনেরটি টেলিপ্রিণ্টার ও প্রয়োজনমত সরাসরি টেলেক্সেরও ব্যবস্থা হল। কেননা, উদ্যোক্তারা চেয়েছিলেন,

ওলিম্পিকসের মত ১৯৫৮-এর বিশ্বের বৃহত্তম ফুটবল মহোৎসবের প্রচারে যেন কোনো ত্রুটি না থাকে। ওলিম্পিকের মত বিশ্বকাপের এই বিরাট ব্যয় মেটাতে জার্মান সরকারকে খুব বেশি খরচ করতে হয়নি। দুটি ক্রীড়া যজ্ঞেরই বেশ পরিমাণ অর্থ আসে 'গ্লুক স্পিরেল' লটারির মাধ্যমে।

পশ্চিম জার্মানীর ফুটবল পরিচালকদের ১৯৫৮ বিশ্বকাপ চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা সর্বকালের বৃহত্তম ফুটবল অনুষ্ঠান। আর সেই অনুষ্ঠানে সেরা শিরোপা পেল উদ্যোক্তা দেশ। নতুন ফিফা কাপ জিতল তারা। এই প্রতিযোগিতা থেকে গৃহীত হয়েছে ৩১০ লক্ষ ডলার। প্রায় দু' কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষ পশ্চিম জার্মানীর আটটি শহরের ন'টি স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়ে খেলা দেখেছেন। টেলিভিশন দর্শক ও রেডিওর শ্রোতা ছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আরও একশ' কোটি। পশ্চিম জার্মানী ও নেদারল্যাণ্ডসের ফাইনাল দেখার টিকিটের কালোবাজারী দর ছিল গগনচুম্বী। ৩০ মার্ক অর্থাৎ ৩ টাকা ৪৬ পয়সা দামের টিকিট বিক্রি হয়েছে ১,৫০০ মার্কে অর্থাৎ ৫,১৯০ টাকায়। ফাইনাল পর্যায়ে উন্নীত ষোলটি দলের প্রত্যেকটি দল পেয়েছে ৭৮,৪৩৯ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৭,০৫,৮৭০ টাকা করে। বিজয়ী পশ্চিম জার্মানীর প্রত্যেক খেলোয়াড় পেয়েছেন আমাদের হিসাবে ২,১০,০০০ টাকা। নামী পেশাদার ফুটবলারদের কাছে এই টাকাটা অবশ্য তেমন কিছু নয়। কারণ, নেদারল্যাণ্ডসের অধিনায়ক যোহান ক্রুয়েফের দৈনিক আয় পনের হাজার টাকা। স্পেনের বার্সিলোনা ক্লাব ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকায় তাঁকে কিনেছিল অ্যাজাক্স আমস্টার্ডাম ক্লাবের কাছ থেকে।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে পশ্চিম জার্মানী শুধু 'ফিফা' কাপই জেতেনি, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলার সুবাদে ৩২ পয়েন্ট অর্জন করে 'ফেয়ার প্লে' কাপও পেল। এদিক থেকে ৩০ পয়েন্ট পেয়ে পোল্যাণ্ডের স্থান দ্বিতীয়, ২৫ পয়েন্টে নেদারল্যাণ্ডসের স্থান তৃতীয়। সর্বাধিক গোল করায় পোল্যাণ্ড ১০ হাজার মার্ক দামের গোল্ড কাপ পেয়েছে।

বিশ্বকাপ ফুটবলে দর্শকদের জন্য ইতিপূর্বে কখনও বীমা করা হয়নি। পশ্চিম জার্মানীর উদ্যোক্তারা মিউনিখে ফাইনালের প্রতিটি টিকিটের সঙ্গে বীমার দামও ধরে রাখেন। টিকিটধারী কেউ হতাহত হলে উদ্যোক্তারা মাথা-পিছু সত্তর হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। উদ্যোক্তারা বেশি নজর রাখেন বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা সম্পর্কে। কেননা, মিউনিখ ওলিম্পিকের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁদের রয়েছে। প্রতিযোগিতার কয়েকদিন আগে ১১ জুন পশ্চিম

জার্মানীর জেল থেকে দুই প্যালেস্টানীয়কে মুক্ত করে কায়রোর বিমানে তুলে দেওয়া হল। নিরাপত্তার কঠোরতা সম্পর্কে একদিন তো অবাক হয়ে স্কটল্যাণ্ড দলের ম্যানেজার বললেন: My God, is this what sport has come to? সেদিন ফ্রাঙ্কফুর্ট স্টেডিয়ামের উপর দিয়ে ঘনঘন হেলিকপ্টার ঘোরাঘুরি করছিল এবং প্রতিটি হেলিকপ্টারে ছিল হেলমেট পরা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য। আসলে জার্মান সরকার ও ফুটবল কর্তৃপক্ষ কোন ঝুঁকি নিতে চাননি।

এবারের বিশ্বকাপে যেমন রেকর্ড দর্শক হয়েছে, তেমনি আরও আগের সব নজিরকে ম্লান করেছে। পাওয়া গেছে ৩১০ লক্ষ ডলার।

খেলা দেখে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এতদিন মিড-ফিল্ডে স্ট্রাইকারের বেশি আনাগোনা ছিল। কিন্তু এবারের বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা বলে দিল, ফ্লাঙ্কের ও মিড-ফিল্ডের সব খেলোয়াড়ই সমভাবে সক্রিয়। তাঁরা প্রত্যেকেই গোলের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। নেদারল্যাণ্ডস দেখাল আগামীদিনের ফুটবল কীভাবে খেলতে হবে। বিশেষজ্ঞরা খুশি হতে পারেননি গোলের সংখ্যায়। ৩৮টি খেলায় ৯৭টি গোল হয়েছে। অর্থাৎ গোলের গড়—খেলা পিছু ২.৫৫। এর ২৮টি গোলই জাইর ও হাইতির বিপক্ষে হয়।

ব্রাজিল এই নিয়ে দশমবার (রেকর্ড) বিশ্বকাপ ফাইনাল রাউণ্ডে খেলল। এই পর্যায়ে প্রথম খেলল এবার জাইর, অস্ট্রেলিয়া ও হাইতি।

এবারের প্রতিযোগিতা শেষে স্পষ্ট হল, এই প্রতিযোগিতার আয়োজন বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। প্রতিযোগীর সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে বিশ্বকাপের খেলা প্রাথমিক পর্যায়ে লীগের বদলে পৃথিবী জুড়ে নক্-আউট পদ্ধতিতে করা ছাড়া উপায় নেই। আর চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দল বাই পেয়ে ফাইনাল রাউণ্ডে আসে। ফাইনাল রাউণ্ডে সরাসরি খেলার যোগ্যতা যদি উদ্যোক্তা দেশ পায়, তবে তৃতীয় স্থানাধিকারী দেশও কেনই বা বঞ্চিত হবে? মনে হয় এতে সংগঠকদের কাজের অনেক সুবিধা হবে।

বিশ্বকাপ শুরুর আগে ব্রাজিলের জোয়াও মারি হাভেলান্জ ফিফার সভাপতি হলেন ১১ জুন। ফিফা কংগ্রেসে ৬৬-৫২ ভোটে বর্তমান সভাপতি স্যার স্ট্যানলি রাউসকে পরাস্ত করলেন। রাউস গত ১৩ বছর এই পদে ছিলেন।

তাইওয়ানের বদলে চীনকে নেওয়ার প্রস্তাব ৫৯ জন সমর্থন করেন। বিরুদ্ধে ছিলেন ৪৭ জন। প্রস্তাব গৃহীত হতে তিন-চতুর্থাংশ সমর্থন প্রয়োজন ছিল। তাই চীন ফিফার সদস্য হতে পারল না।

ব্রাজিলের ম্যানেজার মারিও জাগালোর ধর্মভীরুতা ও নানা সংস্কারে বিশ্বাস এ মেক্সিকোতেই ছিল। জার্মানীতে আসার আগে এই চার বছরে ওইসবে তাঁর বিশ্বাস আরও বেড়েছে। জার্মানীতে ব্রাজিল দলে নানা বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। এর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য লুইস পেরিরা। যেমন দুঃসাহসী, তেমনি দ্রুত দৌড়তে পারেন। কিন্তু ফাইনালের আগেই তিনবারের চ্যাম্পিয়ন দল বিদায় নিলে স্বদেশে খেলোয়াড়দের কুশপুত্তলিকা পোড়ান হল।

নেদারল্যাণ্ডস অ্যাডভেঞ্চারার্স ফুটবল খেলেছে গোটা প্রতিযোগিতায়। যদিও তাদের ডিফেন্সে কিছুটা দুর্বলতা ছিল, তবুও তা তেমন চোখে পড়েনি। এর বিশ্বকাপে এত সুন্দর ফুটবল কেউ খেলেনি। তাদের আক্রমণে যে গতি, বৈচিত্র্য এবং পরিকল্পনা ছিল তা ক্যাসিয়াস ক্লে ওরফে মহম্মদ আলির বক্সিং-এর সঙ্গেই তুলনীয়। এই ধরনের খেলায় 'অ্যান্টি-ক্লাইমাক্সই' দেখা যায় পরিণতিতে। ফাইনালে তাই-ই হল। নেদারল্যাণ্ডস হারল। ক্রুয়েফের বিদ্যুৎগতির দৌড়ের পরক্ষণেই নেদারল্যাণ্ডস প্রথম মিনিটে পেনাল্টি পেয়ে যে গোলটি করে, তখনই পরাজয়ের বীজ বপন হয়ে যায়। এরপর তারা একটু সাবধানতা অবলম্বন করে। অথচ আগের আগের খেলায় জিততে কখনও তারা এই নীতি অনুসরণ করেনি। অবশ্য বিরতির পর খেলার ধারা বদল করেছিল। কিন্তু মন্দভাগ্য তাদের ফিফা কাপ জিততে দেয়নি।

কাপ জয়ের জন্য পশ্চিম জার্মানীর নানা প্রয়াস ছিল, নানান গুণেরও সমাহার করেছিল তারা এবং সবকিছুর মূলে ছিলেন ম্যানেজার হেলমুট শ্যোন। তৃতীয় পুরস্কার পেয়ে পোল্যাণ্ড খুব খুশি ছিল। তাদের এই জয় যোগ্যতারই পুরস্কার। সুইডেনকেও বহুদিন চুয়াত্তরের দর্শকরা স্মৃতিতে রাখবেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রথম রাউণ্ডে স্কটল্যাণ্ড বিদায় নিলেও ষোলটি দেশের মধ্যে তারা অন্যতম অপরাজিত দল। পরে স্কটল্যাণ্ডে তাদের ম্যানেজারের নামে রাস্তা হল। স্কটল্যাণ্ড তার গ্রুপে সন্ত্রস্ত করেছিল ব্রাজিল ও যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে যথাক্রমে ০-০ ও ১-১ ড্র করে। তাই জার্মানী থেকে তারা যখন গ্লাসগো বিমানঘাঁটিতে পৌঁছল, দশহাজার জনতা এল অভিনন্দন জানাতে। কেননা, দীর্ঘকাল শোচনীয় ফলের পর এবার তারা কিছুটা মান রেখেছে। একটি রাস্তা হল ম্যানেজার উইলি অরমণ্ডের নামে। এডিনবরা কাস্‌ল-এ ওদের সম্মানে নৈশ ভোজও হল। তাদের সাধনা শুধু

এটুকুতে—'বিশ্বকাপে আমরা অপরাজিত।' জার্মানীতে দুই নম্বর গ্রুপে চারটি দলের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডের স্থান ছিল তৃতীয়। তারা হারায় শুধু জাইরকে।

ব্রাজিলে ঠিক বিপরীত দৃশ্য। তাদের জাতীয় গৌরব শুধু নয়, বিশ্ব-ফুটবলের গৌরব ব্রাজিলের মত রেকর্ড কারুর নেই। দল জার্মানীতে যাওয়ার সময় ব্রাজিলের নাগরিকরা স্থির করেন, এর বিশ্বকাপ জিতে ফেরার আগেই খেলোয়াড়, ম্যানেজার প্রমুখের মূর্তি তৈরি করে রাখা হবে। কিন্তু তাদের ফল দেখে ওই নাগরিকরাই কুশপুত্তলিকা দাহ করেন।

আর ইংল্যাণ্ড প্রাথমিক পর্যায়ের পাঁচ নম্বর গ্রুপের (ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস ও পোল্যাণ্ড) ত্রিদলীয় লীগে শীর্ষস্থান না পাওয়ায় তাদের বিদায় নিতে হল বিশ্বকাপ থেকে। ১৯৫০ থেকে কখনও বিশ্বকাপ ফুটবলে ইংল্যাণ্ডের এমন বিপর্যয় ঘটেনি। তাই কাপ জিতে ইংল্যাণ্ডের ম্যানেজার যে আলফ রামসেকে 'স্যার' খেতাবে সম্মানিত করা হয়েছিল, এবারের পরাজয়ের সব গ্লানিও তাঁকেই নিতে হল। রামসের বদলে ইংল্যাণ্ড জাতীয় দলের কোচ তথা ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন ডন রিভি।

চিলি ও রাশিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ের প্লে-অফ্ ম্যাচে রাজনৈতিক প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠায় রাশিয়া শেষ পর্যন্ত খেলতে অসম্মত হয়। ফিফা ওদের বিশ্বকাপ থেকে বাতিল করে দিলে চিলি জার্মানীতে চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

শুরুতে তো এদের খেলা ঘিরে বিশ্বকাপ ফুটবল কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট দুই শিবিরে বিভক্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। প্রাথমিক খেলায় ইউরোপ অঞ্চলের নবম গ্রুপের বিজয়ী রাশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের তৃতীয় গ্রুপের বিজয়ী চিলির পরস্পর দুই দেশের দুটি খেলায় প্রতিযোগিতার কথা ছিল। সেপ্টেম্বরে মস্কোয় প্রথম খেলাটিতে কোনো পক্ষই গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয় খেলা নিয়ম অনুযায়ী চিলিতে হওয়ার কথা। ওই দেশের রাজধানী সান্টিয়াগোতে তদনুযায়ী খেলার তারিখও ধার্য হল। কিন্তু ইতিমধ্যে চিলিতে রাজনৈতিক অঘটন ঘটে গেল। ১১ সেপ্টেম্বর চিলির প্রেসিডেণ্ট আলেন্দের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান হল। রাশিয়া তাই যুক্তি দেখাল ওখানকার পরিস্থিতি ফুটবলের উপযুক্ত নয়। তারা ফিফাকে অনুরোধ জানায়, অন্য কোনো নিরপেক্ষ দেশে খেলার ব্যবস্থা করুন। ফিফা সঙ্গে সঙ্গে সান্টিয়াগোয় দুজন পর্যবেক্ষক পাঠালেন। তাঁরা ফিরে এসে জানালেন, ওখানে

খেলা হতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু রাশিয়া রাজি হল না। তারা এবার জানায়, সামরিক অভ্যুত্থানের সময় চিলির যে স্টেডিয়াম সেখানকার দেশপ্রেমিকদের বন্দী-শিবিরে রূপান্তরিত হয়েছিল, অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চলেছিল, সেখানে তাদের পক্ষে খেলা সম্ভব নয়।

ফিফা এবার সংগঠক সমিতির সদস্যদের মতামত জানতে চাইল। অধিকাংশ সদস্য জানালেন, সান্টিয়াগোতেই খেলা হোক। ফিফা সম্পাদক ডঃ কেসার এই রায় রাশিয়াকে জানালেন তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন,—কোনো দল যদি কোয়ালিফাইং ম্যাচ না খেলে, তবে তারা বিশ্বকাপ থেকে বাতিল হয়ে যাবে। ফিফা সম্পাদকের এই বক্তব্যের পর বিশ্বকাপে জটিল অবস্থা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয়। অবশেষে ফিফা রাশিয়াকে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দেয়—তারা সান্টিয়াগোতে খেলতে রাজি কিনা জানাতে। ওই সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই রাশিয়া জানিয়ে দেয়—চিলিতে তাদের পক্ষে খেলা অসম্ভব। ফলে রাশিয়া বাতিল এবং পশ্চিম জার্মানীতে যাওয়ার জন্য চিলি যোগ্যতা লাভ করল।

বিশ্বকাপ ফুটবল পেশাদারী, সরকারীভাবে এই পেশাদারী ফুটবল ভারতে এখনও প্রচলিত হয়নি। উপরন্তু আইনত বিশ্বকাপের খেলোয়াড়রা আর কখনও ভারতের কোনো অপেশাদার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। তবুও অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ঘোষণা করে: বিশ্বকাপে ভারত খেলবে। প্রাথমিকভাবে এন্ট্রিও পাঠানো হয়েছিল। তারপর ১৯৭৩-এর ১১ মার্চ নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। নাম প্রত্যাহার করে ফিলিপিনস, গ্যাবন, মাদাগাস্কার ও জামাইকা।

কোন্ দল কেমন

পেলে-বিহীন ব্রাজিল: বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের অনেক আগে পেলে যখন তাঁর অবসরের কথা ঘোষণা করেননি, তখন অনেকের ধারণা ছিল পেলে দলে থাকলে পশ্চিম জার্মানী থেকে ফিফা কাপ আনতে বেগ পেতে হবে না, আর এবার হবে ব্রাজিলের চতুর্থবার বিশ্বকাপ ফুটবলে জয়।

কিন্তু পেলের ধারণা অন্যরকম। বললেন: ব্রাজিল আমাকে ছাড়াই জিতবে। টিভি মারফৎ যখন চার কোটি দর্শককে জানালেন ওই কথা, তখন কারুর মনে কোনোরকম সন্দেহ দেখা দেয়নি। তিনি জানালেন: ব্রাজিলে

বেশ ভাল ভাল খেলোয়াড় রয়েছেন। ব্রাজিলের নাগরিকদের উচিত তাঁদের প্রতি আস্থাবান হওয়া। আমার ধারণা এঁরা পশ্চিম জার্মানীতে সফল হবেন।

টিভি দর্শকরা কোনো প্রশ্ন না তুললেও স্টুডিও থেকে বের হতেই পেলেকে ঘেরাও-এর মধ্যে পড়তে হল। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিভিন্ন বয়সের শত শত লোক তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সমস্বর চিৎকার 'পেলে ফিরে এস', 'পেলে ফিরে এস' আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট তাঁদের ফুটবল সভাপতি জোয়াও হ্যাভেলান্জ মারফতও ১৯৭২ সালে অনুরোধ করেন, পেলে, তুমি ব্রাজিল দলের হয়ে আর একটিবার বিশ্বকাপে যাও।

পেলে জাতীয় দলে খেলার জন্য বেশি টাকার দাবি করছিলেন কিনা জানা যায়নি। ওই গুজব রটতেই বললেন তিনি: আমার টাকার প্রয়োজন নেই। শোনা গেল, ফ্রাঙ্কফুর্টে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে খেলার জন্য পেপসি-কোলা কোম্পানী দশ লক্ষ ডলার দিতে চেয়েছে। পেলে পরিষ্কার জানালেন: আমি ব্রাজিল ছেড়ে আপাতত কোথাও যাচ্ছি না। পেলেকে পশ্চিম জার্মানীতে ব্রাজিল দলে খেলার জন্য অনুরোধ জানিয়ে হাজার হাজার টেলিগ্রাম এল। কিন্তু তাঁর মতের পরিবর্তন হয়নি। ফুটবল অনুরাগীরা আশঙ্কা করলেন: পেলে-বিহীন ব্রাজিল অত্যন্ত দুর্বল।

১৯৭০-এর কাপ-বিজয়ী দলের দুই নির্ভরযোগ্য—রিভেলিনো ও জেয়ারজিনো দলে থাকলেও ১৯৭৪-এর ব্রাজিল অন্যদের তুলনায় তেমন শক্তিমান হয়নি। গত চার বছরে অন্যান্য উন্নত দেশের ফুটবল ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। গত বিশ্বকাপের কিছু আগে, প্রায় শেষ সময়ে জাগালোর উপর ম্যানেজারের দায়িত্ব এসেছিল সালধানা বিতাড়িত হওয়ায়। প্রকৃতপক্ষে দলের সাফল্যের সোপান তৈরি করেছিলেন সালধানাই। সালধানা দল গঠন করতেন সব কিছু লক্ষ্য রেখে। তাঁর একমাত্র দোষ ছিল, একগুঁয়েমী। তবে খেলোয়াড়দের আশা, হতাশা ও সংস্কারের কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হতেন না। সকলের আগে তাঁর মনে পড়ত ব্রাজিলের জনসাধারণের কথা।

এই চার বছরে ব্রাজিলে অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল। খেলার মাঠের বাইরে নানা আকর্ষণীয় বিষয় ফুটবলের পক্ষে হানিকর হয়ে দেখা দেয়। কিশোর ও তরুণরা বলে লাথি মারার চাইতে মোটর গাড়ি বা মোটর সাইকেলে ভ্রমণকে পরমানন্দের বস্তু ধরে নিল। ফলে ক্লাবগুলির

সদস্য-সংখ্যা কমল, হ্রাস পেল আর্থিক সঙ্গতিও। এদিকে ব্রাজিলের জাতীয় ফেডারেশন সি বি ডি তো আগের মতই কঠোর রয়েছে। অন্য দেশে যেমন, তেমনি বিশ্বকাপের বছরে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের চার মাসের জন্য ছেড়ে দিতেই হয়। এতে ক্লাবগুলো ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে যে সব দেশে পেশাদারী ফুটবল। ক্লাবগুলোর সংগঠন এবং খেলোয়াড়দের সামরিক বিভাগের মত কঠোর আইন-কানুনে, অনুশীলনে রাখা তো কম কথা নয়! কিন্তু মনে রাখা দরকার, দর্শকরা কখনও 'পেশাদার' নন, তাঁরা 'অ্যামেচারী' মন নিয়ে মাঠে আসেন, খেলা দেখেন ও চলে যান।

ব্রাজিলের মত ফুটবলে উন্নত দেশেও ফুটবল জীবন্ত হয়ে ওঠে এখন শুধু চার বছর পরে বিশ্বকাপের বছরে। চুয়াত্তরের বিশ্বকাপের দু'বছর আগে মারাকানা স্টেডিয়ামের একটি ম্যাচে আটশ' দর্শক এসেছিলেন, এ ঘটনা ভাবা যায়? অথচ দশ বছর আগে ওই ধরনের খেলায় এসেছেন অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার। এমনও দিন আসবে যখন এক মরশুমে পঁচিশটি খেলায় মোট একলাখ দর্শক আসবেন। এখন গড়ে পনের বা ষোল হাজারের বেশি দর্শক আসেন না। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এইভাবে চলতে থাকলে পেশাদারী ফুটবলের অস্তিত্ব ত্রিশ বছরের মধ্যে লোপ পাবে।

জার্মানীতে ব্রাজিলের খেলা দেখে প্রাক্তন ম্যানেজার সালধানা মন্তব্য করলেন: আমাদের অনেকেই শিম্পাঞ্জীর মত ফুটবল খেলেছে। কিন্তু জার্মানী রওনা হওয়ার আগে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন: চতুর্থবার কাপ জয় ব্রাজিলের পক্ষে সহজই হবে। যদিও দলে নেই পেলে, গার্সন, টোস্টাও ও কার্লস আলবার্টো। কিন্তু দলে এখনও অনেক বড় বড় ফুটবলার আছে। লুই পেরিরার মত চমৎকার ডিফেণ্ডার আছে, যে সক্রিয় হতে পারে সেরা ফরওয়ার্ডের মতই। বিশ্বে এখন ওর মত খেলোয়াড় কমই মেলে। মারিনোর মত শক্তিমান ফুলব্যাক আছে। কুপারের মত শক্তি তার, আর দুই পায়েই সে বিপক্ষকে 'হত্যা' করতে সক্ষম। মিড-ফিল্ডে ক্লোডোয়াল্ডো, রিভেলিনো, ফ্লেমিঙ্গোর পাউলো সিজার। সুতরাং আমরা দুর্বল নই। সম্মুখভাগে আছে জেয়ারজিনো ছাড়াও তিন-চারজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়।

সবই আছে। এখন সংশোধনের দরকার শুধু মনোভাবের। আমাদের ডিফেন্সে শুধু বিপক্ষকে দমিয়ে রাখার প্রবণতা। সালধানা সতর্ক করে দিয়ে বললেন: গাভিয়া বিচের পিছনের যে বাড়িতে জাতীয় দলের প্রশিক্ষণ হচ্ছে,

সেখানকার অতি কঠোরতা খেলোয়াড়দের মানসিকতায় একঘেয়েমী আনবে। বিশ্বকাপের আগে তিনমাস ধরে তাদের এই সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন ক্ষতিকর। আমি যখন ম্যানেজার ছিলাম, রাত্রে প্রত্যেককে ছুটি দিতাম নারীসঙ্গ লাভের জন্য কঠোর প্রশিক্ষণকালেই। বলে দিতাম একই সপ্তাহে একাধিক মেয়ের কাছে যাবে না, সপ্তাহের মাঝামাঝি মেয়ে বদল করতে পারবে না। কেননা, সপ্তাহের শুরুতে প্রত্যেকটি মেয়ে বেশ তাজা থাকে। সপ্তাহে ওরা দু'বার হানিমুন করলে নিঃশেষ হয়ে যায়। মেয়েদের সঙ্গ ভাল, কিন্তু কোনো কিছুই অতিরিক্ত হওয়া মানে ক্ষতিকর।

জার্মানীতে আসার আগে দুনিয়ার ফুটবল বিশেষজ্ঞরা ব্রাজিল সম্পর্কে যা বললেন, তার সারমর্ম : জাগালোর ব্রাজিলের জয়ের আশাই বেশি। তবে সালধানার ব্রাজিলের পরাজয়েও গৌরব ছিল।

বিশ্বকাপে নিজ গ্রুপে ইতালি, পোল্যাণ্ড ও হাইতির সঙ্গে খেলার আগে বুয়েনস আয়ারসে আর্জেন্টিনা একাধিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলল। তিয়াত্তরে ঝটিকা সফরে আর্জেন্টিনা ৩-২ গোলে হারায় পশ্চিম জার্মানীকে মিউনিখে। প্রাক্তন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় ওমর সিভরির নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা ওই ম্যাচে দারুণ খেলে। আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপের ফাইনাল বা চূড়ান্ত পর্যায়ে আসে প্রাথমিক পর্যায়ে অপরাজিত থেকে। প্যারাগুয়ে ও বলিভিয়ার বিরুদ্ধে তারা তিনটিতে জেতে, একটি হয় ড্র। কিন্তু এর পরেই দলে ভীষণ রদবদল হয়। আর্জেন্টাইন ফুটবল কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হওয়ায় তাঁকে দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে হল। ওমর সিভরির উত্তরাধিকারী প্রাক্তন 'আন্তর্জাতিক' হাফব্যাক ভ্লাদিস্লাওক্যাপকেও কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমঝোতা করতে কম বেগ পেতে হয়নি। ক্যাপ বাইশজনকে নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করলেন, এর মধ্যে দলের প্রাথমিক পর্যায়ের নয়জন। তিনি অসুবিধায় পড়লেন অন্য দেশে ট্রান্সফার নেওয়া পাঁচজন 'তারকা'কে নিয়ে। এই পাঁচজন : গোলরক্ষক ডানিয়েল কার্ণেভালি, ফরওয়ার্ড রুবেন আয়েলা। এঁরা দুজন ছিলেন স্পেনে। ডিফেণ্ডার অ্যাঞ্জেল বার্গাস ফ্রান্সে। সেণ্টার ফরওয়ার্ড হেক্টর ইয়াজান্দ পর্তুগালে গিয়ে টপ-স্কোরার হন এবং ডিফেণ্ডার রবার্টো পারফুমো ব্রাজিলে। ক্যাপ বললেন : এঁদের বাদ দিয়ে বিশ্বকাপ দল গঠিত হতে পারে না। তবুও এঁদের বাদ রেখেই শুরু করলেন প্রশিক্ষণ। তিনি বললেন : জার্মানীতে অ্যাটাকিং ফুটবল না খেললে বেপাত্তা হতে হবে।

আর্জেন্টিনার স্থানীয় প্রথম ডিভিশন খেলাগুলোর উপর নজর রাখলেন তিনি। দেখলেন প্রতিটি ম্যাচে গড়ে গোল হচ্ছে চারটি। গোলের সর্বাধিক কৃতিত্ব ওসভাল্ডো পটেন্টে, রকি অ্যাভালে, রেনে হাউসম্যান ও অল্ডো পয়-এর। কিন্তু জার্মানীতে নির্ভর করতে হবে মিগুয়েল ব্রিন্দিসির উপর। বয়স চব্বিশ, পঁয়ত্রিশটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। বাছাই বাইশজনের মধ্যে তিনি প্রবীণ। অ্যাটাকিং হাফ। গতবারের আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলিতে দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। ব্রিন্দিসি প্রথম ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন হারাকানের টপ-স্কোরার গত চার বছর। ব্রিন্দিসির কৃতিত্বের জন্যই মিলান তাঁকে আটলক্ষ পঁচাত্তর হাজার ডলার ট্রান্সফার ফি দিতে চায়। কিন্তু আর্জেণ্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অনুমতি দেয়নি।

যাই হোক, বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে সপ্তাহে চারদিন করে জাতীয় দলকে ট্রেনিং দেওয়া হল পোলো মাঠে। বুয়েনস আয়ার্সের শহরতলীতে এই ব্যবস্থা হয় ভিড় এড়াতে।

উরুগুয়ে জানত জার্মানীতে তারা সুবিধা করতে পারবে না। তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছিল গোলের গড়ে এগিয়ে থাকায়। কলম্বিয়া হয় দ্বিতীয়, তৃতীয় ইকোয়েডর। বাষট্টি বছরের রবার্টো পোর্টা চৌত্রিশ জনকে নিয়ে ট্রেনিং শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে রইলেন বাছাই পর্বের পনের জনের এগার জন। বাকি চারজনের তিনজন বিদেশে চুক্তি অনুযায়ী চলে যান, অধিনায়ক নেন অবসর। এই বছর মার্চে বাইরে সফরে গিয়ে উরুগুয়ে ১-০ গোলে প্রথম ম্যাচে হাইতিকে হারায়, তাদের সঙ্গে দ্বিতীয় ম্যাচ ০-০ হয়। উরুগুয়ের যে পাঁচজন বিদেশের নানা ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, তাঁরা এই সফরে যাননি। গোলরক্ষক মাজুরকিউইজ, ডিফেণ্ডার আনচেতা ও পাবলো ফোরলান এবং মিড-ফিল্ডম্যান পেড্রো রোশা ছিলেন ব্রাজিলে। আর আর্জেন্টিনায় রিকার্ডো পাভনি। উরুগুয়ের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন স্বদেশের হয়ে বিশ্বকাপে খেলার ব্যাপারে সব কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কেননা, এদের অভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। মাজুরকিউইজ, আনচেটা ও রোশা তো মেক্সিকোর চূড়ান্ত পর্বে খেলেছিলেন। গত বিশ্বকাপের এসপারাগো ও কুবিল্লার কথাও মনে পড়েছিল। কিন্তু কুবিল্লার বয়স চৌত্রিশ, তাঁকে নিয়ে আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুচিত।

উল্লিখিত খেলোয়াড়দের বাদ রেখে উরুগুয়ের দল গঠন যথার্থ শক্তির

পরিচায়ক নয়। তাছাড়া সফরকারী দল পুরোপুরি সুস্থ ছিল না। তবে হাইতি সফরকারী ওই দলে একুশ বছর বয়সী সেণ্টার ফরওয়ার্ড ফার্ণাণ্ডো মোরেনার সুনাম ছিল। গত মরশুমে উরুগুয়ের লীগে তিনি ছিলেন টপ-স্কোরার বাইশটি গোল দিয়ে। বিশেষজ্ঞরা বললেন মোরেনা জার্মানীতেও ভাল খেলবে। কিন্তু এ সম্পর্কে সন্দেহই ছিল না যে, চার বছর আগে যেমন দল নিয়ে উরুগুয়েয়ানরা মেক্সিকো গিয়েছিল, জার্মানীগামী দল তদপেক্ষা অনেক অনেক দুর্বল।

চিলির যে দলটি গত বছর দক্ষিণ আমেরিকায় বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল পেরুকে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে হারিয়ে, তারা মস্কোয় গিয়ে রাশিয়াকে রুখে (০-০) দেয়। নামে চিলির জাতীয় দল হলেও অধিকাংশ খেলোয়াড় ছিলেন কোলো কোলো-র 'এ' টিমের। কোলো কোলো চিলির সবচেয়ে ধনী ও জনপ্রিয় দল। সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সেরা সেরা খেলোয়াড় কিনে এনে দলগড়াই এদের রীতি।

চিলি জাতীয় দল ও কোলো কোলো উভয়ের কোচ লুই আলমোস। বিশ্বকাপে চিলি যখন তৃতীয় হয় আলমোস তখন ম্যানেজার ফার্ণাণ্ডো রিয়েরার সহকারী। এবার আলমোস নিজের ক্লাবের অধিকাংশকে জাতীয় দলে নেওয়ায় সংহতি বাড়ল। দলের জুয়ান রডরিগুয়েজ, অ্যাণ্টনিও কুইণ্টানো ও ইলিয়াস ফিগারোয়া তো বিদেশের ক্লাবে খেলে খেলে খ্যাতি অর্জন করেন। এঁরা ছিলেন চিলির রক্ষণভাগের প্রাচীর। কিন্তু মিড-ফিল্ডেই চিলির শক্তি নিহিত ছিল। বিশেষ করে হাফব্যাক ফ্রান্সিসকো ভাল্ডেজ। তাঁকে সহযোগিতা করেন পিলারমো পেজ, সার্জিও মেসেন ও গিলারমো ভেলিজ— তা খেলা ৪-৩-৩ বা ৪-২-৪ যে ছকেই হোক। ভাল্ডেজ বিপক্ষের রক্ষণভাগকে প্রায়শ বিপদে ফেলেন দূর থেকে মারা শটে। কার্লস কাজেলিকে বিপক্ষরা নজরে রাখতে সক্ষম হয় না সর্বদা তিনি চলমান থাকায়। চমৎকার ড্রিবলার সার্জিও আহুমাদার সর্বদা লক্ষ্য থাকে গোলের দিকে। তবে জার্মানীতে কাজেলি সম্পর্কেই বেশি আশা পোষণ করলেন চিলির ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। ২৩ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়ের চেহারা কিন্তু চোখে পড়ার মত নয়। সর্বদা বুটের উপরিভাগ মোজায় মুড়ে নেন; কখনও সিনগার্ড ব্যবহার করেন না। বলেন: সিনগার্ড থাকলে বলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। তা ছাড়া সিনগার্ড প্রত্যেককে 'স্লো' করে দেয়। দু'পায়েই সমান জোরালো শট,

হেডেও কুশলী। সারামাঠ বিচরণকারী তাঁর মত খেলোয়াড় চিলির ফুটবল ইতিহাসে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

পশ্চিম জার্মানী—এবারের বিশ্বকাপের আগে যেমন, পশ্চিম জার্মানীর ফুটবল দলে তেমন স্বস্তি কখনও পরিলক্ষিত হয়নি। জাতীয় দল এবার ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন, আর বেয়ার্ণ মিউনিখ হয়েছে ইউরোপীয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়ন। বিশ্বকাপে সবচেয়ে ফেভারিট তাই পশ্চিম জার্মানী। বিশেষজ্ঞ-দের মতে—জার্মানী শুধু জিতবে না, তারা আকর্ষণীয় ফুটবল দেখাবে, দেখাবে গঠনমূলক ফুটবল কাকে বলে।

জার্মান ফুটবলের প্রশিক্ষণ বিভাগের সর্বময় কর্তা কার্ল হেঞ্জ হেদেরগট এবার তাঁর দেশের সাফল্যের জন্য অহঙ্কার করলে তা যথার্থই হবে। ১৯৬৭-তে একচল্লিশ বছর বয়সে তিনি জার্মান ফুটবল কোচিং-এর ডিরেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রায় কুড়ি বছর জার্মানীর বিভিন্ন আঞ্চলিক ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কোচের চাকরির পর। এই দীর্ঘকালে দেশের অতীত ও বর্তমানের বহু ফুটবলারের খেলোয়াড় জীবন শুরু হয়েছে হেদেরগটের কাছেই। এদের মধ্যে ওভারাথ, স্নেলিঙ্গার, লোহার, ওয়েরার, উইমার, ফ্লোহে, কালমান প্রভৃতি।

হেদেরগট ১৯৫৬-য় জার্মান জাতীয় স্কুল দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব নেন। এবার বিশ্বকাপের কিছু আগে অনুরূপ একটি দল নিয়ে ইংল্যাণ্ডে গেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানীর ফুটবলের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনাকালে বলেন: ইংল্যাণ্ড আধুনিক ফুটবল রপ্ত করার ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে। তিনি জানালেন: এবার আমার স্কুল দল ওয়েমব্লিতে ৪-০ গোলে হেরেছে। এতে ইংল্যাণ্ডের দর্শকরা নিশ্চয়ই ভীষণ খুশি। তাঁরা ভেবেছেন এই জুনিয়র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মত তাঁরা সিনিয়র আন্তর্জাতিক ফুটবলেও সফল হবেন। কিন্তু এ ধারণা অমূলক। ইংল্যাণ্ড আঠার বছরের কম বয়সী ছেলেদের ফুটবলে অর্থাৎ 'উইফা' যুব ফুটবলে জিতেছে আরম্ভ (১৯৪৭) থেকে ছ'বার। আন্তর্জাতিক যুব ফুটবলে এটি তাদের রেকর্ড। কিন্তু সিনিয়র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তথা বিশ্বকাপে তারা তো ১৯৪৭-র আগে একবারই ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। পশ্চিম জার্মানী কিন্তু আন্তর্জাতিক যুব ফুটবলে একবারও চ্যাম্পিয়ন হয়নি। তবুও তারা ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে বিজয়ী, ১৯৪৭-তে রানার্স আপ এবং ১৯৫৮ ও ১৯৪৭-এ সেমিফাইন্যালিস্ট ছিল।

হেদেরগটের দৃঢ় ধারণা, ইংল্যাণ্ডের ফুটবলারদের মধ্যে শৈথিল্য বা ধীর গতির জন্য দায়ী তাদের শিক্ষণ-পদ্ধতি। উন্নত অন্যান্য দেশে ফুটবলারদের মধ্যে নব নব উদ্ভাবনীশক্তি দেখা যায়। এক-একজন 'কমপ্লিট' ফুটবলারের মধ্যে স্ট্যামিনা ও শিল্পীর সমন্বয় হয়। তাছাড়া ট্রেনিং-এর সময় যেমন ফিটনেসে দড় করে তোলা হয়, তেমনি স্কিলেও পোক্ত হয়। যাঁরা বলেন, স্কিল জন্ম থেকেই অধিগত—হেদেরগট তাঁদের সঙ্গে একমত নন। জার্মানীতে হেনকেস ও নেৎজারের মত প্রতিভাবান খেলেয়াড় আজও জন্মাননি। তবুও হেদেরগট তাঁদের ট্যাকটিক্স শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন: আমি তো সেরা ফুটবলারদের শিক্ষা দিতে পারব না। এমন কাউকে আমার ফুটবল স্কুলে নেব না—যারা ড্রিবলিং করতে পারে না। তাঁর মতে আধুনিক ফুটবলারকে এমন হতে হবে যিনি অবস্থা বুঝে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিতে পারবেন। খেলা দেখেই উপলব্ধি করবেন, গতি কোন্ দিকে যাচ্ছে, খেলা হচ্ছে কী ধারায়। বেয়ার্ণ মিউনিখের ফুলব্যাক ব্রাইটনারকে তিনি 'সত্তর দশকের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়' আখ্যাত করলেন বিশ্বকাপের আগে। মূলত ডিফেণ্ডার হলেও, আট্যাকেও তিনি সমান কুশলী। তাই বলে তাঁর স্কিল রপ্ত করতে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত প্রতিভার প্রয়োজন নেই।

হেদেরগট দেখেছেন, তাঁর স্কুলবালকরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে স্কিলের উন্নতি ঘটিয়েছে। 'শুধু পরিশ্রম কর, শুধু পরিশ্রম কর' এতে কাজ হয় না। একজন খেলোয়াড়কে 'পরিশ্রম কর' উপদেশ দেওয়ার আগে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে—কীভাবে সে কাজ করবে। তাকে সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত করতে হবে। তাকে সহজ সরল করে ম্যাচের অবস্থা বা সমস্যা বলে দিয়ে জানতে চাইতে হবে—বল কীভাবে সমাধান করবে। যদি সে সেই সমস্যার সমাধান করতে না পারে, আর একটি সমস্যার সমাধান জানতে চাইবে। সর্বদাই তার মাথা থেকে কিছু 'আবিষ্কারের' ব্যবস্থা করা দরকার। যদি সে তা না পারে, তবে সাহায্য করতে হবে। জার্মানীর ফুটবলারদের এইভাবে গড়ে তোলা হয়েছে ১৯৪৭-এর বিশ্বকাপের জন্য।

পশ্চিম জার্মানীর শুধু নয়, বিশ্ব-ফুটবলে সবচেয়ে সৃষ্টিধর্মী ডিফেণ্ডার নিঃসন্দেহে ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ের। জাতীয় দলে নির্বাচিত হয়ে পরের বছরই বিশ্বকাপে (১৯৪৭) খেলতে গেলেন। তখন ছিলেন রাইট হাফ। তাঁর অনবদ্য ড্রিবলিং ও পাসিং দলকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। কিন্তু নিজের

ক্লাব বেয়ার্ণ মিউনিখে ছিলেন সুইপার। মেক্সিকোর বিশ্বকাপে জার্মান দলের কৃতিত্বের মূলে তাঁর সক্রিয়তা অতুলনীয়। তাঁর প্রথম গোলই ইংল্যাণ্ডকে ৩-২ গোলে পরাজয়ে বাধ্য করে কোয়ার্টার ফাইনালে। জাতীয় দলের ম্যানেজার হেলমুট শ্যোন দুবছর বাদে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে বেকেনবাউয়েরকে মিড-ফিল্ডে নিয়ে এলেন তাঁর স্কিলের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য। বেকেনবাউয়েরকে দিলেন আরও স্বাধীনতা। মিড-ফিল্ডের দায়িত্ব রইল, ডান দিকে ফরওয়ার্ড লাইনেও তাঁকে ঘন ঘন দেখা গেল। মাঝে মাঝে আবার বিপক্ষে পেনাল্টি-বক্সের মধ্যেও। ওয়েমব্লিতে ৩-১ গোলে ইংল্যাণ্ডকে হারাল এবং পরে বেলজিয়মে হল চ্যাম্পিয়ন।

চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার অনেক আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, জার্মানীকে ফিফা কাপ এনে দিতে পারেন গার্ড মূলার। সন্দেহ নেই গত দশকে তাঁর মত আশ্চর্যজনক গোলদাতা কমই মিলেছে। জার্মানীর অ্যাটাকেও তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর স্পিড এবং তাৎক্ষণিক সক্রিয়তা অতুলনীয়। আর পেনাল্টি-বক্সের বাইরে মূলারের মত বিপজ্জনক খেলোয়াড় কমই মেলে। পেনাল্টি-বক্সের কাছে দৌড় অবস্থায় বল পেলে কোনো রক্ষকের বা ডিফেণ্ডারের সাধ্য নেই তাঁকে রোখে। হেডে এ পর্যন্ত অনেক গোল দিলেও ভাল হেডারের খ্যাতি তাঁর নেই। হ্রস্বকায় হলেও হেডের গোলগুলি হয়েছে তাঁর নিখুঁত পজিশন জ্ঞানের জন্যই। গত পাঁচ মরশুমের চারটিতে তিনি জার্মানীর বাণ্ডিশ্লিগায়ারে সক্রিয় গোলদাতা। তবে ১৯৪৭ এর মত (৪০টি) কখনও দেননি। হেলমুট শ্যোনের বড় নির্ভর এই মূলার।

নেদারল্যাণ্ডস—নেদারল্যাণ্ডস মানেই ক্রুয়েফ, আর ক্রুয়েফ মানেই নেদারল্যাণ্ডস। বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা সম্পর্কে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা নেদারল্যাণ্ডস সম্পর্কে ওই কথাগুলি বললেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত অ্যাজাক্স আমস্টার্ডামের পক্ষে যোহন ক্রুয়েফ যে ভূমিকা নেন, তা বিশ্লেষণ করলে নেদারল্যাণ্ডস সম্পর্কে ওই কথাগুলি একেবারে অযৌক্তিক নয়। তাঁর হ্রস্বতা বাধা হলেও অসম্ভব গতিই স্ট্রাইকিং সেণ্টার ফরওয়ার্ডের দায়িত্ব দেয়। লীগে ৩৩টি গোল সহ ডাচদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্কোরার ছিলেন। ছয়বার অ্যাজাক্সকে ডাচ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী করায় তাঁর ছিল অনন্য ভূমিকা। হেডে তেমন পারদর্শী না হলেও তাঁর মত অলরাউণ্ডার এখন কোনো দেশে নেই। নেদারল্যাণ্ডসের স্কিমার ও স্কোরারের দ্বৈত ভূমিকায় তিনি

অবতীর্ণ হন। মাঠে সব সময় নিজেকে মুক্ত রাখেন সতীর্থদের পাস আসার পূর্ব মুহূর্তে। তারপর বল পাঠিয়ে দেন গোলের কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা সহযোগীকে। তাঁর স্পিড ও স্কিল এমনই যে, যেকোনো সময়ে তিনজন ডিফেণ্ডারকে অনায়াসে অতিক্রম করেন আর তখনই বিপক্ষরা মনোবল হারিয়ে ফেলে। পরক্ষণেই তিনি অথবা তাঁর সতীর্থদের কেউ গোল করেন। তিনি একই মিনিটে, ডিফেণ্ডার, সুইপার, ডিফেন্সে শেষ খেলোয়াড় এবং পৃথিবীর সেরা স্ট্রাইকার। তিনি পাঁচটি ভাষায় কথা বলেন। পা চলে মুখের মতই দ্রুত। তাঁরই বিহনে তিনবার ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ন অ্যাজাক্স নিস্প্রভ হয়ে যায়। ক্রুয়েফ তখন সি এফ বার্সিলোনায়।

দল হিসাবেও নেদারল্যাণ্ডস দারুণ। তাদের সম্পর্কে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা বললেন: দুটি টাচ্-লাইনে তাদের খেলার জুড়ি নেই। নেদারল্যাণ্ডস ফুটবল দলের চিকিৎসকও 'বিপ্লবী মতবাদে' বিশ্বাসী ছিলেন ব্রাজিলের সালধানার মতই। প্রতি তিন বা চারদিন পর রাত্রে খেলোয়াড়দের ছুটি দিতেন বিশ্বকাপে আসার আগে। বলতেন, স্ত্রী বা মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে কাটিয়ে এস, মন ভাল থাকবে। নারী সংসর্গকে তিনি খেলার পক্ষে ক্ষতিকর মনে করেননি। এতে উপকারই মিলেছে। কিন্তু সমূহ ক্ষতি হয়েছে সিগারেট, মদ্যপান বা উত্তেজক কিছু গ্রহণে।

জার্মানীতে খেলার আগে নেদারল্যাণ্ডস সম্পর্কে কিন্তু আশংকাই করা হল। বলা হল—তারা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়বে, অন্তত প্রথম ম্যাচে উরুগুয়ের বিপক্ষে তো বটেই। এদিকে ১৯৪৭ থেকে এই দুই দেশের মধ্যে বেশ মনোমালিন্য। অ্যাজাক্স ইউরোপীয়ান কাপের চ্যাম্পিয়ন হয়েও উরুগুয়ের ন্যাশনালের সঙ্গে খেলতে অসম্মত হয়। অ্যাজাক্স জানায়, স্বাস্থ্যের কারণে তারা যাবে না। আসলে ভয় ছিল গণ্ডগোলের। অ্যাজাক্সের আশংকা ছিল—মণ্টিভিডিওয় যেমন সেলটিক ও রেসিং ক্লাবে এবং বুয়েনস আয়ার্সে এস্টুডিয়াণ্টেস ও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের খেলার মধ্যে মারামারি হয়েছিল, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

উরুগুয়ানরা নেদারল্যাণ্ডসের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল এবং ১৯৪৭-এও তা কমেনি। জার্মানীতে খেলা শুরুর সপ্তাহখানেক আগে এক ডাচ সাংবাদিক উরুগুয়ের শিবিরে ইণ্টারভ্যু নিতে গেলে তাঁকে বলা হল: হল্যাণ্ডের (নেদারল্যাণ্ডস) সাংবাদিকরা এলে দুই শ' ডলার ফি দিতে হবে। আর অধিনায়কের সঙ্গে

কথা বলার ফি তিন শ' ডলার। ডাচ সাংবাদিক প্রত্যুত্তরে জানান, তাঁদের খেলোয়াড়ের দাম আরও বেশি। শুনিয়ে দিলেন, অ্যাজাক্সের কাছে বার্সিলোনা নয় লক্ষ পাউণ্ডে ক্রুয়েফকে কিনেছিল। ক্রুয়েফ ছাড়াও আছেন ক্রল, নিসকেন্স, ভান হালেজেম, কাইজার ও রেপ।

নেদারল্যাণ্ডস চূড়ান্ত পর্যায়ে আসে চারটি খেলায় চব্বিশটি গোল দিয়ে। বেলজিয়মের বিরুদ্ধে দুটি খেলা গোলশূন্য ছিল, তবে অসংখ্য ফাউলের জন্য কারুর খেলা দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারেনি।

পোল্যাণ্ড—বিশ্বকে বিস্মিত করে পোল্যাণ্ড চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলতে এল। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাদের ফাইনাল রাউণ্ডে আগমন। শুধু তাই নয়, তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় ব্রাজিলের মত দলকে হারায়। এর আগে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় ১৯৭৩-এর ১৭ অক্টোবর ওয়েমব্লিতে ইংল্যাণ্ডকে রুখে দেয়। তারও আগে ৬ জুন পোলিশরা ২-০ গোলে প্রথম খেলায় হারায় আলফ রামসের ১৯৬৬-র বিশ্বকাপ বিজয়ী ইংল্যাণ্ডকে। কিন্তু অক্টোবরের শেষ খেলায় ইল্যাণ্ডের প্রয়োজন ছিল জয়ের। ১৭ অক্টোবরের কনকনে শীত, তার উপর বৃষ্টি, ওয়েমব্লিতে হাজার হাজার সমর্থক উপস্থিত ছিলেন ইংল্যাণ্ডের জয় দেখতে। ইংল্যাণ্ড অবিশ্বাস্যভাবে ড্র-র বেশি কিছু করতে পারল না। এই ড্র-র অর্থ বিশ্বকাপ থেকে প্রাথমিক পর্যায়েই বিদায়। ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের কঠোর পরিশ্রম ও সমর্থকদের উৎসাহদানেও কোনো উপকার হল না। ওই ঠাণ্ডায় তারা ঘেমে স্নান করল, খেলা শেষে খেলোয়াড়দের সকলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। ১৯৫০-এ বিশ্বকাপে ইংল্যাণ্ডের আগমন। সেই থেকে ইংল্যাণ্ডের ফুটবল ইতিহাসে এমন ট্র্যাজেডি দেখা যায়নি।

১৭ অক্টোবর খেলার আগে ইংল্যাণ্ডের ফুটবল বিশেষজ্ঞরা, সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের সমালোচকরা একবাক্যে বলেছিলেন : ইংল্যাণ্ডের জয় সম্পর্কে কোনো সন্দেহই নেই। তারা পোল্যাণ্ডকে বিদায় দিতে বসেছিলেন বিশ্বকাপ থেকে। লণ্ডন টাইমসের জিওফ্রে গ্রিনের মত অভিজ্ঞ ফুটবল সমালোচক ইংল্যাণ্ডকে সতর্ক করে লিখলেন : তোমরা আগের ম্যাচের পরাজয়ের কথা মনে রাখলে হতাশায় ভুগবে, আর তাহলে তোমাদের পরাজয় অনিবার্য। পোল্যাণ্ড এই জিওফ্রে ছাড়াও বাকিদের ইংল্যাণ্ড-প্রীতিকে যেন চিবিয়ে খেল খেলার মাঠে, আর ক্যাসিয়াস ক্লের মত আপার কাট মারল প্রত্যেককে। পোলিশরা শুধু ইংল্যাণ্ডের ফুটবলকে একটা বড় রকমের ধাক্কা

দিয়ে ক্ষান্ত রইল না, শেষ করে দিল স্যার আলফ রামসের স্বপ্ন ও সাধনাকে। তাঁর ম্যানেজারশিপের ইতি ঘটাল এই ম্যাচের ফল।

অথচ ইংল্যাণ্ডের গোলরক্ষক পিটার শিলটন ছাড়া বাকি সকলেই পোলিশ হাফে হানা দিয়েছেন সারাক্ষণ। যখন তাঁরা আক্রমণ করেছেন, পোলিশরা তখনই ভেঙে পড়েছেন। হাণ্টার, হাগ্‌স ও কেল তো প্রতি মুহূর্তে বিপক্ষের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়েছেন। পোলিশরা বিবর্ণ মুখে অসহায়ের মত ছোটাছুটি করেছেন। আসলে পোল্যাণ্ডকে এদিন ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বীই মনে হয়নি। বেল কুরি, হাগস, চানল বিভিন্ন কোণ থেকে পোল্যাণ্ডের গোলে শটের বন্যা বইয়েছিলেন। পোলিশরা উপায় না দেখে নিজেদের পেনাল্টি-সীমানার চতুর্দিকে পাহারা দিয়েছেন। ওখানেই অধিকাংশ সময় তাঁদের লাল জার্সির ভিড় ছিল। পরদিনের টাইমসে জিওফ্রে গ্রিন লিখলেন: পোল্যাণ্ডের গোল-এরিয়া পিকাডিলি সার্কাসের সঙ্গে তুলনীয়। পিকাডিলি সার্কাসে ভিড়ের সময় যেমন অবস্থা হয়, তেমনি ওদের গোল-মুখেও।

পোলিশরা কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এসেছিল সব হাল ছেড়ে দিয়েই। ইংল্যাণ্ড তো ফাইনাল রাউণ্ডে যাবেই—এই ছিল তাদের ধারণা। কিন্তু ভাগ্য ইংল্যাণ্ডের দিকে বক্রভাবে হেসেছিল। দু'বার বল পোল্যাণ্ডের গোল-লাইনের উপরে গিয়েও আটকে গেল ডিফেণ্ডারদের তৎপরতায়। একবার রেফারি গোল নাকচ করলেন। সর্বোপরি ছিল গোলরক্ষক তোমাসজোস্কির অপূর্ব ক্রীড়া-নৈপুণ্য। ইংল্যাণ্ডের চারটি অবধারিত গোল তিনি রুখে দেন। তোমাসজোস্কি পরাস্ত হলেন শুধু ক্লার্কের পেনাল্টিতে সমাপ্তির সাত মিনিট আগে। তবে সে গোল শোধ করেন ডোমারস্কি নিচু শটে।

পরদিন ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রগুলি দু'ভাগ হয়ে গেল। কেউ বললেন: ইংল্যাণ্ড বাজে ফুটবল খেলেছে। অন্যরা বললেন: সাম্প্রতিককালে ইংল্যাণ্ড এত ভাল খেলেনি। তবে সকলে একমত হলেন: গতকাল ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা অকারণে ছোটাছুটি করেছেন। ওঁদের মধ্যে সমন্বয় বড় কমই ছিল।

ইংল্যাণ্ডের বিদায়ে সবচেয়ে বেদনাহত হলেন পশ্চিম জার্মানীর উদ্যোক্তারা। বললেন: ফাইনাল রাউণ্ডে আমাদের অধিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হবে। ইংল্যাণ্ডের অনুপস্থিতিতে বিশ্বকাপের আকর্ষণ কমে যাবে। কলোনের একটি কাগজ হেডলাইন করল 'পাত্রী ছাড়াই বিয়ে হবে'। তাঁরা আরও লিখলেন—পশ্চিম জার্মানীতে ইংল্যাণ্ডকে বাদ দিয়ে বিশ্বকাপ মানে শ্যাম্পেন ছাড়াই পার্টি।

প্রাথমিক পর্যায়ে জয়ের পর পোল্যাণ্ডের মনোবল বেড়ে গেল। তারা নতুন করে প্রস্তুতি শুরু করল দুর্বলতাগুলি খুঁজে। কিন্তু হতাশা এনে দিল তাদের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উলোডজিমারেজ লুবানস্কির বাঁ হাঁটু অস্ত্রোপচার। এটি তাঁর দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার। চিকিৎসকরা প্রথমবার আশা দিয়েছিলেন, এবার নিরাশ করলেন : জুনে পশ্চিম জার্মানীতে খেলা অসম্ভব। পোল্যাণ্ড-ইংল্যাণ্ড প্রথম ম্যাচেই লুবানস্কির হাঁটুতে আঘাত লাগে ববি মূর পিছনে পড়ে গেলে। তখনই অস্ত্রোপচার হয়। আর তাই অক্টোবরে ওয়েমব্লিতে ফিরতি ম্যাচে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি। প্রথম ম্যাচে পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় গোলটি হয়েছিল তাঁরই প্রয়াসে।

লুবানস্কির যখন এই অবস্থা, সহকারী ম্যানেজার জাসেক গামোশ নিজেদের গ্রুপের আর্জেন্টিনার খেলা দেখলেন। বললেন দেশে ফিরে : চমৎকার ওদের টেকনিক, প্রত্যেকটি খেলোয়াড় বেশ শক্ত। আমাদের বেগ দিতে পারে।

তিনটি নতুন দেশ

বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনটি নতুন দেশ এল। হাইতি, অস্ট্রেলিয়া ও জাইর ফাইনাল রাউণ্ডে এল এবারই প্রথম।

হাইতি—বছরে মাথা-পিছু গড় আয় চারশ' পাউণ্ড। পঞ্চাশ লক্ষ জনসংখ্যার হাইতিতে শতকরা কুড়িজনের অক্ষরজ্ঞান আছে। একনায়কতন্ত্রের এই দেশের অভ্যন্তরের বাসিন্দাদের অনেকেই ঘর ছেড়ে কয়েক মাইল দূরে গিয়ে আজও দেখেননি কেমনভাবে সমুদ্র তাঁদের দেশকে ঘিরে রেখেছে। একটি ডলার রোজগারের জন্য আটঘণ্টা কায়িক শ্রম করতে হাইতিয়ানরা পরাঙ্মুখ নন। কর্তৃপক্ষ যখন খুশি ওঁদের লে-অফ করেন, কিন্তু তার প্রতিবাদের জন্য আজও সেখানে একটিও ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠেনি।

ফুটবল এঁদের জাতীয় খেলা নয়, তবুও ফুটবল হলে সমগ্র হাইতি অদ্ভুত উন্মাদনায় ভোগে। আর সব কিছুতে কম-বেশি সরকারী বিধিনিষেধ আছে, কিন্তু ফুটবলের ব্যাপারে নৈব নৈব চ।

ওখানকার ফুটবল সংস্থা বিশ্বকাপে এণ্ট্রি পাঠাল মূলত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাতেই। সরকার সমস্ত দায়িত্ব দিলেন জাতীয় কোচ অ্যানটয়নি তাসি-কে। একনায়কতন্ত্রের অভ্যন্তরে আর এক একনায়কতন্ত্র। অর্থ? সরকারের পক্ষ থেকে তাসি-কে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। যেভাবে উরুগুয়ে বা

চিলি দল গড়ে সেইভাবে প্রস্তুতি চালাও, ওইসব দেখে গিয়ে ম্যাচ খেলে অভিজ্ঞতা অর্জন কর। নিয়ে এস ওদের হাইতিতে। যে দেশে ভাল পয়ঃ-প্রণালী দুষ্প্রাপ্য তারাই বিদেশ থেকে ফুটবল দল আনল শুধু পনের হাজার পাউণ্ড 'গ্যারান্টি-মানি' দিয়ে।

হাইতিতে পেশাদার ফুটবলের প্রচলন নেই। তবুও মাথা-পিছু দশ ডলার পকেট খরচ দেওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয় বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলার সময়। পশ্চিম জার্মানী যাওয়ার আগে মাথা-পিছু প্রতিমাসে তিনশ' ডলার দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং তার সঙ্গে একটি পার্ট-টাইম চাকরিও। আর এজন্য খেলোয়াড়দের প্রত্যেকেই অসীম ঋণে আবদ্ধ হলেন মোটাসোটা চেহারার নিগ্রো-জাতীয় কোচ তাসির কাছে।

তবুও টাকার ব্যাপারে হাইতির খেলোয়াড়দের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। কেননা, তাঁরা জানতেন অন্যান্য সব দেশের বিশ্বকাপ খেলোয়াড়রা অনেক বেশি আয় করেন, অনেক বেশি টাকা পান। তবে অসন্তোষ মেটাতে তাসি-কে বেগ পেতে হত না। তিনি জানতেন হাইতির কোনো ক্লাব খেলোয়াড়দের দাবি মেটাতে পারবে না। তাছাড়া ক্লাবগুলো তো সবই অপেশাদার। তাসিই ওইসব ক্লাবের একমাত্র ত্রাণকর্তা। কোনো খেলোয়াড় অসদাচরণ করলে তিনি শাস্তি দিতে পিছ-পা হন না। যদি কোনোদিন কেউ অনুপস্থিত থাকত, তাসি তাকে কিছুই বলতেন না, মাসের শেষে ওই খেলোয়াড়ের চেকটি আটকে দিতেন। তাসি যদি বলতেন, আজ ওই পাহাড়ে চলো, সকলেই হুড়মুড়িয়ে ছুটত। নিজের দল সম্পর্কে তাসির বক্তব্য : আমি যখন কথা বলি, তখন ওরা তা গোগ্রাসে গেলে।

সকাল আটটাতেই সূর্যের তেজ গরম ইস্ত্রির মত, তবুও ট্র্যাক-স্যুট পরে তাসি যেমন, তেমনি খেলোয়াড়রাও তেতে যাওয়া পাহাড়ী অঞ্চলে অনুশীলন করে। হাইতির কৃষি কলেজে অবশ্য ট্রেনিং মাঠ আছে, তবে উষ্ণ অঞ্চলের নানা রকম ঘাসে মাঠটি ঢাকা।

ক্রীড়া অধিকর্তা ও জাতীয় কোচ হওয়ার আগে তাসি প্যারিসে একবছর ও ছ'মাস দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে পড়াশুনা করেছেন, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। পোর্ট আউ প্রিন্সের অন্যতম ক্লাব রেসিং-এ দীর্ঘকাল ছিলেন লেফট ইন। পশ্চিম জার্মানীতে গিয়ে হাইতি ভাল ফল দেখাবে বলে তাঁর দৃঢ় আশা। এই ধারণার কারণও ছিল। সম্প্রতি তাঁর জাতীয় দল

শক্তিশালী চেলাসকে হারায়, পরাস্ত করে দক্ষিণ ব্রাজিল একাদশকে। তাঁর অগাধ বিশ্বাস ডিফেণ্ডারদের শারীরিক পটুতা সম্পর্কে। আর এদিক থেকে সেরা খেলোয়াড় ফ্রান্সে ক্রীড়ারত স্টপার নাজাইর। কিন্তু অ্যাটাকিং-এ তেমন শক্তিমান খেলোয়াড় নেই। মিড-ফিল্ডের ফিলিপ ভোরবে, জঁা ক্লদ ডেসার-এর দুর্বলতা এখানেই।

ফরাসী ঔরসে জাত শ্বেতকায় ভোরবে স্কিল ও গোলের সুযোগ সৃষ্টিতে কুশলী ; জঁা ক্লদ হ্রস্বকায়, ভীষণ পরিশ্রমী। একুশ বছর বয়সী নিগ্রো অ্যাথলীট ইমানুয়েল সানোন হাইতির সেরা গোলদাতা। অতি দ্রুত দৌড়ে গোলের মুখে পৌঁছে যাওয়ার কাজে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই হাইতিতে। তবে এসব তাসি-কে এমন বিশ্বাস আনতে পারল না যে, জার্মানীতে উদ্বোধনী ম্যাচে ইতালির বিরুদ্ধে তারা আহা-মরি কিছু করে ফেলবে। তাসি স্থির করলেন : আমরা বরং সতর্কতার সঙ্গে আত্মরক্ষা করব।

জার্মানীতে গিয়ে হাইতি ভাল ফল করবে—হাইতির ফুটবল বিশেষজ্ঞদের কেউ তেমন আশা করলেন না। বললেন : দ্বিতীয় রাউণ্ডে টিকে থাকাই দায় হবে। উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন : আমেরিকার বিরুদ্ধে হাইতি যুদ্ধ ঘোষণা করলে যেমন অবস্থা দাঁড়াবে, জার্মানীতে বিশ্বকাপেও তেমনি হাল হবে।

অস্ট্রেলিয়া—পশ্চিম জার্মানীতে এক অদ্ভুত দল নিয়ে অস্ট্রেলিয়া উপনীত হল। তাদের গোলরক্ষক প্রাইভেট ডিটেকটিভ, জার্মান-সেণ্টার হাফ গোয়ালা, একজন ফুলব্যাক ঝড়তি-পড়তি ধাতুর জিনিস ব্যবসায়ী, যমজ স্ট্রাইকার-দ্বয়ের কাজ পুরনো মোটর গাড়ি বিক্রি করা। এছাড়া একজন 'টার্নার', একজন 'স্টোরম্যান', একজন 'প্লাম্বার', দর্জির একজন 'কাটার', দু'জন কেরানী এবং কয়েকজন কোম্পানী ডিরেক্টর নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল দল এল অদ্ভুত নাম নিয়ে। নিজেদের ওঁরা 'সকারুস' বলে পরিচয় দিলেন। নিজেদের সম্পর্কে ওঁরা ভাবতেই পারতেন না—'আমরা জুনে হামবুর্গ যাব, এবং নেৎজার, বেকেনবাউয়ের, মূলার প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের নামও উচ্চারিত হবে।'

দলে দু'জন স্কচ, কয়েকজন স্ল্যাভ, একজন ইংলিশম্যান। শেষের জন একদা ক্রয়ডন অ্যামেচার্স ক্লাবে ছিলেন। খেলোয়াড়দের অধিকাংশই সেফওয়ে ইউনাইটেড, মার্কনি প্রভৃতি ক্লাবের। ফুটবল তাঁদের 'পার্ট-টাইম' কাজ, খেলে সপ্তাহে পান সর্বোচ্চ সত্তর পাউণ্ড।

দল কেমন? এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্ভুত পেশার ব্যক্তিদের সমন্বয়কারী

যিনি, সেই যুগোশ্লাভ কোচ র‍্যালে রেসিক স্বীকার করলেন, ইংলিশ প্রথম ডিভিশনে মেরে কেটে দু'একজন সুযোগ পেতে পারে। কোচ রেসিক রাশিয়ান ও বালগেরিয়ান সহ পাঁচটি ভাষায় কথা বলেন। প্রতিদিন দু' ঘণ্টা অ্যাপ্লায়েড সাইকলজি পড়েন। আলফ রামসের দারুণ ভক্ত। কিন্তু সাঁইত্রিশ বছর বয়সী রেসিক মনে করেন, ১৯৪৭-র পর ইংলিশ ফুটবল নেতিয়ে পড়েছে। প্লেয়াররা যেন রেফ্রিজারেটরের মধ্যে রয়েছে। উপরন্তু 'এটা কর, সেটা কর' বললে কাজ হয় না। তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ নেই। ইংল্যাণ্ডের পতনের কারণ, তারা ববি চার্লটনের জায়গায় তেমন কাউকে পেল না। আসলে সেখানে ফুটবল আর তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। ইংল্যাণ্ড এবার ফাইনাল রাউণ্ডে যেতে না পারায় অনেকেই সমালোচনার ঝড় তুলেছেন, কেউ কেউ আফসোস করছেন। কিন্তু তাঁরা কি জাতীয় দলের প্রস্তুতিতে তেমন গুরুত্ব দিয়েছিলেন? অন্ততঃ অন্য কোনো দেশের মত সময়ও তো দেননি। আমি অবাক হয়েছিলাম ও হেসেছিলাম যখন শুনলাম পোল্যাণ্ডের সঙ্গে ম্যাচের আগেও তারা শনিবারে শনিবারে নিজেদের ক্লাবের ম্যাচে নামছে। কোনো জাতীয় দল এ ব্যাপার বরদাস্ত করতে পারে? ইংল্যাণ্ডের চাইতে অন্যরা কত প্রস্তুতি নিয়েছে! পোল্যাণ্ডের জাতীয় দলের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছেন পোলিশ সরকার। যুগোশ্লাভ দলে সর্বক্ষণের জন্য সাইকলজিস্ট রয়েছেন। মেক্সিকোয় ১৯৭০-এ তিনি ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন ব্রেকফাস্ট থেকে রাত্রে ঘুমোন পর্যন্ত তাদের চলাফেরা।

প্রাথমিক পর্যায়ে ইংল্যাণ্ডের বিদায় সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ান কোচ স্যার আলফ রামসেকে দোষ দেননি। কেননা, তিনি 'স্যার' এবং তাঁর কাজের ফল ১৯৬৬-তে বিশ্বকাপ জয়। এবারও ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে পনেরটি সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু তারা গোল দিতে পারেনি। এজন্য দায়ী কী স্যার রামসে? রেসিক ইংল্যাণ্ডের এক সাংবাদিককে বললেন: এতকাল আমরা আপনাদের কাছে ফুটবল শিখেছি। এবার আপনারা অন্যদের কাছে শিখুন। দরকার হলে অস্ট্রেলিয়াও জ্ঞান দেবে। আমি তো কোচ হয়ে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, যখন খেলোয়াড়দের চাইব, তখন তারা একত্রে মিলিত হবে। জানি ক্লাবগুলো ওদের টাকা দেয়। কিন্তু আগে অস্ট্রেলিয়া, না আগে ক্লাব?

হ্যাঁ, আপনি হয়ত হাসবেন—অস্ট্রেলিয়া আবার ফুটবল খেলবে! কিন্তু

বলুন তো এবার প্রাথমিক পর্যায়ে ইংল্যাণ্ড ক'টি ম্যাচ খেলেছে? মাত্র চারটি। আর আমরা এগারটি। এবং খেলতে হয়েছে নানা পরিবেশে, নানা আবহাওয়ায়। নানা প্রতিকূল অবস্থায়। যেতে হয়েছে হাজার হাজার মাইল। আমরা শূন্য ডিগ্রির কম তাপাঙ্কে খেলেছি, খেলেছি সাত ডিগ্রি ফারেনহিটেও। খেলেছি সমুদ্রপৃষ্ঠের সমান মাঠে, আবার ছয় হাজার ফুট উঁচুতেও। আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি বুক ফুলিয়ে বলব, বিশ্বকাপের ফাইনাল রাউণ্ডে যাওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার অস্ট্রেলিয়ার আছে।

অস্ট্রেলিয়ার মিড-ফিল্ড খেলোয়াড় রে রিচার্ডস লেটন ওরিয়েণ্টে সুযোগ না পেয়ে দেশে ফিরে আসেন। স্থানীয় দলে খেলা শুরু করেন। অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর মত অভিজ্ঞ ও প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় কমই আছেন। যে জিম ম্যাক্‌কের গোলে হংকং-এ অস্ট্রেলিয়া ১-১ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়েছিল, এবং পশ্চিম জার্মানীতে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়, সেই ম্যাক্‌কে এয়ারড্রাই-এ খেলতেন সাত বছর আগে। পিটার উইলসন তো মিডলবরো থেকে ফ্রি ট্রান্সফার নেন। আড্রিয়ান আলস্টন ছিলেন ইংল্যাণ্ডের ফ্লিটউডে। আলস্টন অবশ্য ল্যাঙ্কাশায়ারে ফেরার আহ্বান পান ব্ল্যাকপুলে খেলার জন্যই। কিন্তু তিনি জানিয়ে দেন, 'বিশ্বকাপের খেলার সুযোগ ছাড়ব না।' আলস্টন অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ গোলদাতা। প্রথমিক পর্যায়ের এগারটি ম্যাচেই খেলেন। তিনি স্বীকার করেন, অস্ট্রেলিয়াও ফুটবলে আরও উন্নত হতে পারত যদি সকলে 'ফুলটাইমার' হতেন। সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম, তারপর প্রতি সন্ধ্যায় ফুটবল অনুশীলন, এভাবে ভাল ফুটবলার তৈরি অসম্ভব।

প্রতিজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে তাঁদের মালিকের চুক্তি হল কোচ রেসিক চাইলেই কর্তৃপক্ষ যেন খেলোয়াড়দের ছুটি দেন বিশ্বকাপের জন্য। ১৭ বছর বয়সে রেসিক ফুলটাইম পেশাদার ফুটবলার ছিলেন যুগোশ্লাভিয়ায়। জাতীয় যুবদলের উইং হাফে খেলতেন। ১৯৪৭-তে মেলবোর্ণে যান খেলতে, পায়ে আঘাত পেয়ে চার বছর পরে হন কোচ। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করেন ১৯৭১-এ জাতীয় দল নিয়ে বিদেশ সফরের মাধ্যমে। অস্ট্রেলিয়ান সকার ফেডারেশন দশ হাজার ডলার ব্যয় করলেন, কিন্তু দল যা অভিজ্ঞতা অর্জন করল, তাতে ওই অর্থব্যয় বিফলে যায়নি। এশিয়া ওশানিয়া গ্রুপে তারা বিজয়ী হল।

জার্মানীতে অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে রেসিক বললেন: আমরা

পশ্চিম জার্মানীকে হারাব—এমন আশা করি না। তবে পূর্ব জার্মানীকে বা চিলিকে হারানো নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। একটা কথা পরিষ্কার জানানো দরকার —আমরা খেলছি এখনকার জন্য নয়, এসব ভবিষ্যতের প্রস্তুতি। দশ বছর আগে এভার্টন এখানে এসে অস্ট্রেলিয়াকে আট গোলে হারিয়েছিল। আমি আজ বাজি রেখে বলতে পারি এভার্টন, লিডস এমন কি পশ্চিম জার্মানীও আট গোলে এখন হারাতে পারবে না। আর আগামী দশ বছরের মধ্যে হয়ত আমরা বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল বা সেমিফাইনালে পৌছতে পারব।

রেসিক আরও বললেন : নানা দেশের খেলোয়াড় নিয়ে এই দল, কিন্তু আমরা ঐক্যবদ্ধ এবং সকলেই অস্ট্রেলিয়ান। তবে নানা জাতির সমন্বয়ে সমস্যাও কম নয়। প্রথম সফরে ম্যাঞ্চেস্টারে গিয়ে আমরা সমস্যায় পড়ি। সকাল ন'টাতেও বেশ অন্ধকার। ড্রেসিং-রুমে গিয়ে আমাদের কৃষ্ণকায় হ্যারিকে দেখি। সে মাথায় করাঘাত করছে আর তার সঙ্গে কান্না। জিজ্ঞাসা করলাম : কী হয়েছে? সে বলল : আমাকে কেউ বল পাস দেয়নি। ওকে বুঝিয়ে বললাম, তোমার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কেউ ও-কাজ করেছে ভেবো না। তুমি এত কালো যে, অন্ধকারের মধ্যে কেউ তোমায় দেখতে পায়নি।

জাইর—লিভিংস্টোনের আফ্রিকা অভিযান বা স্ট্যানলির কঙ্গো নদীর মুখে উপনীত হওয়ার সাতানব্বই বছর পরে যে সেই মহাদেশের একটি রাষ্ট্রের বিশ্বকাপ ফুটবলে যাওয়ার পথ হবে কেউ কী সেদিন একথা ভেবেছিলেন?

বাণ্টু, সুদানী ও পিগমী অধ্যুষিত এই জাইরের আকৃতি স্কটল্যাণ্ডের ত্রিশ-গুণ বড়, কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র স্কটল্যাণ্ডের চারগুণ। এরা স্বাধীন হয়। তার আগে ষাট বছরেরও বেশি ছিল মধ্য-আফ্রিকাস্থ বেলজিয়াম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ষাটের দশকে সামরিক অভ্যুত্থান ও প্রতি-অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতি তাদের স্বাধীনতা লাভ। ফরাসী তাদের 'আন্তর্জাতিক' ভাষা। 'সহিলী' ভাষা যাঁরা জানেন জাইরে তাঁরাও বেশ খাতির পান। আমাদের যেমন ছিলেন গান্ধীজি, বাংলাদেশের যেমন শেখ মুজিবুর রহমান, তেমনি জাইরের ফাদার অফ দ্য নেশন বা জাতির জনক যোশেফ মোবুটু। মোবুটু এখন জাইরের রাষ্ট্রপতি। জাইরের প্রধান প্রধান শহর লিভপোল্ডভিল, স্ট্যানলিভিল, এলিজাবেথভিল, কিনশাসা, ফিসানগুয়াই। প্রধান শহর হয়েছে নিহত রাজনীতিক ও দেশপ্রেমিক লমুম্বার নামে লমুম্বাশি। প্রতিটি শহরেই ফুটবল ভীষণ জনপ্রিয়।

সাম্প্রতিককালে আফ্রিকার ইতিহাসে জাইর যেমন রাজনৈতিক বিপ্লব দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত, তেমনি বিশিষ্ট ফুটবলের কৃতিত্বেও। বিস্ময়েরও বৈকি! সম্পূর্ণ কৃষ্ণ আফ্রিকা থেকে এই প্রথম একটি দেশের বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় যোগদানের যোগ্যতা অর্জন। যাদের জন-সংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ এখনও মুখোস পরে ঘুরে বেড়ায়, নগ্ন পায়ে চলাফেরা করে এবং অধিকাংশের দেহ নানা রঙে রঞ্জিত, তারাই আধুনিক ফুটবলের চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলবে—এ নিশ্চয়ই অভাবনীয়। সবচেয়ে বড় কথা জাইর যখন বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে, মাঠের ধারে ট্রেনার, কোচ বা ম্যানেজারের পাশেই বসে থাকেন যাদুকর-ডাক্তার। এই ডাক্তার তাঁর মন্ত্রবলে বিপক্ষের শক্তি খর্ব করেন, বাণ মারেন। খেলতে নামার আগে নিজদলের প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র বলেন, চোখে-মুখে ফুঁ দিয়ে অসীম শক্তির অধিকারী করে দেন।

জাইর দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে অদ্ভুত বিশেষণ দ্বারা পরিচয় দেওয়া হয়। যথা—রাইট উইঙ্গার কাকোকে জেব্রার চাইতে দ্রুত। জাইরের সাংবাদিক অন্যদেশের সেরা সেরা খেলোয়াড়কেও অনুরূপভাবে আখ্যাত করেন। যেমন—ডেনিস ল খেলেন সিংহের মত।

স্কটল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের জাইরের খেলোয়াডদের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা চলাকালে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়—চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে পারলে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে একখানি বাড়ি দেওয়া হবে। ওঁরা তা পানও। এ ছাড়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী বা খেলোয়াড়রা মেয়ে-বন্ধুকে নিয়ে সরকারী খরচে যেখানে খুশি দু'সপ্তাহ বেড়িয়েছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি রাষ্ট্রপতি মোবুটুর, তিনি জানান, প্রত্যেককে পাকা বাড়ি দেওয়া হবে ফাইনাল রাউণ্ডে গেলে।

চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে জাইর দশটি ম্যাচ খেলে টোগো, ক্যামেরুণ, ঘানা, জাম্বিয়া ও মরক্কোর সঙ্গে। গ্রুপ ম্যাচে তথা প্রাথমিক পর্যায়ে জয়লাভে সবচেয়ে খুশি হন তাঁদের যুগোশ্লাভ কোচ ব্লাগোয়েভ ভিডিনিক। যুগোশ্লাভিয়ার এই প্রাক্তন গোলরক্ষক আঠাশ বার তাঁদের জাতীয় দলে খেলেছেন। ১৯৫৬ ওলিম্পিকসে রানার্স আপ দলে ছিলেন। ১৯৬০-এ ইউরোপীয়ান নেশনস্ কাপ ফাইনালেও ওঠে তাঁর দল।

বিশ্বকাপের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেশাদার ফুটবল চালু হলে সেখানেই

ভিডিনিক কোচিং-জীবন শুরু করেন। তারপর চলে যান মরক্কোয়, সেখানকার জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে। তাঁরই ম্যানেজারশিপে মরক্কো বিশ্বকাপে যায়। মেক্সিকোয় মরক্কো প্রথম খেলায় হেলমুট শ্যোনের পশ্চিম জার্মানাকে ভীষণ বেগ দিয়েছিল। ভিডিনিক জাইরে আসেন এবং তিন বছরের মধ্যে আফ্রিকার দুই শক্তিশালী দল ঘানা ও মরক্কোকে বিদায় দেন বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্যায়ে। এরপরেও ভিডিনিক স্বীকার করেন: তিন বছর প্রশিক্ষণ কিছুই নয়। আমার ছেলেরা এখনও কাঁচা রয়েছে। এখনও প্রচুর কাজ করতে হবে। এই বৃহৎ দেশটিতে প্রতিভার অভাব নেই। প্রচুর ফুটবল টিম আছে। কিন্তু অধিকাংশই খেলে গোলপোস্ট ব্যতিরেকেই, অধিকাংশেরই বুট নেই, এবং বল যা আছে, আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা তা অনুমোদন করবে না।

কয়েক বছর আগেও এদের জাতীয় ফুটবল সংস্থার দফতরে না ছিল টেলি-ফোন, না টেলেক্স। তখন লীগের ফল জানানো হত ড্রাম পিটিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে। এখন সারা দেশে ষাটটি লীগ চালু আছে। প্রতিটি লীগে একশ' করে দল খেলে। এখন ফুটবল এতই জনপ্রিয় যে, কিনসাসা জাতীয় স্টেডিয়ামে (এখানে ক্যাসিয়াস ক্লের লড়াই হয়েছিল) জাইর দলের ম্যাচ থাকলে তো বটেই, তারা ট্রেনিং নিতে এলেও আশি হাজার আসন পূর্ণ হয়ে যায়।

কিনীয়, উগাণ্ডীয় বা তানজানীয়দের মতই আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলের খেলোয়াড়দের দৈহিক পটুতার তুলনা নেই। এখানকার অ্যাথলীটরা তো বিশ্বের ট্র্যাক ও ফিল্ডে ঘন ঘন রেকর্ড ভাঙে গড়ে। ছেলেবেলা থেকেই শারীরিক পটুতায় এরা অগ্রণী। দু' ঘণ্টা ট্রেনিং-এও ওদের গা ঘামে না। এর অন্যতম কারণ অবশ্য নিরক্ষীয় আবহাওয়া। এদের ট্রেনিং তাই আমাদের বা অন্যান্য দেশের মত শারীরিক পটুতা রক্ষার জন্য নয়, প্রধান লক্ষ্য স্পিড, টেকনিক ও স্ট্যামিনা বৃদ্ধি।

ইউরোপীয় বা দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলে এদের রপ্ত করার কাজে ভিডিনিককে শুরুতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। কেননা, আফ্রিকানদের প্রবণতা শুধু আক্রমণে। ভিডিনিকের লক্ষ্য ৪-২-৪ প্রকরণ এরা শিখুক। সামনে যদি ফাঁকা জমি থাকে, তবে বল নিয়ে দ্রুত দৌড়তে এদের জুড়ি নেই। ভিডিনিক তাই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থায় হাত দিলেন। চিরাচরিত প্রথায় উইং-এর খেলায় উৎসাহ দিলেন প্রতিভাকে কাজে লাগাতে। কিন্তু শুটিং-এ ভীষণ

দুর্বল। যদিও কেম্বো ও কাকোকা বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্যায়ের অর্ধেক গোলই দিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই তাঁদের খালি পায়ের শট জাল ছিঁড়ে ফেলে, কিন্তু নিখুঁত শট তাঁদের পা থেকে কদাচিৎ উৎপাদিত হয়।

জাইরের ফুটবল বিশেষজ্ঞ বা গোঁড়া সমর্থকরাও স্বীকার করেন তাঁদের রক্ষণভাগ মোটেই সুসংগঠিত নয়। ডেনিস ল বা ব্রেমনারের মত দৈহিক ক্ষমতা তাদের নেই, জেয়ারজিনো বা রিভেলিনোর মত স্পিড নেই। কিন্তু অস্বীকার করলে চলবে না—তারা দ্রুত এগোচ্ছে। ফেব্রুয়ারিতে কিনসাসা স্টেডিয়ামে জাইর ৪-৪ ড্র করে ব্রাজিলের শক্তিশালী ফ্লেমিঙ্গোর সঙ্গে এবং শুরুর দশ মিনিটের মধ্যে জাইরই ২-০ গোলে এগিয়েছিল। ৩-২ পিছিয়ে পড়ে একটি আত্মঘাতী গোল ও পেনাল্টিতে। তারপর লিওপোল্ডভিলের 'লিওপার্ডরা' আবার তেতে উঠে দশ মিনিটের মধ্যে দুটি গোল দিয়েছিল। ব্রাজিলের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জে মারিয়া সমাপ্তির দু' মিনিট আগে একটি গোল দিয়ে ড্র করে সেদিন কোনোক্রমে ফ্লেমিঙ্গোর মুখ রক্ষা করেছিলেন।

জাইর কায়রোয় আফ্রিকান নেশনস কাপ ফুটবলে যায়নি বিশ্বকাপের আগে। কারণ ভিডিনিকের লক্ষ্য ছিল বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত হওয়া, আর সে জন্য অপেক্ষা করছিলেন দল নিয়ে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড সফরের জন্য। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জাইর চূড়ান্ত পর্যায়েও অঘটন ঘটাক। তিনি জানতেন যুগোশ্লাভিয়া জার্মানী যাবে সাইকলজিস্ট নিয়ে, ব্রাজিলের সঙ্গে থাকবে সাইকিয়াট্রিস্ট। মন্ত্রতন্ত্রে ভিডিনিকের বিশ্বাস না থাকলেও তাঁর অবচেতন মনে উঁকি দিত 'আমাদের তো সঙ্গে যাদুকর-ডাক্তার আছেন।'

প্রথম রাউণ্ডের খেলা

পশ্চিম জার্মানীতে চূড়ান্ত পর্যায় বা ফাইনাল রাউণ্ডের খেলা শুরু হল ১৩ জুন। এবার বিশ্বকাপ থেকে সেমিফাইনাল তুলে দেওয়া হল নতুন নিয়মে। প্রাথমিক ফাইনাল পর্যায়ের ১৬টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলা হল। ওই চারটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স মোট আটটি দলকে দুই গ্রুপে ভাগ করে আবার হল লীগ প্রথায় খেলা। দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল দুটি সরাসরি ফাইনাল খেলে। দুই গ্রুপের রানার্স দল দুটি পুনরায় মিলিত হয় তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের জন্য।

চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রথম রাউণ্ড শুরুর আগের দিন অর্থাৎ ১২ জুন বিভিন্ন ক্রীড়াকেন্দ্রে গেরিলা হানার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফ্রাঙ্কফুর্টের পুলিশের হোরস্ট ভোগেল জানান, ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঘিরে প্রচণ্ড নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে। বিমানবন্দরে সাড়ে চারশ' পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বার্লিনের ওলিম্পিক স্টেডিয়াম ঘিরে আড়াই হাজার পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী ছিলেন। এত কড়া পাহারা আর কোথাও হয়নি। কারণ চিলি ছিল বার্লিনে, তাদের খেলাও হয় ওই স্টেডিয়ামে। কয়েকদিন আগে পুলিশ জানতে পারে—তুরস্ক থেকে ছ'জন আরব ও দু'জন জাপানীর একটি আত্মঘাতী গেরিলা দল ফ্রাঙ্কফুর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। তাই বিভিন্ন শিবির ও হোটেল তো বটেই, প্রতিটি স্টেডিয়ামের ভিতরে ও বাইরে একহাজার করে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী রইলেন আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে। কারুর পকেটে ছুরি থাকলেও তা পুলিশের সরঞ্জামে ধরা পড়বে। বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞরা স্টেডিয়ামের প্রতি ইঞ্চি জমি পরীক্ষা করলেন। স্টেডিয়ামে যাতে বিমান-আক্রমণ না হয় সেজন্য স্টেডিয়ামের চতুর্দিকে ৩·৭ কিলোমিটার মুক্ত এলাকা রাখা হল খেলা শুরুর আধঘণ্টা আগে ও পরে। তবুও উদ্বোধনী খেলার দিন ফ্রাঙ্কফুর্টস্থ চিলির দূতাবাস আক্রান্ত হল। ক্ষোভ সে দেশের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে। কড়া নিরাপত্তার আরও কারণ মিউনিখ ওলিম্পিকসে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' গ্রুপের হাতে ইজরায়েলের ১১ জন অ্যাথলীটের জীবনহানি।

ব্রাজিল : যুগোশ্লাভিয়া—উদ্বোধনী খেলায় যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল তো জিততে পারলই না, বরং যুগোশ্লাভিয়াই বেগ দিল তাদের ০-০ ফল দ্বারা। দু'ঘণ্টাব্যাপী মনোরম বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের পর গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মধ্যে ব্রাজিলের ফরওয়ার্ড লিভিনার সেণ্টারে ১৯৭৪-এর বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হল। ব্রাজিল ও যুগোশ্লাভিয়া কারুর খেলাই বিরক্তিকর ছিল না। বরং দর্শনীয় ফুটবল খেলল উভয় দল। যুগোশ্লাভিয়ার ভাগ্য মন্দ। তা না হলে দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে তারা এক গোলে এগিয়ে যেতে পারত—যদি ওবলাকের হেডটি পোস্টে লেগে ফিরে না আসত।

যুগোশ্লাভদের কুশলতা ও দ্রুততা পরিলক্ষিত হলেও তারা বিপক্ষকে থামাতে মাঝে মাঝে অতিমাত্রায় রাফ্ ফুটবল খেলতে লাগল। সুইস রেফারি শুয়েরার সতর্ক করলেন একাধিক জনকে। ওবলাক অযথা দেরী করেছিলেন

ফ্রি-কিক্ মারতে, এসিমোভিক ফাউলের পর তর্কে অবতীর্ণ হলেন। শুধু বেঁচে যান মুজিনিক বুটের ডগা দিয়ে সিজারকে আঘাত করা সত্ত্বেও।

প্রথমার্ধে ব্রাজিল কিছু অর্থবহ ফুটবল খেলল। কিন্তু বিরতির কাছাকাছি যুগোশ্লাভিয়ার প্রাধান্যই চোখে পড়ে। তারা ব্রাজিলের গোলমুখে গিয়ে তেমন সুবিধা করতে পারেনি পেরিরা ও মারিও মারিনোর দৃঢ়তার জন্য। সুযোগের জন্য তাদের বিয়াল্লিশ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় যখন জাজিক সেণ্টার করলেন এসিমোভিককে। ব্রাজিলের দুই ডিফেণ্ডার তাঁকে ঠেকাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন ওই মুহূর্তে। যুগোশ্লাভিয়া আশা করেছিল তারা পেনাল্টি পাবে। কিন্তু রেফারী ভ্রূক্ষেপই করলেন না। এসিমোভিক এরপর আরও দুটি সুযোগ নষ্ট করেন।

তবে অর্ধেক সময় জুড়ে ব্রাজিলই সুযোগ পায় আক্রমণ করার। জেয়ারজিনো, ভাল্ডোমিরো ও সিজারকে যুগোশ্লাভিয়ার ডিফেণ্ডাররা আটকে দেন শারীরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। দুটি নিশ্চিত গোল বাঁচালেন যুগোশ্লাভ গোলরক্ষক মারিক। মারিনোর প্রচণ্ড শট সামান্য ঘুষিতে বারের উপর দিয়ে তুলে দিলেন। আর একবার রিভেলিনোর কর্ণারও ঠেলে বাইরে পাঠান। ব্রাজিল আর একবার বঞ্চিত হল জেয়ারাজিনোর সামান্য ভুলে। একটু দ্রুত ছুটলেই গোলটি হত।

যুগোশ্লাভিয়ার ওবলাক স্বর্ণ সুযোগটি পেয়েছিলেন সমাপ্তির কুড়ি মিনিট আগে। জাজিকের সেণ্টার ব্রাজিলের গোলমুখে ধরতে ওবলাক ছুটে গেলেন। সুযোগ বুঝে বল পায়ে না ধরে হেড দিলেন। কিন্তু বাঁদিকের পোস্টে লেগে বল ফিরে এল। কাটালিনস্কি রিবাউণ্ড মারলেন, কিন্তু তা তেমন কার্যকর হল না। ব্রাজিলের লুই পেরিরার পায়ে বল পড়ল, তিনি সেটি ক্লিয়ার করে দিলেন।

সম্রাট পেলে এই খেলার আগের দিন জার্মানীতে পৌছান। ফ্রাঙ্কফুর্টে তিনি ছিলেন দর্শক। সাংবাদিকদের কাছে দর্শকাসনে বসে বলেন: মাঠের মধ্যে না খেলে দর্শক হিসাবে মাঠের পাশে বসে থাকা আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

পশ্চিম জার্মানী : চিলি, স্কটল্যাণ্ড : জাইর ও পূর্ব জার্মানী : অস্ট্রেলিয়া—১৪ জুন তিনটি খেলা তিন শহরে হল। বার্লিনে পশ্চিম জার্মানী : চিলির খেলায় পশ্চিম জার্মানী ১-০ গোলে জিতল। ডর্টমুণ্ডে স্কটল্যাণ্ড :

জাইরের খেলায় স্কটল্যাণ্ডের জয় হল ২-০ গোলে এবং হামবুর্গে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ব জার্মানী ২-০ গোলে জিতল।

বার্লিন ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে ৮৩ হাজার ১৬৮ জন দর্শক এলেন ১৯৫৪ সালের চ্যাম্পিয়ন ও ১৯৪৭-র রানার্স পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে চিলির খেলায়। দুপুর রোদের মধ্যে খেলাটি ভাল হল না। কিন্তু ১৯৪৭-এর চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রথম গোলটি দিলেন পশ্চিম জার্মানীর পল ব্রাইটনার ষোড়শ মিনিটে। তাঁর জোরালো শট চিলির গোলরক্ষকের হাতে লেগে গোলে ঢোকে। এই ম্যাচেই প্রথম একজনকে মাঠের বাইরে পাঠালেন রেফারি। ৭০ মিনিটের সময় তুরস্কের রেফারি ভোগান বাবাকান চিলির ক্যালস ক্যাসজেলকে মাঠ থেকে বের করে দেন মারাত্মক ফাউলের অভিযোগে। খেলার বাইরে তাঁদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিক্ষোভে তাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন। খেলার মাঠের বহিষ্কার চিলির খেলোয়াড়দের আরও অখুশি করল। কারণ ক্যাসজেল চিলির সেরা ফরওয়ার্ড। রীতি: এই বহিষ্কারের জন্য গ্রুপের প্রথম রাউণ্ডের কোনো খেলায় আর তিনি অংশ নিতে পারবেন না। ফিফা শাস্তিদান কমিটি তাঁকে এরপর মাত্র একটি ম্যাচের জন্যই সাসপেণ্ড করেন।

প্রথমদিকে পশ্চিম জার্মানীর রক্ষণভাগে দুর্বলতা দেখা দেয় চিলির দৃঢ়তায়। বিরতির পর জার্মানরা দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে প্রবলভাবে চাপ সৃষ্টি করে। তবুও ওভারাথের আশানুরূপ বল নিয়ন্ত্রণ চোখে পড়েনি। দ্বিতীয়ার্ধে তো তাঁর বদলে হোলৎসেনবাইন নামলেন। মূলার একটিই ভাল সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এত দ্রুত এগিয়েছিলেন যে, বলের সঙ্গে সংযোগ হল না। তবুও এই খেলা দেখে, অন্তত জার্মানদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য বলে দিল-প্রথম ফিফা বিশ্বকাপ জয় তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। বেকেনবাউয়েরের খেলায় কোনো ঘাটতি ছিল না। চমৎকৃত করলেন হ্যোনেস। বল নিয়ে ডানদিকে দ্রুত টাচ্-লাইন বরাবর দৌড় এবং হঠাৎ বল মারা বিস্ফোরণ বৈকি! আর এটাই চিলির রক্ষণভাগকে বিপর্যস্ত করে। গ্রাবোস্কিও তাঁর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিলেন। তবে ব্রাইটনার ছিলেন সবার উপরে। একবার জার্মানদের চারজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বেকেনবাউয়ের চমৎকার ক্রসপাস পেলেন। তিনি দ্রুত এগিয়ে ব্রাইটনারকে সেটি বাড়ালেন। চিলির গোলরক্ষক ভ্যালেজোস বুঝতেই পারেননি পঁচিশ গজ দূর থেকেও এত জোরালো শট আসতে পারে অপ্রত্যাশিতভাবে। জার্মানীর ঘন ঘন বোমাবর্ষণ দেখে চিলির নয়জনেই

আত্মরক্ষায় মনোনিবেশ করেন। এরই মাঝে সুযোগ বুঝে চিলিয়ানরা দু-একটি আক্রমণ রচনা করেন। আহুমাদা দ্রুত দৌড়ে একটি বল বিপক্ষের গোলে মারলেনও, কিন্তু সামান্যের জন্য সেটি উপর দিয়ে চলে যায়।

ক্যাসজেল বাইরে যাওয়ায় তাঁরা আগেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। রিনোজ ও কুইনটানা এদিন তেমন খেলতে পারেননি বিপক্ষের প্রহরায়, এরই মধ্যে সমাপ্তির পাঁচ মিনিট আগে আহত হলেন রডরিগুয়েজ। তাঁকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নেওয়া হল। গ্যালারিতে বসা বেশ কয়েক হাজার দর্শক এই দৃশ্যে উল্লসিত হলেন। তাঁরা চিলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করলেন জার্মান জাতীয় সঙ্গীত উচ্চারণ দ্বারা। সঙ্গে সঙ্গে 'দাঙ্গা পুলিশের' নজর গেল ওইদিকে।

এর বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে নবাগত জাইর ০-২ গোলে হারলেও স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে সুপরিকল্পিত ফুটবল খেলল। তারা মাঝে মাঝে স্কটল্যাণ্ডের বিশ্বসেরা পর্যায়ের আক্রমণকেও প্রতিরোধ করতে থাকে। এদের খেলা দেখতে উন্মুক্ত স্টেডিয়ামে তেমন ভিড় না হলেও যাঁরা এলেন, তাঁদের অনেকেরই হাতে হ্যামডেনের ব্যানার ও পতাকা। ওঁরা স্কটল্যাণ্ডের খেলা দেখতে আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে এখানে আসেন। কয়েকজনের হাতে জাইরের পতাকাও ছিল। সম্ভবত তাঁদের ধারণা অনেকটা উত্তর কোরিয়ার মতই ছিল জাইর সম্পর্কে। তবে জাইরের কেউই কোরিয়ার পাক ডক ইক বা হান বন জিনের মত উঁচুদরের ছিলেন না। তৃতীয় মিনিটেই স্কটল্যাণ্ডের আক্রমণে জাইরের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। তারপর একের পর এক তারা আক্রমণ করে চলে। কিন্তু অধিকাংশ বল বারে লেগে ফিরেছে বা উপর দিয়ে চলে যায়। লরমারের রকেটের মত ভলিতে ১-০ হয়। আট মিনিটের মধ্যে ২-০ হল ব্রেমনারের ফ্রি-কিকে জর্ডানের হেড থেকে। দুটি গোল খেলেও জাইরের গোলরক্ষক কাজাডির প্রচেষ্টায় ব্যবধান বাড়তে পারেনি। তারা আক্রমণও করে সুযোগ বুঝে দুই উইং থেকে। মায়াঙ্গার একটি জোরালো শট পোস্টের উপর দিয়ে চলে যায়। স্কটিশরা এদিন দৈহিক ক্ষমতা প্রয়োগ করায় দর্শকরা খুশি হতে পারেননি। ফলে হলটনকে একবার সতর্ক হতে হয় পশ্চিম জার্মান রেফারি জি শুলেনবার্জের কাছে। খেলায় তখন একটু উগ্রতা প্রকাশ পেলেও সকলের মেজাজ ঠিক হয়ে যায় পাঁচ মিনিটের জন্য আলোর অভাবে খেলা বন্ধ থাকলে।

হামবুর্গে আর এক নবাগত—অস্ট্রেলিয়া ০-২ গোলে পূর্ব জার্মানীর কাছে হারলেও সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয় চমৎকার খেলে। বিরতি পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া প্রচণ্ড সংগ্রাম করে। ৫৭ মিনিটের সময় গোল বাঁচাতে গিয়ে অস্ট্রেলীয় ডিফেণ্ডার কুরান গোলরক্ষক রিলিকে ব্যাকপাস দিতে গেলে ১-০ হয়ে যায়। সত্তর মিনিটের সময় পূর্ব জার্মান ফরওয়ার্ড স্ট্রেশ হুক করা ভলিতে ২-০ করলেন। আজ অধিকাংশ সময় বল এই নবাগত দলের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আর তাদের অলস্টানই ছিলেন মাঠের সেরা বল-প্লেয়ার।

নেদারল্যাণ্ডস : উরুগুয়ে, পোল্যাণ্ড : আর্জেণ্টিনা, ইতালি : হাইতি ও সুইডেন : বালগেরিয়া—১৫ জুন হ্যানোভারে নেদারল্যাণ্ডস ২-০ গোলে উরুগুয়েকে, স্টুটগার্টে পোল্যাণ্ড ৩-২ গোলে আর্জেণ্টিনাকে, মিউনিখে ইতালি ৩-১ গোলে হাইতিকে হারাল এবং ডুসেলডর্ফে সুইডেন ও বালগেরিয়ার খেলাটি ০-০ হল।

১৯৩০ ও ১৯৫০-এর বিশ্বকাপ জয়ী দক্ষিণ আমেরিকার শক্তিশালী দল উরুগুয়েকে হারিয়ে নেদারল্যাণ্ডস (হল্যাণ্ড) স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বিজয়ী দলের দুটি গোলই করেন জনি রেপ—প্রথমার্ধের অষ্টম মিনিটে ও সমাপ্তির চার মিনিট আগে। উরুগুয়ে গুছিয়ে খেলতে না পারার বদলে কোণঠাসা হয়ে ফাউল করতে থাকে। মনটেরো ক্যাসটিলোর ফাউল ৬৮ মিনিটের সময় এমন মারাত্মক হল যে, হাঙ্গেরিয়ান রেফারি কে পালোতাই তাঁকে বের করে দিলেন।

দু-একবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়ে উঠলেও বিস্ফোরকের মত কিছু হল না। মনটেরো ক্যাসটিলো শুরুর দিকে নিসকেন্সকে ও পরে ক্রুয়েফের পিছু নিলেন। তবে তিনি ফাউলটি করেন রেনসেনব্রিঙ্ককে। নেদারল্যাণ্ডসের খেলোয়াড়দের নিখুঁত পাস সারাক্ষণ বল তাদের দখলে রাখতে সাহায্য করে। তা না হলে উরুগুয়ের সঙ্গে দৈহিক সংঘর্ষে এলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। ক্রুয়েফকে কখনও কখনও মাঝমাঠে দেখা গেলেও বেশিক্ষণ ছিলেন বাঁদিকের টাচ্-লাইনে। তবে এদিন তাঁর আসল খেলার বিকাশ ঘটেনি। তাঁদের খেললেন যা ভান হানেজেম, যেমনটি দেখা গিয়েছিল ১৯৭০-এ মেক্সিকোয় ব্রাজিলের গার্সনের মধ্যে। হানেজেমের চমৎকার চমৎকার পাস, বল নিয়ন্ত্রণ, ফ্রি-কিক্ ও সোয়ার্ভিং শট দর্শকদের মাতিয়ে রাখল।

উরুগুয়ে হতাশংকর ফুটবল শুধু এদিনই খেলল না, দেখাল বাকি

খেলায়ও তারা দর্শক ও সমর্থকদের কেমন বিমর্ষ করে তুলবে। চার বছর আগের আর এবারের উরুগুয়েতে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। রোশার মত ফরওয়ার্ডের উপর অতি বিশ্বাসই তাদের কাল হল। কুবিল্লারও বয়স হয়েছে। চৌত্রিশ বছর বয়স শুধু নয়, খেলেছেনও অনেক এবং স্বভাবতই আধুনিক ফুটবলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছেন না। রোশা তো হাঁপিয়ে পড়েছিলেন জানসেনের মারাত্মক ট্যাক্‌লিং-এ।

চল্লিশ হাজার ডাচ সমর্থক তাঁদের জাতীয় দলের জার্সির রং-এ রং মিলিয়ে পোশাক পরে স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন। মনে হচ্ছিল সারা নিদারস্থাশন স্টেডিয়াম জুড়ে কমলা রং-এর কুঁড়ি ছড়িয়ে আছে। হাজার হাজার ফুল ফুটে উঠল একই সঙ্গে শুরুর অষ্টম মিনিটে। তখন ক্রুয়েফ বল ধরে স্কোয়ার পাস দিয়েছেন সুবরিয়রকে। সুবরিয়র সেটি রেপের কাছে পাঠাতেই তিনি হেডে উরুগুয়েয়ান গোলরক্ষক মাজুরকিউইজকে পরাস্ত করলেন (১-০)। রেপকে দ্বিতীয় গোলটির জন্য পঁচাত্তর মিনিট অপেক্ষা করতে হল। হানেজেম ও রেনসেনব্রিঙ্কের পাস থেকে তিনি সহজে শেষ গোলটি দিলেন।

স্টুটগার্টের নেকার স্টেডিয়ামে এবারের বিশ্বকাপের এ পর্যন্তের সেরা খেলা হল পোল্যাণ্ড-আর্জেন্টিনার। প্রতি মুহূর্তে যেমন উত্তেজনা, তেমনি উভয় দলের স্কিল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রদর্শনী।

খেলার পর কয়েকজন ইংরেজ সাংবাদিক পোলিশ ম্যানেজার ও কোচের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁরা জানান, আজকের জয়ের জন্য আমরা ইংল্যাণ্ডের কাছে ঋণী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই পোল্যাণ্ড প্রাথমিক পর্যায়ে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়েছিল। পোলিশ ম্যানেজার কাজিমিয়ার্জ গোর্কাস্কি ও কোচ জাসেক গোমোশ বললেন : রামসে সাংবাদিকদের পছন্দ করেন না, আমরা করি। জানালেন : প্রাথমিক পর্যায়ের ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলার সময় আমরা অনেক কিছু শিখেছিলাম, আজ সেগুলো কাজে লাগিয়েছি।

আট মিনিটের মধ্যে সহজে দুটি গোল দিয়ে পোল্যাণ্ড নিরাপদ হয়। তারা তখন চমৎকার খেলে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেন্টিনা নৈপুণ্য দেখাতে কার্পণ্য করেনি।

পোল্যাণ্ড জয়ের বনিয়াদ গড়েছিল যেমন আরম্ভে, তেমনি খেলা খেলল আবার শেষ পর্যায়ে। তারা আজ ছটি গোলও দিতে পারত। গাডোছার

একটি ফ্রি-কিক্ বারে লাগে। জার্মাশও আর্জেন্টিনীয় ডিফেণ্ডারদের কাটিয়ে অনুরূপভাবে বঞ্চিত হন। কার্ণেভালি একটি অবধারিত গোল বাঁচান।

পোলিশদের এই খেলা দেখে এক ফুটবল বিশেষজ্ঞ বললেন: ইংরেজরা আজ নিশ্চয়ই খুশি হবে। পোল্যাণ্ড যোগ্য দল হিসাবেই ইংল্যাণ্ডকে হারিয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়কর মনে হল আর্জেন্টিনার ম্যানেজার ভ্লাদিস্লাওয়ের বক্তব্য। তিনি পরাজয়ের সব দোষ গোলরক্ষক কার্ণেভালির উপর চাপিয়ে দিলেন। অথচ তিনি কিন্তু দারুণ খেলেন। অবশ্য দুটি ভুল তিনি করেন। একবার তিনি অত্যন্ত দুর্বল থ্রো করেন এবং তা থেকে লাটো গোল দেন। তার আগে গর্গনের শটের তীব্রতা উপলব্ধি করতে পারেননি।

এদিন লাটো ও গাডোছাই আর্জেন্টিনার মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেন্টিনা খেলার গতি পরিবর্তন করেছিল মূলত উলফের অক্লান্ত প্রয়াস ও অপূর্ব দক্ষতা।

ইতালি অতি সহজেই চূড়ান্ত পর্যায়ে নবাগত হাইতিকে হারাল। চারটি গোলই হয় বিরতির পরে। ইতালি দেয় তিনটি। প্রথম গোলটি দেয় হাইতি। ২০ সেপ্টেম্বরের পর ইতালির গোলরক্ষক ডিনো জফ এই প্রথম গোল খেলেন।

বালগেরিয়া ও সুইডেনের খেলাটি উভয়ের সুযোগের অপব্যবহারের প্রদর্শনী বৈ নয়। তাই ফলও ০-০। দুই দলই আক্রমণ করেছে, সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু কেউই সঠিক নিশানায় শট করতে পারেনি। বালগেরিয়ার দুর্ভাগ্য কুড়ি গজ দূর থেকে পেণ্ডের তীব্র শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। তারা এই ভাবেই গোটা দশেক গোল থেকে বঞ্চিত হল। সুইডেনের পক্ষে স্যাণ্ডবার্গ ওভেগ্রান ও কিণ্ডভাল ত্রাস সৃষ্টি করলেও গোল দিতে পারেননি।

পশ্চিম জার্মানী : অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল : স্কটল্যাণ্ড, পূর্ব জার্মানী : চিলি ও যুগোশ্লাভিয়া : জাইর—১৮ই জুন হামবুর্গে পশ্চিম জার্মানী ৩-০ গোলে অস্ট্রেলিয়াকে হারাল, ফ্রাঙ্কফুর্টে ব্রাজিল ০-০ ড্র করল স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে, ড্র হল বার্লিনে পূর্ব জার্মানী—চিলির খেলাও, কিন্তু গেলসেনকিরখেনে যুগোশ্লাভিয়া ৯-০ গোলে পরাস্ত করে জাইরকে।

ফোকসপার্ক স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে পশ্চিম জার্মানী দ্বিতীয় রাউণ্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জনের পথ তৈরি করে নিল। তিন গোলের ব্যবধানে হারলেও অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়নি। তবে পশ্চিম

জার্মানীর রক্ষণভাগকে তারা বিপর্যস্ত করতে পারল না। আজ ওভারাথেরই প্রাধান্য ছিল সারাক্ষণ। বিপক্ষের কেউই তাঁকে ক্ষণিকের জন্যও বাধা দিতে পারেননি। বিশ্বকাপে ওভারাথ দারুণ খেলেছিলেন, কিন্তু তারপরেই তাঁর খেলা পড়ে যায় এবং নেৎসার তাঁর বদলে অবশ্য-খেলোয়াড় হন। বর্তমান প্রতিযোগিতার কয়েক সপ্তাহ আগেও নেৎসারই ছিলেন জাতীয় দলে প্রথম এগার জনের মধ্যে। কিন্তু প্রস্তুতি-ম্যাচে তাঁকে তেমন দক্ষ মনে হল না। ম্যানেজার হেলমুট শ্যোন ডেকে পাঠালেন ওভারাথকে। অতএব নেৎসার বাদ। জাতীয় দলের নাম ঘোষিত হতেই কলোনের খেলোয়াড় বাদ পড়ায় কড়া সমালোচনা হল, অন্যরা অভিনন্দিত করলেন ওভারাথকে।

কয়েক মিনিট না কাটতেই জার্মানীর সমর্থকরা ওভারাথের খেলায় মুগ্ধ হলেন। ত্রয়োদশ মিনিটে গ্রাবোস্কি ও মূলারের দেওয়া-নেওয়ার বল পেয়ে ওভারাথ কুড়ি গজ দূর থেকে উঁচু শটে ১-০ করলেন। পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় জার্মানীর দ্বিতীয় গোলটি আসে কালম্যানের হেড থেকে। ৩-০ করলেন ১৯৭০-এর সর্বোচ্চ গোলদাতা মূলার। এটিও হেড দিয়ে। অস্ট্রেলিয়া একটিই সুযোগ পেয়েছিল—সমাপ্তির বারো মিনিট আগে। অ্যাবনি-র শট জার্মান গোলপোস্টের ধার ঘেঁষে বাইরে গেল। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া প্রথম রাউণ্ড থেকে বিদায়ের মুখে এসে দাঁড়াল। জার্মানী জিতলেও শেষদিকে বেকেনবাউয়েরের খেলা মন্থর হওয়ায় দর্শকরা তাঁকে বিদ্রূপ করলেন। তিনিও থুতু দেবার ভঙ্গী করলে বিদ্রূপ আরও বেড়ে যায়।

স্কটরা এদিন ব্রাজিলের উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করল। হে, ব্রেমনার, লরিমার ও জর্ডান তো একটুর জন্য গোল করা থেকে বঞ্চিত হলেন। ব্রাজিলের খেলা ও তাদের ট্যাক্‌লিং দেখে দর্শকদের একটি বিরাট অংশ সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল। রিভেলিনো শুরুতেই সতর্ক হয়ে ছিলেন রাফ ট্যাক্‌লিং-এর জন্য।

খেলার শুরুতে স্কটিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সদস্যরা অবাক হন জনস্টোন বা হাচসনের বদলে মর্গানকে দেখে। ওই সদস্যরা এদিন সকাল দশটায় ম্যানেজার ওরমণ্ডের কাছে দলের তালিকা চান, কিন্তু ম্যানেজার তা জানাননি বা জানাতে পারেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল ব্রাজিলের টিমটি জেনে তবে স্কটল্যাণ্ডের নাম প্রকাশ করবেন। ব্রাজিল দলে কোনো পরিবর্তন হল না। যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে যাঁরা ০-০ করেছিলেন, তাঁরাই রয়ে গেলেন। ব্রাজিলের

টেকনিক্যাল কমিটি শুধু ভাল্ডোমিরোর বদলে মিরানডিনাকে আনার সুপারিশ করেন।

রাত্রে খেলার শুরুতেই ব্রাজিল একের পর এক সুযোগ পেল। দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ মিনিটের মধ্যে তারা তিনটি ভাল সুযোগ পায়। রিভেলিনোর শট স্কটিশ গোলরক্ষক হার্ভে এক হাতে কোনরকমে ঠেকিয়ে দেন। স্কটল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বিপদ আসে মেলিনোর কর্ণার থেকে। লিভিনার ভলি ক্রসবারে লেগে ফেরে। এই সময় স্কটিশ খেলোয়াড় বুচানের দুর্বল পাস জেয়ারজিনোর পায়ে পড়ে। তিনি বল পেয়েই জোরালো শট করলেন। ব্রেমনার স্কুপ না করলে এটি গোল হতই।

স্কটিশদের সবচেয়ে সুবিধা হল এখানকার ভিজে মাঠ। খেলোয়াড়রা ঘন ঘন পড়ে গেছেন, আর এই ফাঁকে হয়েছে ফাউল। কিন্তু রেফারির বাঁশি সব সময় বাজেনি। জর্ডান ও মর্গান স্বভাবসিদ্ধভাবে শূন্যে বল রাখার চেষ্টা করেছেন। তবে জর্ডান পেরিরার সঙ্গে পেরে ওঠেননি। তারা পঞ্চান্ন মিনিটের সময় গোলের সুযোগ পায়। পঁচিশ গজ দূর থেকে হে-র শট জাল ছিঁড়ে ফেলত। লিয়াও ক্রসবারের উপর দিয়ে ওটি ফিস্ট করে পাঠান। জর্ডানের একটি হেডও ব্রাজিল গোলরক্ষক আটকালেন। লিয়াওকে উপর্যুপরি আরও কয়েকটি শট আটকাতে হল।

গেলসেনকির্খেনে জাইরের বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়া গোলের বন্যা বইয়ে দিল। শুরুর একুশ মিনিটের মধ্যেই হল চারটি গোল। বাজেভিক এই প্রতি-যোগিতায় প্রথম নেমে তিনটি গোল দিলেন। এর আগে দুটি ম্যাচ খেলেননি সাসপেণ্ড থাকায়। বাছাই পর্বে গ্রীসের সঙ্গে খেলার সময় তিনি এই শাস্তি পেয়েছিলেন।

দিনের বাকি খেলায় পূর্ব জার্মানীর পক্ষে হফম্যান ও চিলির পক্ষে আহুমাদা একটি করে গোল দেন। চিলি গোল শোধ দিয়েছে শুনে সান্টিয়াগোয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে লোরেনজো পারডো নামে এক ব্যক্তি জ্বলন্ত স্টোভে লাথি মারেন ও আগুনে ঘর পুড়ে যায়। তিনিও অগ্নিদগ্ধ হন।

চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৮ জুন ফিফা কমিশন হাইতির ডিফেণ্ডার আর্নস্ট জিন মোসেফকে বিশ্বকাপ খেলা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। ১৫ জুন ইতালি-হাইতি খেলার দিন যোসেফ উত্তেজক ওষুধ খেয়েছিলেন ও তা প্রমাণিত হয়। বিশ্বকাপে ডোপিং-এর অভিযোগে তিনিই এবার প্রথম বহিষ্কৃত হলেন।

ফিফার ডোপিং নিয়ন্ত্রক কমিটির ডিরেক্টর অধ্যাপক গটফ্রায়েড শ্চোনহোলজার বলেন, এই ওষুধ সেবনে খিদে পায় না। হাইতি দলের ফরাসী চিকিৎসক প্যাট্রিক হুগো জানান, তিনি যোসেফকে ওই ওষুধ দেননি। যোসেফ বলেন, আমার হাঁপানি আছে, এই বড়ি হাঁপানিরই ওষুধ। ফিফা কমিশন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ঘোষণা করেন মিউনিখ ওলিম্পিকে মার্কিন সাঁতারু রিক ডে মণ্ট এই ধরনের ওষুধ খেয়ে সোনার পদকটি খুইয়েছিলেন। হাইতি পরে স্বীকার করে যোসেফ 'প্রেলুডিন' নামে যে হাঁপানির ওষুধ খান, তা ডোপ-এর মধ্যেই পড়ে।

নেদারল্যাণ্ডস : সুইডেন, আর্জেণ্টিনা : ইতালি, পোল্যাণ্ড : হাইতি ও বালগেরিয়া : উরুগুয়ে—১৯ জুন খেলা শেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক লীগের ২৪টি খেলার মধ্যে ১৬টি খেলা শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যে এক নম্বর গ্রুপের ফল থেকে বোঝা গিয়েছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে দুই জার্মানী এবং দুই নম্বর গ্রুপ থেকে ব্রাজিল ও যুগোশ্লাভিয়ার খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এদিন খেলা শেষে তিন ও চার নম্বর গ্রুপের নেদারল্যাণ্ডস ও সুইডেন এবং পোল্যাণ্ড ও আর্জেণ্টিনার দ্বিতীয় লীগে খেলার আভাষ পাওয়া গেল। তিন নম্বরে সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী উরুগুয়েরও দ্বিতীয় পর্যায়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে নেই—এমন কথা বলা যায় না। তারা যদি সুইডেনকে হারায় এবং নেদারল্যাণ্ডসের কাছে যদি বালগেরিয়া হারে তবে উরুগুয়ের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। তবে এ পর্যন্ত তারা খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেনি। শুধু উরুগুয়ের কথাই বা বলি কেন—ফুটবলে সমৃদ্ধ দক্ষিণ আমেরিকার কোনো দলই এবার ইউরোপীয়দের টেক্কা দিতে পারছে না।

১৯ জুন ডর্টমুণ্ডে নেদারল্যাণ্ডস-সুইডেন ০-০ করল, ১-১ হল বালগেরিয়া-উরুগুয়ের খেলা হ্যানোভারে। স্টুটগার্টে আর্জেণ্টিনা-ইতালিও ড্র হল (১-১)। শুধু নিষ্পত্তি হল মিউনিখে। পোল্যাণ্ড ৭-০ গোলে হারাল হাইতিকে।

নেদারল্যাণ্ডস যেমন তাদের কর্তৃত্ব দেখাতে পারল না, সুইসদেরও বেশ বিপজ্জনক মনে হল। নেদারল্যাণ্ডস সীমান্ত থেকে মোটরে এক ঘণ্টার পথ এই ডর্টমুণ্ড। তাই বোঝার উপায় ছিল না নেদারল্যাণ্ডস স্বদেশে খেলছে, না বিদেশে রয়েছে। শুরুর দু' ঘণ্টা আগে তাদের হাজার হাজার সমর্থক ব্যানার, ব্যাণ্ড প্রভৃতি নিয়ে গ্যালারি জুড়ে হৈ চৈ শুরু করলেন। তবে খেলা শুরু হতেই প্রথম পাঁচ মিনিট রা কাড়লেন না। কেন না, সুইডেনের ঘানের

জোরালো শট জংব্লডকে ঠেকাতে হল। তারপর খেলা চলে যায় প্রধানত নেদারল্যাণ্ডসের ক্রুয়েফের দখলে। জানসেন, হানজেম ও ক্রুয়েফ একনাগাড়ে পনের মিনিট সুইডেনের দিকে যেন বোমা ফেলে চললেন। কিন্তু হেলস্ট্রোয়েম ঠেকালেন একটি বল।

সুইশদের অসাফল্যের কারণ নিখুঁত শট মারতে না পারা। অ্যাণ্ডারসন ডাচদের রাইট ফ্লাঙ্ককে পরাহত করে স্যাণ্ডবার্গকে দেন, তিনি সেটি স্থির লক্ষ্যে পাঠালে জংব্লডের সাধ্য ছিল না ধরার। বিরতির পরও দুই দলই আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ করে, কিন্তু গোল কেউ দিতে পারল না।

ইতালির বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার খেলা বুঝিয়ে দিল, তারা দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে যাচ্ছেই। আজ যা খেলল তারা, তাতে পরের খেলায় হাইতিকে হারাবেই এবং ইতালিকে এবারও স্বদেশে ফিরে আরও বেশি পচা টম্যাটোর দ্বারা অভিনন্দিত (?) হতে হবে। শুরুর দিকে হেরে দেশে ফিরলে তাদের প্রতি অনুরূপ আচরণ করা হয়েছিল। আর্জেন্টিনার হাউসম্যান কুড়ি মিনিটের মধ্যে ১-০ করলেন সহজেই। ভুল পাসের ফলে ইতালীয়দের কোনো প্রচেষ্টাই সফল হল না। ১-১ হয় পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময়। আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক কার্ণেভালি সহজেই বনেট্টি-রিভেরার আক্রমণ প্রতিহত করতে পারতেন। কিন্তু পারফুমো হঠাৎ ছুটে এসে যেই বলটি নিয়ে কার্ণেভালির কাছে দিতে গেলেন অমনি তা গোলে ঢুকে গেল। পারফুমোর আত্মঘাতী গোলে একটি পয়েণ্ট কমল আর্জেন্টিনার।

চার নম্বর গ্রুপে প্রথম ত্রিশ মিনিটে হাইতির বিরুদ্ধে তিনটি গোল দিয়ে পোল্যাণ্ড দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে যাওয়ার সোপান তৈরি করল। প্রথমার্ধে গোল হল মোট পাঁচটি, ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে একুশ হাজার দর্শকের অধিকাংশই হাইতিকে সর্বক্ষণ সমর্থন জানালেও সেই চিৎকার পোল্যাণ্ডকে গোল দেওয়া থেকে বঞ্চিত করতে পারল না। জারমাশ একাই তিনটি গোল দিলেন। বাকি চারটি—লাটো (২), ডিনা ও গরগনের। এত গোলের জন্য হাইতির গোলরক্ষক হেনরি ফ্রান্সিসকে দায়ী করা যায় না—যদিও দশ বছরের খেলোয়াড় জীবনে তিনি এত গোল খাননি। এদিন তিনি ঠেকান সাতটি কঠিন শট।

বালগেরিয়া-উরুগুয়ের ম্যাচে খেলা শেষের পনের মিনিট আগে বালগেরীয় অধিনায়ক ক্রিস্টো বোনেভ যে গোলটি দিলেন, বারো মিনিট পরে সেটি শোধ করলেন রিকার্ডো পাভনি।

২১ জুন প্রভাতী প্রশিক্ষণের পর গা হিম হওয়ার মত খবর হল স্কটিশ ফুটবলারদের কাছে। ফ্রাঙ্কফুর্টের উত্তর-পশ্চিমে দীর্ঘ পাইন বনের মধ্যে ওদের হোটেল। সেই হোটেলের টেলেক্সে জার্মান ভাষায় হুমকি আছে তাদের প্রতি : প্রোটেস্টান্ট দুজন খেলোয়াড়কে খুন করা হবে। হুমকি আসে আইরিশ রিপাব্লিকান আর্মি থেকে। সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা কর্মীরা হোটেলের প্রবেশ-পথগুলি বন্ধ করে দেন। অতিরিক্ত রক্ষীবাহিনী আসে। স্কটিশ ম্যানেজার ওরমণ্ডকে ভীষণ বিচলিত ও উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল। তিনি নির্দেশ দিলেন কোনো খেলোয়াড় যেন বাইরের কারুর সঙ্গে দেখা না করে।

পূর্ব জার্মানী : পশ্চিম জার্মানী, ব্রাজিল : জাইর, অস্ট্রেলিয়া : চিলি ও যুগোশ্লাভিয়া : স্কটল্যাণ্ড—২২ জুন হামবুর্গে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ১-০ গোলে পূর্ব জার্মানী হারাল পশ্চিম জার্মানীকে। ফুটবলের সুবাদে উনত্রিশ বছর পর দ্বিখণ্ডিত দুই জার্মানী একত্রিত হল। গত জানুয়ারিতে পূর্ব জার্মান ফুটবল প্রতিনিধিরা পশ্চিম জার্মানীতে আসে বিশ্বকাপের ড্র-র সময়। আর জুনে খেলার সময় খেলোয়াড়রা ছাড়াও কিছু দর্শকরা এলেন সীমান্ত পেরিয়ে। পেলেন তাঁরা সাদর অভ্যর্থনা। 'বিবদমান' দুই জার্মানীর মধ্যে ফুটবল তৈরি করল মৈত্রীর সেতুবন্ধন।

গেলসেনকিরখেনে ব্রাজিল ৩-০ গোলে জাইরকে হারায়। বাকি দুটি খেলা ড্র হল। বার্লিনে অস্ট্রেলিয়া-চিলি ০-০ এবং ফ্রাঙ্কফুর্টে যুগোশ্লাভিয়া-স্কটল্যাণ্ড ১-১।

এদিনের খেলা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিল অস্ট্রেলিয়া, চিলি, স্কটল্যাণ্ড ও জাইর। ব্রাজিল আজই এবারের প্রতিযোগিতায় প্রথম গোল দিল। স্কটল্যাণ্ড ও ব্রাজিলের পয়েণ্ট সমান হলেও স্কটল্যাণ্ড বিদায় নেয় গোল পার্থক্যে (লীগ টেবল দ্রষ্টব্য)।

আজ ২২ জুন দেখা গেল ফাইনাল অর্থাৎ ৭ জুলাইয়ের সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথম ষোলটি খেলায় দর্শক সমাগম আশানুরূপ হয়নি। প্রাথমিক লীগের ২৪টি খেলায় ১৫ লক্ষ ৭০ হাজার টিকিটের মধ্যে ১০ লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়েছে। প্রথম ষোলটি খেলার আর উল্লেখ্য বিষয়, এবার এখনও একটিও পেনাল্টি হয়নি। ষোলটি ম্যাচে খেলেছেন মোট ২২৬ জন। সবচেয়ে কম খেলিয়েছে যুগোশ্লাভিয়া, মোট ১২ জনকে। আর প্রতিযোগিতার মাঝে দেশে ফিরেছেন শুধু একজন—তিনি হাইতির যোশেফ। প্রথম পর্যায়ের

লীগ শেষে পশ্চিম জার্মানীর খেলোয়াড়রা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। বহুদিন পর তাঁরা স্ত্রী ও বান্ধবীদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেলেন। বিরক্ত হলেন স্কটল্যাণ্ডের কোচ ওরমণ্ড। টেলিভিশনে স্কটল্যাণ্ড-ব্রাজিলের গোলশূন্য খেলা দেখার পর ইংল্যাণ্ডের ক্রীড়াপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন বলেন, স্কটিশরা আরও শক্তিশালী হত যদি স্ট্রাইকার পিটার লরিমাকে সেণ্টার ফরওয়ার্ডে খেলানো হত। এই শুনে ম্যানেজার ওরমণ্ড বলেন, প্রত্যেক মানুষকেই নিজের কাজে আবদ্ধ থাকা উচিত।

২৩ জুন দুই জার্মানী মাঠের মধ্যে মুখোমুখি দেখে মনে হল, গতরাত্রে হামবুর্গে তারা স্বপ্ন দেখেছে। আর পূর্ব জার্মানীর ১-০ গোলে জয় নিশ্চয়ই আশাতীত।

বেসরকারী বা সরকারীভাবে পূর্ব জার্মানী থেকে পশ্চিম জার্মানীতে এই প্রথম একটি ফুটবল দল এসেছে। সর্বত্র তাদের জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা হল। কারণ, দুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনায় এই খেলার গুরুত্ব অনেকটা। পূর্ব জার্মান জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠল হুইস্‌ল-এর সঙ্গে সঙ্গে। গ্যালারিতে কিছু পতাকাও ছিল তাদের, কিন্তু পশ্চিম জার্মানদের ভিড়ে সেগুলি চেনার উপায় ছিল না। অন্যান্য দিনের খেলার সঙ্গে এই ম্যাচের পার্থক্যও দৃষ্ট হল বেশ। দর্শকরা দু' দলকেই সমানভাবে উৎসাহিত করলেন। কারুর খেলার ঘাটতি থাকলেও কোনো দর্শকের মুখে ব্যঙ্গোক্তি শোনা গেল না।

সমাপ্তির বারো মিনিট আগে পূর্ব জার্মানী জয়সূচক গোলটি করে নিতান্ত সহজেই। গোলরক্ষক ক্রয়ের কাছ থেকে বল পেয়ে পঁয়ষট্টি মিনিটের সময় বদলী খেলোয়াড় হামান ডানদিকে দ্রুত ছুটলেন এবং চল্লিশ গজ দূর থেকে পাস দিলেন স্পারওয়াশারকে। তিনি দ্রুত ছুটে পশ্চিম জার্মান রক্ষণব্যূহ ভেদ করে গোল দিলেন (১-০)। বলাবাহুল্য ক্রিশে প্রথমার্ধে অনুরূপ একটি গোল থেকে পূর্ব জার্মানীকে বঞ্চিত করেন। তাই বলে পূর্ব জার্মানী যে খুব একটা প্রস্তুত হয়েই বিশ্বকাপে এসেছিল, তা নয়। ম্যানেজার জর্জ বুশনারের নজর ছিল যে মিড-ফিল্ডেই। স্ট্রেশ ও লো-কে আনেননি। শুরুর দিকে হফম্যানকে কাজে লাগান।

পশ্চিম জার্মানীকে এদিন বেশ দুর্বল মনে হল। সত্তর মিনিটের সময় ওভারাথকে বসিয়ে নেৎসারকে নামানো হয়। গ্যালারিতে তখন প্রচণ্ড

হাততালি। কিন্তু তাঁর আগের খেলা দেখা গেল না। হেলমুট শ্যোন দেখলেন তিনি যথার্থই সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন নেৎসারকে বাদ দিয়ে।

যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে স্কটল্যাণ্ড যেভাবে লড়াই করল, তাতে স্কটল্যাণ্ডের জেতাই উচিত ছিল। খেলা শেষে স্কটিশ সমর্থকরা এমনভাবে তাদের উদ্দেশে শ্লোগান ও গানের কলি ছুঁড়ে দিচ্ছিল, মনে হল ১-১ ড্র নয়, তাদের জয় হয়েছে। কিন্তু এই ড্র তাদের বিশ্বকাপ থেকে বিদায় করে দিল। এদিকে জাইরের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের ৩-০ গোলে জয়ের খবর ফুটে উঠেছে ইলেকট্রনিক স্কোর বোর্ডে, আর এই মাঠে ড্র। স্কটল্যাণ্ডকে টিকে থাকতে হলে জিততে হবে। গ্যালারিতে তাই প্রবল উত্তেজনা। জয় যখন সম্ভব হল না, স্কটল্যাণ্ড থেকে আগত সাংবাদিকরাও অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। কোনো কোনো সাংবাদিক ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। গত এক-দশকে স্কটিশরা কিন্তু এত ভাল ফুটবল খেলেনি। শেষ মিনিটে জর্ডানের গোলেই ১-১ হয়। এর আগের মুহূর্তে ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ডে দেখা যাচ্ছিল ব্রাজিল জিতছে ২-০ গোলে। ব্রাজিল যদি জাইরের সঙ্গে ২-০-য় শেষ করত তা হলে স্কটিশরাই দ্বিতীয় রাউণ্ডে যেত গোলের পার্থক্যে এগিয়ে থাকায়। কিন্তু স্কটিশদের সব আশা নির্মূল হয়ে যায় ব্রাজিলের তৃতীয় গোলের সঙ্গে সঙ্গেই। এদিন যুগোশ্লাভিয়ার গোলটি হয় কারাসির হেড থেকে। উল্লেখ্য, স্কটিশরা একটিও ম্যাচে হারেনি।

নেদারল্যাণ্ডস : বালগেরিয়া, সুইডেন : উরুগুয়ে, পোল্যাণ্ড : ইতালি এবং আর্জেন্টিনা : হাইতি—প্রথম রাউণ্ডের শেষ চারটি খেলা হল ২৩ জুন। এদিন ডর্টমুণ্ডে ৪-১ গোলে নেদারল্যাণ্ডস হারায় বালগেরিয়াকে, ডুসেলডর্ফে সুইডেন ৩-০ গোলে উরুগুয়েকে, স্টুটগার্টে পোল্যাণ্ড ২-১ গোলে ইতালিকে ও মিউনিখে ৪-১ গোলে আর্জেন্টিনা হারাল হাইতিকে। বিস্ময়কর ঘটনা, এদিন ১৯৪৭-এর রানার্স ইতালির বিশ্বকাপ থেকে বিদায়।

শুরুতে অনেকের ধারণা ছিল, ইতালির সাংগঠনিক শক্তি এবং সুপরিকল্পিত ফুটবল তাদের সুনাম আরও বাড়িয়ে দেবে বিশ্বকাপে। কিন্তু নেকার স্টেডিয়ামে পোল্যাণ্ড দেখাল মিউনিখ ওলিম্পিকের চাইতে তারা অনেক উন্নত। চারটি গ্রুপের মধ্যে তারাই একমাত্র দেশ, যারা ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পেরেছে প্রথম পর্যায়ের লীগে। প্রকৃতপক্ষে এই লীগে নেদারল্যাণ্ডস ও পোল্যাণ্ডের মত আর কেউ দৃঢ়তা দেখাতে পারেনি। পোল্যাণ্ড তিনটিতে

জিতলেও তাদের রক্ষণভাগের তুর্বলতা যথেষ্ট ; ১৯৪৭-এ মেক্সিকোতে ব্রাজিলেরও এমনি অবস্থা ছিল।

পোলিশরা এই ম্যাচে সারাক্ষণ প্রাধান্য বিস্তার করলেও সমাপ্তির পাঁচ মিনিট আগে কোনোরকমে তাদের তুটি গোলের একটি কাপেলো শোধ করেন। আর একটি গোল দেওয়া তাদের পক্ষে তুঃসাধ্য ছিল। এবং তাই দেশে ফিরতে বিমানে ওঠার আগে সব খেলোয়াড় পুরনো পোশাক পরে নিলেন, ১৯৬৬-তে ডিম ও পচা ফল দ্বারা অভিনন্দনের কথা মনে রেখে।

ইতালিও এদিন চমৎকার খেলে। পোল্যাণ্ড যখন ১-০ এগোয়, ইতালির তখন অন্তত তুই বা তিন গোলে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। রিভেরা ও রিভাকে এই ম্যাচে বাদ রেখে ইতালিকে ভুলের মাশুল দিতে হয়।

পোলিশরা প্রথমার্ধে মাত্র ছয় মিনিটের ব্যবধানে তুটি গোল করে। নিখুঁতভাবে বল দেওয়া-নেওয়া, প্রচণ্ড শক্তি ও সুন্দর ফুটবল দেখিয়ে আটত্রিশ মিনিটের সময় জারমাশ ১-০ করেন। দ্বিতীয় গোলটি ডিনার। কুড়ি গজ দূর থেকে প্রচণ্ড শটে ইতালির গোলরক্ষক জোফকে পরাস্ত করেন। এর পরেও যেমন পোল্যাণ্ড, তেমনি ইতালি বেশ কয়েকটি চমৎকার সুযোগ পায়।

ইতালির পরাজয়ের খবর শুনে ও টেলিভিশনে দেখে রোমের ফুটবল প্রেমিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। রোম নগরীর গার্বাসো স্ট্রীটের অধিবাসীরা জানলার ধারে ভিড় জমান। জনৈক ফুটবল প্রেমিক পোল্যাণ্ড দ্বিতীয় গোল দিতেই রেগে গিয়ে তাঁর টেলিভিশন সেটটি রাস্তায় ফেলে দেন তিনতলা থেকে। বিজয় উৎসব করবে আশায় যাঁরা শত শত পতাকা কিনেছিলেন, সেগুলি পোড়ানো হল। শোকচিহ্নস্বরূপ অনেকে কালো ব্যাজ ধারণ করলেন একদল কিশোর আবার অন্যপথ নিল—তারা রোমস্থ পোলিশ দূতাবাসে টম্যাটো ও পাথর ছুঁড়ল। ফ্রাঙ্কো পেরা নামে এক তরুণ ছুরি দিয়ে নিজের হাতের শিরা কেটে ফেলে জাতীয় দলের পরাজয়ের গ্লানিতে।

নেদারল্যাণ্ডসকে এদিন সমর্থন জানালেন চল্লিশ হাজার দর্শক। ৪-১ গোলের মধ্যে নেদারল্যাণ্ডসের তুটি গোল পেনাল্টি থেকে হলেও, তাদের সঙ্গে বালগেরিয়া যুঝতেই পারেনি। তবুও বিজয়ী দলের ত্রুটি ছিল, এবং সে ত্রুটি গোল করার ব্যাপারেই। তাঁরা খেলতে থাকেন নিতান্ত অবহেলা ভরেই। তবুও ঘনঘন ফাউল করছিলেন কেন বোঝা গেল না। অস্ট্রেলীয় রেফারি বসকতিক তো ক্রুয়েফকে অকারণে সময় নষ্ট ও তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কির জন্য

সতর্ক করলেন। নেদারল্যাণ্ডস পেনাল্টি পায় ভ্যাসিলেভ ক্রুয়েফকে ফাউল করায়। বালগেরিয়া যে গোলটিতে ৪-১ করে সেটির জন্য তাদের কৃতিত্ব নেই। বালগেরিয়ার বনেভ বল নিয়ে ডাচ রক্ষণব্যূহ ভেদ করতে গেলে ক্রল গোল বাঁচাতে নিজেদের গোলরক্ষককে বল বাড়ালে আত্মঘাতী গোলটি হয়।

আর্জেন্টিনা ৪-১ গোলে হাইতিকে হারিয়ে গোল পার্থক্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। ইতালিরও তিন পয়েণ্ট হয়েছিল। কিন্তু গোলের সংখ্যা কম থাকায় তারা বিদায় নেয়। বিজয়ী দলের সমর্থকরা গ্যালারিতে ড্রাম পিটিয়ে তাদের উৎসাহিত করতে থাকেন শুরু থেকেই। তারা দুই অর্ধে দুটি করে গোলও দিলেন। বিরতির আগে তারা যখন ২-০ এগিয়ে তখন গ্যালারিতে নাচানাচির খবর রেডিওয় শুনে, টেলিভিশনে দেখে পুলিশের ধারণা হল ওখানে গণ্ডগোল চলছে। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্রবাহিনী সেখানে গিয়ে বোকা বনে ফিরে এল।

সুইডেন প্রথম রাউণ্ডের লীগের শেষ খেলায় ৩-০ গোলে উরুগুয়েকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠল। একুশ বছর বয়সী এস্ট্রোয়েম দুটি ও স্যাণ্ডবার্গ দিলেন একটি গোল। তিন নম্বর গ্রুপে নেদারল্যাণ্ডসের পরেই তাদের স্থান হল।

চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রথম রাউণ্ড সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নানা ঘটনা ঘটে। চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য যোগ্যতা অর্জন করায় জাইরের প্রেসিডেণ্ট মোবুটু তাদের প্রত্যেককে ফোকসওয়াগন মোটর গাড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে ০-২, ০-৯ ও ০-৪-এ হেরে বিদায় নেওয়ায় তিনি গাড়িগুলি ফিরিয়ে নেন।

পশ্চিম জার্মানীর খেলোয়াড়রা যখন শুনলেন, নেদারল্যাণ্ডসের খেলোয়াড়রা বিশ্রাম-দিনে স্ত্রী ও মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কাটাচ্ছে, তখন তাঁরাও ওই সুযোগ দাবি করেন। ম্যানেজার হেলমুট শ্যোন সঙ্গে সঙ্গে বললেন : তোমরা স্ত্রী ও মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে পার, কথাও বলবে। খবরদার তার বেশি আর কিছু নয়। সুইডেন দ্বিতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হওয়ায় তাদের দুজন খেলোয়াড় পরবর্তী প্লেন ধরে বাড়ি চলে যান স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে।

দ্বিতীয় রাউণ্ড

প্রথম রাউণ্ডের চারটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সদের নিয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা হল দুই গ্রুপে ভাগ করে এবং আবার লীগ প্রথায়। 'এ'

গ্রুপে রইল নেদারল্যাণ্ডস, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও পূর্ব জার্মানী। 'বি' গ্রুপে পশ্চিম জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড ও সুইডেন।

পশ্চিম জার্মানী : যুগোশ্লাভিয়া, নেদারল্যাণ্ডস : আর্জেন্টিনা, পোল্যাণ্ড : সুইডেন ও ব্রাজিল : পূর্ব জার্মানী—২৬ জুন ডুসেলডর্ফে পশ্চিম জার্মানী ২-০ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে, গেলসেনকিরখেনে নেদারল্যাণ্ডস ৪-০ গোলে আর্জেন্টিনাকে, স্টুটগার্টে পোল্যাণ্ড ১-০ গোলে সুইডেনকে ও হ্যানোভারে ব্রাজিল ১-০ গোলে পূর্ব জার্মানীকে হারাল।

'বি' গ্রুপ লীগে প্রথম রাউণ্ডের এক নম্বর গ্রুপের রানার্স পশ্চিম জার্মানীর কাছে দুই নম্বর গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন যুগোশ্লাভিয়ার হার কিছুটা অপ্রত্যাশিত হলেও জার্মানরা চমৎকার খেলেছে। ফাইনাল পর্যায়ে যুগোশ্লাভিয়ার এটি প্রথম পরাজয়। ৩৮ মিনিটে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে বুলেটের মত শটে লেফট ব্যাক পল ব্রাইটনার ১-০ করেন। ২-০ হয় ৭৭ মিনিটে জটলার মধ্য দিয়ে গার্ড মুলার শট করলে। যুগোশ্লাভ প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো মাঠে গিয়ে খেলাটি দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিম জার্মানী ও যুগোশ্লাভ নিরাপত্তা বাহিনী তাঁকে টেলিভিশনে খেলা দেখার অনুরোধ করেন।

নেদারল্যাণ্ডস এদিন প্রথম ২৫ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে যায়। বাকি দুটি গোল বিরতির পরে। সুইডেনের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ড বিরতির আগে লাটোর একমাত্র গোলে জেতে। ব্রাজিল—পূর্ব জার্মানীর খেলাটি বিরতির আগে গোলশূন্য ছিল। ৬০ মিনিটের সময় রিভেলিনো খেলার নিষ্পত্তি করেন।

ফাইনাল রাউণ্ডে দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলার প্রথম দিনে বোঝা গেল প্রথম রাউণ্ডে যারা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, এখন তারা প্রবল বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রথম রাউণ্ডে নেদারল্যাণ্ডস-সুইডেন গোলশূন্য ড্র করেছিল। কিন্তু ২৬ জুন আর্জেন্টিনাকে তারা বিপর্যস্ত করল। খেলা দেখে মনে হল ৭ জুলাই তারা ফাইনাল খেলবেই। রেনসেনব্রিঙ্ক বললেন : এই ফল আমাদের উৎসাহিত করেছে, কিন্তু আরও দুটি শক্ত ম্যাচ রয়েছে। সুইপার আরি হান জানালেন : এত সহজে আর কাউকে হারানো যাবে না। তাঁর ধারণা, বিশ্বকাপে পশ্চিম জার্মানীই ফেভারিট।

গত সপ্তাহের সঙ্গে এদিনের পার্থক্য আরও অনেক। পশ্চিম জার্মানী ভীষণ

খুশি, যুগোশ্লাভিয়া বেদনাহত। পোল্যাণ্ডকে বেশ সংগ্রাম করতে হল। সুইডেনের শিবিরে বিষাদের ছায়া শুধু পরাজয়ের জন্য নয়, খেলার সময় গুরুতর আঘাত পেয়ে অ্যাণ্ডারসন হাসপাতালে ভর্তি হলেন। পশ্চিম জার্মান কোচ হেলমুট শ্যোনের মনোবল দৃঢ় হল। তাঁর ধারণা, এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দলের লড়াকু মনোভাবও বেড়েছে। এদিন রাইনার বনহোফ জার্মানীর খেলাকে নতুন পথে চালিত করেছেন যেমন, তেমনি যুগোশ্লাভিয়া অত্যন্ত রক্ষণাত্মক খেলেছে। রক্ষণাত্মক খেলা সম্পর্কে যুগোশ্লাভ ম্যানেজার মিলজানিক বললেন: এছাড়া উপায়ও ছিল না। অ্যাটাকিং ফুটবল খেললে জার্মানরা আমাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। যুগোশ্লাভদের দুর্বলতার প্রধান কারণ বাজেভিক বাদ পড়ায়, তাদের সেণ্ট্রাল স্ট্রাইকার বলতে দ্বিতীয় কেউ তো ছিলেন না।

ব্রাজিল : আর্জেণ্টিনা, নেদারল্যাণ্ডস : পূর্ব জার্মানী, পশ্চিম জার্মানী : সুইডেন ও পোল্যাণ্ড : যুগোশ্লাভিয়া—৩০ জুন হ্যানোভারে ব্রাজিল ১-০ গোলে আর্জেণ্টিনাকে, গেলসেনকিরখেনে নেদারল্যাণ্ডস ২-০ গোলে পূর্ব জার্মানীকে, ডুসেলডর্ফে পশ্চিম জার্মানী ৪-১ গোলে সুইডেনকে, ফ্রাঙ্কফুর্টে পোল্যাণ্ড ২-১ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে হারাল।

ব্রাজিল-আর্জেণ্টিনার রেষারেষি শুধু ফুটবল মাঠে নয়। জাতীয় অর্থাৎ রাজনৈতিক স্তরেও ভীষণ মনোমালিন্য। পশ্চিম জার্মানীতে দুটি দেশ মুখোমুখি হবে বিশ্বকাপে। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় এই দুই দেশের একটি সেতু খেলার দিনে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সীমান্ত শহর আর্জেণ্টিনার নাসো ডি লস লিবার্স ও ব্রাজিলের সীমান্ত শহর উরুগুয়েয়ানার মধ্যবর্তী সেতুটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক গণ্ডগোলেই দুই দেশের মধ্যে বেশি প্রীতি ম্যাচ হতে পারেনি। ১৯৭১-এ শেষ ম্যাচে ১-১ হয়েছিল। ১৯০৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে মোট খেলা হয়েছে ৫৪টি। এর মধ্যে আর্জেণ্টিনা জিতেছে—২৬, ড্র—১০, পরাজয়—১৮। পাশাপাশি হলেও দুই দেশের ফুটবলের স্টাইল ভিন্ন। ব্রাজিলের আগের উজ্জ্বলতা না থাকলেও ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ঝলক দেয় মাঝে মাঝে। আর্জেণ্টিনার হাড় কাঁপানো ও হুড়মুড়িয়ে খেলার ভঙ্গী এখনও বিদ্যমান। ওরা ব্রাজিলের স্টাইলকে বলে 'মেয়েলি' আর নিজেদেরকে 'মর্দানি'। ব্রাজিল বলে, ওরা 'পাশবিক' ফুটবল খেলে, আর আমরা 'শৈল্পিক'।

লোয়ার স্যাক্সনি স্টেডিয়ামে এই দুই দেশের খেলায় মেক্সিকোর 'স্পিরিট' ও 'স্টাইলে'র প্রত্যাবর্তন ঘটল। শ্বাসরুদ্ধকারী এই ম্যাচে দর্শকরা শুরু থেকে

শেষ পর্যন্ত গভীর উৎকণ্ঠায় কাটালেন। ব্রাজিল এই ম্যাচে জিতলেও ফাইনালে পৌঁছতে তাদের শক্ত বাধা—নেদারল্যাণ্ডসকে হারাতে হবে পরবর্তী ম্যাচে। খেলার গুণে নেদারল্যাণ্ডসেরই ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। অবশ্য আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে আজ তারা যেমন খেলল, তা বজায় থাকলে অন্য ফলও হতে পারে। বলা বাহুল্য এবারের বিশ্বকাপে ব্রাজিল এত ভাল আর খেলেনি। আজই তারা প্রথম বিপক্ষের রক্ষণভাগে ঘন ঘন চাপ সৃষ্টি করেছে। বিপক্ষের আক্রমণভাগকে ছত্রভঙ্গ করেছেন লুইস পেরিরা ও জে মারিয়া। ব্রাজিলের আক্রমণভাগকে সজীব করে রাখেন রিভেলিনো ও দুই পাউলো সিজার। জেয়ারজিনোর দ্রুত দৌড়ের সঙ্গে আর্জেন্টিনা পেরে ওঠেনি।

রিভেলিনো জেয়ারজিনোকে চমৎকার পাস দিয়েই বুট বদল করতে মাঠের বাইরে গেলেন। ফিরেই ছুটলেন আর্জেন্টিনার পেনাল্টি-এলাকায় লুইস পেরিরার স্কোয়ার পাস ধরতে। তারপর বাঁ পায়ে নিখুঁতভাবে মারতেই কার্ণেভালি পরাস্ত হলেন। গ্যালারিতে ড্রামগুলি বেজে উঠল উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু চার মিনিটের বেশী তা স্থায়ী হল না। এরই মধ্যে আর্জেন্টিনার বাবুয়েনা বল নিয়ে ব্রাজিল পেনাল্টি-এলাকার বাইরে পড়ে গেলেন লাথি খেয়ে। ব্রাজিলের আটজন পাঁচিল তুলে দাঁড়ালেন ফ্রি-কিকের সামনে। ব্রিন্দিসির শটে লিয়াও পরাস্ত হলেন হতভম্ব হয়ে। ১-১ হতে আর্জেন্টিনার আস্থা ফিরে এল।

কিন্তু ব্রাজিলের স্কিল, দ্রুততা ইত্যাদির সঙ্গে তাদের পেরে ওঠা দায় ছিল। ৪৯ মিনিটের সময় তাদের ঢিলেমীতে ব্রাজিল ২-১ গোলে এগিয়ে গেল। জে মারিয়া একটি মৃত বল ধরে জেয়ারজিনোকে পাস দিতেই, তিনি সেটি নিয়ে দ্রুত ছুটলেন ও সকলকে অতিক্রম করে ব্রাজিলের জয়সূচক গোলটি দিলেন। ব্যবধান সামান্য হলেও ব্রাজিলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোনো দ্বিধা ছিল না। আর্জেন্টিনার হানাদাররা বারংবার ব্রাজিল রক্ষণে আঘাত করেন বটে, তবে তা ফলপ্রসূ হয়নি ব্রাজিলের শান্ত রক্ষকদের তৎপরতায়।

খেলা শেষে ব্রাজিলকে চিন্তায় ফেলল ফ্রান্সিসকো মারিনো হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায়। এক্স-রেতে দেখা যায় তাঁর পাঁজরার একটি হাড় ভেঙে গেছে। ৬৮ মিনিটের সময় গ্নারিয়ার ধাক্কায় ফ্রান্সিসকোর পাঁজরায় আঘাত লাগে। সাইড-লাইনে মিনিট পাঁচেক ট্রেনারের শুশ্রূষা নেন। কিন্তু আবার মাঠে নেমে সর্বক্ষণ আঘাতপ্রাপ্ত ডান দিকটা হাতে ধরে রেখেই খেললেন।

গেলসেনকিরখেনে নেদারল্যাণ্ডসও দর্শনীয় ফুটবল খেলল পূর্ব জার্মানীর

বিরুদ্ধে। তাদের ২-০ গোলে জয়ের প্রথমটি হল আরম্ভের নয় মিনিটের মধ্যে নিসকেন্সের পা থেকে। এই নিসকেন্সকে খেলা শুরুর মাত্র একঘণ্টা আগে 'ফিট' ঘোষণা করা হয়। প্রবল বৃষ্টি হলেও ডাচ সমর্থকরা মাঠে হাজির হতে পিছপা হননি। যোহান ক্রুয়েফ-বাহিনী 'ফুটবলের সম্পূর্ণ রূপ' দেখাতে চেয়েছিলেন এদিন। কিন্তু বৃষ্টির জন্য তাদের চমৎকার অ্যাঙ্গুলার পাস লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও দর্শকরা খুশি হলেন। ডাচদের চার ব্যাক সুবরিয়র, ক্রল, রিজবার্জেন ও হান মাঝে মাঝেই হানা দিচ্ছিলেন পূর্ব জার্মানীর পেনাল্টি-সীমানায়। দ্বিতীয় গোলের জন্য তো হানেরই অবদান সর্বাধিক। অবশ্য নিসকেন্সের শেষ পাস থেকে রেনসেনব্রিঙ্ক গোলটি দেন। বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি তাঁর প্রথম গোল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পূর্ব জার্মানী আক্রমণের চেষ্টা করে রণে ভঙ্গ দেয় নেদারল্যাণ্ডসের তৎপরতা দেখে। এই খেলার পর ডাচ কোচ রিনার মিচেলসকে খুব খুশি মনে হল। রসিকতা করে বললেন: শনি কিংবা রবিবার ছাড়া ফাইনাল খেলব না। তবে রবিবারই বেশি পছন্দ করব, যদিও আমরা ইহুদি নই। ব্রাজিলের সঙ্গে কী হবে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন: উভয়েই অ্যাটাকিং ফুটবলে বিশ্বাসী, সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবেই। তবে আমাদের সঙ্গে ওরা পেরে উঠবে না। উপরন্তু ওই ম্যাচ তো ড্র হলেও আমরা ফাইনালে যাচ্ছি।

ওয়াল্ড স্টেডিয়ামে ৩০ জুনের খেলা শেষের সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়া এবারের বিশ্বকাপকে কার্যত বিদায় জানাল। পোল্যাণ্ড তাদের হারাল ২-১ গোলে। আজ যুগোশ্লাভিয়ার পরাজয়ের মূলে আক্রমণে অনীহা। জিততেই হবে—এমন মনোভাবও দেখা যায়নি তাদের। তাছাড়া তাদের যে সামর্থ্য আছে সে প্রমাণ মেলে অনেক পরে। তাদের ব্যর্থতা প্রকাশ পায় বিপক্ষের গোলমুখে গিয়ে। কারাসি ছাড়া আর কেউ দলের দায়িত্ব নিতে যেন প্রস্তুত ছিলেন না। অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন পোলিশরা ভাগ্যবান, তাই জিতল। কিন্তু যে পেনাল্টি তাদের সবচেয়ে সহায়ক ছিল, তা কী কোনো রেফারী না দিয়ে পারতেন? আসলে পোল্যাণ্ড সর্বদা আক্রমণাত্মক খেলেছে, কিন্তু খেলায় সৌন্দর্য ছিল যুগোশ্লাভদের।

পোলিশরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আজই ২৬ মিনিটের সময় সর্বপ্রথম যুগোশ্লাভদের বেগ দেয়। যুগোশ্লাভ পেনাল্টি-এলাকায় বল যেতেই কারাসি মারাত্মক লাথি মারলেন জারমাশকে।

যুগোশ্লাভিয়া এদিন দুর্বলও ছিল অন্যান্য দিনের তুলনায়। খেলার কিছু আগে জাজিক অসুস্থ হয়ে পড়েন, অষ্টাদশ মিনিটে ওব্‌লাকের উরুতে আঘাত ইত্যাদি তাদের মানসিক দৌর্বল্য আনে। তবুও বিরতির এক মিনিট আগে কারাসি ১-১ করলে মনোবল বেড়ে যায়। কিন্তু আক্রমণে তেমন দৃঢ়তা দেখা যায়নি। ৮৩ মিনিটের সময় গাডোছার কর্ণারে লাটো মাথা দিতেই ২-১ হল।

এদিন রাত্রে পশ্চিম জার্মানী সহজেই হারাল ৪-২ গোলে সুইডেনকে। অবশ্য প্রথম গোলটি দেন সুইডেনের এস্ট্রোয়েম ২৬ মিনিটের সময়। কিন্তু সুইডেন এই প্রাধান্য বেশিক্ষণ বজায় রাখতে পারেনি। ৫১ ও ৫২ মিনিটে পর পর দুটি গোল দিলেন পশ্চিম জার্মানীর ওভারাথ ও বনহোফ। খেলা হচ্ছিল অত্যন্ত দ্রুত লয়ে। ৫৩ মিনিটে সুইস খেলোয়াড় স্যাণ্ডবার্গ ২-২ করলেন। কিন্তু ৭১ মিনিটে গ্রাবোস্কি জার্মানীকে ৩-২ এগিয়ে দিলেন, ৪-২ হল ৮৯ মিনিটে হোনেসের পেনাল্টি থেকে।

পশ্চিম জার্মানী : পোল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস : ব্রাজিল, সুইডেন : যুগোশ্লাভিয়া ও পূর্ব জার্মানী : আর্জেন্টিনা—৩ জুলাই দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগের শেষ চারটি খেলায় গেলসেনকিরখেনে পূর্ব জার্মানী-আর্জেন্টিনা ১-১ ড্র করলেও যেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না, তেমনি নিয়মরক্ষার খেলা ছিল ডুসেলডর্ফে সুইডেন ২-১ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে হারালেও। 'এ' ও 'বি' গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দুটি দলই যাবে ফাইনালে। সুতরাং ফ্রাঙ্কফুর্টে পশ্চিম জার্মানী-পোল্যাণ্ডের ও ডর্টমুণ্ডে নেদারল্যাণ্ডস-ব্রাজিলের খেলায় দিকেই রইল সকলের লক্ষ্য। নেদারল্যাণ্ডস ২-০ গোলে ব্রাজিলকে হারিয়ে ও পশ্চিম জার্মানী ১-০ গোলে পোল্যাণ্ডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠল। লীগের শেষ খেলায় পয়েন্টের হিসাবে পোল্যাণ্ড ও ব্রাজিল রইল দুই গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে। অতএব তৃতীয় স্থান নির্ণয় হয় এদের খেলার ফলে।

চুয়াল্লিশ বছরের ইতিহাসে নেদারল্যাণ্ডস এই প্রথম ফাইনালে উঠল। পশ্চিম জার্মানী এর আগে কাপ জেতে ১৯৫৪-য়, ১৯৪৭-তে হয়েছিল রানার্স।

ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ও নেদারল্যাণ্ডস

পোল্যাণ্ড আজ ওয়াল্ড স্টেডিয়ামে পশ্চিম জার্মানীকে জয় করতে পারত! পারেনি শুধু জার্মান গোলরক্ষক শেপ মেয়ারের প্রচণ্ড দৃঢ়তায়। এই খেলার পর বিশ্ব ফুটবলের পুরস্কার ফিফা কাপ জয় থেকে জার্মানরা মাত্র একধাপ দূরে

রইল। গার্ড মূলারের একমাত্র গোল পোল্যাণ্ডকে ফাইনালে উঠতে দিল না। পোলিশদের জন্য তাই অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করলেন।

প্রবল বৃষ্টিতে মাঠ ভেসে যায় খেলার আধঘণ্টা আগে। দমকল বাহিনীর এঞ্জিন জল পাম্প করার পর নির্দিষ্ট সময়ের ৩১ মিনিট পরে খেলা শুরু হয় কাদার মধ্যে ফুটবলের অনুপযোগী মাঠে। বিরতির পরে বৃষ্টি নামলে মাঠের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়। এমন পরিবেশে পোলিশরাই তাদের বিভিন্ন বিভাগে চমৎকার খেলে। পাস দিয়ে লক্ষ্যে বল পাঠানো বা বল ধরায় তাঁরা জার্মানদের অপেক্ষা নির্ভুল ছিলেন। কিন্তু তাঁরা আসল কাজ—গোল করতে পারলেন না কেবলমাত্র জার্মান গোলরক্ষকের জন্য। শেপ মেয়ার জীবনে এত ভাল আর কখনও খেলেননি।

আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দুই দলই দারুণ অ্যাটাকিং ফুটবল খেলল। আর এই তুল্যমূল্য খেলার জন্য গ্যালারিতে সারাক্ষণ যেমন উত্তেজনা, তেমনি উৎকণ্ঠা। এই খেলা আর কিছু না হোক, সেই সব কোচদের চোখ খুলে দিল—যাঁরা ডিফেন্সিভ ফুটবলে বিশ্বাসী। তাঁরা বুঝলেন, রক্ষণাত্মক খেলাই ফুটবলের অন্তিম ডেকে আনছে।

মূলার গোল দিলেও জার্মানরা বহুকাল ঋণী থাকবেন বনহোফের কাছে। দলে তাঁর আক্রমণের পর থেকে জার্মানীর খেলার আদল পাল্টে গেছে। বনহোফের ফুটবল-কুশলতা জার্মানদের সারা মাঠ বিচরণের দিগদর্শকের কাজ করল। পোলিশদের একাগ্রতা যখনই নষ্ট হয়েছে, জার্মানরা তখনই আঘাত হেনেছে। জার্মানদের শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্ট হল বিরতির পরে। ৬৫ মিনিটে জার্মানরা পেনাল্টি পায়। কিন্তু পোলিশ গোলরক্ষক তোমাসজোস্কি সেটি আটকে দেন। এই বিশ্বকাপে এটি তাঁর দ্বিতীয় কৃতিত্ব। কিন্তু কিক্ করার আগেই তিনি নড়াচড়া করেছেন—এই অভিযোগে পুনরায় কিকের সিদ্ধান্ত হল। হোনেশের এই শট ক্রসবারের উপর দিয়ে চলে যায়। জমুডা হোলৎসেন-বাইনকে ফাউল করায় পেনাল্টি হয়েছিল। ৭৬ মিনিটে বিশ্বের সবচেয়ে সুযোগ-সন্ধানী মূলার আবার এগিয়ে গেলেন পোলিশ পেনাল্টি-এলাকায়, বনহোফের পাসটি তখন এসে পড়ল মূলারের কাছে, তিনি ১-০ করলেন। গোল খেয়ে অপরাজিত পোলিশরা দমলেন না। বরং লাটো, গাডোছা ফ্লাঙ্কে যাদু দেখাতে লাগলেন। গাডোছা জার্মান রক্ষক ব্রাইটনার, বেকেনবাউয়েরকে কাটিয়ে জোরালো শট করলেন, কিন্তু মেয়ারের তৎপরতায় সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

পশ্চিম জার্মানী-পোল্যাণ্ড কাদা মাঠে খেললেও, একই দিনে অন্য শহর ডর্টমুণ্ডে চমৎকার আবহাওয়ায় শুকনো মাঠে নেদারল্যাণ্ডস ও ব্রাজিল খেলল। বলাবাহুল্য এমন রুক্ষ ফুটবল বহুদিন দেখা যায়নি। ডাচরা তাদের আক্রমণে দ্রুততা বজায় রেখে এবং নব নব পরিকল্পনা রচনা করে গতবারের বিজয়ী ব্রাজিলকে ২-০ গোলে হারাল। ফাউলের এতই আধিক্য দৃষ্ট হল যে, সমাপ্তির পাঁচ মিনিট আগে ব্রাজিলের লুইস পেরিরাকে মাঠ থেকে বের করে দিলেন পশ্চিম জার্মান রেফারী কে শেনশার। সন্দেহ নেই নির্দয় ট্যাক্লিং করেছেন ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা। আঘাত-জর্জরিত হয়ে ডাচ উইঙ্গার রেনসেনব্রিঙ্ক খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে যান। হিংস্রতার দ্বারা ফুটবলের ওস্তাদ ব্রাজিল তার ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করেছে ৯০ মিনিট ধরে। নেদারল্যাণ্ডসের প্রথম গোলদাতা নিসকেন্সও প্রচণ্ড আঘাত পান। তাঁকে প্রথমার্ধে ক্যারাটে আঘাতে ধরাশায়ী করা হয়। লুইস পেরিরা বহিষ্কৃত হন নিসকেন্সকে হাঁটুতে আঘাত হানায়। তবে নিসকেন্স এতই শক্ত যে, তাঁদের চিকিৎসক ডাঃ কেপেল বলেন, ওকে নিয়ে আমাদের চিন্তা নেই। যত ভাবনা রেনসেনব্রিঙ্ককে নিয়ে।

এই খেলাটি লোমহর্ষক হয়েছে ভয়ঙ্করতার জন্যই। প্রথমার্ধে ডাচদের প্রচণ্ড আক্রমণ রুখতে ব্রাজিল যেভাবে ট্যাক্ল করছিল তা দেখে রক্ত হিম হয়। রেফারিও সজাগ দৃষ্টি রাখলেন এবং ব্রাজিলিয়ান-ডিফেণ্ডারের নাম টুকে নিলেন। প্রথমার্ধে তারা এইভাবে নেদারল্যাণ্ডসকে রুখলেও দ্বিতীয়ার্ধে ডাচদের গতিকুশলতার কাছে ব্রাজিল মাথা নত করতে বাধ্য হয়।

ওয়েস্টফালেন স্টেডিয়াম এদিন আবার ফুটবলের পরিবেশে ফিরে আসে। ডাচ সমর্থকরা কাতারে কাতারে হাজির হন তাঁদের নানা ধরনের বাদ্যভাণ্ড সহ। প্রকৃতপক্ষে এই স্টেডিয়াম কখনও এর আগে এমনভাবে জয়গানে মুখরিত হয়নি। নেদারল্যাণ্ডসের ৩৫ হাজার সমর্থক মাঠে ছিলেন।

শুরু থেকেই ব্রাজিল ছন্দহারা ছিল। ডাচরা তখনই গোলের সুযোগ পেয়ে তা কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর হয়। ক্রুয়েফের সোয়ারভিং কর্নার-কিক্ ব্রাজিল গোলরক্ষক লিয়াও ঘুষি মেরে ক্লিয়ার করেন। এর সাত মিনিট পরে জানসেনের একটি শট বাউন্স্ করে ব্রাজিল ডিফেণ্ডার কাছাকাছি পৌঁছে যায়, কাছেই ছিলেন ক্রুয়েফ, তিনি পা ঠেকাতেই বিপজ্জনকভাবে গোলে হাজির হয়, লিয়াও এবারও বলটি বারের উপর দিয়ে বের করে দেন।

সূচনায় যাই হোক, ব্রাজিলের লক্ষ্য ছিল জয়ের দিকে। কারণ একমাত্র জয়ই তাদের ফাইনালে পৌঁছে দিতে পারত। তারা প্রতি-আক্রমণও করে। পনের মিনিটের মধ্যে ওরা একটি সুযোগও সৃষ্টি করে। ভাল্ডোমিরো ডাচদের অফ্-সাইড হওয়ার কৌশলের লক্ষ্য রেখে জংব্লডকে প্রায় পরাস্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দেরীর সুযোগে ডাচ ডিফেণ্ডাররা ভাল্ডোমিরোকে আটকে দিল। এরপরেই ডাচরা সতর্ক হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ আক্রমণের তীব্রতা কমিয়ে বল পেয়ে দ্রুত এগোল ডিরকু সমভিব্যাহারে এবং সেটি অবশেষে বাড়ালেন পাউলো সিজারকে। পাউলোর শট বারের উপর দিকে চলে যেতে রিভেলিনো মাথায় করাঘাত করতে লাগলেন। এরপর ব্রাজিল দলে হতাশা নেমে আসে।

গত আট বছরের আন্তর্জাতিক ফুটবলে ব্রাজিলের পরাজয়ের আভাষ মিলেছিল এবার জার্মানীতে শুরু থেকেই। কিন্তু ৩ জুলাই খেলার ৫০ মিনিটে নেদারল্যাণ্ডসের নিসকেন্স অন্ধকারতম ক্ষণটি এনে দিলেন। যোহান ক্রুয়েফের একটি নিখুঁত পাস তিনি ব্রাজিলের গোলে ঠেলে দেন (১-০)। এর ১৫ মিনিট পরে ক্রুয়েফ সেকেণ্ডেরও ভগ্নাংশ সময়ে অরক্ষিত থেকে লেফট উইং থেকে রেনসেনব্রিঙ্কের ক্রসটি অনবদ্য নৈপুণ্যে গোলে পাঠিয়ে দেন (২-০)।

এরপর উৎকণ্ঠিত ব্রাজিল সারাক্ষণ মারপিট করে খেলল। তারা দাঁড়াতে পারেনি ডাচ-আক্রমণের সামনে। আপ্রাণ চেষ্টায় দু-একবার ডাচ গোল-সীমান্তে হানা দেয়, কিন্তু বিপক্ষের শক্তিশালী ডিফেন্স তা চূর্ণ করে দেয়। শূন্যের বলগুলিতে ব্রাজিল একেবারেই অকেজো ছিল।

এরই মাঝে শুরু হয় মারপিট। জে মারিয়া ডাচ ব্যাকের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করতেই রেফারি কর্তৃক সতর্কিত হলেন, হুঁশিয়ারি পেলেন পেরিরা। জানসেনকে মারার জন্য মারিও মারিনোর নাম টুকে নেওয়া হল। সতর্কিত হলেন রিভেলিনোও।

ছন্দহারা ব্রাজিল ৬২ মিনিটের সময় মিরালডিনাকে বসিয়ে পাউলো সিজারকে (লিমা) নামায়। কিন্তু এর তিন মিনিট পরেই তো ডাচদের দ্বিতীয় গোলটি হয়েছে। ৯০টি মিনিট অসম্ভব চাপ সৃষ্টি করে নেদারল্যাণ্ডস খেলেছে। ব্রাজিল নড়াচড়ার সামান্যই সুযোগ পেয়েছিল।

খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেমে গেল যখন নেদারল্যাণ্ডস দুই গোলে এগিয়ে যায়। গ্যালারিগুলোয়ও কেমন যেন প্রশান্তি নেমে এল। নেদারল্যাণ্ডস

ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর মুখোমুখি হওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে নিল।
বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক
প্রতিযোগিতায় পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে ১৯ বার। এর মধ্যে পশ্চিম জার্মানী জিতেছে সাতবার, নেদারল্যাণ্ডস ছয়বার। ড্র ছয়বার। কেউই এ পর্যন্ত দুই গোলের বেশি ব্যবধানে জিততে পারেনি।

ডুসেলডর্ফে সুইডেন ও যুগোশ্লাভিয়ার খেলাটি ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হল। উভয় দলই গোল করার সুযোগ পায়। কিন্তু সুইস গোলরক্ষক হেলস্ট্রোয়েম ও যুগোশ্লাভ গোলরক্ষক মারিকের দৃঢ়তায় অধিকাংশ সুযোগ ব্যর্থ হয়। যুগোশ্লাভিয়া ২৫ মিনিটে সুরজাকের গোলে এগিয়ে যায়। তাঁকে পাসটি দেন জাজিক। সুইডেনের এস্ট্রোয়েমের ভুল পাসই এই গোলের প্রধান কারণ। তবে তিনি বিরতির পরে কর্ণার-কিক্ থেকে বল পেয়ে ১-১ করেন মারিকের মাথার উপর দিয়ে বল মেরে। এরপর যুগোশ্লাভরা মাঝমাঠেই বল সীমিত রাখে। সমাপ্তির পাঁচ মিনিট আগে এস্ট্রোয়ামের কাছ থেকে বল পেয়ে স্যাণ্ডবার্গ সেটি বাড়ান টর্স্টেনসনকে। তিনি ২-১ করলেন।

ডুসেলডর্ফে যেমন সুইডেন-যুগোশ্লাভিয়ার খেলায় গুরুত্ব ছিল না, তেমনি গেলসেনকিরখেনে পূর্ব জার্মানী-আর্জেণ্টিনার খেলাও নিয়মরক্ষাই বটে। প্রথমার্ধে গোল দুটি হয়েছে। ১৪ মিনিটে পূর্ব জার্মানীর স্ট্রেশ ১-০ করেন। সাত মিনিটের মধ্যে আর্জেণ্টিনার হাওসম্যান সেটি শোধ দেন। বিরতির পর খেলা চলে তুল্যমূল্য। এই সময় হঠাৎ একজন তরুণ ও একজন তরুণী জ্বলন্ত দুটি লাল পতাকা নিয়ে মাঠে প্রবেশ করে। পুলিশ তেড়ে গেলে তারা বেরিয়ে যায়।

লীগের শেষ খেলায় পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জিতে পশ্চিম জার্মান খেলোয়াড়দের মনোবল দৃঢ় হল। ৭ জুলাই নেদারল্যাণ্ডসের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলতে তাদের আস্থা বেড়ে গেল। ৩ জুলাই শেষরাত্রে তারা মিউনিখ শহর থেকে কিছু দূরে গ্রানওয়াল্ড স্পোর্টস স্কুলে আস্তানা নিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট ছাড়ার আগে তারা নেদারল্যাণ্ডস-ব্রাজিল খেলার প্রথমার্ধটুকু দেখে। ৪ জুলাই মিউনিখে যে অনুশীলন হল তা প্রেস কনফারেন্সেরই অঙ্গ বৈ নয়। সকলেই ছুটির মেজাজে বল নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে, গা ছাড়া ব্যায়াম করেছে। কুড়িজন পুলিশ প্রবেশ দুয়ারে, আরও কুড়িজন মাঠের কাছাকাছি এবং দড়ি দিয়ে ঘেরা মাঠের চতুর্দিকে কয়েক শ' নিরাপত্তা রক্ষী। উদ্যোক্তারা কিছুতেই ওলিম্পিক হত্যা-কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি হতে দেবেন না।

অটোগ্রাফ শিকারীরা কাছাকাছি আসতে না পেরে পুলিশের কাছে বই-গুলো পাঠাতে থাকেন। তাদের বদলে ছবি তুলল ওই পুলিশরাই। বন্দুক, রাইফেলের বদলে তাদের হাতে মাঝে মাঝে ক্যামেরার ক্লিক্।

অধিনায়ক বেকেনবাউয়ের বললেন: জার্মানরা পোল্যাণ্ডের মত এমন শক্তিশালী দলের সঙ্গে কখনও খেলেনি। ৭ জুলাই অর্থাৎ রবিবারের ফাইনাল সম্পর্কে কোচ হেলমুট শ্যোন বললেন: নিজের দেশে খেলতে হলে অনেক ঝুঁকি থাকে। সমর্থকরা খুঁটিনাটি নিয়েও সমালোচনা করেন। তবে আমার বিশ্বাস আমার ছেলেরা নেদারল্যাণ্ডসকে হারাবেই। ওদের ডিফেন্স অ্যাটাকিং লাইনের মত শক্ত নয়। ডাচদের পায়ে যখন বল থাকে, তখন ওরা ভীষণ—ভীষণ রকমের ভাল। কিন্তু বিপক্ষের পায়ে বল গেলে ওদের সেই চমৎকারিত্ব দেখা যায় না। ওরা তখন ভুল করে।

পশ্চিম ইউরোপেরই দুটি দল এবার ফাইনালে উঠলেও শ্যোন পরিষ্কার জানান, 'তাই বলে ভাববেন না, আমরা ফুটবলে খুব উন্নত। মনে রাখতে হবে ১৯৭০-এর বিশ্বকাপের পর আমাদের ফুটবলে তেমন কোনো উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি।'

ইউরোপের সংবাদপত্রগুলি পশ্চিম জার্মানী ও নেদারল্যাণ্ডসের ফাইনালে ওঠা সম্পর্কে বলে: দুটি যোগ্য দল ফাইনালে এসেছে। ভিয়েনার 'ক্রোনেন জাইটাং'-এ অষ্ট্রিয়ার কোচ ম্যাকস মার্কেল লেখেন: ডাচদের দুই উইং থেকে আক্রমণ জার্মানদের নাস্তানাবুদ করবে। সমালোচকরা নেদারল্যাণ্ডসকে নতুন যুগের 'সুপার টিম' বলে আখ্যাত করেছেন। পোল্যাণ্ড ও নেদারল্যাণ্ডস সম্পর্কে তাদের মন্তব্য: দুই দলই আক্রমণাত্মক ও দুঃসাহসিক খেলার স্টাইলে দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। দক্ষিণ আমেরিকার এক ফুটবল বিশেষজ্ঞ বলেন: আগামী শতাব্দীর ফুটবল কোন্ ধাঁচে হবে, ওলন্দাজরা তা দেখালেন। তাঁরা সর্বাত্মক আক্রমণ-পদ্ধতি অবলম্বন করে ফাইনালে এসেছে অপরাজিত থেকে। গোলরক্ষক ছাড়া বাকি দশজন ওঠানামা করেন একই সঙ্গে। ফুলব্যাক, হাফব্যাক প্রভৃতির খেলার ধারণাই বদলে দিয়েছেন। ডিফেণ্ডাররা ক্ষণে ক্ষণে স্ট্রাইকার হন। আবার স্ট্রাইকাররা প্রয়োজনে ডিফেণ্ডার।

তৃতীয় স্থান—মিউনিখে ৬ জুলাই তিনবারের বিশ্বকাপ বিজয়ী ব্রাজিল ০-১ গোলে পোল্যাণ্ডের কাছে হেরে চতুর্থ স্থান পেল। তৃতীয় হল পোল্যাণ্ড। ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে ৮০ হাজার দর্শক ভাল খেলা দেখার আশা নিয়ে হাজির

হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বিরক্তিকর খেলা হল এটি এবং তার জন্য মূলত দায়ী ব্রাজিল। শুধু রক্ষণাত্মকই খেলেনি তারা, মাঝে মাঝেই ফাউল করেছে। ৭৪ মিনিটের সময় পোল্যাণ্ডের জয়সূচক গোলটি করেন লাটো। লাটো এর আগে এবার ছয়টি গোল করেন এবং এখন পর্যন্ত তিনি স্কোরারদের শীর্ষে।

ব্রাজিলের কারুর খেলাই এদিন চোখে পড়েনি। রিভেলিনো, জেয়ারজিনো, ডিরকু, ভাল্ডোমিরো প্রমুখ কারুর খেলাতেই এখনও পর্যন্ত পেলে, গার্সন, টোস্টাও-র যে খেলা আছে সেটুকুও দেখা গেল না।

ফাইনাল

ফাইনাল খেলা ঘিরে শুধু মিউনিখে নয়—গোটা জার্মানীতে উত্তেজনা চরমে। উত্তেজনা নেদারল্যাণ্ডস থেকে আগত হাজার হাজার সমর্থকদের মধ্যেও। ফাইনাল দেখার জন্য ৩০ মার্ক দামের এক-একখানা টিকিটের কালো-বাজারে দর ওঠে ১৫০০ মার্ক। সাদা বাজারের টিকিটের দালালরাই ওই দাম হাঁকেন। নেদারল্যাণ্ডস সমর্থকদের জন্য তিন হাজার টিকিট সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু তা সিন্ধুতে বিন্দু হয়। এবং কালোবাজারে আকাশছোঁয়া দামে টিকিট বিক্রি হয়। বাধ্য হয়ে ডাচ সমর্থকরা বারে, কাফেতে ও রেস্তোরাঁর টেলিভিশনে খেলা দেখল।

সন্দেহ নেই, এবারের বিশ্বকাপের মত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কখনও হয়নি। এর মধ্যে আবার সর্বাধিক কঠোরতা অবলম্বিত হল ফাইনালের দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সেক্রেটারী অফ স্টেট' ডঃ হেনরি কিসিঞ্জার খেলা দেখতে এলে। প্রধান ফটকে তাঁর গাড়ি থামিয়ে ঘিরে ধরেন পুলিশের মেশিনগান ও রাইফেল বাহিনী। ওইভাবে ঘিরেই তাঁকে নির্দিষ্ট আসনে নিয়ে যাওয়া হয়। সমাপ্তির দশ মিনিট পরে তিনি যখন বের হলেন, তখনও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল।

ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্যে ছিলেন, ইংল্যাণ্ডের নতুন ম্যানেজার ডন রিভি এবং স্কটিশ ম্যানেজার উইলি ওরমণ্ড। নেদারল্যাণ্ডসের পরাজয়ের পর তিনি বললেন: আমার স্কটল্যাণ্ড দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠতে না পারলেও একটি বিষয়ে গর্ব করতে পারে, সেটি—এই প্রতিযোগিতায় স্কটল্যাণ্ড কারুর কাছে হারেনি।

ফাইনাল শুরুর এক ঘণ্টা আগে মিউনিখ স্টেডিয়ামের হাজার হাজার দর্শককে আনন্দ দেওয়া হল দেড় হাজার সুন্দরী মেয়ের সমবেত নৃত্য ও সঙ্গীত দ্বারা। এর নেতৃত্ব করলেন কানাডার এক তন্বী তরুণী। এল ১৬টি বাস—চূড়ান্ত পর্যায়ের ১৬টি দলের ব্যানার লাগিয়ে।

পশ্চিম জার্মানী : নেদারল্যাণ্ডস—৭ জুলাই জার্মানদের সব উৎকণ্ঠা, রক্তচাপের নিম্ন বা উর্ধ্বগতি এবং সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটল আজ অপরাহ্নে —যখন তারা ১৯৪৭-এর বিশ্বকাপে সবচেয়ে ফেভারিট টিম নেদারল্যাণ্ডসকে ২-১ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বার ফুটবলে বিশ্বজয়ী হল এবং প্রথম ফিফা কাপ জিতল। ০-১ পিছিয়ে পড়েও পশ্চিম জার্মানী চমৎকার ক্রীড়া-নৈপুণ্য দ্বারা বিজয়ী হয়েছে।

তবে সর্বকালের বৃহত্তম ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালের মাঝে মাঝে অত্যন্ত 'রাফ' খেলা হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের রেফারি টেলর একাধিক খেলোয়াড়কে সতর্ক করেছেন। ১৯৪৭-এর ফাইনালে ব্রাজিল যেমন উচ্চমানের ফুটবল দেখিয়েছিল, তা তো দেখা গেলই না—এমন কি ১৯৪৭-র মতও খেলা হল না।

জার্মানীর জয়ের জন্য যদি একজন খেলোয়াড়েরও কৃতিত্ব থাকে, তবে তিনি ফোগটস। সোনালী চুলের হ্রস্বকায় ডিফেণ্ডার এই ফোগটস ক্ষণে ক্ষণে নেদারল্যাণ্ডসের সবচেয়ে সক্রিয় ক্রুয়েফকে রুখে দিয়েছেন। ব্যর্থ করে দিয়েছেন একের পর এক সব আক্রমণ। ক্রুয়েফ যখনই বল পেয়ে জার্মান রক্ষণভাগে প্রবেশ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে এসেছেন ফোগটস, ধ্বংস করে দিয়েছেন নেদারল্যাণ্ডসের বিশ্বকাপ জয়ের আশাকে। বলা বাহুল্য এবারের বিশ্বকাপে এমন মুখোমুখি লড়াই আর হয়নি। অবশ্য শেষের দিকে ক্রুয়েফ একবার জার্মানীর বেকেনবাউয়েরকে অতিক্রম করেছিলেন।

ক্রুয়েফকে রোখার সঙ্গে সঙ্গে নেদারল্যাণ্ডসের সব কুশলতা ও নৈপুণ্য যেন ধাক্কা খেল। শুরুতে যে ঔজ্জ্বল্যের হদিশ মিলেছিল, কিছু পরেই তা ধূসর হয়ে গেল। মনে হল শস্যপূর্ণ জমিতে কেউ চাষ করে সব নষ্ট করে গেল। অবশ্য ডাচ দলে নিসকেন্সের স্ট্যামিনা ও সাহস, ভান হানেজেমের চমৎকার সোয়ার্ভিং পাস, জানসেনের দ্রুততা, সুরবিয়র ও ক্রলের বল নিয়ে ছুটে যাওয়ার জুড়ি কমই মেলে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বল ডাচদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে রেনসেনব্রিঙ্কের বদলী ভান ডার কারথফ সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারেন

নি। তখন হয় ডাচদের শটগুলি নিখুঁত ছিল না, কিংবা জার্মানদের গোল-রক্ষক মেয়ার সেগুলি আটকেছেন।

শুরুর প্রথম মিনিটেই দুটি ফাউল করায় ফোগটসকে সতর্ক করা হলেও মেজাজ হারিয়ে খেলছিল ডাচরা। আর ক্রুয়েফকে দেখান হল হলুদ কার্ড। বিরতির সময় দুই দল মাঠ ছেড়ে বের হচ্ছে যখন, তখন ক্রুয়েফ তর্ক করছিলেন রেফারির সঙ্গে। তার আগে তিনি জার্মান গোলরক্ষকের উপর নিষ্ঠুরভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ফাউলের জন্য সতর্ক হন ভান হানেজেম ও নিসকেন্স।

সন্দেহ নেই জার্মানরা ভাল খেলেই জিতেছে। কিন্তু তাদের শুরুটা ছিল জুলুষহীন। নেদারল্যাণ্ডসের পরাজয়ে অনেকেরই চোখে মুখে বিষাদ নেমে আসে, কেন না—প্রথম মিনিটের একটু পরেই পেনাল্টি পেয়ে ডাচরা ১-০ এগিয়েছিল। বনহোফ ও হ্যোনেসকে কাটিয়ে ক্রুয়েফ এগোতে গেলেই তাঁকে ভূপাতিত করা হয়। নিসকেন্সের পেনাল্টি কিকে গোল খেয়ে কুড়ি মিনিট যাবৎ জার্মানরা যেন অসাড় রইল।

ডাচরা ভুল পথেই চালিত হল। জার্মানীর ওভারাথকে রুখে দিল। দুই উইংকে আটকে রাখল। তাদের ধারণা হল, জার্মানদের খেলতে না দিলেই বিশ্বকাপ জয় করা যাবে। এইখানেই ডাচদের স্ট্র্যাটেজিতে ভুল হল।

তখন জার্মানীর লক্ষ্য—মাত্র একটি গোল। কেননা, একটি গোল দিতে পারলেই খেলার মোড়ও ঘুরবে। ডাচরা কোনরকমে ঠেকা দিয়ে যাচ্ছে দেখে জার্মানরা লম্বা লম্বা পাসে খেলতে লাগল। এইভাবে বল নিয়ে হ্যোলৎসেনবাইন বাঁ দিক থেকে ডাচ পেনাল্টি-সীমানায় ঢুকতেই জানসেন তাঁকে ফাউল করে ফেলে দিলেন। পেনাল্টি হল এবং ব্রাইটনার ১-১ করলেন। এবার মিউনিখ ওলিম্পিক স্টেডিয়াম উল্লাসে ফেটে পড়ল। জার্মানদের পায়ে এরপর যখনই বল, তখনই গগনভেদী চিৎকার।

জার্মানরা 'ডবল উইং' প্রথা প্রয়োগ শুরু করল এবং তা সফল হল। হ্যোনেস বিরাট জমি জুড়ে খেলতে লাগলেন। হ্যোলৎসেনবাইন ও গ্রাবোস্কি ডাচ ফ্লাঙ্কে হানা অব্যাহত রাখলেন নাছোড়বান্দার মত। গোটা প্রতি-যোগিতায় যে সুরবিয়র ও ক্রল অ্যাটাকিং ব্যাক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন, আজ অবশেষে তাঁরাও হার মানলেন জার্মানদের ক্রীড়াশৈলীর কাছে। ৬৩ মিনিটে বেকেনবাউয়ের সামান্যের জন্য জংব্লডকে পরাস্ত করতে

পারেননি। তাঁর ফ্রি-কিক্ ক্রসবারের উপর দিয়ে ঘুষি মেরে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সাত মিনিট পরে মূলার জয়সূচক গোলটি (২-১) দিলেন।

গ্রাবোস্কি বল নিয়ে দ্রুত দৌড়ে বনহোফকে বাড়ালেন। রাইট উইং বরাবর তিনি সেটি পাঠালেন কর্ণার ফ্লাগের কাছে। ততক্ষণে গ্রাবোস্কি সেখানে পৌছেছেন। বল ধরে তৎক্ষণাৎ নিচু সেণ্টার করলেন মূলারের কাছে। তাঁর কাছে তখন কোনো ডাচ ডিফেণ্ডার ছিলেন না ট্যাকল করবার জন্য। দশ গজ দূর থেকে মূলারের শট জংব্লড ধরতে পারলেন না।

দ্বিতীয়ার্ধে জার্মান খেলোয়াড়দের অপেক্ষা সমর্থকদের বেশি উৎকণ্ঠিত মনে হচ্ছিল। উৎকণ্ঠা জার্মান প্রেসিডেণ্ট ভালটার শীলের চোখে-মুখেও। ডাচরা মাঝে মাঝেই বল নিয়ে এগোতে থাকায় জার্মান দর্শকদের রক্তের চাপ বোধহয় বাড়ছিল। বেকেনবাউয়ের তখন যেমন শূন্যে, তেমনি জমিতেও সজাগ প্রহরী। ক্রুয়েফের একটি ফ্রি-কিক্ও চমৎকারভাবে আটকালেন মেয়ার তাঁর নমনীয় দেহ ছুঁড়ে দিয়ে। নেদারল্যাণ্ডসের এটিই ছিল দারুণ সুযোগ এবং গোল হলে অতিরিক্ত সময় খেলা ছাড়া উপায় ছিল না। কারখফের পাস থেকে নিসকেন্সের একটি জোরালো ভলি কোনোক্রমে মেয়ার পোস্টের গায়ে ছুটে এসে ঠেকালেন। সমাপ্তির ২৫ মিনিট আগে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রিজবার্জেন বেরিয়ে গেলে বদলে ডে জং এসে ডাচ খেলার কোনোই উন্নতি ঘটাতে পারেননি।

তবে ওই অবস্থাতেই তারা মাঝ-মাঠ অতিক্রম করে এগোল। কিন্তু প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের দৃঢ়তায় গোল দেওয়া সম্ভব হয়নি। জার্মানরাও অনুরূপ সুযোগ পায়। কিন্তু মূলারের গোলই তো যথেষ্ট। আর সেটিই তো বেকেনবাউয়েরের নতুন ফিফা কাপ গ্রহণের পথ করে দিয়েছে।

ডাচদের সান্ত্বনা—তারা এই প্রতিযোগিতায় এদিনই প্রথম হারল এবং সে হার যোগ্য দলের কাছেই। অবশ্য বিজয়ীরা সর্বক্ষণ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারেনি।

খেলা শেষে জার্মান প্রেসিডেণ্ট ভালটার শীল ফিফা কাপ তুলে দেন অধিনায়ক ফ্রান্জ বেকেনবাউয়েরের হাতে। তিনি সেটি দেন প্রত্যেক খেলোয়াড়কে এবং অবশেষে দেওয়া হল গত দশ বছরের জাতীয় কোচ হেলমুট শ্যোনকে।

মাঠে শোভন আচরণের জন্য ৩২ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে পশ্চিম জার্মানী

'ফেয়ার প্লে' ট্রফিও পেল। এতে দ্বিতীয় পোল্যাণ্ড (৩০) ও তৃতীয় হয় নেদারল্যাণ্ডস (২৫)।

প্রাথমিক পর্যায় বা বাছাই পর্ব

(মোট ৯৮টি দেশ)

ইউরোপ : গ্রুপ—১

সুইডেন, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, মাল্টা

মাল্টা—০ : হাঙ্গেরি—২	অস্ট্রিয়া—২ : হাঙ্গেরি—২
অস্ট্রিয়া—৪ : মাল্টা—০	মাল্টা—০ : অস্ট্রিয়া—২
হাঙ্গেরি—৩ : মাল্টা—০	হাঙ্গেরি—২ : অস্ট্রিয়া—২
সুইডেন—০ : হাঙ্গেরি—০	সুইডেন—৩ : অস্ট্রিয়া—২
অস্ট্রিয়া—২ : সুইডেন—০	হাঙ্গেরি—৩ : সুইডেন—৩
সুইডেন—৭ : মাল্টা—০	মাল্টা—১ : সুইডেন—২

সুইডেন গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ—২

ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড, তুরস্ক, লুক্সেমবার্গ

লুক্সেমবার্গ—০ : ইতালি—৪	ইতালি—৫ : লুক্সেমবার্গ—০
সুইজারল্যাণ্ড—০ : ইতালি—০	লুক্সেমবার্গ—০ : সুইজারল্যাণ্ড—১
লুক্সেমবার্গ ২ : তুরস্ক—০	সুইজারল্যাণ্ড—০ : তুরস্ক—০
তুরস্ক—৩ : লুক্সেমবার্গ—০	সুইজারল্যাণ্ড—? : লুক্সেমবার্গ—?
ইতালি—০ : তুরস্ক—০	ইতালি—২ : সুইজারল্যাণ্ড—০
তুরস্ক—০ : ইতালি—১	তুরস্ক—? : সুইজারল্যাণ্ড—?

ইতালি গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ—৩

বেলজিয়ম, নেদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড

বেলজিয়ম—৪ : আইসল্যাণ্ড—০	আইসল্যাণ্ড—? : নরওয়ে—?
আইসল্যাণ্ড—০ : বেলজিয়ম—৪	নেদারল্যাণ্ড—৫ : আইসল্যাণ্ড—০
নরওয়ে—৪ : আইসল্যাণ্ড—১	আইসল্যাণ্ড—১ : নেদারল্যাণ্ডস—৮

নরওয়ে—০ : বেলজিয়ম—২ বেলজিয়ম—১ : নেদারল্যাণ্ডস—২

নেদারল্যাণ্ডস—৯ : নরওয়ে—০ বেলজিয়ম—১ : নরওয়ে—১

বেলজিয়ম—০ : নেদারল্যাণ্ডস—০ নেদারল্যাণ্ডস—০ বেলজিয়ম—০

নেদারল্যাণ্ডস গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ—৪

রোমানিয়া, পূর্ব জার্মানী, আলবানিয়া, ফিনল্যাণ্ড

ফিনল্যাণ্ড—১ : আলবানিয়া—০ রোমানিয়া—১ : পূর্ব জার্মানী—০

ফিনল্যাণ্ড—১ : রোমানিয়া—১ ফিনল্যাণ্ড—১ : পূর্ব জার্মানী—৫

পূর্ব জার্মানী—৫ : ফিনল্যাণ্ড—০ পূর্ব জার্মানী—২ : রোমানিয়া—০

রোমানিয়া—২ : আলবানিয়া—০ আলবানিয়া—১ : ফিনল্যাণ্ড—১

পূর্ব জার্মানী—২ : আলবানিয়া—০ রোমানিয়া—৯ : ফিনল্যাণ্ড—০

আলবানিয়া—১ : রোমানিয়া—৪ আলবানিয়া—১ : পূর্ব জার্মানী—১

পূর্ব জার্মানী গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ—৫

ইংল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ওয়েলস

ওয়েলস—০ : ইংল্যাণ্ড—১ পোল্যাণ্ড—২ : ইংল্যাণ্ড—০

ইংল্যাণ্ড—১ : ওয়েলস—১ পোল্যাণ্ড—৩ : ওয়েলস—০

ওয়েলস—২ : পোল্যাণ্ড—০ ইংল্যাণ্ড—১ : পোল্যাণ্ড—১

পোল্যাণ্ড গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ—৬

বালগেরিয়া, পোর্তুগাল, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, সাইপ্রাস

পোর্তুগাল—৪ : সাইপ্রাস—০ বালগেরিয়া—২ : পোর্তুগাল—১

সাইপ্রাস—০ : পোর্তুগাল—১ উঃ আয়ারল্যাণ্ড—৩ : সাইপ্রাস—০

বালগেরিয়া—৩ : উঃ আয়ারল্যাণ্ড—০ উঃ আয়ারল্যাণ্ড—০ : বালগেরিয়া—০

সাইপ্রাস—০ : বালগেরিয়া—৪ পোর্তুগাল—২ : বালগেরিয়া—২

সাইপ্রাস—১ : উঃ আয়ারল্যাণ্ড—০ পোর্তুগাল—১ : উঃ আয়ারল্যাণ্ড—১

উঃ আয়ারল্যাণ্ড—১ : পোর্তুগাল—১ বালগেরিয়া—২ : সাইপ্রাস—০

বালগেরিয়া গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ—৭

যুগোশ্লাভিয়া, স্পেন, গ্রীস

স্পেন—২ : যুগোশ্লাভিয়া—২
যুগোশ্লাভিয়া—১ : গ্রীস—০
গ্রীস—২ : স্পেন—৩
স্পেন—৩ : গ্রীস—১
যুগোশ্লাভিয়া—০ : স্পেন—০ }
যুগোশ্লাভিয়া—১ : স্পেন—০ }
গ্রীস—২ : যুগোশ্লাভিয়া—৪

যুগোশ্লাভিয়া গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ—৮

চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, স্কটল্যাণ্ড

ডেনমার্ক—১ : স্কটল্যাণ্ড—৪
স্কটল্যাণ্ড—২ : ডেনমার্ক—০
ডেনমার্ক—১ : চেকোশ্লোভাকিয়া—১
চেকোশ্লোভাকিয়া—১ : ডেনমার্ক
স্কটল্যাণ্ড—২ : চেকোশ্লোভাকিয়া—১
চেকোশ্লোভাকিয়া—১ : স্কটল্যাণ্ড—০

স্কটল্যাণ্ড গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ—৯

রাশিয়া, ফ্রান্স, রিপাব্লিক আয়ারল্যাণ্ড

ফ্রান্স—১ : রাশিয়া—০
রিপাব্লিক আয়ারল্যাণ্ড—১ : রাশিয়া—২
রিপাব্লিক আয়ারল্যাণ্ড—২ : ফ্রান্স—১
রাশিয়া—১ : রিপাব্লিক আয়ারল্যাণ্ড—০
ফ্রান্স—১ : রিপাব্লিক আয়ারল্যাণ্ড—১
রাশিয়া—২ : ফ্রান্স—০

রাশিয়া গ্রুপ বিজয়ী।

১ নম্বর থেকে ৮ নম্বর গ্রুপে প্রতিটি বিজয়ী দল বা দেশ পশ্চিম জার্মানীতে চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলার জন্য বিবেচিত হয়। তবে ৯ নম্বর গ্রুপের বিজয়ী ও দক্ষিণ আমেরিকার ৩ নম্বর গ্রুপের বিজয়ীর মধ্যে তিনটি খেলায় যারা বিজয়ী হয় তারাই চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার যোগ্য। এই দুই গ্রুপে বিজয়ী ছিল যথাক্রমে রাশিয়া ও চিলি। এদের মধ্যে চিলিই চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

দক্ষিণ আমেরিকা

গ্রুপ—১

উরুগুয়ে, কলম্বিয়া, ইকোয়েডর

কলম্বিয়া—?	:	ইকোয়েডর—?	ইকোয়েডর—১	:	উরুগুয়ে—২
কলম্বিয়া—০	:	উরুগুয়ে—০	উরুগুয়ে—০	:	কলম্বিয়া—১
ইকোয়েডর—?	:	কলম্বিয়া—?	উরুগুয়ে—৪	:	ইকোয়েডর—০

উরুগুয়ে গ্রুপ বিজয়ী

গ্রুপ—২

আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া

বলিভিয়া—?	:	প্যারাগুয়ে—?	বলিভিয়া—১	:	আর্জেন্টিনা—০
আর্জেন্টিনা—৪	:	বলিভিয়া—০	প্যারাগুয়ে—	:	বলিভিয়া—?
প্যারাগুয়ে—১	:	আর্জেন্টিনা—১	আর্জেন্টিনা—৩	:	প্যারাগুয়ে—১

আর্জেন্টিনা গ্রুপ বিজয়ী

গ্রুপ—৩

পেরু, চিলি, ভেনেজুয়েলা

(ভেনেজুয়েলা নাম প্রত্যাহার করে)

পেরু—২	:	চিলি—০	চিলি—২	:	পেরু—০
			চিলি—২	:	পেরু—১

চিলি গ্রুপ বিজয়ী

১ ও ২ নম্বর গ্রুপের বিজয়ী দুটি দেশ চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য বিবেচিত হয়। চিলি ইউরোপের ৯ নম্বর গ্রুপের বিজয়ীর সঙ্গে খেলে জিতে পশ্চিম জার্মানীতে যায়।

উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

গ্রুপ—১

কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র

কানাডা—৩	:	যুক্তরাষ্ট্র—২	মেক্সিকো—৩	:	যুক্তরাষ্ট্র—১
কানাডা—০	:	মেক্সিকো—১	মেক্সিকো—২	:	কানাডা—১
যুক্তরাষ্ট্র—২	:	কানাডা—২	যুক্তরাষ্ট্র—১	:	মেক্সিকো—২

মেক্সিকো গ্রুপ বিজয়ী

?=ফল পাওয়া যায়নি।

গ্রুপ—২

গুয়াতেমালা, এল সালভেডর

গুয়াতেমালা—১ : এল সালভেডর—০ এল সালভেডর—০ : গুয়াতেমালা—১

গুয়াতেমালা গ্রুপ বিজয়ী

গ্রুপ—৩

কস্টা রিকা, হণ্ডুরাস

হণ্ডুরাস—২ : কস্টা রিকা—১ কস্টা রিকা—৩ : হণ্ডুরাস—৩

হণ্ডুরাস বিজয়ী

গ্রুপ—৪

জামাইকা, নেদার্ল অ্যান্টিলেস

জামাইকা নাম প্রত্যাহার করায় নেদার্ল অ্যান্টিলেস বিজয়ী।

গ্রুপ—৫

হাইতি, পোর্টো রিকা

হাইতি—৭ : পোর্টো রিকো—০ পোর্টো রিকো—০ : হাইতি—৫

হাইতি গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ—৬

সুরিনাম, ত্রিনিদাদ, আন্টিগুয়া

ত্রিনিদাদ—১১ : আন্টিগুয়া—১ ত্রিনিদাদ—১,: সুরিনাম—১

আন্টিগুয়া—১ : ত্রিনিদাদ—২ আন্টিগুয়া—০ : সুরিনাম—৬

সুরিনাম—১ : ত্রিনিদাদ—২ সুরিনাম—৩ : আন্টিগুয়া—১

ত্রিনিদাদ গ্রুপ বিজয়ী।

ছয়টি গ্রুপের বিজয়ীদের ফাইনাল

হণ্ডুরাস—০ : ত্রিনিদাদ—১ মেক্সিকো—০ : গুয়াতেমালা—০

হাইতি—৩ : নেদার্ল অ্যান্টিলেস—০ হণ্ডুরাস—১ : মেক্সিকো—১

হাইতি—২ : ত্রিনিদাদ—১ নেদার্ল অ্যান্টিলেস—২ : গুয়াতেমালা—২

হণ্ডুরাস—০ : হাইতি—১ নেদার্ল অ্যান্টিলেস—০ : মেক্সিকো—৮

গুয়াতেমালা—০ : ত্রিনিদাদ—১
হণ্ডুরাস—২ : নেদার্ল অ্যান্টিলেস—২
গুয়াতেমালা—১ : হাইতি—২
ত্রিনিদাদ—৪ : মেক্সিকো—০
হণ্ডুরাস—১ : গুয়াতেমালা—১
ত্রিনিদাদ—৪ : নেদার্ল অ্যান্টিলেস—১
মেক্সিকো—১ : হাইতি—০

হাইতি চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত।

এশিয়া/ওশানিয়া

গ্রুপ—এ

তাইল্যাণ্ড—১ : দঃ ভিয়েতনাম—০
ইজরায়েল—২ : জাপান—১
হংকং—১ : মালয়েশিয়া—০

গ্রুপ—১

জাপান—৪ : দঃ ভিয়েতনাম—০
হংকং—১ : জাপান—০
হংকং—১ : দঃ ভিয়েতনাম—০

গ্রুপ—২

দঃ কোরিয়া—৪ : তাইল্যাণ্ড—০
ইজরায়েল—৩ : মালয়েশিয়া—০
ইজরায়েল—৬ : তাইল্যাণ্ড—০
দঃ কোরিয়া—০ : মালয়েশিয়া—০
মালয়েশিয়া—২ : তাইল্যাণ্ড—০
দঃ কোরিয়া—০ : ইজরায়েল—০

সেমিফাইনাল

দঃ কোরিয়া—৩ : হংকং—১
ইজরায়েল—১ : জাপান—০ (অতিরিক্ত সময়ে)

ফাইনাল

দঃ কোরিয়া—১ : ইজরায়েল—০ (অতিরিক্ত সময়ে)

দক্ষিণ কোরিয়া বিজয়ী

গ্রুপ—বি

সাব-গ্রুপ বি—১ : অস্ট্রেলিয়া, ইরাক, নিউজিল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া

অস্ট্রেলিয়া—১ : নিউজিল্যাণ্ড—১
অস্ট্রেলিয়া—৩ : নিউজিল্যাণ্ড—৩
ইন্দোনেশিয়া—১ : নিউজিল্যাণ্ড—১
অস্ট্রেলিয়া—০ : ইরাক—০
অস্ট্রেলিয়া—৩ : ইরাক—১
ইন্দোনেশিয়া—১ : নিউজিল্যাণ্ড—০
ইরাক—২ : নিউজিল্যাণ্ড—০
ইরাক—৩ : ইন্দোনেশিয়া—২

অস্ট্রেলিয়া—২ : ইন্দোনেশিয়া—১ ইরাক—৪ : নিউজিল্যাণ্ড—•
ইরাক—২ : ইন্দোনেশিয়া—১ অস্ট্রেলিয়া—৬ : ইন্দোনেশিয়া—•

অস্ট্রেলিয়া সাব-গ্রুপে বিজয়ী।

সাব-গ্রুপ বি-২

(ভারত নাম প্রত্যাহার করায় শেষ মুহূর্তে উত্তর কোরিয়ার এন্ট্রি গৃহীত হয়)

সিরিয়া—২ : কোয়ায়েত—১ ইরাণ—• : উঃ কোরিয়া—•
সিরিয়া—১ : উঃ কোরিয়া—১ ইরাণ—২ : কোয়ায়েত—১
উঃ কোরিয়া—• : কোয়ায়েত—• ইরাণ—১ : সিরিয়া—•
ইরাণ—২ : উত্তর কোরিয়া—১ সিরিয়া—২ : কোয়ায়েত—•
উঃ কোরিয়া—২ : সিরিয়া—• ইরাণ—• : সিরিয়া—১
সিরিয়া—১ : ইরাণ—• কুয়ায়েত—২ : উঃ কোরিয়া—•

সাব গ্রুপ বি-২তে ইরাণ বিজয়ী।

তিনটি গ্রুপের বিজয়ীদের মধ্যে খেলা

অস্ট্রেলিয়া—৩ : ইরাণ—• ইরাণ—২ : অস্ট্রেলিয়া—•
অস্ট্রেলিয়া—• : দঃ কোরিয়া—• দঃ কোরিয়া—২ : অস্ট্রেলিয়া—২
অস্ট্রেলিয়া—১ : দক্ষিণ কোরিয়া—•

এশিয়া/ওশানিয়া গ্রুপ থেকে অস্ট্রেলিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত।

আফ্রিকা

প্রথম রাউণ্ড

গ্রুপ—১

মরক্কো—• : সেনেগাল—• সেনেগাল—১ : মরক্কো—২

গ্রুপ—২

আলজিরিয়া—১ : গিনি—• গিনি—৫ : আলজিরিয়া—১

গ্রুপ—৩

মিশর এ আর—২ : টিউনিসিয়া—১ মিশর এ আর—• : টিউনিসিয়া—২

গ্রুপ—৪

সিয়েরা লোন—• : আইভরি কোস্ট—১ আইভরি কোস্ট—২ : সিয়েরা লোন—•

গ্রুপ—৫

কিনিয়া—২ : সুদান—০ সুদান—১ : কিনিয়া—০

গ্রুপ—৬

মরিশাস : মাদাগাস্কার

(নাম প্রত্যাহার)

গ্রুপ—৭

তানজানিয়া—১ : ইথিওপিয়া—১ ইথিওপিয়া—৩ : তানজানিয়া—০
ইথিওপিয়া—০ : তানজানিয়া—০

গ্রুপ—৮

লেসোথো—০ : জাম্বিয়া—০ জাম্বিয়া—৬ : লেসোথো—১

দ্বিতীয় রাউণ্ড

গিনি—১ : মরক্কো—১ মরক্কো—২ : গিনি—০
টিউনিসিয়া—১ : আইভরি কোস্ট—১ আইভরি কোস্ট—২ : টিউনিসিয়া—১
মরিশাস—১ : কিনিয়া—৩ কিনিয়া—২ : মরিশাস—২
ইথিওপিয়া—০ : জাম্বিয়া—০ জাম্বিয়া—৪ : ইথিওপিয়া—২

তৃতীয় রাউণ্ড

আইভরি কোস্ট—১ : মরক্কো—১ মরক্কো—৪ : আইভরি কোস্ট—৪
কিনিয়া—০ : জাম্বিয়া—২ জাম্বিয়া—২ : কিনিয়া—২

বিজয়ী মরক্কো, জাম্বিয়া এবং ৯, ১০, ১১ ও ১২ নম্বর গ্রুপের বিজয়ী জাইয়েরের সঙ্গে চূড়ান্ত খেলা হয়।

প্রথম রাউণ্ড

গ্রুপ—৯

নাইজিরিয়া—২ : কঙ্গো—১ কঙ্গো—১ : নাইজিরিয়া—১

গ্রুপ—১০

দাহোমি—০ : ঘানা—৫ ঘানা—৫ : দাহোমি—১

গ্রুপ—১১

টোগো—০ : জাইর—৯ জাইর—৪ : টোগো—০

গ্রুপ—১২

ক্যামেরুন : গাবোন (নাম প্রত্যাহার করে)

দ্বিতীয় রাউণ্ড

নাইজিরিয়া—২ : ঘানা—৪ ঘানা—০ : নাইজিরিয়া—০

(খেলা পণ্ড ও ঘানা বিজয়ী ঘোষিত)

ক্যামেরুন—০ : জাইর—১ জাইর—০ : ক্যামেরুন—১

জাইর—২ : ক্যামেরুন—২

তৃতীয় রাউণ্ড

ঘানা—০ : জাইর—২ জাইর—২ : ঘানা—১

ফাইনাল গ্রুপ

জাম্বিয়া—৪ : মরক্কো—০ জাম্বিয়া—০ : জাইর—২

জাইর—২ : জাম্বিয়া—১ মরক্কো—২ : জাম্বিয়া—০

জাইর—৩ : মরক্কো—০ মরক্কো—০ : জাইর—২ (ম্যাচ বাতিল)

জাইর চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত।

যোলটি দেশ কীভাবে ফাইনাল রাউণ্ডে এল এবং কতবার

আর্জেন্টিনা (ষষ্ঠবার): ৪-০, ১-০ বলিভিয়াকে ; ১-১, ৩-১ প্যারাগুয়েকে।

অস্ট্রেলিয়া (প্রথম): ১-১, ৩-৩ নিউজিল্যাণ্ডকে ; ৩-১, ০-০ ইরাককে ; ২-১, ৬-০ ইন্দোনেশিয়াকে ; ৩-০, ০-২ ইরাণকে ; ০-০, ২-২, ১-০ দক্ষিণ কোরিয়াকে।

ব্রাজিল (দশমবার ও রেকর্ড): গতবারের বিজয়ী হুবাদে সরাসরি।

বালগেরিয়া (চতুর্থবার): ৩-০, ০-০ উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে ; ৪-০, ২-০ সাইপ্রাসকে ; ২-১, ২-২ পোর্তুগালকে।

চিলি (পঞ্চমবার): ০-২, ২-০, ২-১ পেরুকে। ইউরোপের ৯ নম্বর গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন রাশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার ৩ নম্বর গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন চিলির প্রথম খেলা ০-০। কিন্তু ফিরতি খেলা না হওয়ায় চিলি ওয়াকওভার পায়।

পূর্ব জার্মানী (প্রথম): ৫-০, ৫-১ ফিনল্যাণ্ডকে; ২-০, ৪-১ আলবানিয়াকে; ০-১, ২-০ রোমানিয়াকে।

পশ্চিম জার্মানী (অষ্টমবার): উদ্যোক্তা স্বাদে সরাসরি।

হাইতি (প্রথম): ৭-০, ৫-১ পোর্টো রিকোকে; ৩-০ নেদার্ল অ্যান্টিলেসকে; ২-১ ত্রিনিদাদকে; ১-০ হণ্ডুরাসকে; ২-১ গুয়াতেমালাকে; ০-১ মেক্সিকোকে।

নেদারল্যাণ্ডস (তৃতীয়বার): ৯-০, ২-১ নরওয়েকে; ০-০, ০-০ বেলজিয়মকে; ৫-০, ৮-১ আইসল্যাণ্ডকে।

ইতালি (অষ্টমবার): ৪-০, ৫-০ লুক্সেমবার্গকে; ০-০, ২-০ সুইজারল্যাণ্ডকে, ০-০, ১-০ তুরস্ককে।

পোল্যাণ্ড (দ্বিতীয়বার): ০-২, ৩-০ ওয়েলসকে; ২-০, ১-১ ইংল্যাণ্ডকে।

স্কটল্যাণ্ড (তৃতীয়বার): ৪-১, ২-০ ডেনমার্ককে; ২-১, ০-১ চেকোশ্লোভাকিয়াকে।

সুইডেন (ষষ্ঠবার): ০-০, ৩-৩ হাঙ্গেরিকে; ০-২, ৩-২ অষ্ট্রিয়াকে; ৭-০, ২-১ মাল্টাকে।

উরুগুয়ে (সপ্তমবার): ০-০, ০-১ কলম্বিয়াকে; ২-১, ৪-০ ইকোয়েডরকে।

যুগোশ্লাভিয়া (ষষ্ঠবার): ২-২, ০-০, ১-০ স্পেনকে; ১-০, ৪-২ গ্রীসকে।

জাইর (প্রথম): ০-০, ৪-০ টোগোকে; ১-০, ০-১, ২-০ ক্যামেরুনকে; ০-১, ৪-১ ঘানাকে; ২-০, ২-১ জাম্বিয়াকে; ৩-০ মরক্কোর সঙ্গে একটি খেলা। ফিরতি খেলাটি হয়নি।

চূড়ান্ত পর্যায়: প্রথম রাউণ্ড

গ্রুপ—১

পশ্চিম জার্মানী—১ : **চিলি—০**

(ব্রাইটনার)

বিরতি ১-০

পূর্ব জার্মানী—২ : **অস্ট্রেলিয়া—০**
(কুরান-আত্মঘাতী, স্ট্রেশ)

বিরতি ০-০

চিলি—১ : **পূর্ব জার্মানী—১**
(আহুমাদা) (হফম্যান)

বিরতি ০-০

পশ্চিম জার্মানী—৩ : **অস্ট্রেলিয়া—০**
(ওভারাথ, কালমান, মূলার)

বিরতি ২-০

অস্ট্রেলিয়া—০ : চিলি—০
পূর্ব জার্মানী—১ : **পশ্চিম জার্মানী—০**
(স্পারওয়াসার)

বিরতি ০-০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
পূর্ব জার্মানী	৩	২	১	০	৪	১	৫
পশ্চিম জার্মানী	৩	২	০	১	৪	১	৪
চিলি	৩	০	২	১	১	২	২
অস্ট্রেলিয়া	৩	০	১	২	০	৫	১

গ্রুপ—২

ব্রাজিল—০ : **যুগোশ্লাভিয়া—০**
স্কটল্যাণ্ড—২ : **জাইর—০**
(লরিমার, জর্ডান)

বিরতি ২-০

যুগোশ্লাভিয়া—৯ : **জাইর—০**
(বাজেভিক ৩, জাজিক, সুরজাক,
কাটালিনস্কি, বগিসেভিক, ওবলাক,
পেটকভিক

বিরতি ৬-০

স্কটল্যাণ্ড—০ : **ব্রাজিল—০**

ব্রাজিল—৩ : **জাইর—০**
(জেয়ারজিনো, রিভেলিনো, ভাল্ডোমিরো)

বিরতি ১-০

স্কটল্যাণ্ড—১ : **যুগোশ্লাভিয়া—১**
(জর্ডান) (কারাসি)

বিরতি ০-০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
যুগোশ্লাভিয়া	৩	১	২	০	১০	১	৪
ব্রাজিল	৩	১	২	০	৩	০	৪
স্কটল্যাণ্ড	৩	১	২	০	০	১	৪
জাইর	৩	০	০	৩	০	১৪	০

গ্রুপ—৩

সুইডেন—০ : **বালগেরিয়া—০**

নেদারল্যাণ্ডস—২ : **উরুগুয়ে—০**
(রেপ)

বিরতি ১-০

নেদারল্যাণ্ডস—০ : **সুইডেন—০**

বালগেরিয়া—১ : **উরুগুয়ে—১**
(বোনেভ) (পাভনি)

বিরতি ০-০

নেদারল্যাণ্ডস—৪ : **বালগেরিয়া—১**
[নিসকেন্স ২ (পেনাল্টি) রেপ, ডে জং] (ক্রল-আত্মঘাতী)

বিরতি ১-০

সুইডেন—৩ : **উরুগুয়ে—০**
(এস্ট্রোয়েম ২, স্যাণ্ডবার্গ)

বিরতি ০-০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
নেদারল্যাণ্ডস	৩	২	১	০	৬	১	৫
সুইডেন	৩	১	২	০	৩	০	৪
বালগেরিয়া	৩	০	২	১	২	৫	২
উরুগুয়ে	৩	০	১	২	০	৬	১

গ্রুপ—৪

ইতালি—৩ : **হাইতি—১**
(রিভেরা, বেনেট্টি, আনাস্তাসি) (সানন)
বিরতি ০-০

পোল্যাণ্ড—৩ : **আর্জেন্টিনা—২**
(লাটো ২, জারমাশ) (হেরেডিয়া, বাবিংটন)
বিরতি ২-০

পোল্যাণ্ড—৭ : **হাইতি—০**
(লাটো ২, ডিনা, জারমাশ ৩, গরগন)
বিরতি ৫-০

আর্জেন্টিনা—১ : **ইতালি—১**
(হাউসম্যান) (পারফুমো-আত্মঘাতী)
বিরতি ১-১

পোল্যাণ্ড—২ : **ইতালি—১**
(জারমাশ, ডিনা) (কাপেলো)
বিরতি ২-০

আর্জেন্টিনা—৪ : **হাইতি—১**
(ইয়াজাল্ডে ২, হাউসম্যান, আয়েলা) (সানন)
বিরতি ২-০

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
পোল্যাণ্ড	৩	৩	০	০	১২	৩	৬
আর্জেন্টিনা	৩	[illegible]	১	১	৭	৫	৩
ইতালি	৩	১	১	১	৫	৪	৩
হাইতি	৩	০	০	৩	২	১৪	০

দ্বিতীয় রাউণ্ড

গ্রুপ—এ

গেলসেনকিরখেন-এ

নেদারল্যাণ্ডস—৪ : আর্জেন্টিনা—০

(ক্রুয়েফ ২, ক্রল, রেপ)

বিরতি ২-০

জংব্লড, স্যুরবিয়র, ক্রল, হান, রিজবার্জেন, জানসেন, নিসকেন্স, ভান হানেজেম, রেপ, ক্রুয়েফ, রেনসেনব্রিঙ্ক।

কার্নেভালি, পারফুমো, ম্যানুয়েল, উলফ (গ্লারিয়া), হেরিডিয়া, টেলশ, বালবুয়েনা, আয়েলা, ইয়াজাল্ডে, স্কুইও, হাউসম্যান (কেম্পেস)।

রেফারি—আর ডেভিসন (স্কটল্যাণ্ড)

হ্যানোভার-এ

ব্রাজিল—১ : পূর্ব জার্মানী—০

(রিভেলিনো)

বিরতি ০-০

লিয়াও, জে মারিয়া, পেরিয়া, ফ্রান্সিসকো মারিনো, মারিও মারিনো, পাওলো সিজার (কার্পেগিয়ানি), রিভেলিনো, ডিরকু, ভাল্ডোমিয়ো, জেয়ারজিনো, পাউলো সিজার (লিমা)।

ক্রয়, কিশে, ব্রাঁশ, ভেইজ, ভেটলিশ, কার্বজুভেট, হামান, লাউক (লোভে), স্পারওয়াসার, স্ট্রেশ, হফম্যান।

রেফারি—সি টমাস (ওয়েলস)

গেলসেনকিরখেন-এ

নেদারল্যাণ্ডস—২ : পূর্ব জার্মানী—০

(নিসকেন্স, রেনসেনব্রিঙ্ক)

বিরতি ১-০

জংব্লড, স্যুরবিয়র, রিজবার্জেন, হান, ক্রল, জানসেন, নিসকেন্স, ভান হানেজেম, রেপ, ক্রুয়েফ, রেনসেনব্রিঙ্ক।

ক্রয়, কিশে, ভেইজ, ব্রাঁশ, কার্বজুভেট, লাউক (ক্রিশে), পমেরেঙ্কে, স্যুপেজ, লোভে (ডাক), স্পারওয়াসার, হফম্যান।

রেফারি—আর শুয়েরার (সুইজারল্যাণ্ড)

হ্যানোভার-এ

ব্রাজিল—২ : আর্জেন্টিনা—১

(রিভেলিনো, জেয়ারজিনো) (ব্রিন্দিসি)

বিরতি ১-১

লিয়াও, জে মারিরা, পেরিয়া, মারিও মারিনো, ফ্রান্সিসকো মারিনো, পাওলো সিজার (কার্পেগিয়ানি), রিভেলিনো, ডিরকু, ভাল্ডোমিরো, জেয়ারজিনো, পাওলো সিজার (লিমা)।

কার্নেভালি, গ্লারিয়া, হেরেডিয়া, বার্গাস, সা (কারাসকোসা), ব্রিন্দিসি, স্কুইও, বাবিংটন, বালবুয়েনা, আয়েলা, কেম্পেস (হাউসম্যান)।

রেফারি—এম লোরাক্স (বেলজিয়ম)

ডর্টমুণ্ড-এ

নেদারল্যাণ্ডস—২ : ব্রাজিল—০

(নিসকেন্স, ক্রুয়েফ)

বিরতি ০-০

জংব্লড, সুরবিয়র, হান, রিজবার্জেন, ক্রল, জানসেন, নিসকেন্স (ইজ্রায়েল), ভান হানেজেস, রেপ, ক্রুয়েফ, রেনসেনব্রিঙ্ক (ডে জং)।

লিয়াও, জে মারিয়া, পেরিরা, মারিও মারিনো, ফ্রান্সিসকো মারিনো, পাওলো সিজার (কার্পেগিয়ানি), রিভেলিনো, ডিরকু, ভাল্ডোমিরো, জেয়ারজিনো, পাওলো সিজার (লিমা) বদলী মিরানডিনা।

রেফারি—কে শেনশার (পশ্চিম জার্মানী)

গেলসেনকিরখেন-এ

আর্জেণ্টিনা—১ : পূর্ব জার্মানী—১

(হাউসম্যান) (স্ট্রেশ)

বিরতি ১-১

ফিলন, উলফ, হেরেডিয়া, বারগাস, কারাসকোসা, ব্রিন্দিশি, টেলশ, বাবিংটন, হাউসম্যান, কেম্পেস, আয়েলা।

ক্রয়, কার্বজুভেট, ব্রাঁশ, ওয়াইজ, শামুফেজ, পমেরেঙ্কে, লোভে, স্ট্রেশ, স্পারওয়াসার, ক্রিশে, হফম্যান।

রেফারি—জে টেলর (ইংল্যাণ্ড)

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
নেদারল্যাণ্ডস	৩	৩	০	০	৮	০	৬
ব্রাজিল	৩	২	০	১	৩	৩	৪
পূর্ব জার্মানী	৩	০	১	২	১	৪	১
আর্জেন্টিনা	৩	০	১	২	২	৭	১

গ্রুপ—বি

ডুসেলডর্ফ-এ

পশ্চিম জার্মানী—২ : যুগোশ্লাভিয়া—০
(ব্রাইটনার, মূলার)

বিরতি ১-০

মেয়ার, ফোগটস, ব্রাইটনার, শোয়রৎ-সেনবেথ, বেকেনবাউয়ের, বনহোফ, ভিমার (হোনেস), হোলৎসেন-বাইন (ফ্লোহে), ওভারাথ, মূলার, হেরৎসপ।

মারিক, বুলজান, হাজ্ডিয়াবিক, মুজিনিক, কাটালিনস্কি (পেটকভিক), ওরলাক, পপিভাডো, এসিমোভিক, সুরজাক, কারাসি, জাজিক (জারকভিক)।

রেফারি—এ মারকুইস (ব্রাজিল)

স্টুটগার্ট-এ

পোল্যাণ্ড—১ : সুইডেন—০
(লাটো)

বিরতি ১-০

তোমাসজেস্কি, গাট, গর্গন, জেমানোস্কি, জমুডা, কাস্পার্কজাক, ডিনা, মাসকিক, লাটো, জার্মাশ (মিকিক), গাডোছা।

হেলস্ট্রোয়েম, অ্যাণ্ডারসন (আগস্টসন, গ্রিপ, কার্লসন, নরকুইস্ট, লার্সন টর্টেনসন, ট্যাপার (অলস্ট্রোয়েম), এস্ট্রোয়েম, ব্রাণ, স্যাণ্ডবার্গ।

রেফারি—বারেটো (উরুগুয়ে)

ডুসেলডর্ফ-এ

পশ্চিম জার্মানী—৪ : সুইডেন—২ ১০

(ওভারাথ, বনহোফ, গ্রাবোস্কি, হোনেস—পেনাল্টি) (এস্ট্রোয়েম, স্যাণ্ডবার্গ)

বিরতি ০-১

মেয়ার, ফোগটস, শোয়ারৎসেনবেখ, বেকেনবাউয়ের, ব্রাইটনার, বনহোফ, ওভারাথ, হোনেস, হোলৎসেনবাইন (ফ্লোহে), মূলার, হেরৎসপ (গ্রাবোস্কি)।

হেলস্ট্রোয়েম, অগাস্টসন, কার্লসন, নরকুইস্ট, ওলসন, ব্রাণ, লার্সন, ট্যাপার, টর্টেনসন, এস্ট্রোয়েম, স্যাণ্ডবার্গ।

রেফারি—এম কাসাকভ (রাশিয়া)

ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ

পোল্যাণ্ড—২ : যুগোশ্লোভিয়া—১

(ডিনা-পেনাল্টি, লাটো) (কারাসি)

বিরতি ১-১

তোমাসজোস্কি, জেমানোস্কি, গর্গন, জমুডা, মুসিয়াল, কাসপার্কজাক মাজকিক ডিনা (ডোমাস্কি), জার্মাশ (মিলিউইজ), লাটো, গাডোছা।

মারিক, বুলজান, হাজিয়াবিক, বগিসেভিক, কাটালিনস্কি, ওবলাক, কারাসি (জারকভিক), পেটকভিক (পেট্রভিক), বাজেভিক, এসিমোভিক, সুরজাক।

রেফারি—গ্লকনার (পূর্ব জার্মানী)

ডুসেলডর্ফ-এ

সুইডেন—২ : যুগোশ্লোভিয়া—১

(এস্ট্রোয়েম, টর্টেনসন) (সুরজাক)

বিরতি ০-১

হেলস্ট্রোয়েম, ওলসন, নরকুইস্ট, কার্লসন, অগাস্টসন, ট্যাপার, ব্রাণ, পার্সন, টর্টেনসন, এস্ট্রোয়েম, স্যাণ্ডবার্গ।

মারিক, বুলজান, হাজিয়াবিক, কাটালিনস্কি, বগিসেভিক, পাভিভ্ভভিক (পেরুজভিক), পেট্রভিক (কারাসি) জারকভিক, সুরজাক, এসিমভিক, জাজিক।

রেফারি—এল পেণ্ডারিনো (আর্জেন্টিনা)

ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ

পশ্চিম জার্মানী—১ : পোল্যাণ্ড—০
(মূলার)

বিরতি ০-০

পশ্চিম জার্মানী	পোল্যাণ্ড
মেয়ার, ফোগটস, ব্রাইটনার, শোয়ারৎসেনবেখ, বেকেনবাউয়ের, বনহোফ, হোনেস, গ্রাবোস্কি, ওভারাথ, মূলার, হোলৎসেনবাইন।	তোমাসজোস্কি, জেমানোস্কি, গর্গন, জমুডা, মুসিয়াল, কাসপার্কজাক, (মিকিজ), ডিনা, মাসকিক (মিকিক), লাটো, ডোমাস্কি, গাডোছা।

রেফারি—ই লিনেমার (অষ্ট্রিয়া)

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
পশ্চিম জার্মানী	৩	৩	০	০	৭	২	৬
পোল্যাণ্ড	৩	২	০	১	৩	২	৪
সুইডেন	৩	১	০	২	৪	৬	২
যুগোশ্লাভিয়া	৩	০	০	৩	২	৬	০

তৃতীয় স্থান

মিউনিখে

পোল্যাণ্ড—১ : ব্রাজিল—০
(লাটো)

বিরতি ০-০

পোল্যাণ্ড	ব্রাজিল
তোমাসজোস্কি, জেমানোস্কি, গর্গন, জমুডা, মুসিয়াল, মাসকিক, ডিনা, কাসপার্কজাক (মিকিজ), লাটো, জার্মাশ, (কাপকা), গাডোছা।	লিয়াও, জে মারিয়া, পেরিরা, মারিও মারিনো, ফ্রান্সিসকো মারিনো, পাওলো সিজার (কার্পেগিয়ানি), রিভেলিনো, আডেমির ডি গুইলা (মিরানডিনা), ভাল্ডোমিরো, জেয়ারজিনো, ডিরকু।

রেফারি—এ অ্যাঙ্গোনেজ (ইতালি)

ফাইনাল (মিউনিখ ; ৭.৭.৭৫ ; দর্শক ৭৪,২১৮)

পশ্চিম জার্মানী—২ : নেদারল্যাণ্ডস—১

(ব্রাইটনার-পেনাল্টি, মূলার) (নিসকেন্স)

বিরতি ২-১

মেয়ার, ফোগটস, ব্রাইটনার, শোয়ারৎ-সেনবেখ, বেকেনবাউয়ের, বনহোফ, হ্যোনেস, গ্রাবোস্কি, ওভারাথ, মূলার, হ্যোলৎসেনবাইন।

জং ব্লড, সুরবিয়র, হান, রিজবার্জেন (ডে জং), ক্রল, জানসেন, ভান হানেজেম, নিসকেন্স, রেপ, ক্রুয়েফ, রেনসেনব্রিঙ্ক (ভান ভার কারখফ)।

রেফারি—জে টেলর (ইংল্যাণ্ড)। **ল্যাইন্সম্যান**—আলফানসো গঞ্জালেজ খারচুণ্ডিয়া (মেক্সিকো) ও র‍্যামোন বারোটা রুইজ (উরুগুয়ে)

চূড়ান্ত পর্যায়ে একটির বেশি গোলদাতা

৭—লাটো (পোল্যাণ্ড)।

৫—নিসকেন্স (নেদারল্যাণ্ডস), জার্মাশ (পোল্যাণ্ড)।

৪—এস্ট্রোয়েম (সুইডেন), মূলার (পশ্চিম জার্মানী), রেপ (নেদারল্যাণ্ডস)।

৩—বাজেভিক (যুগোশ্লাভিয়া), ব্রাইটনার (পশ্চিম জার্মানী)। ক্রুয়েফ (নেদারল্যাণ্ডস), ডিনা (পোল্যাণ্ড)। হাউসম্যান (আর্জেন্টিনা), রিভেলিনো (ব্রাজিল)।

২—বাবিংটন, ইয়াজাল্দে (আর্জেন্টিনা), জর্ডান (স্কটল্যাণ্ড), জেয়ারজিনো (ব্রাজিল), কারাসি, সুরজাক (যুগোশ্লাভিয়া), ওভারাথ (পশ্চিম জার্মানী), স্যাণ্ডবার্গ (সুইডেন), সানন (হাইতি), স্ট্রেশ (পূর্ব জার্মানী)।

পরবর্তী বিশ্বকাপ ১৯৭৮-এ আর্জেন্টিনায়

বিশ্ব-ফুটবলে স্মরণীয়

আদেমীর—জন্ম ১৯২৪। পুরো নাম আদেমীর মারকুইস ডে মেনেসেস। সাতটি গোল দিয়ে ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে টপ-স্কোরার ছিলেন ব্রাজিলের এই খেলোয়াড়। ৩৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোল দিয়েছেন ৩২টি। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি গতি ও বল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। দুই পায়ে তীব্র শট। ফরওয়ার্ডে যে কোনো পজিশনে খেলতে পারতেন। তবে স্ট্রাইকিং পজিশন বা লেফট আউটেই সর্বাপেক্ষা পারদর্শী ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে অতিরিক্ত ফুলব্যাক রাখা সহজ হত। ভাস্কো ডা গামা দলের হয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ১৯৪৫, ১৯৪৭, ১৯৪৯, ১৯৫০ ও ১৯৫২-য়। ১৯৪৬-এ যখন ফ্লুমিনেন্স চ্যাম্পিয়ন হয়, আদেমীর তখন ওই দলেই।

আইভর অলচার্চ—জন্ম ১৯২৯। ক্লাব পর্যায়ে তেমন ভাল না খেললেও ওয়েলস জাতীয় দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সোয়ানসি, নিউক্যাসল ও কার্ডিফের এই খেলোয়াড় ১৬ বছরের মধ্যে ওয়েলসের পক্ষে রেকর্ড-সংখ্যক (৬৮) ম্যাচ খেলেছেন। কুশলী ইনসাইড ফরওয়ার্ড। লীগের ৬৯৪টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র ১০৩টি ম্যাচ প্রথম ডিভিশনে।

সোয়ানসি বহু খেলোয়াড়ের আবিষ্কর্তা। ১৯৫৪-৫০-এ যখন ক্লাব তৃতীয় ডিভিশনে উঠল অলচার্চ তখনই দলে এলেন, তারপর একনাগাড়ে দশ বছর খেলেছেন। এর মধ্যে অনেক ধনী ক্লাব থেকে তাঁর ডাক এলেও তিনি সোয়ানসি ছাড়েননি। ১৯৫৮-য় সুইডেনের বিশ্বকাপ ফুটবলে ওয়েলসকে প্রভূত সাহায্য করেন কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠতে। পেলের একমাত্র গোলে ব্রাজিলের কাছে গেটেবার্গে ওয়েলসের পরাজয় ঘটে। অলচার্চ এক বছর বাদে চলে যান নিউক্যাসলে। ১৯৪৭-তে নিউক্যাসলের অবনমন ঘটলে তিনি ওয়েলসে ফিরে আসেন। মাঝের একটি মরশুম ছিলেন কার্ডিফে। পজিশন জ্ঞান, নিখুঁত পাস ইত্যাদির জন্য অলচার্চ প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় গণ্য হতেন। জাতীয় দলের পক্ষে ২৩টি গোল দিয়েছেন। আরও দুটি গোল যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে এবং এটি ছিল তাঁর জীবনের সেরা খেলা। লীগে ২৫১টির মধ্যে সোয়ানসির পক্ষে রেকর্ড (১৬৬) করেন।

আর্টিলিও আনচেটা—জন্ম ১৯৪৮। ১৯৪৭-এর বিশ্বকাপে এঁর খেলা

দেখে সমালোচকরা একবাক্যে স্বীকার করেন আনচেটা এখন দক্ষিণ আমেরিকার সেরা ব্যাক। এবং তাঁর যা বয়স আরও উন্নতি করবেন ; ১৮ বছরের সময় ন্যাশিওনালের প্রথম দলে নিয়মিত খেলার সুযোগ পান। সেণ্টার ব্যাকে তাঁর খেলা অচিরেই সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই উরুগুয়ের জাতীয় দলে নির্বাচিত হন। মেক্সিকো বিশ্বকাপে খেললেন অভিজ্ঞ ও প্রবীণদের মতই। অথচ দলের তিনি কনিষ্ঠতম। তাঁর উচ্চতা, চমৎকার স্বাস্থ্য, স্পিড ও সক্রিয়তা উরুগুয়ের ডিফেন্সকে দুর্ভেদ্য করে রেখেছিল। সেমিফাইনালে ব্রাজিল আনচেটাকে একবার অতিকষ্টে কাবু করেছিল। বিশ্বকাপে তাঁর খেলা ব্রাজিলের গ্রিমিও ক্লাবের কর্মকর্তাদের আকৃষ্ট করে। এ ন্যাশিওনাল ছেড়ে আনচেটা যোগ দিলেন গ্রিমিওতে।

অ্যালান বল—জন্ম ১৯৪৫। ইংল্যাণ্ডে এঁর মত পরিশ্রমী ইনসাইড ফরওয়ার্ড এখন দ্বিতীয় জন নেই। ব্রিটেনে দুবার তাঁর বদলের জন্য রেকর্ড-মূল্য দিতে হয়েছে। দলবদলের সময় এভার্টনকে দিতে হয় ১ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড। ১৯৪৭ সালে আর্সেনাল অনুরূপ মূল্য দেয়। ছোট ছোট পাসের খেলায় কুশলী। বিপক্ষের ডিফেন্সকে বোকা বানাতে, কোথায় কখন পাস দিতে হবে সে সম্পর্কে দারুণ অভিজ্ঞ, চোখ বুজে বলে দিতে পারেন তাঁর সতীর্থরা কোথায় এবং তৎক্ষণাৎ কার কাছে বল পাঠাতে হবে।

ব্ল্যাকপুলে থাকাকালেই অ্যালান বলের সুনাম হয়। ইংল্যাণ্ডের বিশ্বকাপ দলের কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় ছিলেন এবং ফাইনালে তাঁর দুর্দান্ত খেলা ইংল্যাণ্ডকে বিশ্বকাপ জয়ের পথ করে দেয়। গোল দেওয়ার পারদর্শিতা না থাকলেও ১৯৪৭-র পর থেকে জাতীয় দল থেকে বলকে বাদ রাখা সম্ভব হয়নি। এফ এ কাপ বিজয়ী দলে খেলেন।

ছিলেন রানার্স দলে। যেমন তাঁর লাল চুল, তেমনি খেলার মাঠে মেজাজ হারিয়ে লাল হয়ে যান। শাস্তিও পেয়েছেন, কয়েকবার হয়েছেন সাসপেণ্ড।

আনাতলি বাইশোভেটস—জন্ম ১৯৪৬। সেণ্টার ফরওয়ার্ডে হোক, বা দুই উইং-এই হোক স্ট্রাইকার হিসাবে দ্রুত হানা দিতেন। ডায়নামো কিয়েভেই খেলা শুরু, খ্যাতিও এই ক্লাবে। কৈশোরেই ক্লাবের প্রথম দলে খেলা আরম্ভ। পর পর তিন বছর লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং লীগ ও কাপ দ্বিমুকুট জয়ে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। লীগে

রাইট আউটে তিনিই একমাত্র অর্থভক্ত উইঙ্গার। তাঁর ক্রসপাসেই রুশ ফুটবলে উইঙ্গার-এ জোরদারের পুনরাবৃত্তি ঘটে। আলফ রামসের ইংল্যাণ্ডও এই পদ্ধতিই নিয়েছিল। বাইশোভেটসের দুটি গোলেই মরশুমে সেলটিক কাপ থেকে বিদায় নেয়। বিশ্বকাপের পর তিনি রুশ জাতীয় দলভুক্ত হন। বিশ্বকাপে রাশিয়ার পক্ষে ছটি গোল দেন। তবে সেরা দুটি গোল বেলজিয়মের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে দর্শনীয় দ্বিতীয়টি। দুজন বেলজিয়ান ডিফেণ্ডারকে স্ট্যাচুর মত দাঁড় করিয়ে রেখে অসম্ভব নিশানা থেকে গোলটি করেন। রুশ জাতীয় দলের পক্ষে ২৯টি ম্যাচ খেললেও শেষদিকে কার্টিলেজের ব্যথায় তাঁর খেলার প্রচণ্ডরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাইশোভেটসের চমৎকার বল নিয়ন্ত্রণ আপামর ফুটবল অনুরাগীর প্রশংসা অর্জন করলেও বল বেশিক্ষণ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রবণতায় কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হন। কিন্তু বাইশোভেটসের মত প্রতিভাবান খেলোয়াড়ও বেশিদিন ক্লাব বা দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলেন না কার্টিলেজের গোলমালেই। অচিরেই খেলার গতি গেল কমে, ফুটবল থেকে অবসর নিতে বাধ্য হলেন এমন সময়ে, যখন বিশ্বের ফুটবল-প্রেমিকরা তাঁর কাছে অনেক প্রাপ্তির আশায়।

অ্যানটনিও কারবাজাল—জন্ম ১৯২৯। বিশ্বকাপের খেলার রেকর্ড-ধারী মেক্সিকোর এই গোলরক্ষক বিশ্বকাপে প্রথম খেলেন ১৯৫০-এ এবং শেষ ১৯৬৬-তে ৩৭ বছর বয়সে। তার আগে এসপানা দলে অপেশাদার খেলোয়াড় ছিলেন। তখনই মেক্সিকো জাতীয় দলে সুযোগ পান। খেলেন ১৯৪৮ ওলিম্পিক ফুটবলে। ওলিম্পিক থেকে ফিরে লিঁয়তে যোগ দেন ও পেশাদার হন। ১৯৬৬-তে অবসরের আগে পর্যন্ত এই ক্লাবেই ছিলেন। তিন বছর পরে হলেন লিঁয়র কোচ। চিলিতে ১৯৪৭-র বিশ্বকাপে মেক্সিকোর সেরা খেলোয়াড় ছিলেন এই কারবাজাল।

আমানকিও—জন্ম ১৯৪০। পুরোনাম আমানকিও আমারো ভারেলা। স্পেনে এঁর মত শক্তিমান রাইট আউট বা রাইট ইন আজও দেখা যায়নি। লুই সুয়ারেজ ইতালি চলে যাওয়ার পর আমানকিও নিজেকে তাঁর দলের সেরা ফরওয়ার্ডে পরিণত করেন কঠোর সাধনায়। শুধু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নন, চমৎকার বল নিয়ন্ত্রণ, দুরন্ত গতির ডান পায়ের শটে ক্ষণে ক্ষণেই বিস্ফোরণ

ঘটাতেন। জেণ্টোর কাছ থেকে স্পেনের জাতীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণের পর ৩৪ বার স্পেনের হয়ে খেলেছেন, গোল করেছেন ১৩টি।

সুয়ারেজের মতই আমানকিওর জন্ম করুণা প্রদেশে। খেলা শুরু স্থানীয় দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব ডিপোর্টিভ করুণায়। এই ক্লাবের পক্ষে প্রথম লীগ খেলেন ১৮ বছর বয়সে রাইট ইনে। শুরু থেকেই রিয়ালের নজর ছিল তাঁর উপর। তারা আমানকিওকে কিনল ও নিয়ে গেল মাদ্রিদে। সেখানে হলেন রাইট আউট। কয়েকবছর না কাটতেই তাঁর ফুটবল এমন পরিণত হল যে, রাইট আউটে থাকলেও স্ট্রাইকারের ভূমিকাই নিতেন।

জাতীয় দলে প্রথম খেলেন ১৯৪৭-এ রোমানিয়ার বিপক্ষে। দুবছর না কাটে ১৯৪৭ উরোপীয় ফুটবলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল দারুণ অ্যাটাকার হিসাবে। স্পেন মাদ্রিদে ইউরোপীয় নেশনস্ কাপের ফাইনালে ২-১ গোলে হারায় রাশিয়াকে। এর আগে ভিয়েনায় রিয়াল মাদ্রিদ ৩-১ গোলে হারে ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনালে। রিয়ালকে ফাইনালে যেতে ও নেশনস্ কাপে সবচেয়ে অবদান ছিল আমানকিওর। দুবছর বাদে রিয়ালকে ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনালে উঠতে তিনিই সর্বাধিক সাহায্য করেন। এবার রিয়াল কাপ জিতল। আমানকিও-ই ১-১ করে রিয়ালের মনোবল দৃঢ় করেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বেলগ্রেডের পার্টিজান ক্লাব ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল। কয়েকমাস পরে গেলেন ইংল্যাণ্ডে বিশ্বকাপ (১৯৪৭) খেলতে। তবে প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে তাঁকে দলে নেওয়া হয়নি। খেললেন সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। স্পেনের ২-১ গোলে জয়ের জয়সূচক গোলটি দিলেন আমানকিও। পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচেও ছিলেন তিনি।
তিনি ব্রাজিলের বিরুদ্ধে বিশ্ব-একাদশে নির্বাচিত হলেন।
এলেন রাইট ইনে। রিয়ালকে এবার সাহায্য করেন কাপ-উইনার্স কাপের ফাইনালে উঠতে। অ্যাথেন্সে রিয়াল প্রথম দিন চেলসির সঙ্গে ড্র করল দারুণ লড়ে, কিন্তু ফিরতি ম্যাচে চেলসিই জেতে। পরের মরশুমে আমানকিওর খেলা রিয়ালকে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়ন করল।

ইউসেবিও—জন্ম ১৯৪২। পুরো নাম ইউসেবিও ডা সিলভা ফেরিরা। দুর্দান্ত কুশলী স্ট্রাইকার। ইউসেবিওর চমৎকার ক্রীড়া-নৈপুণ্যেই পোর্তুগাল ও তাঁর ক্লাব বেনফিকা অসংখ্য ম্যাচে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, সফলও হয়েছে। বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকারদের অন্যতম ইউসেবিওর বড় গুণ গোলের কাছে বল

পেলে অবিশ্বাস্যভাবে তার সদ্ব্যবহার। বিশ্ব-ফুটবলের ইতিহাসে তাঁর কিছু শট সবচেয়ে সক্রিয় এবং বিস্ফোরণ ঘটালেও পৃথিবীর তাবৎ ফুটবল অনুরাগীরা বিমোহিত প্রতিটি ম্যাচে তাঁর অনন্য ক্রীড়াধারায়।

তাঁকে সর্বাধিক খ্যাতি এনে দিয়েছে গোল করার অদ্ভুত ক্ষমতা। বিশ্বকাপে ৯টি গোল দিয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পান একহাজার পাউণ্ড। ১৯৪৭ পর্যন্ত ছিলেন পোর্তুগালের লীগে সর্বোচ্চ গোলদাতা (১৫২—যথাক্রমে ২৯, ২৮, ২২, ৩১ ও ৪২)। ইউসেবিওর খেলার বড় গুণ, তিনি যে কোনো মুহূর্তে খেলাকে নিজেদের অনুকূলে আনতে পারতেন। আর এই কৃতিত্বই তাঁকে 'ইউরোপের পেলে' আখ্যা দেয়। বিশ্বকাপে তো কোনো কোনো সমালোচক বললেন ব্রাজিলের দশ নম্বরের চাইতেও ইউসেবিওর খেলা বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

ছেলেবেলায় অ্যাথলীট ছিলেন, তখন তাঁর প্রধান ইভেণ্ট ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়। অ্যাথলেটিকসের দৌড়ের ওই গতিকে প্রয়োগ করলেন ফুটবলে। তাঁর বিদ্যুৎগতির সোয়ার্ভিং শটগুলো বিপক্ষের ডিফেন্সের কাছে সবদাই ভয়াবহ ছিল। শটে এত শক্তি মিশ্রিত থাকত যে, তা অপ্রতিরোধ্য হত। কথাই ধরা যাক। সেমিফাইনালে উত্তর কোরিয়ার কাছে তিনগোলে পিছিয়ে পড়েছে পোর্তুগাল। কিন্তু ইউসেবিওর তাৎক্ষণিক বুদ্ধিতে খেলার স্ট্রাটেজি পরিবর্তনের পর পোর্তুগাল শুধু গোল শোধই করল না, কোরিয়ানদের হারিয়ে তারা কোয়ার্টার ফাইনালে পৌছল। পোর্তুগাল জিতল ৫-৩ গোলে এবং এর চারটি গোল ইউসেবিওর। কোরীয় গোলে তাঁর মুহুর্মুহু হানা এবং গোল হওয়ায় পর সেণ্টার সার্কলে বল স্থাপনের ঘটনা বহুকাল বিশ্ব-ফুটবলকে সমৃদ্ধ করে রাখবে।

সেমিফাইনালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এই 'ব্ল্যাক প্যান্থার' খুব খুশি হতে পারেননি, যদিও দুর্ভেদ্য গর্ডন ব্যাঙ্কসকে পেনাল্টিতে তিনি পরাস্ত করেছিলেন।

পোর্তুগীজ জাতীয় দলে প্রথম খেলেন ১৯৪৭-র অক্টোবরে, ১৯ বছর বয়সে। পোর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকার রাজধানী লুরেঙ্কো মার্কুইসের দরিদ্র পল্লীতে তাঁর জন্ম। ওখানে বছর দুয়েক ফুটবল থেকে জীবিকা অর্জন করেন। কিন্তু যখন লুক্সেমবার্গের বিরুদ্ধে নির্বাচিত হলেন, তখন অভিজ্ঞতা সামান্যই। নতুন ক্লাব বেনফিকার হয়ে ততদিনে মাত্র ২৫টি ম্যাচ খেলেছেন। তার মধ্যে

গুরুত্বপূর্ণ মন্টিভিডিওয় বিশ্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে পেনারোলের বিরুদ্ধে প্লে-অফ্ ম্যাচ। ইউসেবিও আরও বেশি ম্যাচের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর দল বদল নিয়ে প্রচণ্ড গণ্ডগোল চলছিল। বেনফিকা ও স্পোর্টিং ক্লাব একযোগে আদালতে হাজির করিয়েছে লুরেঙ্কো মার্কুইস স্পোর্টিং ক্লাবকে। ইউসেবিও গোলমাল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চলে গেলেন আলগার্ভে এবং সেখানেই অনুশীলন করতে থাকেন।

ইউসেবিও নিজের সাধনায় বেনফিকা ও পোর্তুগালে নিজের স্থান পাকা করে নেন। ক্লাবের খেলায় প্রথম নেমে যখন হ্যাটট্রিক করেছিলেন, তেমনটি জাতীয় দলের হয়ে করতে না পারলেও প্রথম ম্যাচেই সকলে মুগ্ধ হলেন। সকলেই স্বীকার করলেন তাঁর মত এমন খেলা কমই চোখে পড়ে।

তাঁর ক্রীড়া-নৈপুণ্যে বিশ্বের ধনী ধনী ক্লাবগুলো আগ্রহী হয়ে বেশি টাকায় তাঁকে কিনতে চায়, কিন্তু ইউসেবিও কোনোদিন বেনফিকা ছাড়ার কথা চিন্তা করেননি। ১৯৪৭-তে একবার মনে হয়েছিল ইউসেবিও বেনফিকা ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু তাঁর দাবি (কিছু বাড়তি টাকা) মেনে নিতেই সব সমস্যা মিটে যায়। ইউসেবিও মস্ত খেলোয়াড় হলেও অন্যান্য খ্যাতিমানদের মত অর্থভাগ্য তাঁর হয়নি। অবশ্য যা পেয়েছেন, তাতেই তিনি খুশি ছিলেন। তাঁর মত প্রতিভাধররা দেশে ও বিদেশে যে সম্মান কুড়িয়েছেন, ইউসেবিওর ভাগ্যে তার কিছুই জোটেনি—একমাত্র স্বদেশে ছাড়া। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সকলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন। ১৯৪৭-তে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ব একাদশ দলে খেলার দুবছর পরে 'ইউরোপীয়ান ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' হয়েছেন।
এর শুরুর দিকে জাতীয় দলের পক্ষে আটশ' ম্যাচ সম্পূর্ণ করেন।
তাঁর কৃতিত্বে বেনফিকা ইউরোপীয়ান কাপ বিজয়ীয় পদক পেল,
পায় রানার্স আপের পদক।

বিশ্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপসেও ছিল রানার্স। মরশুম শেষে হিসাব করে দেখা গেল বেনফিকার পক্ষে ইউসেবিওর গোলসংখ্যা ২৯৬। চারটি মরশুম মিড-ফিল্ডে খেলা সত্ত্বেও তিনি সর্বোচ্চ স্কোরার। মরশুমে ইউসেবিও আবার ফিরলেন অগ্রভাগে এবং লীগে ৪০টি গোল দিয়ে 'গোল্ডেন শ্যু' পুরস্কার পেলেন। সম্ভবত তাঁর অপূর্ব স্কিল, অপ্রতিরোধ্য শুটিং, আশ্চর্য বল কণ্ট্রোল এবং ঠাণ্ডা মাথায় খেলাই এই সম্মান দেয়। দলে পেলের মত কাছাকাছি প্রতিভাধর একাধিক বা একজনও খেলোয়াড়ও ছিলেন না ইউসেবিওর। কিন্তু

তাঁর গুণাবলী তাঁকে বিশ্বের সেরা ফুটবলারদের সঙ্গে একই সারিতে বসার মর্যাদা দেবে।

ইরিবার কোর্তাজারেনা, জোস অ্যাঙ্গেল—জন্ম ১৯৪৩। ষাটের দশকের মাঝামাঝি স্পেন জাতীয় দলের গোলরক্ষক। ১৯৪৩-তে ইউরোপীয়ান নেশনস্ কাপ ফাইনালে রাশিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে স্পেন যে গৌরব অর্জন করে তাতে ইরিবার কৃতিত্ব উল্লেখ্য। ১৯৪৩-র বিশ্বকাপ দলে ছিলেন। লিসবনে বেনফিকার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সম্মিলিত দলে খেলেন।

ইরিবার খেলা শুরু মাত্র আটবছর বয়সে জারায়ুজে কলেজ লা সালে-র সঙ্গে। এই বিদ্যায়তনের হয়ে প্রতিটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। প্রথম লীগে অংশ নেন বাস্কোনিয়ার পক্ষে। বাস্কোনিয়ায় এই ম্যাচে ইন্দাউচুকে ২-০ গোলে হারায়। ইরিবার বাস্কোনিয়া যখন আটলাটিকো মাদ্রিদকে স্বদেশের কাপ প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় করে দিল, স্পেনের ফুটবল মহলে তখন সোরগোল পড়ে যায়। ওই খেলায় ইরিবার গোলরক্ষণই ছিল আটলাটিকোর দলের দূরে সরিয়ে রাখার মূলে। পরের মরশুম শুরু না হতেই ইরিবারকে নিয়ে টানাটানি পড়ে গেল। ভ্যালেনসিয়া, জারাগোজা, বার্সিলোনা, আটলাটিকো, বিলবাও প্রভৃতি দলে ডাক পড়ল ইরিবার। শুরুতে ইরিবার কারুর আহ্বানে সাড়া দেননি। এমনকি বিলবাও-এর মত ক্লাবেও যেতে রাজি হননি। বিলবাও-এর চাইতে অন্য ক্লাবের টাকার অঙ্ক বেশ বেশি ছিল। কিন্তু ইরিবার বাবা ছেলেকে উপদেশ দিলেন: তুমি বিলবাও-এ সই কর। তাহলে বাড়িতে থাকতে পারবে। স্বরুতে বিলবাও-এ না যাওয়ার আরও হেতু ছিল। বিলবাও-এর গোলরক্ষক কারমেলো ছিলেন ইরিবার আদর্শ। তাঁর কাছে দ্রোণাচার্য। সুতরাং ইরিবার কেমন করে ওই দলে গিয়ে সুযোগ পাবেন?

পিতৃ উপদেশে উত্তম ফলই হল। স্বল্প দিনের মধ্যেই ইরিবার বিলবাও-এর পয়লা নম্বর গোলরক্ষক হলেন। নেশনস্ কাপ ম্যাচে প্রথম আন্তর্জাতিক খেলায় নামলেন আয়ারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সিভিলি-তে। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলেন ৪০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ৪৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে স্পেনের রেকর্ড ছিল গোলরক্ষক জামোরার। জামোরা ও ইরিবার, গর্ডন ব্যাঙ্কস ও লেভ ইয়াসিন প্রভৃতির সঙ্গে বিশ্বের সেরা গোলরক্ষকদের গুণাবলীতে সমৃদ্ধ ছিলেন।

ইগর চিসলেঙ্কো—জন্ম ১৯৩৬। মস্কো ডায়নামোর শুধু আক্রমণাত্মক ফরওয়ার্ডই নন, নিখুঁত ও জোরালো শটের জন্যও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন চিসলেঙ্কো। ক্লাবের মিড-ফিল্ড খেলোয়াড় হলেও রুশ জাতীয় দলে খেলেন স্ট্রাইকাররূপেই। ৫০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ২৬টি গোল দিয়ে রাশিয়ার রেকর্ডধারী গোলদাতা ভ্যালেনতাইন ইভানভের সমকক্ষ হন।

১৫ বছর বয়সে টর্পেডো ইয়ুথ টিমে খেলা শুরু করেন। তারপর গেলেন ফিজিক্যাল এডুকেশন স্কুল অফ ইয়ুথ দলে। সেখানে একবছর কাটিয়ে ১৯৫৬-য় সই করলেন মস্কো ডায়নামোয়। চমৎকার আইস হকি খেলোয়াড় চিসলেঙ্কো ডায়নামোর পক্ষে ৩০০ ফুটবল ম্যাচ খেলেছেন, দুটি চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি জিতেছেন। ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার চিসলেঙ্কো কদাচিৎ মাথা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু হেডের শূন্যস্থান পূরণ করেছে তাঁর দুটি পা। দ্রুত পা দুখানি সর্বদাই প্রথম সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। মাঝে মাঝে তাঁর আক্রমণাত্মক খেলায় দুর্বলতা প্রকাশ পেলেও সঙ্কটকালে তিনি সব সময় জ্বলে উঠেছেন। আর এই কারণেই ১৯৪৩-র বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর এক খেলোয়াড়কে লাথি মারার দরুন তাঁকে মাঠ থেকে বহিষ্কার করা হয়। চিলিতে ১৯৪৩-র বিশ্বকাপেও ছিলেন। ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলেছেন। কিন্তু তাঁর সেরা খেলা ওয়েমব্লিতে। এখানে গর্ডন ব্যাঙ্কসকে পরাস্ত করে দুটি গোল দিয়েছিলেন।

মাঠের বাইরে চিসলেঙ্কো একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। একবার অত্যধিক মদ্যপানের অভিযোগে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েন। সোভিয়েট ফুটবলের কড়া সমালোচক তিনি। তাঁর বক্তব্য: ক্লাব বা দেশের স্বার্থ যেখানে বড়, সেখানে রাজনৈতিক মতবাদের কথা মনে রেখে কাউকে বাদ দেওয়া উচিত নয়। ফুটবল খেলা থেকে অবসর নিলেও চিসলিঙ্কো ফুটবলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারেননি। হয়েছেন ডায়নামো জুনিয়র দলের ট্রেনার।

ইভানভ ভ্যালেনতাইন—জন্ম ১৯৩৪। পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে রাশিয়ার ইনসাইড ফরওয়ার্ড ও মাঝমাঠের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। ২৬টি গোল দিয়ে রুশ জাতীয় দলের রেকর্ডধারী। ইভানভ টর্পেডো মস্কোর আবিষ্কার। সেকথা ইভানভ কোনোদিন ভোলেননি এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই ক্লাবও ছাড়েননি কোনোদিন। ১৯৫২-য় টর্পেডোর পক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলেন, শেষ ম্যাচ । সেদিন লেনিন স্টেডিয়ামে একলক্ষ দর্শক উপস্থিত

হয়ে তাঁকে প্রাণঢালা শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানান। ওই ম্যাচের পর থেকে ইভানভ কোচ হন।

আক্রমণ রচনায় যেমন, তেমনি কুশলী ছিলেন শেষ কাজটি—গোল করায়ও। তাঁর সময়ে অত সুন্দর পাস দিতে পারতেন কম খেলোয়াড়ই, আর বিপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে এমনভাবে চলাফেরা করতেন যে, তাঁরা বুঝতেই পারতেন না তাঁর গতিবিধি। ইভানভকে আন্তর্জাতিক ম্যাচের শুরুতে বেশ বিরোধিতায় পড়তে হয়। সমালোচকদের ধারণা ছিল স্পার্টাকের সারজি সালনিকভের দায়িত্ব তিনি বইতে পারবেন না। ইভানভ ওঁদের ওই ধারণাকে ধূলিসাৎ করেন ক্লাব ও জাতীয় দলের পক্ষে চমৎকার খেলে।

প্রথম আন্তর্জাতিক খেলা ১৯৫৬-য় মেলবোর্ণ ওলিম্পিকসে। রাশিয়া সেবার সোনা জিতেছিল। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে খেলার পর জাতীয় দলে নির্বাচন স্থায়ী হল। ১৯৬০-এ তাঁর কালেই রাশিয়া প্রথম নেশনস্ কাপ (ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ) জেতে। বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে উদ্যোক্তা চিলির সঙ্গে পরাজয়ের আগে গ্রুপ ম্যাচে রাশিয়া যে আটটি গোল করেছিল তার চারটিই ইভানভের। নেশনস্ কাপ ফাইনালে উন্নীত রুশ দলেও ছিলেন। বিশ্বকাপ কোয়ালিফাইং ম্যাচে খেললেও চূড়ান্ত পর্যায়ে বাদ দেওয়া হয় বয়সের ভারে শ্লথ গতির জন্যই।

টর্পেডো মস্কোয় তাঁর রেকর্ড আছে ২৮৭টি লীগ ম্যাচে ১২৪টি গোল করার। টর্পেডো ১৯৫৭ থেকে '১৯৫৮ লীগ চ্যাম্পিয়নও হয়। কাপ ফাইনালে জয়সূচক গোলটিও ইভানভের। ১৯৫৭ থেকে '১৯৬৫ পর্যন্ত নয় বছর তিনি রাশিয়ায় সেরা খেলোয়াড়দের তালিকায় স্থান পান। ওদের সেরা খেলোয়াড় তালিকায় প্রতিটি পজিশনে তিনজন করে খেলোয়াড় থাকে। নয় বছরের মধ্যে সাত বছর ইভানভের স্থান ছিল শীর্ষে। চার বছর রাইট ইন এবং ৬৪ তিনবছর রাইট হাফ। অবসরের দু'বছর পরে ইভানভ হয়েছেন টর্পেডোর প্রধান কোচ।

ইমিলিও আলভারেজ—জন্ম ১৯৩৯। এক পা খাটো থাকায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খেলতেন। কিন্তু এতে তাঁর খেলায় কোনো ব্যাঘাত ঘটত না, বরং বিপক্ষরা যত শক্তিমান হতেন, তাঁর খেলাও তত খুলত। দ্রুত বল ধরা এবং তক্ষুণি তার সুব্যবহারে ওস্তাদ ছিলেন। লম্বাটে কৃষ্ণকায় 'কোকোতো' আলভারেজ ১৯৬০ থেকে উরুগুয়ে জাতীয় দলের নিয়মিত খেলোয়াড়—

সেণ্টার ব্যাক। . ১৯৫৭ বিশ্বকাপে খেলেন, ১৯৫৭-তে দলের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে গেলেও খেলেননি।

মাঠে 'দুরন্ত' বলে তাঁর খ্যাতি থাকলেও এই সেণ্টার ব্যাকের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে দ্বিমত ছিল না। কখনও মেজাজ হারাতেন না, বরং কোনো কারণে দোষ করলে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করতেন, ক্ষমা চাইতেন। কখনও ইচ্ছাকৃত ফাউল করেননি। পজিশন জ্ঞান ছিল ভীষণ, ডিফেন্সে মাঝে মাঝে একটু ধীরগতি হলেও তাঁর উপর সর্বদা আস্থা রাখতেন জাতীয় নির্বাচক কমিটি। ইমিলিওর হেড ছিল অতুলনীয়, আর তাই ক্লাব বা জাতীয় দলের—যাদেরই খেলা থাকুক বিপক্ষের গোলের কাছে ফ্রি-কিক্ বা কর্ণার পেলে বিপক্ষের পেনাল্টি-অঞ্চলে পাঠানো হত এই ডিফেণ্ডারকে তাঁর মাথাকে কাজে লাগাতে।

উরুগুয়ের ন্যাশিওনাল ক্লাবে যতদিন ছিলেন, ততদিন ন্যাশিওনাল তাঁকে ভাঙিয়েই খেলেছে। ইমিলিও আলভারেজ কখনও টাকা নিয়ে পীড়াপীড়ি করেননি কর্মকর্তাদের। জুনিয়র এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পগুণের খেলোয়াড়রা টাকা বাড়াবার দাবি জানালেও, তিনি কোনোদিন এসব নিয়ে কথা বলতেন না। আর তাই তাঁর আয় ছিল প্রায় রিজার্ভ খেলোয়াড়দের মতই। মরশুম শেষে ইমিলিও ঢাক-ঢোল না পিটিয়েই ফুটবল থেকে সন্তর্পণে অবসর নেন। কিন্তু তাঁর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খেলা এবং বিজ্ঞানসম্মত ফুটবল বিশ্বের সেরা সেণ্টার ব্যাকদের সঙ্গে একইভাবে বহুদিন মনে রাখতে বাধ্য করবে।

ইয়াকিমভ ডিমিটার—জন্ম ১৯৪১। বালগেরিয়া জাতীয় দলের রাইট ইন ও চমৎকার গোলদাতা। ছোট ছোট পাসে পারদর্শী। তিনটি বিশ্বকাপ সহ মোট ৬০টি ম্যাচ খেলেছেন জাতীয় দলের পক্ষে। নিজের একমাত্র ক্লাব সি এস কে এ। সেপ্টেম্বরে এই ক্লাবে প্রথম ম্যাচ খেলেন। ১২টি মরশুমে ক্লাবের ৩০৭টি ম্যাচে ১৫১টি গোল করেছেন। জিতেছেন ৬টি চ্যাম্পিয়নশিপ পদক। সতীর্থ পিটার জেকবের সর্বোচ্চ গোলের (২৬) রেকর্ড ম্লান করেন, কিন্তু খেলা পড়ে যাওয়ায় মরশুম থেকে সি এস কে এ-র প্রথম দলে নিয়মিত নির্বাচন থেকে বঞ্চিত হন।

উইলিমোস্কি আর্নেস্ট—জন্ম ১৯১৬। কুশলী লেফট ইন। ১৯৩৮-এর বিশ্বকাপে পোল্যাণ্ড যদিও ৫-৬ গোলে ব্রাজিলের কাছে হারে, তবুও উইলিমোস্কি একাকী চারটি গোল করেন। নিজ ক্লাব রুচ চোর্জোর পক্ষে

আটটি প্রতিযোগিতায় গিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। পোল্যাণ্ডের পক্ষে খেলেছেন ২১টি ম্যাচ। তারপর পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হলে জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন ও তাদের পক্ষে ১৩টি গোল করেন ৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে। পোল্যাণ্ড জাতীয় দলের পক্ষে গোল দিয়েছিলেন ২১টি। জার্মানীতে গিয়ে ঘন ঘন ক্লাব বদল করেন ও এক ডজন ক্লাবে খেলেন।

উইলসন রে—জন্ম ১৯৩৪। সর্বকালের অন্যতম সেরা লেফট-ব্যাক। তবে উইলসনের খেলার উন্নতি হয় অনেক দেরিতে এবং ২৫ বছর বয়সে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন। মোট ৬৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাঁকে দেখা গেলেও কখনও সেরা খেলোয়াড়ের ভূমিকা নিতে পারেননি। রামন উইলসন নটিংহামশায়ারের নাগরিক হলেও তাঁকে আবিষ্কার করে হাডার্সফিল্ড এবং ব্যাকে নিয়োগ করে। মোটা অঙ্কের ফি নিয়ে এভার্টনে যোগ দেন ১৯৫৭-তে এবং দুবছর পরে তাদের এফ এ কাপ জয়ে সাহায্য করেন। এরই কয়েক সপ্তাহ পরে বিশ্বকাপের জন্য ইংল্যাণ্ড দলের নাম ঘোষণা হতেই তাঁর নাম পাওয়া গেল। অবশ্য চিলিতে ১৯৫৭-তেও খেলেন, ফাইনালে তাঁর ভুলেই পশ্চিম জার্মানী একটি গোল দিয়েছিল। সমগ্র প্রতিযোগিতায় উইলসন এই একমাত্র ভুলের জন্য কম অনুতপ্ত ছিলেন না।

দুর্দান্ত স্পিড ও বল যথাযথভাবে ফেরত পাঠানো তাঁর কাজ হলেও উইলসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য গোলের সুযোগ তৈরি করা। খেলার মাঠে আঘাতের পর আঘাত পেলেও বল সম্পর্কে তাঁর প্রাক্-ধারণা খেলাকে খুব বিঘ্নিত করতে পারেনি। ১৯৫৭-তে এভার্টনের পক্ষে আর একটি ফাইনাল খেলার কিছুদিনের মধ্যে বড় রকমের আঘাত পেলেন এবং পা ফুটবলের অযোগ্য হল। অবশ্য ব্র্যাডফোর্ড সিটির কোচ হওয়ার আগে ওল্ডহামে সামান্য কিছুদিনের জন্য খেলেছিলেন। ফুটবলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ব্যবসায়ে যোগ দেন।

এরহার্ড হারবার্ট—জন্ম ১৯৩০। সেণ্টার হাফে পশ্চিম জার্মানীর দারুণ নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। বিপক্ষের সঙ্গে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়তেন। একবার খেলা স্পেনের বিরুদ্ধে। এরহার্ডকে কিছুতেই থামানো যাচ্ছিল না রাফ ট্যাক্লিং থেকে। বিরতির সময় ডি স্টিফানো চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'এরহার্ড কি ফুটবল খেলোয়াড়? সে তো রীতিমতো যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়েছে মাঠটিকে।' ৫০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের মধ্যে ১৯৫৮ ও ১৯৫৭-র বিশ্বকাপের

খেলাগুলিও অন্তর্ভুক্ত। শুরুতে ছিলেন স্পাভাগ ফার্থ ক্লাবে, ৩২ বছর বয়সে যান বেয়ার্ণ মিউনিখে। কিন্তু সেখানে যোগ্যতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ফুটবল-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ওকরিক আর্নস্ট—জন্ম ১৯৩২। অস্ট্রিয়ার' অ্যাটাকিং সেণ্টার-হাফদের সম্ভবত সর্বশেষ সেরা খেলোয়াড়। ওকরিককে ওয়েমব্লিতে 'ক্লকওয়ার্ক' আখ্যা দেওয়া হয়। চমৎকার বল নিয়ন্ত্রণ ও অদ্ভুত পাস তাঁকে মাঝমাঠের যোগ্যতম খেলোয়াড় গণ্য করে। ওয়েমব্লিতে অস্ট্রিয়ার খেলার মূলে ছিলেন তিনিই।

তাঁর ৬২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের শুরু ১৯৪৮-এ। ১৯৪৮-এ লণ্ডন ওলিম্পিকসে অস্ট্রিয় দলে ছিলেন। ১৯৫১-য় তাঁর নেতৃত্বে ওয়েমব্লিতে অস্ট্রিয়া-ইংল্যাণ্ড ২-২ ড্র হয়। সেদিন তিনি ছিলেন উভয় দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। ওই ম্যাচে অস্ট্রিয়ার পুরো খেলাই নির্ভরশীল ছিল সেণ্টার-হাফের অ্যাটাকের উপর। ওকরিক শুধু ব্যাকের পাশ ধরা নয়, সেখানে থেকে পাস দেন ফরওয়ার্ডের কাছে অথবা যে কোনো মুক্ত খেলোয়াড়ের নিকটে। গোটা ফরওয়ার্ড লাইন ওকরিকের দিকে লক্ষ্য রেখেই পজিশন নেয়। ওকরিকও যেমনটি চাইতেন, তেমনিভাবেই পেতেন সতীর্থদের। এতে গোলের সুযোগ তেমন পরিলক্ষিত না হলেও খেলায় প্রত্যেকের নৈপুণ্য প্রকাশ পায় এবং খেলা সুপরিকল্পিতভাবেই। সারা ম্যাচে অস্ট্রিয়া একবারই ভেঙে পড়েছিল, তবে তা ফরওয়ার্ড লাইনের গোল করার ব্যর্থতায়। ওকরিক নিজেই বল নিয়ে বিপক্ষের গোলমুখে এগোতে থাকেন ঘন ঘন। আর তা গোল-সীমানার কাছ থেকেই। সতীর্থদেরও গোলের সুযোগ করে দেন ৩০টি শর্ট পাস দিয়ে।

ওকরিকের শুধু বাঁ পা চলত এবং তা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। বল যে অ্যাঙ্গেলে বা যত উঁচু হয়েই আসুক, এক 'টাচেই' থামাতেন এবং পরবর্তী মুভের জন্য প্রস্তুত হতেন তখনই। বল নিয়ে তাঁর ক্রীড়াশৈলী ছিল নয়নাভিরাম। উচ্চতায় ছয় ফুট হলেও কদাচিৎ মাথা ব্যবহার করতেন।

১৯৫৩-য় ওয়েমব্লিতে ফিফা একাদশের পক্ষে উইং হাফ ছিলেন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ফল হয় ৪-৪। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি অস্ট্রিয়া যখন পুরনো পদ্ধতির বিদায় দিয়ে নয়া পদ্ধতি অবলম্বন করে ওকরিক তখন চিরাচরিত প্রথায় উইং হাফে খেলেন। তাঁকে দেখা গেল ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে। ১৯৫৫-য় অবশিষ্ট ইউরোপীয় দলের পক্ষে বেলফাস্টে গেলেন। গ্রেটব্রিটেন ওই খেলায়

৪-১ গোলে হারে। পরবর্তী মরশুমে ৩০ বছর বয়সে গেলেন ইতালি এবং সাম্পাডোরিয়ার ক্লাবে পেশাদার খেলোয়াড় হলেন। অত্যন্ত কুশলী খেলোয়াড় হিসাবে পাঁচ বছর সেখানে আগের অসংখ্য শর্ট পাসের নজির দেখালেন। অস্ট্রিয় পদ্ধতি ইতালিতেও সমাদৃত হল। ভিয়েনায় ফিরে আবার এফ কে অস্ট্রিয়ায় খেললেন। কিন্তু পরের মরশুমে ডাক এল সাম্পাডোরিয়ার ম্যানেজারী করার। ওকরিক আবার ইতালি চললেন। অস্ট্রিয়ায় ফিরে পুরোন ক্লাব এফ কে অস্ট্রিয়ার ম্যানেজার হলেন। ক্লাব দুবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হল। খ্যাতি আরও বাড়ল। এবার গেলেন বাণ্ডেস্লিগায় কলোনের দায়িত্ব নিতে। কিন্তু আর্সেনালের কাছে হেরে কলোন ফেয়ার্স কাপ সেমিফাইনালে পৌছতে না পারায় তাঁর চুক্তির মেয়াদ বাড়েনি। এর শুরুতে আডমিরা-এনার্জির ম্যানেজারের দায়িত্ব পেলেন ওকরিক।

ওভারাথ উলফ্যাঙ্গ—জন্ম ১৯৪৩। পশ্চিম জার্মান জাতীয় দলের এই ওভারাথের খেলা প্রতিমুহূর্তে দর্শকদের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। বাঁ পায়ের জোরালো শট যে কোনো সময় খেলার গতি পরিবর্তনে সক্ষম। ফরওয়ার্ডে, এগিয়ে অপূর্ব ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, পা থাকে বলে, কিন্তু দৃষ্টি সম্মুখে, আর নিখুঁত পাসে তখন বিপক্ষ ক্ষণে ক্ষণেই বোকা বনে যায়। ওভারাথ এক-পেয়ে খেলোয়াড় হলে কী হবে, ওই পা এতই নিপুণ যে, কখনও ডান পায়ের দুর্বলতা ধরা পড়ে না। জাতীয় যুবদলে থাকাকালেই তাঁর স্বপ্ন ছিল 'একদিন তো সিনিয়ার দলে খেলবই'। ওভারাথ কুড়ি বছর বয়সে সিনিয়রে নির্বাচিত হলেন এবং মিড-ফিল্ডে নিজের স্থান পাকা করে নেন। তাঁর দুধারে তখন বেকেনবাউয়ের ও হলার। বল নিয়ে ক্ষমতার প্রকাশ এবং বেকেনবাউয়ের প্রমুখের মত সমান লড়াই ১৯৫৭-র বিশ্বকাপেই তাঁকে বিশ্ব-পর্যায়ের খেলোয়াড়ের মর্যাদা দিল। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশে খেললেন। কলোনকে সাহায্য করলেন জার্মান কাপ বিজয়ে। আগের চার বছর তো ওরা লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়। ইউরোপীয়ান কাপ উইনার্স কাপেও সেমিফাইনালে বার্সিলোনার কাছে পরাজয়ের আগে পর্যন্ত বেশ খেলেন। মেক্সিকো বিশ্বকাপের পথে পশ্চিম জার্মানীকে এগিয়ে নেওয়ার পথে ওভারাথের অবদান কোনো অংশে কম ছিল না।

বিশ্বকাপ দর্শকরা উপলব্ধি করলেন, ওভারাথ সংকটকালে কত ঠাণ্ডা মাথায় খেলেন এবং প্রতিমুহূর্তে বলের গতি কেমনভাবে পরিবর্তন করেন।

তাঁর নিখুঁত পাস কেমনভাবে বিপক্ষের গোলমুখে পড়ে ও গোল-ক্ষুধার্ত সতীর্থ মূলার কেমনভাবে উপকৃত হন। তবে পেনাল্টি-এলাকার বাইরের থেকে মাঝে মাঝে তিনিও শ্বাসরুদ্ধকারী শট নেন। ১৯৫৭-এ তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় উরুগুয়ের বিরুদ্ধে অ্যাটাকে এগিয়েছিলেন মাঝে মাঝেই। জার্মানী যে ১-০ গোলে জেতে তার সূচনা ও সমাপ্তি ওভারাথেরই।

বেকেনবাউয়ের যখন মিড-ফিল্ড ছেড়ে সুইপার হয়ে আরও রক্ষণাত্মক হলেন, জার্মান ম্যানেজার হেলমুট শ্যোনকে তখন ওভারাথের নতুন সঙ্গী খুঁজতে হল। কাগজে কলমে অবশ্য ম্যানেজার গুণটার নেৎসারকে পাশাপাশি রাখলেন, কিন্তু মাঠে নামতেই তাঁকে বেমানান মনে হল। একের খেলা অপরের পরিপূরক না হয়ে পরিপন্থী হল। ইউরেপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে শ্যোন অবশ্য দুজনকে ঘসে মেজে সমঝোতা আনলেন। ওভারাথের ওই সময় অস্ত্রোপচার হওয়ায় একটু সুবিধা হল, চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁর অনুপস্থিতি নেৎসারের সঙ্গে 'সংঘর্ষ' এড়াতে সাহায্য করে। সুতরাং নেৎসারের অংশীদার হলেন হার্বার্ট ভিমার। ভিমার সুযোগ পেলেন নৈপুণ্য প্রদর্শনের।

ওভারাথ অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে বিপাকে পড়লেন নেৎসার তাঁর নৈপুণ্য প্রদর্শন দ্বারা স্থায়ী স্থান করে নেওয়ায়। অর্থাৎ ওভারাথকে এখন নেৎসার অপেক্ষা ভাল খেলতে হবে অথবা তাঁর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। ম্যানেজার হেলমুট শ্যোন স্থির করলেন ১৯৫৭-এর বিশ্বকাপে স্বদেশে (পশ্চিম-জার্মানীতে) দুজনকেই 'নামাবো'। অন্যরা কিন্তু শ্যোনের এই সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারলেন না। ১৯৫৭-এর বিশ্বকাপের আগে আবার অন্য কথাও শোনা গেল। কেউ কেউ বললেন, উয়ে জিলার ও মূলারের মধ্যে সমঝোতা নেই। শ্যোন এই দুজনকে শুধু খেলালেন তাই নয়, দুজনকে একই ঘরে থাকার ব্যবস্থা করেন। তিনি ভাবলেন ওভারাথ ও নেৎসারকেও এইভাবে মেলাতে পারলে মিউনিখের বিশ্বকাপ পশ্চিম জার্মানীর দখলে আসবেই। কিন্তু বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে নেৎসারকে শ্যোন আগের দৃষ্টিতে দেখলেন না। নেৎসার শ্যোনের স্নেহ বঞ্চিত হন সম্ভবত ১৯৫৭-এ জার্মানীর ক্লাব মোয়েনশেনগ্লাডবাশ থেকে রিয়াল মাদ্রিদে চলে যাওয়ায়। রিয়ালে খেলাও একটু পড়ে যায়।

বিশ্বকাপ দলে নেৎসার থাকলেও ওভারাথই অধিকাংশ ম্যাচ খেলেন শুরুতে। পূর্ব জার্মানীর বিরুদ্ধে অবশ্য সমাপ্তির ২০ মিনিট আগে ওভারাথের

বদলে নেৎসারকে নামানো হয়, কিন্তু তিনি আগের নৈপুণ্য প্রদর্শনে ব্যর্থ হন। সুতরাং কলোনের ওভারাথ উলফ্যাঙ্গের স্থানই পাকা থাকে ফাইনাল পর্যন্ত।

ওরভার বার্গমারক—জন্ম ১৯৩০। ওরভার কখনও সুইডেনের ফুলব্যাক কখনও বা সেণ্টার হাফ। জাতীয় দলের পক্ষে ৯৪টি ম্যাচে খেলেছেন। বাইসেক থেকে এসে ১৯৪৯-এ শুরুতে ওরব্রো দলে ছিলেন সেণ্টার ফরওয়ার্ড। তারপর গেলেন পিছনে, হলেন ফুলব্যাক। স্বদেশে দুই ফ্ল্যাঙ্কেই দড় ছিলেন। রক্ষণ-ভাগে প্রতিমুহূর্তে মারাত্মক প্রহরী, বিপক্ষের ফরওয়ার্ড তাঁকে সর্বদাই দুর্ভেদ্য মনে করতেন। পরবর্তীকালে হন বিশ্বস্ত সেণ্টার-হাফ। ওরব্রো ছেড়ে বার্গমারক স্বল্পকালের জন্য অন্য ক্লাবে যান। ১৯৫৫-৫৬-য় ছিলেন সোলনায় ও ১৯৬২-৬৪-তে ইতালির রোমায়। দুই ক্লাবের কোথাও তেমন সুযোগ পাননি। তাই ওরব্রোতে ফিরে আসেন এবং দ্বিতীয় ডিভিশনেই কাটান ফুটবল-জীবনের অর্ধেক বয়স।

জন্মসূত্রেই যেন অধিনায়ক ছিলেন। অধিনায়ক নিজ ক্লাব ও জাতীয় দলের। প্রথমবার অধিনায়ক ১৯৫১-য়, দ্বিতীয়বার ১৯৫৩-য় নেতৃত্ব পেয়ে হ্যামডেনে সুইডেনকে জেতালেন স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে। ১৯৫৮-য় স্টকহমের বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠল আর বার্গমারক নির্বাচিত হলেন প্রতিযোগিতার সেরা রাইট-ব্যাক। ১৯৫৭-তে সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচের পর জাতীয় দলের ম্যানেজার হলেন এবং
বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁর দল ছিল ইউরোপের সেরাদের অন্যতম। বার্গমারকের জনপ্রিয়তা শুধু জনসাধারণের মধ্যে নয়, সাংবাদিক ও খেলোয়াড়রাও তাঁকে ভীষণ পছন্দ করতেন। যেখানেই গেছেন, সেখানেই সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। পর্যন্ত সুইডেনের ম্যানেজারী করেছেন ৪৯টি খেলায়। ‍িতেছেন ২৬টি, ড্র ১১, পরাজয় ১২। ওরব্রোর ম্যানেজার হন ।

ওরশি রাইমোণ্ডো—জন্ম ১৯০১। ওরশি ছিপছিপে হলে কী হবে, ভীষণ শক্তিমান, অত্যন্ত দ্রুত ও কুশলী ফুটবলার। চমৎকার তাঁর শট এবং দারুণ বলপ্লেয়ার। ১৯২৮-এর ওলিম্পিক ফাইনালে আর্জেণ্টিনার এই লেফট আউট উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলেন, কিন্তু ছ' বছর পরে বিশ্বকাপ ফাইনালে দেখা গেল তিনি খেলছেন ইতালির পক্ষে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে।

আর্জেণ্টিনীয়রা স্বাভাবিকভাবেই খুশি হতে পারেননি ওরশি যখন ইতালির

জুভেন্টাসের পক্ষে সই করলেন। প্রতিমাসে ৮ হাজার লিরা বেতন দিয়ে জুভেণ্টাস এঁকে নিয়ে যায়। আর্জেন্টিনা শুধু তাঁর প্রতি অখুশি হয়েই ক্ষান্ত ছিল না। শুরুতে তাঁকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতিই দেয়নি এবং পুরো একটি মরশুম না খেলিয়ে বসিয়ে রাখে। তবে ইতালীয়রা তাঁকে পেয়ে আর কাল-বিলম্ব করল না। স্থান দিল জাতীয় দলে। ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে ইতালি দলের পক্ষে প্রথম খেলা পোর্তুগালের বিরুদ্ধে মিলানে, ইতালি জিতল ৬-১ গোলে। খেলা থেকে যখন অবসর নিলেন তখন হিসাব কষে দেখলেন তিনি ইতালিতে এসে দ্বিতীয় জাতীয় দলের পক্ষে ৩৫টি ম্যাচ খেলেছেন এবং গোল করেছেন ১৩টি, তবে ১৯৩৪-এর বিশ্বকাপ ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে যে গোলটি দিয়ে ১-১ করেন তদপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গোল কখনও করতে পারেননি। বাঁ পায়ে বল তুলে ডান পায়ের চমৎকার সোয়ার্ভিং শটে চেক গোলরক্ষক প্লানিকাকে পরাস্ত করেন। তাঁর মাথার উপর দিয়ে বল এমনভাবে গোলে প্রবেশ করে যে, তিনি ঠাহর করতেই পারেননি বল কোথা দিয়ে যাচ্ছে। পরদিন ওরশি শূন্য গোলে কুড়িবার ওই শটের মহড়া দেন ফটোগ্রাফারদের অনুরোধে তাঁদের ছবির স্বার্থে। কিন্তু তিনি ফাইনালের দিনের শটের পুনরাবৃত্তি করতে পারেননি।

উপর্যুপরি পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন জুভেন্টাস দলে ১৪৩টি ম্যাচ খেলেছেন। তখন অনেক ম্যাচেই তাঁর সঙ্গী ছিলেন আর্জেন্টিনার সতীর্থ লুইসিটো মন্টি। 'মুমো' ছদ্মনামধারী এই ওরশি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এতই সচেতন ছিলেন যে, রাস্তায় বের হলে যদি কোনো ভক্ত তাঁকে দেখে টুপি খুলে সম্মান না জানাতেন, তবে ভীষণ রেগে যেতেন।

ওলিভিরি আল্ডো—জন্ম ১৯১০। ইতালির স্টাইলিস্ট ও উদ্দীপনাময় গোলরক্ষক ওলিভিরি ১৯৩৮-এর বিশ্বকাপ বিজয়ী দলে ছিলেন। মার্সাইয়ে নরওয়ের বিরুদ্ধে তাঁর অভূতপূর্ব গোলরক্ষা এই সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে। নরওয়ের সেণ্টার ফরওয়ার্ড ব্রানিল্ডসেন দারুণ জোরালো শট ওলিভিরি এক হাতেই ধরে ফেলেন। তাঁর এই গোল রক্ষা ইতালিকে বাঁচাল। ব্রুনিল্ডসেন পরক্ষণেই ওলিভিরির কাছে গিয়ে করমর্দন করলেন। ইতালির ম্যানেজার পোজোও কৃতজ্ঞতার হাসিসহ তাকালেন তাঁর গোলরক্ষকের দিকে।

ওলিভিরির খ্যাতি ছড়ায় এর দুবছর আগে ১৯৩৬-এর নভেম্বরে বার্লিনের ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে। জার্মানীর বিরুদ্ধে ইতালি জাতীয় দলে খেলেন

ওইদিন থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত। ইতালি জাতীয় দলে তিনিই ছিলেন পয়লা নম্বর গোলরক্ষক। অবশ্য মাঝে কয়েকটি ম্যাচে তিনি নামেননি। কিন্তু ১৯৩৮-এর বিশ্বকাপে প্রতিটি ম্যাচের গুরু দায়িত্ব ছিল তাঁরই উপর। বিশ্বকাপের খ্যাতি ১৯৩৮-এর শেষদিকে হাইবারিতে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট ইউরোপীয় দলে নির্বাচিত করে। এই বছরই তিনি লুক্কার লুচেজ দল ছেড়ে তোরিনোয় যোগ দেন। ওলিভিরি ইতালির সিনিয়র জাতীয় দলের হয়ে ২৪টি ও ইতালি 'বি' দলের পক্ষে ৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন যুদ্ধের পরে ম্যানেজার হিসাবেও সাফল্য অর্জন করেন যথাক্রমে জুভেন্টাস ও ইণ্টারন্যাজোনালে।

ওয়াল্টার ফ্রিৎস—জন্ম ১৯২০। ১৯৫৪-র যে পশ্চিম জার্মান দল বিশ্বকাপ জেতে, ওয়াল্টার শুধু তার অধিনায়ক নন,—গোটা প্রতিযোগিতায় স্কিমারও ছিলেন তিনি। যেমন বুদ্ধিদীপ্ত, তেমনি নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টিতে পারঙ্গম এবং সর্বোপরি অক্লান্ত পরিশ্রমী। শেপ হারবার্জারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা পশ্চিম জার্মানীর ফুটবলকে অনেক উন্নত করেছে। ১৯৫৮-য় এঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে পশ্চিম জার্মানী সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিল, খেলেছিলেন ওয়াল্টারও। বিয়াল্লিশে পড়লে কী হবে! ওয়াল্টার বেশ সতেজ ছিলেন। কিন্তু হারাবার্জারের আপত্তিতে তিনি খেললেন না।

১৯৪০-এর ১৪ জুলাইয়ের ঘটনা। হারবার্জার জার্মান জাতীয় দলে কুড়ি বছরের একটি ছেলেকে প্রথম সুযোগ দিলেন খেলায়। তাঁরই নাম ওয়াল্টার ফ্রিৎস। লেফট ইনে নতুন খেলোয়াড়টির যেমন নিখুঁত শট ও পাস, তেমনি ট্যাকটিসিয়ানও। নিজেদের ডিফেন্স থেকে বল ধরে এগিয়ে যান বিপক্ষের গোলমুখে। ফ্রাঙ্কফুর্টে সেদিন রোমানিয়া ২-৯ গোলে হারল জার্মানীর কাছে। এর মধ্যে ওয়াল্টারের দুটি, পরের খেলায় দিলেন তিনটি। ১৯৪১-এ রোমানিয়ার বিরুদ্ধে আরও তিনটি। ইতিমধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। ফুটবল ছেড়ে ওয়াল্টার যোগ দিলেন জার্মান ছত্রীবাহিনীতে। যুদ্ধ তাঁকে কোন্ ধারণার সৃষ্টি করেছিল কে জানে! পরবর্তীকালে ফুটবলে ফিরে তিনি বিমানে ম্যাচ খেলতে যেতে রাজি হতেন না।

যখন শান্তি ফিরল, ওয়াল্টার চলে গেলেন আবার তাঁর সেই একমাত্র ক্লাব কাইজার্সলটার্নে। সহোদর ওটমারের সঙ্গে খেলে ১৯৫১ ও ১৯৫৩-য় ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ন করলেন। জাতীয় দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড হলেন এই সময়েই এবং তা হারবার্জারের অনুরোধেই। ওয়াল্টারের প্রতি হারবার্জারের যেমন দুর্বলতা

ছিল, তেমন আর কারুর প্রতি দেখা যায়নি। কিন্তু হারবার্জার জানতেন দল ওয়াল্টারের কাছে কতটুকু পাবে এবং কতটুকু তাঁর দেওয়ারও সামর্থ্য আছে। ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে ওয়াল্টারের মধ্যে যখন স্নায়ুর চাপ পরিলক্ষিত হল, হারবার্জার অমনি রসিক হেলমুট রানকে তাঁর শয়নকক্ষে একত্রে থাকার ব্যবস্থা করলেন স্বাভাবিকতায় ফিরতে। ওয়াল্টারের জীবনের স্মরণীয় অধ্যায় ১৯৫৪-র বিশ্বকাপ। তবে জার্মানরা যখন বিশ্বকাপে খেলার জন্য সুইজারল্যাণ্ড রওনা হয়, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া তখন মোটেই ওয়াল্টার-ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুকূলে ছিল না। এর তিন সপ্তাহ আগে চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে তাঁদের ক্লাব কাইজার্সলটার্ন হ্যানোভারের কাছে ৬-১ গোলে হারে। আশ্চর্যের কথা, বিশ্বকাপ দলে তবুও কাইজার্সলটার্নের পাঁচজন নির্বাচিত হলেন, আর হ্যানোভার থেকে একজনও নয়।

সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে 'গৃহবিবাদ' অতি অল্প সময়েই মিটে যায়। ফ্রিৎস ওয়াল্টার সঞ্চিত ফুটবলের সব অভিজ্ঞতা উজাড় করে দিতে লাগলেন সুইজারল্যাণ্ডের মাঠে। উড়ন্ত রান ও শেফারকে বল পাস, মাঝে মাঝে বিপক্ষের পেনাল্টি-অঞ্চলে বিপদ সৃষ্টি ইত্যাদি জার্মান দলকে গোটা প্রতিযোগিতায় সেরা দলের আখ্যা দিল। তাঁর দল পরিচালনাও নিখুঁত। তাঁর নেতৃত্বে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে জার্মানী চমক দেখাল। অস্ট্রিয়াকে হারাল ৬-১ গোলে ও হাঙ্গেরির সঙ্গে ০-২ গোলে পিছিয়ে থেকেও ৩-২ গোলে জিতল। ওয়াল্টার দিলেন তিনটি গোল। একটি তুরস্কের বিরুদ্ধে, বাকি দুটি সেমিফাইনালে পেনাল্টি স্পট থেকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। ১৯৫৮ সালেও ওয়াল্টারকে গত বিশ্বকাপের মতই সক্রিয় দেখা যায়, যদিও এর আগের বছর (১৯৫৭) তিনি একটিও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি। এই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে সুইডিশ ডিফেণ্ডারের মারাত্মক ফাউলে যদি গুরুতর আহত না হতেন, তবে ফাইনালে সম্ভবত ব্রাজিলের মুখোমুখি হত পশ্চিম জার্মানী। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর ফুটবলে ফ্রিৎস ওয়াল্টার-যুগের অবসান ঘটে। জার্মান জাতীয় দলের পক্ষে ৬১টি ম্যাচে ৩৩টি গোল করেছেন। অনেকের ধারণা ছিল শেপ হারবার্জারের পরে জার্মান জাতীয় দলের দায়িত্ব তাঁরই উপর বর্তাবে। প্রস্তাবও আসে। কিন্তু তিনি দায়িত্ব এড়ান। পরিষ্কার জানিয়ে দেন, 'আমার স্নায়ু ম্যানেজারশিপের দায়িত্ব নেওয়ার মত শক্ত নয়।' তিনি ব্যবসাকে জীবিকা বেছে নেন। একখানি বইও লিখেছেন।

কোজিস স্যাণ্ডর—জন্ম ১৯২৯। পঞ্চাশের দশকের 'যাদুকর গোলদাতা' হাঙ্গেরির এই ইনসাইড ফরওয়ার্ড জাতীয় দলের পক্ষে ৭৫টি গোল করেছেন। এর ১১টিই ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে। বুদ্ধিদীপ্ত ও কুশলী কোজিসের সবচেয়ে বড় গুণ, খেলা একটু দেখলেই মেজাজ বুঝতে পারতেন। সমসাময়িককালে বিশ্ব-ফুটবলে গোলের সুযোগ গ্রহণে তাঁর মত খেলোয়াড় কদাচিৎ দেখা গেছে। তাঁর প্রতিটি খেলায় সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও নিখুঁত টেকনিক প্রকাশ পেয়েছে, দুটি পা-ই সমান চলত। লম্বা নন উচ্চতায়, তৎসত্ত্বেও লাফিয়ে অধিকাংশ গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে বল পাঠাতেন হেডে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ফুটবল বিশেষজ্ঞরা তাঁকে 'গ্রেটেস্ট হেডার' আখ্যা দিয়েছেন, জাতীয় দলের পক্ষে সাতটি হ্যাটট্রিক করে 'গোল্ডেন হেড' বলে পরিচিতি পেয়েছেন। এর চারটি গোল বিশ্বকাপের গ্রুপ ম্যাচে ১৯৫৪-তে পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে।

কোজিসের ফুটবল-জীবন হাঙ্গেরীর জনপ্রিয় ক্লাব বুদাপেস্টের ফেরেঙ্ক ভারোসে। ওঁর বাবা ছিলেন সেখানকার এক সরাইখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মী। এই সুবাদেই স্থানীয় ক্লাবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং ছেলেকেও তাই ওখানে পাঠান। শীর্ণকায় কোজিস বালক দল থেকে জুনিয়র দলের প্রথম টিমে এলেন ১৯৪৮-৪৯-এ ১৯ বছর বয়সে। ফরওয়ার্ডে তিনি পেলেন বুদাই, ডিক, মেসজারোস ও জিবরকে, আর ফেরেঙ্কভারোস ৩০টি ম্যাচে ১৪০টি গোল করে। তারা চ্যাম্পিয়ন হল ১১ পয়েন্টের ব্যবধানে। কোজিসের এটাই প্রথম খেলা। মরশুম শেষে কোজিস, বুদাই ও জিবর একত্রে গেলেন হনভেড দলে। সেনাবাহিনী দেশের সেরা সেরা খেলোয়াড় নিয়ে নতুন দল তৈরি করল। দলে আর এলেন পুসকাস, বোজসিক ও গ্রসিকস। স্বাভাবিকভাবেই হনভেডের দখলে উপর্যুপরি দেশের চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি যেতে থাকল। পরবর্তী সাত মরশুমের পাঁচবারই চ্যাম্পিয়ন হল হনভেড এবং গোলদাতাদের তালিকায় পুসকাসের মতই কোজিসও শীর্ষস্থান পেলেন। তিনবার তিনি সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন। ২৬টি ম্যাচে প্রতিটি মরশুমেই তিনি ৩০টির বেশি গোল করেন। ৩০টি ১৯৫১-য়, ৩৬টি ১৯৫২-য় ও ৩৩টি ১৯৫৪-য়।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনেও পুসকাসের মতই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল কোজিসের। কোজিস ৬৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন, আর পুসকাস ৮৪টি। কিন্তু কোজিসের গোলের ব্যবধান পুসকাস অপেক্ষা মাত্র আটটি কম ছিল। ১৯৫২-য় অলিম্পিক বিজয়ী হাঙ্গেরি দলে কোজিস ছিলেন। ১৯৫৩ ও ১৯৫৪-য়

যে হাঙ্গেরি নাস্তানাবুদ করে ইংল্যাণ্ডকে, তার দ্বিতীয় ম্যাচে কোজিসের অবদান দুটি গোল। কিন্তু তিনি খ্যাতির শীর্ষে উপনীত হন ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে। পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে পুসকাস আহত হয়ে বাইরে যাওয়ার পর থেকে দলের পুরো দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়, বিশেষ করে হাঙ্গেরির অ্যাটাকে। তিনি কোরিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি, জার্মানীর বিরুদ্ধে চারটি গোল করেন। কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের সঙ্গে 'বারণ এর যুদ্ধে' করলেন দুটি। তবুও তাঁর সেরা খেলা উরুগুয়ের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে। ২-০ এগিয়ে থাকার পর উরুগুয়ে ২-২ করে। তারপর অতিরিক্ত সময়ে কোজিসের কৃতিত্বেই হাঙ্গেরি ফাইনালে ওঠে।

১৯৫৬-র শেষদিকে হাঙ্গেরিতে যখন বিপ্লব শুরু হয়, কোজিস তখন হনভেডের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকা সফরে। কয়েকজন সতীর্থের সঙ্গে তিনিও দেশে না ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। শুরুতে সুইজারল্যাণ্ডের কিশোরদের কোচ হলেন, তারপর সপরিবারে স্পেনে গিয়ে বার্সিলোনায় যোগ দিলেন। তবে রিয়াল মাদ্রিদে পুসকাস যেমন সফল ছিলেন, কোজিস তেমনটি হতে পারলেন না। বার্সিলোনার পক্ষে দুটি লীগে চ্যাম্পিয়ন হলেন, দুটি কাপ প্রতিযোগিতায় হলেন বিজয়ী। তারপর ষাটের দশকে গেলেন ইউরোপ সফরে। ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনালে ৩-২ গোলে হারলেন বেনফিকার কাছে। দুটি গোলের একটি পুরনো সতীর্থ জিবরের, বাকিটি তাঁর। কিন্তু দুই দফার ফেয়ার্স কাপ ফাইনালে যে ৭-৩ গোলে ভ্যালেনসিয়ার কাছে বার্সিলোনা হারে তার তিনটিই কোজিসের। অবশ্য ১৯৫৮-৬০-এ তাঁরা ফেয়ার্স কাপ জিতেছিলেন এবং প্রথম দফার খেলায় তিনিও শরীক হন।

নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের জন্যই কোজিস হাঙ্গেরির প্রবীণ খেলোয়াড়দের স্নেহের পাত্র ছিলেন। পরবর্তী কালেও যে দেশে গেছেন, একই গুণে সেখানেও সকলের মন জয় করেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি যখন খেলায় সক্রিয় ভূমিকা থেকে অবসর নেন তখন তাঁর বিদায়-সংবর্ধনায় খেলা হয় বার্সিলোনা স্টেডিয়ামে হামবুর্গের বিরুদ্ধে। বার্সিলোনা স্টেডিয়াম ওদিন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। অবসরের পর শুরুতে সেলসম্যানের কাজ নেন। কিন্তু ফুটবলের সঙ্গে সম্পর্কহীন ওই কাজে তাঁর মন বসবে কেন? কয়েকটি ছোট ক্লাবে ফুটবল প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিলেন।

কলার মণ্টেরুবিও, এনরিক—জন্ম ১৯৩৪। স্পেনের এই লেফট উইঙ্গারের আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলার সংখ্যা আরও বাড়ত, যদি জেণ্টোর সঙ্গে তাঁর ফুটবল-জীবন সমসাময়িক না হত। কলার ১৯৫৪-য় মরশিয়া ছেড়ে আটলাটিকো মাদ্রিদে যোগ দেন। ষাটের দশকে তাদের হয়ে একটি লীগে জেতেন ও তিনটি কাপ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন। প্রথম আন্তর্জাতিক খেলেন ১৯৫৫-য়। স্পেনের জাতীয় দলে ২৩টি ম্যাচ খেলে ৬টি গোল দেন। সারাজীবন তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে জেণ্টোকে হটিয়ে জাতীয় দলে স্থান পেতে। বিশ্বকাপে স্পেনের শেষ গ্রুপ ম্যাচে রাইট উইং-এ খেলার (জেণ্টো লেফট উইং) সুযোগ পান। স্পেন ওই ম্যাচে হারে। কলার অবসর নেন ১৯৫৭-এর মরশুম শেষে। তাঁর শেষ ক্লাব ছিল ভ্যালেনসিয়া।

কস্টা পেরিরা আলবার্টো ডা—জন্ম ১৯২৯। পোর্তুগীজ জাতীয় দলের এই গোলরক্ষক ষাটের দশকে বেনফিকার ইউরোপীয় কাপ বিজয়ী দলে ছিলেন। কস্টা পেরিরার ফুটবল-জীবনের বিষাদময় ঘটনা বিশ্বকাপে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলায় বাদ পড়া। অথচ ওয়েমব্লিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ওই সেমিফাইনালে তাঁর মত শান্ত ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। কিন্তু তাঁর বদলে নামানো হল জোসে পেরিরাকে। জোসে যেভাবে সেদিন গোল খেলেন, তা কস্টার কল্পনাতীত ছিল।

জন্ম পোর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকায় নাকালায়। লিসবনের বেনফিকায় যোগ দেন ১৯৫৪-য় এবং এক যুগেরও বেশি এই দলের পয়লা নম্বর গোলরক্ষক রইলেন। বয়স যখন ত্রিশের কোঠায়, তখনও ২৪টি ম্যাচে নামেন। যেমন উচ্চতা, তেমনি সুদেহী। সর্বদাই ধূসর জার্সি পরে মাঠে নামতেন। খেলার সর্বক্ষণ অসম্ভব উদ্দীপনা নিয়ে খেলতেন। প্রতিবারই গোলরক্ষণে বোঝা যেত কস্টা পেরিরা জিমন্যাস্ট বৈ নন।

বেনফিকায় থাকাকালে সাতবার ওই ক্লাব লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়। ওদের সঙ্গে দলের প্রথম চারটি ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনালে ছিলেন।

বিশ্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপেও খেলেন। বেনফিকা ১৯৫৭-র ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনালে বার্সিলোনার বিরুদ্ধে যে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে, তাতে তাঁর অনবদ্য ক্রীড়াশৈলী স্মরণীয়। স্প্যানিশ দল ওই খেলায় অনবরত চাপ সৃষ্টি করে বেনফিকার ডিফেন্সে। তাঁর দারুণ প্রতিরোধে বার্সিলোনা সুবিধা করতে পারেনি। তারা সকলকে কাটিয়ে কেবলমাত্র কস্টা পেরিরাকে সামনে

পেয়েও তুটি গোল করতে পারেনি তাঁর দক্ষতায়। পরের বছর ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনাল খেলেন আমস্টার্ডামে রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে। ফেরেঙ্ক পুসকাসের বাঁ-পায়ের ম্যাজিকের মত শটে কস্টা পেরিরা তিনবার পরাস্ত হলেও বেনফিকা জেতে ৫-৩ গোলে। ওয়েমব্লিতে মিলানের জোসে আলতাফিনির তুটি শট তাঁকে পরাস্ত করে এবং বেনফিকা ইউরোপীয়ান কাপ থেকে বিদায় নেয়। আলতাফিনি সেদিন যে শট করেছিলেন, তা কোনো গোলরক্ষকই আটকাতে পারতেন না। কাপ ফাইনালে সান সিরোয় ইণ্টান্যাজোনেলের জেয়ারের শটে গোল হওয়ায় কস্টাকে দায়ী করা হয়, আনা হয় দেরীর অভিযোগ। আসলে কস্টা পেরিরা সেদিন অসুস্থ ছিলেন। তাঁর বদলে জার্মানোকে নামানো হয়। খেলার মাঝে প্রচণ্ড বৃষ্টি সত্ত্বেও খেলা হল, কিন্তু গোল-মুখ খেলার অযোগ্য হয়ে পড়ে। এর পরেই কস্টা পেরিরা বেনফিকার গোল থেকে অবসর নেন ও কোচ হন। কিন্তু আজও তাঁর মানের একজনও গোলরক্ষক পোর্তুগালে দেখা যায়নি।

ক্লডোয়াল্ডো—জন্ম ১৯৪৯। পুরো নাম ক্লডোয়াল্ডো ট্যাভারেস ডে সান্তানা। বিশ্বকাপে ব্রাজিলে দলে গার্সনের সঙ্গে মিড-ফিল্ডে দারুণ খেলেন। ব্রাজিলের ম্যানেজার মারিও জাগালো সত্তরের বিশ্বকাপে ক্লডোয়াল্ডোকে গোটা প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা খেলোয়াড় বলো অভিহিত করেন। তিনি প্রতিপক্ষের বল কেড়ে নিতেই শুধু সক্ষম ছিলেন না, প্রতিটি ম্যাচে দেখা গেছে তাঁর চমৎকার পাস এবং ব্রাজিলিয়ান ফরওয়ার্ডে তাঁর অদ্ভুত একক নৈপুণ্য। তাঁর ঠাণ্ডা মাথার খেলা এবং দৃঢ়তা দলের মনোবল বাড়ায়। সময় ও সুযোগ পেলেই বলের সদ্ব্যবহার করতেন। অকারণে বিপদের মুখে যেতেন না। কিন্তু প্রয়োজনে বিপক্ষকে কাটিয়ে দলকে বিপদ থেকে মুক্তি দিতেন।

জাতীয় দলে প্রথম সুযোগ পান ১৯৫৭ সালে। জোয়াও সালধানা ইংল্যাণ্ডে ব্রাজিল দল নিয়ে গেলেন প্রধানত স্যাণ্টোসের খেলোয়াড় নিয়ে। তবে জেয়ারজিনো, গার্সন ও টোস্টাওকে নিলেন শক্তি বৃদ্ধির জন্য। ক্লডোয়াল্ডো যে আহামরি খেললেন, তা নয়। তবে আবার নির্বাচনলাভের মতই নৈপুণ্য দেখান। শুরুতে ছিলেন স্যাণ্টোস জুনিয়র দলে, তারপর ১৭ বছর বয়সে সিনিয়রে। মাঝমাঠের 'মোটর' বলে পরিচিত জিটোর জায়গায় নিজেকে চালিত করে অসাধ্য সাধন করলেন। অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিকদের পক্ষে যে কাজ

অসাধ্য ছিল, ক্লডোয়াল্ডো সেই গুরুদায়িত্ব নিলেন। উপরন্তু স্যান্টোস তখন ৪-২-৪ প্রথায় খেলছে, যার মিড-ফিল্ডের খেলোয়াড়ের চাই অফুরন্ত নৈপুণ্য। এতৎসত্ত্বেও ক্লডোয়াল্ডো স্বল্পক্ষণের মধ্যেই মানিয়ে নিলেন এবং অভিজ্ঞদের মত উঁচুমানের খেলা দেখাতে থাকেন। ১৯৫৭ থেকে উপর্যুপরি তিনবছর স্যান্টোসকে সাওপাওলো লীগে চ্যাম্পিয়ন হতে সাহায্য করে তাঁর উঁচুমানের ক্রীড়া-নৈপুণ্য। দলের সঙ্কটে মুহূর্তে তাঁর খেলা বিশেষ সাহায্য করত। ব্রাজিলকে তিনি ১৯৫৭-এর বিশ্বকাপ ফাইনালেও কয়েকবার সঙ্কট থেকে মুক্ত করেন। মেক্সিকোর বিশ্বকাপে ক্লডোয়াল্ডো ও গার্সনের চমৎকার বোঝাপড়া দলের সাফল্যের সোপান তৈরি করে। একাধিকবার ভুল করলেও সম্ভবত গার্সনের সেরা ম্যাচ ছিল উরুগুয়ের সঙ্গে সেমিফাইনাল ও ইতালির বিরুদ্ধে ফাইনাল। সেমিফাইনালে গার্সন তাঁকে বল এগিয়ে দিলেন, তারপর ক্লডোয়াল্ডো ও টোস্টাওর মধ্যে বল আদান-প্রদান চলল। টোস্টাও শেষ পাসটি দিলেন ক্লডোয়াল্ডোকে। মাজুরকিউইজ পরাস্ত হওয়ায় ১-০ হল। ফাইনালে তাঁর ব্যাক হিল ফ্লিক বনিনসেগনা ধরে ইতালিকে ১-১ করলেন। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে নিজেকে সংশোধন করে পেলের মতই ড্রিবল করে ছুটতে লাগলেন। প্রতিপক্ষের পাঁচজনের প্রতিরোধ কাটিয়ে বল বাড়ালেন জোয়ারজিনোকে। জোয়ারজিনো দিলেন পেলেকে। সামান্যের জন্য বল কাছে রেখে পেলে গড়িয়ে পাঠালেন কার্লস আলবার্টোকে। তিনি শেষ কাজটি সমাপ্ত করলেন। শুরুর ভুলের সংশোধন করলেন দ্বিগুণভাবে।

কার্লস আলবার্টো—জন্ম ১৯৪৭। পুরোনাম কার্লস আলবার্টো টোরেস। রাইট ব্যাক, ১৯৫৭-এর বিশ্বকাপ বিজয়ী ব্রাজিলের অধিনায়ক। মেক্সিকোর গোটা প্রতিযোগিতায় দারুণ খেলেন। ফাইনালে ইতালির বিরুদ্ধে শেষ গোলটি তাঁরই। পেলের নিখুঁত পাস থেকে বল পেয়ে যেভাবে গোল করে-ছিলেন তা যেকোনো ফরওয়ার্ডের পক্ষে গর্বের। তাঁর এই গোলটি 'প্রেসিডেন্টের গোল' নামে খ্যাত। কেননা, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট এমিলিও গারাসতাজু মেডিসি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ফাইনালে ব্রাজিল ৪-১ গোলে জিতবে।

কার্লস আলবার্টো পেশাদার ফুটবল শুরু করেন রিও ডি জেনিরোর ফ্লুমিনেন্স ক্লাবের জুনিয়র দলে। দ্রুত নিজের কৃতিত্বে অ্যাটাকিং ফুলব্যাক হিসাবে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেন। সিনিয়র দলে স্থান পান। রিও লীগে বোটাফোগোর তিন বছরের কর্তৃত্ব খর্ব করে ১৯৫৭-তে প্রথম লীগ পদক পেল ফ্লুমিনেন্স।

আলবার্টোর চমৎকার খেলা ব্রাজিল ম্যানেজার ফিওলার দৃষ্টি কেড়ে নেয়। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ক্ষুদে বিশ্বকাপে ১৬ বছর বয়সী এই কার্লসকে ব্রাজিল দলে নির্বাচিত করলেন তিনি। কার্লস প্রথম ম্যাচেই থরহরি সৃষ্টি করলেন, তাঁর অ্যাটাকিং মুভগুলি ইংল্যাণ্ডের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করল এবং সহজেই তারা ৫-১ গোলে ইংল্যাণ্ডকে হারাল। কিন্তু পরের খেলায় আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে এই কার্লস আলবার্টো যেন হারিয়ে গেলেন। না বাধা দিলেন বিপক্ষকে, না বল নিয়ে এগোলেন। সারাক্ষণ জুবথুবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, আর্জেন্টিনা ৩-০ জিতল, ফলও হাতেনাতে মিলল। কার্লস বাদ পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে।
আবার তাঁর জাতীয় ফলে ডাক পড়লে ভীষণ লড়তে হল নির্বাচন লাভে।

এর আগে ১৯৫৭-তে আলবার্টো স্যাণ্টোসে চলে যান। স্যাণ্টোস তার কিছুদিনের মধ্যেই লীগ জিতল। তাই অনেকেই ধরে নিলেন, আলবার্টো যা খেলছেন হালফিলে, তা আগের কয়েকমাসের খেলার সঙ্গে অনেক তফাৎ; সুতরাং ১৯৫৭-র বিশ্বকাপ দলে আসার অনিশ্চয়তা কেটেছে। যাই হোক, স্যাণ্টোস তখন জয়ের পর জয়ে ভূষিত হচ্ছে। ১৯৫৭ থেকে লীগে হ্যাটট্রিক করল। এদিকে আলবার্টোরও বাড়ছে অভিজ্ঞতা ও কদর। হচ্ছে সুনাম। সব সময় মনে হয় এই বুঝি আলবার্টো বল ধরতে পারলেন না। কিন্তু অদ্ভুত-ভাবে প্রত্যেকটি বল এমনভাবে 'কাট্' করতেন যে ওটাই মনে হত। বল ঠেকানোয় তাঁর স্কিল ও তা নিয়ন্ত্রণের চমৎকারিত্ব তাঁকে তাঁর কালের অন্যতম সেরা ফুলব্যাকে পরিগণিত করে। ব্রাজিল জাতীয় দলেও দেখা গেছে কার্লসের খেলার যেমন পরিণতি, তেমনি অধিনায়ক হিসাবেও অত্যন্ত আত্ম-বিশ্বাসী। তাঁর সম্পর্কে একটাই সমালোচনা করা যায়—পাস দেওয়ার সময় মাঝে মাঝে তিনি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয়ে পড়তেন। কিন্তু একেও অতিক্রম করেন তিনি তাঁর দ্রুতগতি ও মুভমেণ্ট দ্বারা।

বোটাফোগোয় খেলতে যান সাময়িকভাবে, আর তখনই তাঁর হাঁটুতে ভীষণ আঘাত লাগে। এমন আহত হন যে, কার্টিলেজ সরিয়ে ফেলতে হল। তাই জুন ও জুলাইয়ে ব্রাজিলের পক্ষে খেলতে পারলেন না। আবার সুস্থ হয়ে স্যাণ্টোসে ফিরলেন এবং পুরনো সব নৈপুণ্যই দেখাতে থাকেন। ব্রাজিল দলে প্রবেশ এবার তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোরিন্থিয়ানসের ফুল ব্যাক জে মারিয়া। কিন্তু কার্লস আলবার্টোকে ম্লান করা মারিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে আবার তাঁকে ব্রাজিল দলে স্বমহিমায় দেখা গেল।

কাসনাক আঁদ্রেজ—জন্ম ১৯৩১। চেকোশ্লোভাক জাতীয় দলের পক্ষে ৪০টি ম্যাচে নেমেছেন। কলিস ক্লাব দলের এই মিড-ফিল্ড খেলোয়াড় স্পার্টা এ সি-তে যাওয়ার আগে শ্লোভাকিয়ার এক ছোট্ট শহরের মেয়র নির্বাচিত হন। কার্টিলেজ অস্ত্রোপচারের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে ১৯৫৭-র বিশ্বকাপ খেলেন। লম্বাটে চেহারার কাসনাকের বল কন্ট্রোলে সুনাম থাকলেও ধীরগতির জন্য জনপ্রিয় হতে পারেননি, অবশ্য এজন্য দায়ী ছিল তাঁর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোন। ১৯৫৭ সালে বেলজিয়ম রেসিং ক্লাবে পেশাদার ফুটবলের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন ১৯৫৭-এর বিশ্বকাপে কোয়ালিফাইং গ্রুপে খেলতে। হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে চেকরা জেতে ৪-১ গোলে। সাধারণত গোলের সুযোগ সৃষ্টিই তাঁর কাজ ছিল, তাই বলে কখনও গোল করতেন না, এমন নয়। স্পার্টার সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন লীগে। কিন্তু একটু বদমেজাজী থাকায় অনেক গোলের সহজ সুযোগ থেকে দলকে বঞ্চিত করেছেন। পাঁচ গজ দূর থেকেও গোলরক্ষককে পরাস্ত করতে না পারার ঘটনা তাঁর ক্রীড়া-জীবনে কম নয়। ১৯৫৭-এর বিশ্বকাপে ব্রাজিলের বিরুদ্ধেও পাঁচ গজ দূর থেকে গোল করতে পারেননি। পেনাল্টি-অঞ্চলের ঠিক বাইরের থেকে একই ভাবে দলকে কতবার বঞ্চিত করেছেন তার হিসাব কষে কাসনাক অনুতপ্ত হন।

কুবিল্লা লুই—জন্ম ১৯৪০। উরুগুয়ের বুদ্ধিদীপ্ত রাইট উইঙ্গার কুবিল্লা একক বিচক্ষণতায় বহুবার চমৎকার আক্রমণ রচনা দ্বারা খেলার গতি বদল করেছেন। কুবিল্লার খ্যাতি শুরু ষাটের দশকের প্রারম্ভে এবং ১০ বছর পরেও তা অব্যাহত থাকে। কয়েক বছর আগে তাঁর খেলা পড়ে গেলেও জনপ্রিয়তা কমেনি। ক্রীড়া-জীবনের অধিকাংশ সময় বিদেশে না কাটালে নিঃসন্দেহে কুবিল্লা উরুগুয়ের সর্বজনপ্রিয় হতেন, আন্তর্জাতিক ম্যাচে নামার রেকর্ডও করতেন।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে পেনারোলের সিনিয়র দলে খেলেন ও ওরা সালে বিশ্বক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়। এরও আগে জেতে দক্ষিণ আমেরিকান কাপ। বার্সিলোনা নিয়ে গেল কুবিল্লাকে। কিন্তু স্পেনে তিনি তেমন খেলা দেখাতে পারলেন না। ১৯৫৭-তে গেলেন আর্জেন্টিনার রিভার প্লেটে। কয়েকটি মরশুম সেখানে তিনি চমৎকার খেললেন আগের ফর্ম ফিরে পাওয়ায়। কিন্তু হঠাৎ রিভার প্লেটের চরম আর্থিক সংকট দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়দের

টাকার অঙ্ক কমাতে হল। রিভার প্লেটে সর্বাধিক অর্থপ্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন কুবিল্লা; তাঁরই টাকায় টান পড়ল বেশি পরিমাণে এবং ফিরলেন স্বদেশে। তবে এবার পুরোনো ক্লাব পেনারোলে নয়, তাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যাশিওনালে।

কুবিল্লা ব্যবসায়ে বেশি জড়িত হয়ে পড়ায় ফুটবল অনুশীলনে কিছুটা ভাঁটা পড়ে, তাই দেহের ওজন বাড়ে। তবে তাতে দেশের সেরা খেলোয়াড়ের মর্যাদাহানি হয়নি। ন্যাশিওনাল সর্বদা তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৯৭০-এর বিশ্বকাপে মেক্সিকোয় তিনি উরুগুয়ের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ছিলেন। পরের মরশুমে টাকা নিয়ে প্রায়ই ক্লাবের সঙ্গে গোলমাল হতে থাকে, তবে দল-বদলের গুজব কার্যকর হয়নি। তিনি ন্যাশিওনালেই রইলেন।

কুবিল্লাস টিওফিলো—জন্ম ১৯৫০। বিশ্বকাপে পেরুর চৌখস খেলোয়াড়। যেমন কার্যকর মিড-ফিল্ডে, তেমনি স্ট্রাইকাররূপেও। জন্ম-সূত্রেই যেন ফুটবলার। কৈশোরেই খেলা শুরু করেন আলিয়াঞ্জা লিমার প্রথম ডিভিশনে, ১৮ বছর বয়সে নির্বাচিত হন জাতীয় দলের জন্য। বিশ্ব-কাপের প্রাথমিক খেলাগুলিতে ছিলেন অন্যতম সেরা। পেরু অভূতপূর্ব খেলে চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত হয়। মেক্সিকোতেও কুবিল্লাস ও তাঁর সতীর্থরা দারুণ অ্যাটাকিং ফুটবল দেখিয়ে বিশেষজ্ঞদের হতচকিত করেন। চারটি ম্যাচে কুবিল্লাস পাঁচটি (তৃতীয় সর্বোচ্চ) গোল করেন। তাঁর খেলা বিশ্বের বিভিন্ন ক্লাব-কর্তার দৃষ্টি কেড়ে নেয়। অনেকেই বলতে থাকেন, 'এ হল দ্বিতীয় পেলে'। পেরু সরকার যখন জানলেন কুবিল্লাস বিদেশে চলে যেতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে তার বিরোধিতা করা হল। কিন্তু বেশিদিন তাঁকে আটকে রাখা গেল না। সুইজারল্যাণ্ডের চ্যাম্পিয়ন বাসেল দলে তিনি সই করলেন।

কুনা লাডিস্লাভ—জন্ম ১৯৪৭। চেক জাতীয় দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড কুনা শুরুতে ছিলেন 'উয়েফা' যুব আন্তর্জাতিক দলের ইনসাইড ফরওয়ার্ড। স্পার্টাক ট্রানভায় তাঁর সময়ের সেরা খেলোয়াড়। ইনসাইড ফরওয়ার্ড থেকে সেণ্টার ফরওয়ার্ডে গিয়ে সারা মাঠে বিচরণ করতেন। 'চেক ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' হন। বিশ্বকাপে দলের আক্রমণভাগের পুরোধা ছিলেন।

কিণ্ডভাল ওভ—জন্ম ১৯৪৩। সুইডেনের এই সেণ্টার ফরওয়ার্ডের বড়

গুণ বিদ্যুৎগতিতে বল নিয়ে যথার্থ পজিশন থেকে গোল করা। কিণ্ডভালের খেলা শুরু নরকপিং-এ। ১৯৫৭-তে তিনি লীগের পাঁচটি খেলায় লাইনের ধারে কাটান ড্রেস করেও। কিন্তু পরের মরশুমে নিজেকে দলের সবচেয়ে বিপজ্জনক সেণ্টার ফরওয়ার্ডে পরিণত করেন। জাতীয় দলে প্রথম নির্বাচিত হন ১৯৫৭-তে। শেষে দেখা গেল ৮৪টি ম্যাচে ৭০টি গোল করেছেন ক্লাবের পক্ষে; ১৯৫৭-তে ১৬টি খেলায় ২০টি গোল করলেও লীগে সর্বোচ্চ স্কোরারই রইলেন। এর পর ফেয়েনুর্ডে যোগ দিয়ে হল্যাণ্ডে সুনাম পেলেন। পাঁচ মরশুমে গোল করলেন ১২৬টি। লীগে গোলদাতাদের তালিকায় শীর্ষে রইলেন ১৯৬৮ (২৮টি) ও ১৯৫৭-এ (৩০টি) এবং ১৯৫৭ ও -এ চ্যাম্পিয়নশিপ পদক জিতলেন। তাঁর সেরা গোল ১৯৫৭-এ সানসিরোয় ইউরোপীয়ান কাপে। তাঁরা শুধু কাপ জিতলেন না, সেলটিকের বিরুদ্ধে কিণ্ডভালই জয়সূচক গোলটি দেন। অতিরিক্ত সময়ের বাকি মাত্র চার মিনিট। সেলটিকের গোলরক্ষক এগিয়ে আসতে কিণ্ডভাল লব করতেই গোল হয়। সেবার ইউরোপীয়ান কাপে ফেয়েনুর্ডের ২৪টির মধ্যে কিণ্ডভাল দেন ৬টি গোল। বিশ্ব-ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে এস্টুডিয়ান্টেসের সঙ্গে টাই ম্যাচে ফেয়েনুর্ড ৩-২ গড়ে জেতে তাঁরই একটি হেডার-এ।

কিণ্ডভাল স্বদেশে ফিরলেন, যোগ দিলেন নরকপিং-এ। কিন্তু আগের ফর্ম ছিল না। ১৪টি ম্যাচে মাত্র ৪টি গোল দিলেন। সুইস জাতীয় দলের পক্ষে তিনি ২৭টি ম্যাচে মোট গোল করেন ১৩টি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১৯৫৭-এ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গোল দুটি। এই জয়ই সুইডেনকে মেক্সিকো বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা এনে দেয়। এর পর তাঁকে সুইডেনের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত করা হয়। সুইডেনে এ সম্মান কিণ্ডভালের আগে পান মাত্র দুজন। একজন ত্রিশের দশকে স্বে রিয়েল, অপর খেলোয়াড় ১৯৫১-এ আগ্নে সিমোনসন।

কেলার টোরে—জন্ম ১৯৫০। লম্বা অথচ ছিপছিপে ইনসাইড ফরওয়ার্ড। সুইডিশ জাতীয় দলের দুর্দান্ত স্কিমার। খেলার শুরুতেই বুঝতে পারতেন গতি কোন্দিকে, বিপক্ষ দলের পরিকল্পনাই বা কি? নরকপিং-এর স্লিপনারের এই অধিনায়ক ১৯৩৮-এ লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব এনে দেন। বলাবাহুল্য, স্লিপনার আর কখনও লীগ জেতেনি। লীগে তাঁর স্কোর ১০০। ১৯২৪-১৯৩৮ পর্যন্ত ২৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে কেলার গোল দিয়েছেন ১৭টি। ১৯৩৮-এর

বিশ্বকাপে, সুইস দলের অধিনায়ক ছিলেন। কেলার আরও আন্তর্জাতিক ম্যাচের সুযোগ পেতেন, কিন্তু তাঁর 'বিদ্রোহী' আচরণ অনেককে ক্ষুব্ধ করেছিল।

কেলসি জ্যাক—জন্ম ১৯২৮। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত ওয়েলসের পয়লা নম্বর গোলরক্ষক। জাতীয় দলের পক্ষে ৪১টি ম্যাচে নেমেছেন, ১৯৫৫-য় অবশিষ্ট ইউরোপের বিরুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেন দলে খেলেন। ১৯৫২-৫৩-য় আর্সেনালে নিয়মিত খেলেন ও লীগ চ্যাম্পিয়নের পদকও পান। কিন্তু তাঁর এধরনের শেষ সম্মান এটি। ক্লাব ও জাতীয় দলের নড়বড়ে রক্ষণভাগের জন্য তাঁকে দুই পোস্টের মাঝে সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হয়েছে। লম্বা লম্বা হাত দিয়ে কেলসি সর্বদাই অসীম সাহস দেখাতেন, অত্যন্ত বিপজ্জনক বলও ধরতেন সহজেই। ১৯৫৮-য় সুইডেনের বিশ্বকাপে ওয়েলসের পক্ষে তিনি স্মরণীয় ম্যাচ খেলেন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ওয়েলস ভীষণ লড়াই করে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছায়। প্রত্যেকটি ম্যাচে কেলসির অসাধারণ গোলরক্ষাই এর মূলে ছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে পেলের দারুণ শটে কেলসি পরাস্ত হলে ব্রাজিল সেমিফাইনালে যায়। চার বছর পরে কেলসির ফুটবল-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ব্রাজিলের সঙ্গে খেলাতেই। ভাভার সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর পিঠে দারুণ আঘাত লাগে।

কোলেভ ইভান—জন্ম ১৯৩০। বালগেরিয়ার দ্রুতগামী ও কুশলী লেফট আউট। জাতীয় দলে শুধু ৭৫টি খেলার রেকর্ড নয়, ২৫টি গোলেরও রেকর্ডধারী। বেঁটে, কিন্তু সুদেহী। বাঁ পায়ে কোলেভের দুর্দান্ত মার সুবিদিত। ১৯৫৬-র ওলিম্পিকে রূপো জয়ী বালগেরীয় ফুটবল দলে ছিলেন। খেলেন বিশ্বকাপেও, সি এস কে এ-র পক্ষে ছয় শতাধিক ম্যাচ খেলেন, বহুবার অধিনায়কত্ব করেন, ১৩টি চ্যাম্পিয়ানশিপ পদক ছাড়াও নানা সম্মানের অধিকারী।

বালগেরীয় সামরিক বাহিনীর কর্নেল কোলেভ সি এস কে এ ছাড়েন ১৯৫৭-তে এবং দলের ট্রেনার হন। ম্যানেজার ছিলেন দ্বিতীয় ডিভিশনের জুসটেনডিল দলের। এই মরশুমের শেষে সোফিয়ায় ফিরে সি এস কে এ যুবদলের দায়িত্ব নেন।

কোপা, রেমণ্ড—জন্ম ১৯৩১। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপের দুর্দান্ত রাইট আউট ফ্রান্সের কোপা। গোটা প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড়দের অন্যতম।

পুরোনাম ছিল কোপাজেস্কি। তিনি সংক্ষিপ্ত করেন কোপা। বাবা পোলিশ—খনি মলিক, মা ফরাসী। জন্ম নোয়া-লে-মাইনসে। ফ্রান্সে অনেক প্রতিভাবান ফুটবলার দেখা গেছে, কিন্তু কেউই আজও কোপার মত হননি বা তাঁর সমকক্ষ নন। শৈশবে একটি খনি দুর্ঘটনা দেখে স্থির করেন, যেভাবেই হোক খনির ধারে কাছে থাকা চলবে না, এখান থেকে পালিয়ে যেতেই হবে। তাই কাছাকাছি অ্যাঙ্গার্স ক্লাবে যোগ দিলেন, সেখান থেকে রিমসে। শুরুতে ভীষণ ড্রিবলিং করতেন। বিদেশের সঙ্গে প্রথম বড় ম্যাচ ১৯৫৩-য় লে হার্ভে-তে। খেলা হয় ফ্রেঞ্চ এসপয়ার্স বনাম ইংল্যাণ্ড 'বি'। উইং-এ তাঁর চমৎকার খেলা ইংল্যাণ্ডের দুর্ভেদ্য ডিফেন্সকে ছত্রখান করে দেয় এবং ফ্রান্স জেতে ৭-১ গোলে। শেষ মুহূর্তে কোপাও একটি গোল করেছিলেন। কয়েকমাস পরে সিনিয়র জাতীয় দলের রাইট আউট নির্বাচিত হলেন।

হ্রস্বকায়, সুন্দর চেহারার কোপাকে আরও সুন্দর দেখাত চমৎকারভাবে যখন বল কণ্ট্রোল করতেন। এতই দ্রুত তাঁর গতি যে, বিপক্ষকে প্রতিমুহূর্তে বোকা বানিয়ে এগোতেন। রিমসের 'হিদেকুটি' নামে পরিচিত হন এই গুণের জন্য। মূলত তাঁরই কৃতিত্বে রিমস ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ন হয় ১৯৫৪-৫৫য়। এই ফল তাদের সর্বপ্রথম ইউরোপীয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা এনে দেয়, তারা ফাইনালেও ওঠে। ফাইনালে প্যারিসে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে ৪-৩ হারে রিমস। কোপার দুর্দান্ত খেলা রিয়ালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খেলার পরেই প্রস্তাব আসে রিয়াল কোপাকে কিনতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে রাজিও হলেন। এই সুবাদে দুই ক্লাবের পক্ষে উপর্যুপরি চারবার ইউরোপীয়ান কাপে খেলার সুযোগ পান। প্রথমবার তো রিমসের পক্ষে খেলেছেন। পরের তিন বছর রিয়াল মাদ্রিদে বিজয়ী দলে। কিন্তু সেণ্টার ফরওয়ার্ডে সুযোগ পেলেন না ডি স্টিফানো থাকায়। কোপাকে দেওয়া হল রাইট উইং-এ। এখানেও বেশ খেললেন, তবে আসল কোপাকে দেখা গেল না। ১৯৫৮-য় ফরাসী ফুটবল কর্তৃপক্ষ যখন বিশ্বকাপে খেলার আহ্বান জানালেন, তখনই তাঁকে সেণ্টার ফরওয়ার্ডে সুযোগ দেওয়া হয়। সুইডেনে বিশ্বকাপের খেলাগুলিতে কোপা নাইসের ইনসাইড ফরওয়ার্ড জাস্ট ফনটাইনের সঙ্গে অদ্ভুত সমন্বয় গড়ে তোলেন। ফনটাইন অগ্রভাগে দ্রুত দৌড়ে, তাব্র শক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা কোপার চমৎকার পাসগুলোকে কাজে লাগালেন এবং বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন ১৩টি গোল করে। ফ্রান্স তৃতীয় স্থান অধিকার করল। বিশেষজ্ঞরা বললেন, ফল আরও ভাল হত

যদি সেমিফাইনালে ব্রাজিলের সঙ্গে খেলার দিনে রবার্ট জংকোয়েত আহত না হতেন। ফ্রান্সের পক্ষে কোপা ১৯৫৪-র সুইজারল্যাণ্ড-বিশ্বকাপেও খেলেন রাইট উইং-এ। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ওখানে পেনাল্টি থেকে একটি গোল করেন। সুইডেনে তো প্রত্যেকটি ম্যাচে নামেন। বিশ্বকাপের পর আর একটি মরশুম রিয়াল দলে ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, ১৯৫৯-এর ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনালে রিয়াল হারাল কোপার পুরানো ক্লাব রিমসকে। রিমস এই খেলার পর রিয়ালকে অনুরোধ করে, তোমরা আমাদের কোপাকে ফিরিয়ে দাও, আমরা ওকে কিনে নেব। কোপা ফিরলেন। তাঁর আগেই ফনটাইনও এসেছিলেন রিমসে।

বিশ্বকাপ ছাড়াও কোপা ১৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে নামেন ফ্রান্সের পক্ষে। সব মিলিয়ে ফ্রান্স দলের হয়ে খেলেন ৪৫ বার। শেষ খেলা ১৯৫৭-র নভেম্বরে, প্যারিসে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে রাইট উইং-এ। ১৯৫৫-য় বেলফাস্টে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ছিলেন অবশিষ্ট ইউরোপীয় দলে। আট বছর পরে নির্বাচিত হন বিশ্ব একাদশে ওয়েমব্লিতে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে। কোপা ছাড়া আর কাউকে দুটি ম্যাচে নামানো হয়নি। ফ্রান্সে রিমসের পক্ষে চারটি চ্যাম্পিয়ানশিপ পদক জেতেন, স্পেনে রিয়ালের হয়ে দুটি। খেলা থেকে অবসর নিয়ে রিমসে তিনি ব্যবসা শুরু করেন।

কোয়ানি, লাজোস—জন্ম ১৯০৭। হাঙ্গেরির অন্যতম সেরা ফুলব্যাক। যেমন ছিল পজিশন জ্ঞান, তেমনি ধৈর্যসহকারে ট্যাকল করতেন। ফেরেঙ্ক ভারোস দলে প্রথম খেলা ১৯২৯-এ। তারপর আর বাদ দেওয়া যায়নি তাঁকে। এই ক্লাব ১৯৩১-৩২-এ কোনো পয়েন্ট না হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৩৩-এ কোয়ানি গুরুতর আহত হলে ফুটবল থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। সুস্থ হয়ে মাঠে নামলে তাঁর খেলার প্রভূত উন্নতি দেখা যায় এবং জাতীয় দলে নির্বাচিত হন। ১৯৩৮-এর বিশ্বকাপসহ ৪০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। বিশ্বকাপে সব ম্যাচে খেললেও ফাইনালে তাঁকে নামানো হয়নি।

কোয়েরনার ১, রবার্ট—জন্ম ১৯২৪। রাইট আউট বা রাইট ইনে অস্ট্রিয়ার অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। কোয়েরনার খেলার তুঙ্গে ছিলেন ১৯৫৪-র বিশ্বকাপের সময়। প্রতিটি ম্যাচে অস্ট্রিয়া দলে খেলেন এবং তারা তৃতীয় হয় বিশ্বকাপে। পরবর্তীকালে অস্ট্রীয় জাতীয় দলের কোচ হন, কয়েকবার র‍্যাপিড দলের ম্যানেজারও হয়েছিলেন।

কোয়েরনার ২, আলফ্রেড—জন্ম ১৯২৬, রবার্টের সহোদর। 'জাওয়ারা' ছদ্মনামে পরিচিত এই মিড-ফিল্ড খেলোয়াড় তাঁর কালে অষ্ট্রিয়ার ডি ষ্টিফানো নামে সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। দীর্ঘ ২১ বছর র‍্যাপিড ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮-এর ওলিম্পিকস ছাড়াও ১৯৫৪ ও ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে খেলেন। ৩৫টি পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক ম্যাচ ও ২৬টি 'বি' ম্যাচ খেলেছেন। আলফ্রেডের স্কোরার খ্যাতি না থাকলেও ১৯৫৪-র বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৭-৫ গোলে জয়লাভের দুটি গোল তাঁর।

খুর্তসিলাভা, মুর্তাজ—জন্ম ১৯৪৩। রুশ জাতীয় দলের অধিনায়ক ও দ্বিতীয় সেণ্টার ব্যাক খুর্তসিলাভার মত এমন উন্নতমানের খেলোয়াড় জর্জিয়ায় আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। ডায়নামো বিলিসি দলে প্রথম খেলা ; এর আগে ছিলেন ওদেরই যুব দলে। সিনিয়র দলের নেতৃত্ব দেননি শুধু, তারা সেই প্রথম লীগও জিতল। নিষ্ঠাবান ও চিন্তাশীল খুর্তসিলাভা জাতীয় দলের অধিনায়ক হন যখন তাঁর রক্ষণভাগের সতীর্থ চেস্তারনেভ কার্টিলেজের আঘাতের জন্য বাদ পড়েন। ইতিমধ্যে খুর্তাসিলাভা বিশ্বকাপসহ ৫০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেমেছেন। নেতৃত্ব পেয়ে মুখেই শুধু উৎসাহ দেন না, বল যোগানও দেন প্রত্যেককে। আবার প্রয়োজনে স্টপার থেকে ফরওয়ার্ডে চলে আসেন বিপক্ষকে বিপর্যস্ত করতে।

গনসালভেজ, নেস্টর—জন্ম ১৯৩৭। উরুগুয়ে জাতীয় দলের গনসালভেজ ওবদুলিও ভারেলার পদাঙ্ক অনুসরণকারী সেণ্টার হাফ। তিনি যখন অধিনায়ক, পেনারোল ক্লাব তখন (ষাটের দশকে) দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলে শীর্ষস্থানীয়। উরুগুয়েতে তাঁর সমকক্ষ অধিনায়ক আর কেউ হননি। পেনারোল ছিল তাঁর একমাত্র ক্লাব, গনসালভেজ শুধু তিনটি দক্ষিণ আমেরিকার কাপ জেতেননি, তাঁর কালে ক্লাব দুবার বিশ্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়ানশিপের পদক বিজয়ী হয়। তিনি ক্লাবকে ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৭-র মধ্যে ১০টি লীগ খেতাব পেতে সাহায্য করেন।

বিশ্বকাপে জাতীয় দলের পয়লা নম্বর সেণ্টার হাফ ছিলেন। ৩৪ বছর বয়সে যখন অবসর নেন, তখন দেখা গেল উরুগুয়ের পক্ষে ৫৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। দক্ষিণ আমেরিকান কাপে আজও তাঁর ৭৭টি খেলার রেকর্ড অম্লান।

এসব সংখ্যার দ্বারা গনসালভেজের গুণের বিচার অসম্ভব। তিনি যে ক্লাব ও জাতীয় দলের পক্ষে কত অপরিহার্য তা বোঝা যায় অবসরের আগের

দিন পর্যন্ত তাঁর খেলায়। শুরু থেকে শেষ তাঁর কৃতকার্যের কথা উরুগুয়ে ফুটবল-প্রেমীরা বহুকাল স্মরণ করবেন। ১৯৫৮-য় যখন তাঁকে তাঁর প্রদেশ থেকে দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার জন্য ডেকে আনা হয় তখনও তিনি প্রথম ডিভিশনে খেলেননি। তবুও দক্ষিণ আমেরিকায় নেমে প্রশংসা কুড়োলেন। গনসালভেজের সাফল্যের শুরু সেই থেকে। অবসরের পর হন পেনারোলের কোচ। সঙ্গে পেলেন প্রাক্তন সতীর্থ আলবার্টো স্পেনসারকে। উভয়ে একত্রে উরুগুয়েতে একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেরও মালিক।

গালেগো—জন্ম ১৯৪৪। আসল নামের সঙ্গে স্পেনের কঠোর পরিশ্রমী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেণ্টার হাফের কোনো মিল নেই। স্কুলের খাতায় তাঁর নাম ছিল ফ্রান্সিসকো ফার্নাণ্ডেজ রডরিগুয়েজ। গালেগো কৈশোরে ছিলেন সিভাইলে। ১৭ বছর বয়সে প্রমোশন হয় ওদের লীগ দলে। ১৯৬৫-তে বার্সিলোনা যাওয়ার আগে আন্তর্জাতিক 'বি' দলে নির্বাচিত হন। প্রথম আন্তর্জাতিক দলে খেলেন বিশ্বকাপে স্পেনের তিনটি ম্যাচেই। বদমেজাজের জন্য স্প্যানিশ ফুটবলের 'হিংস্র খেলোয়াড়' আখ্যায় আখ্যাত হন। বিশ্বকাপে কোয়ালিফাইং ম্যাচে বেলজিয়ামে গুরুতর ঘটনায় লিপ্ত হন। লেফট ব্যাক এলাডিওকে সঙ্গে নিয়ে রেফারিকে আক্রমণ করেন, লড়েন পুলিশের সঙ্গেও। এই খেলার পর থেকে সারা জীবনের জন্য বেলজিয়মে তাঁর খেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অবশ্য স্পেনীয় দূতের মধ্যস্থতায় দুই খেলোয়াড়কে ভর্ৎসনার পর শাস্তি মকুব করা হয়। বার্সিলোনার ম্যানেজার ভিক বাকিংহাম এরপর গালেগোকে অনেকটা শান্ত করেন, গালেগো আবার জাতীয় দলে নির্বাচিত হলেন, পুনরায় তাঁকে সেণ্টার হাফে দেখা গেল।

গেস্টিভো আলভারো—জন্ম ১৯০৭। মৃত্যু ১৯৫৭। ১৯২৮-এর ওলিম্পিক ফুটবলে বিজয়ী উরুগুয়ের লেফট হাফ আলভারো ১৯৩০-এ প্রথম বিশ্বকাপ বিজয়ী দলেও ছিলেন। সামরিক বাহিনীর এই অফিসার পরে পেনারোলের অধিনায়ক হন। উরুগুয়েতে এমন ফুটবলার তাঁর কালে দেখা যায়নি।

গ্যারিঞ্চা—জন্ম ১৯৩৩। পুরোনাম ম্যানোয়েল ফ্রান্সিসকো ডস স্যাণ্টোস। ১৯৫৮ ও ১৯৫৭-র বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সেরা ফুটবলার তথা 'স্টার অফ স্টারস'। অসাধারণ ক্রীড়া-নৈপুণ্য দ্বারা দর্শকদের স্তব্ধ করে রাখতেন গ্যারিঞ্চা। যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তেমনি নমনীয় দেহ। একটু গোলগাল দেখতে হলে কী হবে,

এমন 'ব্যালান্সড্' খেলোয়াড় কমই মেলে। নয়নাভিরাম তাঁর ড্রিবলিং স্টাইল, শটে দুরন্ত গতি, অদ্ভুত তাঁর বলকণ্ট্রোল। অতুলনীয় তাঁর ক্রসপাস। খেলায় নামলেই গ্যারিঞ্চা তাই সংবাদপত্রের শিরোনামা প্রতিদিন।

শৈশব থেকেই গ্যারিঞ্চার বাঁ-পায়ে খুঁত। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটলে বা দৌড়লেও ওঁকে ফুটবল থেকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। ১৪ বছর বয়সে স্থানীয় ক্লাব পাউ গ্রাণ্ডেতে শুধু রাইট ইন নয়, সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবেও খ্যাতিলাভ করেন। ১৭ বছর বয়সে সিনিয়র দলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ওই ক্লাবেই খেলেন। সিনিয়র দলে এসে ৭ নম্বর জার্সি পরে খেলা শুরু করেন। গ্যারিঞ্চার খেলা যেমন বিশ্ব-ফুটবলের কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি কাহিনী তাঁর নামের পিছনেও। কেউ কেউ বলেন, উইং-এ তিনি পাখির মত উড়ে চলতেন, তাই গ্যারিঞ্চা নাম হয়। কেননা, গ্যারিঞ্চা মানে পাখি। কিন্তু তা নয়, ম্যানোয়েল ফ্রান্সিসকোর নেশা ছিল ছোট ছোট পাখি শিকার। এই ছোট ছোট পাখি বা 'গ্যারিঞ্চিন্‌হাস' থেকে ফ্রান্সিসকোর নাম হয় গ্যারিঞ্চা।

১৯৫৩-য় গ্যারিঞ্চা বোটাফোগোর একটি ট্রায়ালে নামলেন এবং এমন কৃতিত্ব দেখালেন যে, দ্বিতীয় ট্রায়ালের জন্য মনোনীত হলেন। নিলটন স্যাণ্টোস সেদিন গ্যারিঞ্চাকে তক্কে তক্কে রাখেন। গ্যারিঞ্চা ওতে ভয় পাননি, বরং নিলটনকেই নাচালো গ্যারিঞ্চার নৈপুণ্য। পরের প্র্যাকটিসে গ্যারিঞ্চাকে সিনিয়র দলে দেখা গেল। কিন্তু লীগে প্রথম খেলায় তিনটি গোল করলেন বমসুসেসো-র বিরুদ্ধে। কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৫৭-য় দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রাজিল জাতীয় দলে নির্বাচিত হলেন গ্যারিঞ্চা। গ্যারিঞ্চা এই প্রতিযোগিতায় যদি তেমন খেলতে পারতেন তবে জাতীয় দলে তাঁর স্থান পাকা হত। কিন্তু কপালে যদি না থাকে শত সুযোগও বোধ হয় ভ্রূকুটি করে। গ্যারিঞ্চাকে বাদ দেওয়া হল এর পরেই। জাতীয় দলে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনি লেফট আউট হয়ে খেলছেন। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে খেলার জন্য সুইডেনে গেলেও প্রথম দুটি ম্যাচে তাঁকে নামানো হল না। দলের সকলেই তখন গ্যারিঞ্চার খেলা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তাঁরাই অনুরোধ করলেন পরবর্তী খেলায় রাশিয়ায় বিরুদ্ধে গ্যারিঞ্চাকে নামানো হোক। গ্যারিঞ্চাকে পেয়ে ব্রাজিলের খেলার আদল সম্পূর্ণ বদলে গেল। ব্রাজিল ২-০ গোলে জিতলই না শুধু, গোটা ম্যাচে সারাক্ষণ প্রাধান্য বজায় রাখে। প্রথম মিনিটে গ্যারিঞ্চা তীরবেগে ধেয়ে

যান রুশ-রক্ষণব্যূহে। সারাক্ষণ একইভাবে রাইট ফ্ল্যাঙ্কে রুশদের তছনছ করেন।

পরবর্তী খেলাগুলিতেও গ্যারিঞ্চার ফুটবল-যাদুতে দর্শকরা মুগ্ধ। বিপক্ষ দলগুলি সর্বশক্তি নিয়োগ করেও তাঁকে শান্ত রাখতে পারেননি। ফাইনালে গ্যারিঞ্চা আরও তুঙ্গে। ব্রাজিলের প্রথম দুটি গোলে তাঁরই অবদান সর্বাধিক। দু-দুবারই ভাভাকে সেণ্টার করার আগে তিনি বিপক্ষ ডিফেন্সকে অত্যন্ত দক্ষতার দ্বারা অতিক্রম করেন। দ্বিতীয়ার্ধে গ্যারিঞ্চার গতি স্তব্ধ করতে সুইডেন তাঁর কাছে দুজন প্রহরী নিয়োগ করে। ব্রাজিলের এতে আরও সুবিধা হয়।

এরপর বোটাফোগোর হাজার হাজার মানুষের ফুটবল-আদর্শ এই গ্যারিঞ্চাকে বিদেশের দলগুলিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বারংবার অনুরোধ আসতে থাকে। তাঁর সময়ে এই বোটাফোগোয় ছিলেন ডিডি, জাগালো, নিলটন স্যাণ্টোস ও আমারিল্ডো। এঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে বোটাফোগো রিও লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়। বিশ্বকাপে গ্যারিঞ্চার শেষ কীর্তি । পেলে আহত হওয়ার পর দলের সব দায়িত্ব বর্তায় গ্যারিঞ্চার স্কন্ধে, তিনি সারা মাঠে বিচরণ করতে থাকেন এবং প্রতিটি অ্যাঙ্গেল থেকে শটের পর শটে বিপক্ষকে বিপর্যস্ত করে তোলেন। কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ওদের সেণ্টার হাফ মরিস নরম্যানকে লাফিয়ে অতিক্রম করে হেডে প্রথম গোলটি দেন। পরের গোলের সুযোগ আসে পেনাল্টি-সীমানার বাইরের তাঁর ফ্রি-কিক্ থেকে। এত জোরে গ্যারিঞ্চা শট করলেন যে, স্প্রিংগেট বল ধরতে পারলেন না। রিবাউণ্ড থেকে ভাভা ২-০ করেন। ৩-০ হল তাঁর চমৎকার নৈপুণ্যে ও দারুণ শটে লেফট-ইন পজিশনে ৩০ গজ দূর থেকে। গোলরক্ষকের ধারণা ছিল, তাঁর উঁচু শট বারের উপর দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু বলটি হঠাৎ বেঁকে বাঁদিকের কোণ দিয়ে গোলে প্রবেশ করে। চিলির বিরুদ্ধে দিলেন দুটি গোল, চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর চমৎকার খেলা ব্রাজিলকে দ্বিতীয়বার বিশ্বজয়ের ট্রফি এনে দিল।

গ্যারিঞ্চা এরপর খ্যাতির শীর্ষে। এই বছরেই তাঁর পারিবারিক জীবনে দারুণ অশান্তি নেমে আসে। গ্যারিঞ্চা শুধু স্ত্রীকে নয়, আট মেয়েকেও পরিত্যাগ করে ঘর বাঁধলেন এক সংগীত-শিল্পীর সঙ্গে। তাঁর ডান পা গোলমাল করতে থাকে। হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পর বোঝা গেল ওখানকার হাড়গুলো টুক্রো টুকরো হয়ে আছে। প্ল্যাস্টিক ও রুপো দিয়ে

সংযোগ স্থান শক্ত করার চেষ্টা হল। এরপরেই বোটাফোগোর সঙ্গে টাকা নিয়ে মনোমালিন্য হতেই তিনি ট্রান্সফার নিলেন কোরিন্থিয়ানসে। ইতিমধ্যে বিশ্বকাপের খেলা এসে গেছে। কিন্তু ১৯৫৮ ও ১৯৫৭-র ফুটবল নায়ক তখন প্রায় অস্তাচলে। বালগেরিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর একটি সোয়ার্ভিং গোল অবশ্য দর্শকদের স্মৃতিকে রোমন্থন করেছিল। গ্যারিঞ্চা ১৯৫৭-এ নাম লেখালেন ওলারিয়ায়। এর মাঝে দল বদল করে যান কোরিন্থিয়ানস থেকে ফ্লেমেঙ্গো, বাঙ্গু ও পোর্তুগীজা স্যানটিস্টা-য়। কিন্তু কোনো দলেই তাঁর খেলা পুরোনো সতীর্থদের খুশি করতে পারেনি। একদার বিশ্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের খেলা তাঁদের বিমর্ষ করল।

গ্রসিকস গিউলা—জন্ম ১৯২৬। অসীম সাহসিকতার সঙ্গে গোলরক্ষার জন্য হাঙ্গেরির এই গ্রসিকসকে 'ম্যাজিক ম্যাগিয়ার্স' আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত ৮৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেমে প্রত্যেকটিতেই কৃতিত্বের ছাপ রাখেন। এই সময়ের মধ্যে হাঙ্গেরিতে তাঁকে বদল করার মত দ্বিতীয় কোনো গোলরক্ষকের আবির্ভাব ঘটেনি। গ্রসিকসের মধ্যে অ্যাথলীটের প্রতিটি গুণ নিহিত ছিল, তাঁর লাফ, দৌড় ও ঝাঁপিয়ে পড়া ইত্যাদিতে। পেনাল্টি-অঞ্চলে তিনি একাকীই লড়তেন এবং ওখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের ডিফেন্স কীভাবে বিপক্ষকে সামাল দেবে, সে নির্দেশ দিতেন। ঠিক কোন্ সময়ে গোল ছেড়ে এগিয়ে গেলে বিপদ ঘটবে না সে সম্পর্কে তাঁর অদ্ভুত ধারণা ছিল এবং আর একজন ব্যাকের ভূমিকা নিতেন; আর একারণেই তাঁকে বলা হত 'চতুর্থ ব্যাক'—গ্রসিকস।

তাঁর খেলা শুরু ডোরোঙ্গে এবং ওই দলের প্রথম ম্যাচ খেলেন ১৯৪৭-এ। ১৯৫০-এ গেলেন হনভেড 'আর্মি' দলে। ওখানেই মিলিত হন পুসকাস, বোজসিক, কোজিস ও বিশ্ববিখ্যাত অন্যান্য খেলোয়াড়ের সঙ্গে। ১৯৫২-র ওলিম্পিকসে চ্যাম্পিয়ন হাঙ্গেরি ফুটবল দলে ছিলেন, তারপর তিনটি বিশ্বকাপেও। অনেক গুরুত্বপূর্ণ খেলায় তাঁর অনবদ্য রক্ষণ-দৃঢ়তা খেলার মোড় ফিরিয়ে দেয়। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁর ব্যর্থতা নগণ্যই। তবে ১৯৫৪-র বিশ্বকাপ ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে ফাইনালে যে গোল তাঁকে পরাস্ত করে, সাধারণত অমন গোলে তিনি কাবু হতেন না।

আসলে ওই মরশুমটা গ্রসিকসের পড়তি খেলা চলছিল। কাস্টমসকে ফাঁকি দেওয়ায় তাঁর সাজা হয় এবং কিছুদিনের জন্য সাসপেণ্ড থাকায় খেলতে

নামতে পারেননি। এর পর গ্রসিকস চলে যান দ্বিতীয় ডিভিশনের তাতাবানিয়া দলে। তবে ১৯৫৩-য় হনভেডের আমন্ত্রণে তাদের সঙ্গে গেলেন দক্ষিণ আমেরিকা সফরে। এই সময়ে হাঙ্গেরিতে বিপ্লব হয়। গ্রসিকস ইউরোপে ফিরে ভিয়েনায় বসবাস শুরু করলেন, কিন্তু কয়েকমাস পরে মত বদল করে ফিরলেন স্বদেশে। ১৯৫৪-র বিশ্বকাপের কিছু পরে গ্রসিকসের ফুটবল-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটছিল যে অবস্থায়, সেখান থেকে আবার তিনি নতুন করে শুরু করলেন এবং আর এক দশক জাতীয় দলে প্রভুত্ব করার যোগ্যতা ফিরে পান। খেললেন ১৯৫৮ ও ১৯৫৭-র বিশ্বকাপেও। আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ গ্রহণের রেকর্ডে বোজসিকের পরেই তাঁর স্থান হল। অবসরের পরে একাধিক প্রথম ডিভিশন দলকে কোচ করেন, কুয়ায়েতেও গেলেন দুবছরের জন্য ফুটবল প্রশিক্ষণ দিতে।

গ্রিভস জিমি—জন্ম ১৯৪০। ইংল্যাণ্ডের ফুটবল-ইতিহাসে জিমি গ্রিভসের মত এমন 'আনন্দদায়ক' খেলোয়াড় বিরল। তাঁর গোল করার ক্ষমতা বা পদ্ধতি ফুটবলের কোনো প্রচলিত ধারা বা ব্যাকরণ মানেনি। তাই ফুটবলের বিতর্কিত চরিত্রের মানুষ এই গ্রিভস। ৫১৭টি লীগ ম্যাচে গোল করেন ৩৫৭টি। অর্থাৎ গ্রিভসের স্থান রাউলে ও ডিনের পরেই। গ্রিভস ইংল্যাণ্ডের জাতীয় দলের ৫৭টি খেলায় নেমে ৪৪টি গোল দেন। এক্ষেত্রে তাঁর স্থান দ্বিতীয়, প্রথম ববি চার্লটন গ্রিভসের দ্বিগুণ খেলে গোলগুলি করেন। এছাড়াও গ্রিভসের কাপ ম্যাচে একটি গোল আছে, এবং আরও অসামান্য গোল নানা প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক ম্যাচে। গ্রিভসের উচ্চতা ও ওজন সাধারণ হলেও উরুদুটি ঠিক কুস্তিগীরের মত। আর গতি বিদ্যুতের মত। তাঁর বল কণ্ট্রোল ইনসাইড ফরওয়ার্ডের মত নয়, দেখলেই সকলে ধরে নিতেন এ উইঙ্গার বৈ নয়। গ্রিভসের নানাগুণের উপরে ছিল গোল করার অপূর্ব ক্ষমতা। দুই পা সমানে চলত। আর লক্ষ্য সর্বদা গোলের দিকে এবং ওই লক্ষ্যে পৌছতেন যে কোনো পজিশন থেকে। সবচেয়ে বড় কথা প্রতিটি পজিশনই বিপক্ষের কাছে যেন একেবারেই অজানা থাকত। ফুটবল মাঠের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বা পরমুহূর্তে কী হবে এমন নির্ভুল জ্ঞান জিমি গ্রিভস ছাড়া আর কারুর মধ্যে আজও দেখা যায়নি। রিবাউণ্ড বা সতীর্থের মিস-কিকের জন্যও তিনি প্রস্তুত থাকতেন। অবশ্য আরও বহু খেলোয়াড়কে ভাগ্যবান মনে হয়েছে, তাঁরা হঠাৎ হঠাৎ গোল করেছেন। কিন্তু ঠিক সময়ে, ঠিক যথার্থ পজিশনে দাঁড়াবার ব্যাপারে গ্রিভসের জুড়ি

আজও নেই। পেনাল্টি-সীমানার মধ্যে গ্রিভস ছিলেন 'জিনিয়াস'। তাঁর সম্পর্কে এই একটি শব্দই ব্যবহার করতে হয়।

কৈশোরেই জিমি গ্রিভসের মধ্যে 'ফুটবল তারকা' হওয়ার আভাষ মিলেছিল। তখন তিনি পূর্ব লণ্ডন ও চেলসিতে। স্কাউট জিমি টমসন নিয়ে যান জিমিকে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে। ওখানে সিনিয়র দলে নির্বাচিত হলেন ১৭ বছর বয়সে। কয়েক মরশুমে ১৩৩টি খেলায় শত গোল পূর্ণ করে ইংল্যাণ্ড জাতীয় দলে নির্বাচন লাভ করলেন। চেলসিতে মরশুমে ১৫৭টি লীগ ম্যাচে গোল করেন ১২৪টি। শেষ মরশুমে ৪১টি গোলের রেকর্ড করলেন। পরের মরশুমে (১৯৫৭) দলবদল করে ৮০ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে গেলেন এ সি মিলান-এ।

কিন্তু সেখানে গিয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলেন না। অন্যান্য ব্রিটিশ ফুটবলারের মতই ইতালীয় ফুটবল আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে ফিরলেন লণ্ডনে। যোগ দিলেন স্পার্সে এক লক্ষ পাউণ্ডের বিনিময়ে। জিমি গ্রিভস কখনও চ্যাম্পিয়নশিপ পদক পাননি ওখানে। পরে টটেনহামের পক্ষে ৩২২টি লীগ ম্যাচে ২২০টি গোল করেন। টটেনহামের এফ এ কাপ বিজয়ে গ্রিভস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। পরের মরশুমে টটেনহাম জিতল কাপ উইনার্স কাপ। প্রথম ডিভিশনের খেলায় সেবার ৩৭টি গোল দিয়ে ক্লাবের রেকর্ড করলেন। আবার এফ এ কাপ জিতল। হোয়াইট হার্টলেনে গ্রিভসের খেলার শেষের দিকে মনে হত, ফুটবলে তাঁর যেন কিছুটা অনীহা। ফুটবলে আগে তাঁর যেমন অসম্ভব স্পৃহা ছিল, তাতে কিছুটা ঘাটতি দেখা দিল। ইতিমধ্যে বিশ্বকাপ দল থেকে তাঁকে বাদ রাখা হয়। এতে জিমি বেশ মুষড়ে পড়েন; তাঁর খেলা আরও আঘাত পেল। রামসে জিমিকে প্রাথমিক ভাবে বাদ রেখেছিলেন তাঁর 'শিন্' আহত থাকায়। অবশ্য বিশ্বকাপ শুরুর আগেই তাঁর আঘাত সেরে গিয়েছিল। ম্যানেজার আলফ রামসের বোধ হয় জিমি সম্পর্কে 'অ্যালার্জি' ছিল। তিনি ঘোষণা করলেন, জিমি গ্রিভস অপরিহার্য নয়। তবে তিনি স্বীকার করেন, 'ওর রেকর্ড বলে, দলে ওর অবশ্যই আসা উচিত।

সালে জিমি গ্রিভস দু লক্ষ পাউণ্ডের বিনিময়ে চলে গেলেন ওয়েস্ট-হামে, এবং ১৯৫৭-এর মরশুম শেষে ৩১ বছর বয়সে অবসরের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ফুটবল ছাড়লেন ব্যবসায়ে সুভবিষ্যৎ দেখে। হঠাৎ ফুটবল থেকে অবসর

নিয়ে তিনি লক্ষ লক্ষ ফুটবল-পাগলকে হতাশ করেন। কিন্তু বিপক্ষের ডিফেন্স ভেদ করে তাঁর তর-তর গতিতে শক্ত পায়ে এগিয়ে যাওয়া, গ্যালারি ও মাঠের প্রবল উত্তেজনার মধ্যেও মানস সরোবরের মত শান্ত থাকা এবং মুহুর্মুহুঃ গোলের সুযোগ করা ও বিদ্যুৎচমকের মত গোল দেওয়ার অসংখ্য ঘটনা দর্শকরা সহজে ভুলতে পারবেন কি ?

ঘিঘিয়া আলসাইডস এডগার্দো—জন্ম ১৯২৬। উরুগুয়ে জাতীয় দলের রাইট আউট ঘিঘিয়া ১৯৫০-এর বিশ্বকাপে শেষ ম্যাচে সমাপ্তির এগার মিনিট আগে জয়সূচক গোলটি করেন। উচ্ছোক্তা ব্রাজিল বঞ্চিত হল স্বদেশের মাটিতে বিজয়মালা পরা থেকে। ব্রাজিলের সব আশা ধূলিসাৎ হল ১-২ গোলে মারাকানা স্টেডিয়ামে হারায়। এর আগের ম্যাচগুলোয়ও দারুণ পরিশ্রমী ও বেগবান ঘিঘিয়া নিখুঁত ও ছোট ছোট সেণ্টারে বিপক্ষের ডিফেন্সকে বিপর্যস্ত করে তোলেন। শেষ ম্যাচে শিয়াফিনো ১-১ করেন ঘিঘিয়ার দৌড় ও চমৎকার সেণ্টার থেকেই। বিশ্বকাপের যে চারটি ম্যাচ খেলেন, তার প্রতিটিতেই একটি করে গোল দিয়েছিলেন।

ঘিঘিয়ার এই কৃতিত্ব ইতালির ফুটবল কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৯৫৪-য় ২৭ বছর বয়সে ঘিঘিয়া রোমায় যোগ দেন ও ১৯৫৭ পর্যন্ত ওখানে ছিলেন। ৩৪ বছরের সময় গেলেন ইতালির অন্যতম সেরা দল মিলানে। ঘিঘিয়ার সহায়তায় মিলান ১৯৫৭-তে হয় লীগ চ্যাম্পিয়ন। তারপর তিনি স্বদেশে ফিরলেন। সকলের ধারণা ছিল, ঘিঘিয়া এবার অবসর নেবেন। কিন্তু সব জল্পনা নির্মূল করে ডানবিয়ো-তে যোগ দিয়ে ১৯৫৭ পর্যন্ত খেলেন।

জন চার্লস—জন্ম ১৯৩১। ওয়েলসের চার্লসের মত এমন সুন্দর স্বাস্থ্যের ফুটবলার সচরাচর দেখা যায় না। তিনি যেমন প্রখর সেণ্টার হাফে, তেমনি সেণ্টার ফরওয়ার্ডেও। ইতালিতে পরিচিত হন 'ইল বুয়োঁ জায়গান্তে' বা 'জেণ্টল জায়াণ্ট' নামে।

জন চার্লসের দীর্ঘ জীবন অনেকটা স্ব-বিরোধী। ১৯৪৯-এ কৈশোরে খেলা শুরু লীডসে, খেলার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ ১৯৫৭-এ হেরেফোর্ডের প্লেয়ার-ম্যানেজার-রূপে। সারা জীবনে ঘন ঘন পজিশন বদল করেছেন। মূলত ডিফেন্সের খেলোয়াড় হয়েও অ্যাটাকে চলে গেছেন। আবার ফিরেছেন ডিফেন্সে। কখনও বা দেখা গেছে পেনাল্টি-কিকের জন্য যেন একমাত্র চার্লসই উপযুক্ত ব্যক্তি। আবার কখনও কখনও তাঁকে কিছুই করতে দেওয়া হত না। তিনি কখনও

গায়ের জোরের ফুটবল পছন্দ করতেন না। আর এ নিয়ে তাঁকে কম সমালোচনা শুনতে হয়নি। বেশ ভাল্ খেলোয়াড়রূপেই চার্লসের খ্যাতি ছিল, কিন্তু কেমন ভাল? হুগি গ্যালাছারের সর্বগুণের সমাহার তাঁর মধ্যে ছিল কি? ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ফুটবলার ইভান শার্প ৫০ বছর ফুটবল দেখার অভিজ্ঞতা থেকে জানান, নয় নম্বর হিসাবে নিজের কালে চার্লস সকলের সেরা, তবে চার্লসকে গ্যালাছারের পরে স্থান দেন। কিন্তু লটন বা ডিনের আগে রাখেন চার্লসকে। শার্প আরও স্পষ্ট করে জানান, চার্লস হয়ত একটু স্বল্প গুণসম্পন্ন, কিন্তু অন্যরাও চাইতেন চার্লস একটু খারাপ খেলুক। তা না হলে ওর সঙ্গে পেরে ওঠা দায় ছিল।

ইতালিতে চার্লস সকলের শ্রদ্ধাভাজন হন ঠাণ্ডা মেজাজ ও ক্রীড়া-কুশলতার জন্য। ওদেশের উত্তেজনাপূর্ণ ফুটবল আবহাওয়াতেও তাঁর খেলোয়াড়ী মনোভাব দর্শকদের মুগ্ধ করে প্রতিটি ম্যাচে। জুভেন্টাসে থাকাকালে তুরিণকে তিনবার চ্যাম্পিয়নশিপ প্রাপ্তিতে সাহায্য করেন। তারা ইতালিয়ান কাপ জেতে দুবার। ইতালিতে প্রতিপক্ষের প্রবল রক্ষণব্যূহ ভেদ করেও একশ'টির কাছাকাছি গোল দেন। রিয়াল মাদ্রিদকে তাদের নিজ মাঠে ইউরোপীয়ান কাপের খেলায় যারা প্রথম হারায়, চার্লস সেই দলেও ছিলেন। এই জুভেন্টাসই একটি ব্রিটিশ ক্লাবকে (লিডস) সবচেয়ে বেশি ট্রান্সফার ফি—৬৫ হাজার পাউণ্ড দিয়ে চার্লসকে নিয়ে যায়। তাঁর আগে আর কোনো ব্রিটিশ খেলোয়াড় ইতালিতে যাননি। আর এই প্রথম ব্রিটিশ খেলোয়াড় ইতালিতে অসাধারণ সফল হলেন।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে জাতীয় দল ওয়েলসের হয়ে খেলেন। ওদেশের ফুটবল ইতিহাসে এত কম বয়সে আর কেউ জাতীয় দলে নির্বাচিত হননি। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপসহ জাতীয় দলের পক্ষে ৩৮টি ম্যাচ খেলেন। ইতালিতে চলে গেলেও একাধিকবার অনুরোধ যায় ওয়েলসের পক্ষে খেলার জন্য, কিন্তু চার্লসের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। শুরুতে সেণ্টার হাফে ছিলেন, তারপর ফ্রাঙ্ক বাক্লের কঠোর প্রশিক্ষণে বড় হয়ে এগিয়ে যান অ্যাটাকিং লাইনে। ১৯৫৩-৫৪-য় ক্লাবে রেকর্ড হল ৪২টি গোল করায়। ১৯৫৫-৫৬ দিলেন ৩০টি এবং লিডস ইউনাইটেড প্রমোশন পেল প্রথম ডিভিশনে। ১৯৫৬-৫৭য় তাঁর ৩৮টি গোল প্রথম ডিভিশনের গোলদাতাদের তালিকার শীর্ষে স্থান পেল।

১৯৫৭-তে লিডস দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যাওয়ায় চার্লসকে ইতালি থেকে

কিনে আনল। কিন্তু ইয়র্কশায়ারে তাঁর মন টিকল না, ফিরলেন ইতালিতে। এবার রোমায়, তারাও লিডসকে ৬৫ হাজার পাউণ্ড ট্রান্সফার ফি দিল। ইতালির ফুটবলে তাঁর দর বেড়েই চলল। ৩২ বছর বয়সে ফিরলেন স্বদেশে; প্রথম শ্রেণীর খেলা শেষ করলেন কার্ডিফের সঙ্গে। ইতিমধ্যে চার্লসের খেলা পড়ে গেল, ঘাটতি দেখা যায় দৌড়ে। কিন্তু তাঁর বল কণ্ট্রোল ও অন্যান্য কৌশলে ভাঁটা পড়েনি। ৬ ফুট ২ ইঞ্চি ও ১৪ স্টোনের এই চার্লস তখনও অপরাজেয়। দিনের পর দিন গোল করতে থাকেন হেডে। তাঁর চমৎকার পাস, জোরালো শট তখনও বিপক্ষের বিপদের কারণ।

শারীরিক গঠন, ক্রীড়াশৈলী এবং মাঠে অদ্ভুতভাবে শান্ত থাকা—এই সব মিলিয়ে চার্লসকে খাঁটি খেলোয়াড় বলা হত। প্রত্যেকের প্রতি সদয় এবং চার্লসের ব্যক্তিত্বও সকলের হৃদয় জয় করে নেয়। তবুও চার্লস কদাচিৎ সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছেন। খেলার মাঠে তাঁর পতন দ্রুত হলেও যথার্থ ছিল। তিনি তো বহুদিন খেলেছেন। ইতালিতে গিয়েই তাঁর ফুটবল খ্যাতি তুঙ্গে ওঠে। হেরেফোর্ডে কিছুদিন খেলার পর অনুরোধ সত্ত্বেও পুরো সময়ের ম্যানেজার হননি, ও ধরনের কাজে আত্মনিয়োগের মত মেজাজ না থাকায়। শুরুতে করতেন ব্যবসা, তারপর চলে যান গাঁয়ে স্বনসিতে, জন্মস্থানের কাছাকাছি। ঘর-সংসারের দিকে নজর দিলেন। বেশি নজর চার ছেলের খেলার দিকে। ওদের একজন স্কুল-ছাত্রদের আন্তর্জাতিক রাগবিতে খেলে এসেছে।

জঁকোয়েত রবার্ট—জন্ম ১৯২৫। জঁকোয়েত তাঁর সমসাময়িক কালে ফ্রান্সের অন্যতম কুশলী সেণ্টার হাফ, সম্ভবত ফ্রান্সে তখন তিনি অদ্বিতীয়। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে তাঁর খেলা সমবেত দর্শকদের চমৎকৃত করে। ব্রাজিল জিতল ৫-২ গোলে। কিন্তু জঁকোয়েত থাকলে হয়ত অন্য ঘটনা ঘটত।

প্যারিসের নাগরিক জঁকোয়েতের রাইম-এর খেলা শুরু ১৯৪২-এ ১৭ বছর বয়সে। ৫৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের প্রথমটি ইতালির বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালের ৪ এপ্রিল প্যারিসে। ইতালি জিতল ৩-১ গোলে। জঁকোয়েত বাদ পড়েন এর পরে এক বছরের জন্য। দ্বিতীয় খেলা রটারডামে হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে, এবারও পরাজয় ৪-১ গোলে, এবং খেললেন একই পজিশনে সেণ্টার হাফে। জঁকোয়েতকে তারপর নামানো হয় স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে। দুটিতেই

হার হল ফ্রান্সের। এই সময় তিনি সর্দিতে আক্রান্ত হন এবং আন্তর্জাতিক ম্যাচে নামার জন্য ১৯৫১-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। আর সেবারই প্রথম জিতল জঁকোয়েতের ফ্রান্স ২-১ গোলে, ম্যাচ ছিল যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে প্যারিসে। লুসানে ১৯৫৮-র বিশ্বকাপের খেলায় জঁকোয়েতের উপর নেতৃত্ব বর্তায়, কিন্তু মেক্সিকোয় দ্বিতীয় ম্যাচে তিনি খেলতে পারেননি।

তাঁর ফুটবল টেকনিক ফরাসীরা শুধু নয়, অন্যরাও বহুকাল মনে রাখবেন, বিশেষত শূন্যের বলকে অসাধারণভাবে কাজে লাগানোয়। ১৯৫৫-য় বেলফাস্টে অবশিষ্ট ইউরোপীয় দলে নির্বাচিত হন। ব্রিটেনকে এই দল ৪-১ গোলে হারায়। রাইম দলেও ছিলেন ১৯৫৬-য়। সেবার প্রথম ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে রাইম সামান্যের জন্য হারে। জঁকোয়েতের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ ১৯৬০-এ। মার্সাইয়ে ইউরোপীয়ান নেশনস্ কাপে ফ্রান্স ২-০ গোলে হারে চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায়। ১৯৬০ পর্যন্ত তিনি রাইমেই ছিলেন। তারপর স্ট্রাসবরগের ম্যানেজার হন। রাইম থেকেও অনুরূপ অনুরোধ আসে, কিন্তু পুরনো সতীর্থ রেমণ্ড কোপার সঙ্গে মতদ্বৈধতার জন্য ম্যানেজারশিপ নেননি।

জর্জ বেস্ট—জন্ম ১৯৪৬। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের জর্জ বেস্ট শুধু উইঙ্গার বা স্ট্রাইকার নন, অন্যতম সেরা স্কিমার। ফুটবল যেন তাঁর রক্তে, ফুটবলে যেন তাঁর জন্মগত অধিকার। তাঁর কালের সর্বাধিক জনপ্রিয় যেমন, তেমনি সর্বাধিক সমালোচিত ফুটবলার তিনি। খবরের কাগজে দিনের পর দিন তিনি এত খবর হতেন যে, ইংল্যাণ্ডের এক সংবাদপত্রের গ্রন্থাগারে তাঁকে নিয়ে দুই ডজনেরও বেশি বড় খাম ভরে যায় তাঁরই সম্পর্কিত কাটিংসে।

বেস্টের কী দৌড়, কী হাঁটা সব কিছুতেই যেন বৈশিষ্ট্য, আবার সব কিছুই সমালোচকদের খোরাক। কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন: মুগ্ধ হওয়ার মত, হতবাক করে দেওয়ার মত এমন ফুটবল-প্রতিভা কমই মেলে। অসাধারণ ক্রীড়শৈলী তাঁকে কিংবদন্তীতে পরিণত করে কয়েক বছরের মধ্যেই। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ভোটাভুটির প্রশ্ন উঠতেই বিরোধিতা হয়, জর্জ বেস্ট ইজ অলওয়েজ অ্যাট হিজ বেস্ট, ওকে নিয়ে ভোটাভুটির কোনো প্রয়োজন আছে কি? এ প্রশ্ন বেস্ট নিজেও তোলেন।

বেস্ট যখন ২৬ বছর বয়সেই ফুটবল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন, কিছু লেখক তখন বিস্মিত হন। আবার তিন সপ্তাহ পরে যখন তিনি

মত বদল করেন, তাতেও সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি অবাক হয়েছিলেন। কেননা, জনসাধারণ জর্জ বেস্ট সম্পর্কে অবাক হওয়ার মত মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছিলেন ইতিপূর্বে তাঁর ঘন ঘন অদ্ভুত আচরণ দ্বারা।

বেস্ট ফিরে এলেন স্বল্প কালের জন্যই। কিন্তু সেই প্রত্যাবর্তন যেন হল ফুটবলের প্রতি তাঁর অসম্ভব ক্ষিধে, যা ইতিপূর্বে তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। যাঁরা জর্জ বেস্টকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন, যাঁরা তাঁকে ঘিরে হৈচৈ করতেন তাঁদের ধারণা হয়েছিল, বেস্টের প্রতি সুব্যবহার করা হয়নি। বেস্ট মাঠে ফিরে এলেন আর্থিক লাভের জন্য। আগেই জানিয়েছি, তা অল্প সময়ের জন্য। ডিসেম্বরে আবার তিনি অদৃশ্য হলেন। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তখন বেশ সংকটে। তারা প্রথম ডিভিশন লীগের সর্বনিম্নে, আর এই সময়ে বেস্ট আবার 'অবসর' নিলেন। এবার আর তাঁর প্রতি সহানুভূতি জানালেন না তেমন কেউ। বরং বেশির ভাগ লোক দুঃখ প্রকাশ করলেন বরখাস্ত ম্যানেজার ফ্রাঙ্ক ও' ফারেল ও তাঁর সহকারীদের জন্য। সহানুভূতি দেখালেন, যাঁরা ক্লাবকে অবনমন থেকে অব্যাহতির জন্য সংগ্রাম করছিলেন।

সন্দেহ নেই ব্যক্তিগতভাবে বেস্ট সম্পর্কে অনেক কিছু বলার ছিল, অনেক সমালোচনাও হয়েছে তাঁকে নিয়ে। কিন্তু তাঁর ফুটবল-জীবন নিয়ে সামান্যই বলেছেন সমালোচকরা, বলারও ছিল না তেমন কিছু। সন্দেহ নেই বেস্ট মাঝে মাঝে সতীর্থদের অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে দেখতেন। বলতেন, ওরা আর এমন কি! দল যা খেলছে তা তো আমার জন্যই। সব সাফল্যের মূলে এই আমি। আর বলতেন, বল তো আমার সম্পত্তি, বিরুদ্ধ পক্ষের ওই জিনিসটি দখল করার কোন অধিকার নেই। নিজের সম্পর্কে বেস্টের এই অহংকারের যথেষ্ট হেতু ছিল। মাঠে নেমে যখন তিনি মনে করতেন—বল তাঁর দখলেই থাকবে, তিনি তা করতে পারতেন। বল নিয়ে এমন যাদু, এমন ক্ষমতা কদাচিৎ দেখা গেছে।

১৭ বছর বয়সে বেস্ট ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দেন, অনেক পরে বেলফাস্টে চলে গিয়ে মন খারাপ হওয়ায় আবার ফেরেন ইউনাইটেডে। আসলে এই ক্লাবের জন্য সর্বদাই তাঁর মন কেমন করত, সব সময়ে কেমন যেন দুর্বলতা ছিল। ক্লাবও তাঁর উপর অগাধ আস্থা রাখত। বল নিয়ে তাঁর অপূর্ব দক্ষতা তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে। এই বল নিয়েই বেস্ট বিপক্ষের যেকোনো ডিফেন্সকে চুরমার করে ফেলতেন। অবশ্য এজন্য তাঁর নানা গুণ

ছিল। তাঁর স্পিড, তাঁর প্রচণ্ড শট এবং সতীর্থদের পাসকে গোলে রূপান্তরিত করার অপূর্ব দক্ষতা তাঁকে ১৯৫৭ -তে প্রথম ডিভিশনে যুগ্মভাগে শীর্ষ গোলদাতার সম্মান দেয় (২৮টি গোল)। জর্জ বেস্টের অসীম সাহসিকতাই বিপক্ষের অকুতোভয়দের সঙ্গে সংগ্রামের মানসিকতা গড়ে দিয়েছিল। ফুটবলে এই সাহসিকতায় প্রয়োজন যে সর্বাধিক, তা তখনকার সমালোচকরা একবাক্যে স্বীকার করেন। সাধারণত গোল-মুখের জটলায় গোল হয় কমই, কিংবা তখন কে গোল করবে তা নিয়ে নিশ্চয়তা থাকে না। কিন্তু বেস্টের ভাগ্য এ ব্যাপারে সর্বদাই সুপ্রসন্ন ছিল।

প্রথম ডিভিশন লীগে প্রথম মরশুমেই বেস্ট উত্তর আয়ারল্যাণ্ড দলে মনোনীত হন এবং ১৯৫৭-র এপ্রিলে ওয়েলসের বিরুদ্ধে মাঠে নামেন। তখনও বেস্টের অষ্টাদশ জন্ম-দিবসের একমাস বাকি। তাঁর ২১ বছরে পূর্তির মধ্যে দুবার ইউনাইটেড লীগ চ্যাম্পিয়নের পদক পেল। ১৯৫৭-তে তিনি ম্যানেজার ম্যাট বুসবির আশা বাস্তবায়িত করলেন ইউরোপীয়ান কাপ জিতে। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধে একক প্রচেষ্টায় গোল করে বেস্ট ওই সাফল্য এনে দেন। একথা সত্যি, বেস্ট হয়ত একক প্রচেষ্টায় ওই গোলটি করতে পারতেন না। কিন্তু ৪০ গজ দূর থেকে তিনি যেভাবে বল নিয়ে এগিয়ে যান ওইভাবে এগিয়ে গোল করা আর কারুর পক্ষে সেদিন সম্ভব ছিল না। আর স্বাভাবিকভাবেই জর্জ বেস্ট হলেন 'ইউরেপীয়ান ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার'। হলেন স্বদেশেরও 'সেরা ফুটবলার'।

জর্জ বেস্ট তরুণ ও কিশোরদের কাছে হিরো এবং তাদের ফুটবল দেবতা হলেও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারে বারে গণ্ডগোল সুদৃষ্টান্তের পরিচায়ক ছিল না। রেফারির সঙ্গে তর্কাতর্কি তো তাঁকে তিনবার মাঠ থেকে বার করে দেয়। কিন্তু এমন অবিচল খেলোয়াড় কদাচিৎ দেখা গেছে, আর সম্পূর্ণ সুস্থ না থেকে ক্লাব বা দেশের পক্ষে অনায়াসে খেলেছেন। ম্যাট বুসবি তাই বলতেন : ও আমার সোনার ছেলে। জর্জ এক পায়ে যা খেলে, অন্যরা দুই পা সর্বদা সচল ও সক্রিয় রেখেও তা পারে না। কিন্তু আইরিশদের দুর্ভাগ্য, এই খেলোয়াড়কে ঘিরে অনেক সময় সমালোচনার ঝড় উঠেছে, আর তিনিও ক্ষণে ক্ষণে মাঠ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন।

৩৩০। লীগের এই খেলাগুলিতে গোল করেন ১৩১টি। শেষ পাঁচ মরশুমে ছিলেন ইউনাইটেডের সর্বোচ্চ গোলদাতা। আক্রমণভাগে তখন তাঁর সমতুল্য ছিলেন আরও দুজন 'ইউরোপীয়ান ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার'—ববি চার্লটন ও ডেনিস ল। জর্জ বেস্ট জাতীয় দলের পক্ষে ৩০টি ম্যাচে গোল দেন ৯টি। শুরু থেকে শেষ ছিলেন উত্তর আয়ারল্যাণ্ড জাতীয় দলের অবশ্যদের তালিকায়। কিন্তু আহত থাকায় বা ক্লাবের স্বার্থে ১১টি আন্তর্জতিক ম্যাচ থেকে বঞ্চিত হন। মরশুমে ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে খাটো করেন অবসরের অজুহাতে।

জর্জ বেস্ট যে রকম অসাধারণ খেলতেন এবং যেভাবে তিনি ফুটবলের 'দেবতা' বনে গিয়েছিলেন, যেভাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়েছিল, শান্ত থেকে তা বজায় রাখলে তিনি সবচেয়ে দামী ফুটবলার হতে পারতেন। সমগ্র ব্রিটেনের ফুটবল-পাগলদের কাছে সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান পেতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর উগ্র মেজাজ ওই সম্মান থেকে বঞ্চিত করে।

জর্জ বেস্ট কিন্তু ফটোগ্রাফারদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। ওঁরা বলতেন, বেস্টের কোনো ছবিই খারাপ হয় না। তা সেটি অ্যাকশান ছবিই হোক, হোক না চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার ছবি—সব কটিই ক্যামেরা-ম্যানদের চিন্তাতীত ছিল। জর্জ বেস্ট তাই ব্রিটেনের সংবাদপত্র, টেলিভিশন ইত্যাদির ছবির অন্যতম 'সাবজেক্ট' ছিলেন। তাঁকে ঘিরে ব্রিটেনের পুরুষদের ফ্যাশন তৈরি হত। বল নিয়ে দ্রুত দৌড়ানো, গোল করা ইত্যাদি ঘটনা দর্শকদের মন থেকে দ্রুত মুছে যাবে না। তা তিনি মাঠে বা মাঠের বাইরে যত 'দুর্ব্যবহারই' করে থাকুন না। তিনি তাঁর প্রতিভা, দ্বারা দীর্ঘকাল বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলাররূপে পরিগণিত হবেন। ফুটবল দ্বারা লক্ষ লক্ষ দর্শককে যে আনন্দ দিয়েছেন তিনি, তাই-ই জর্জ বেস্টকে সব দোষ ঢেকে রাখবে, সকলেই তাঁর খেলার গুণের জন্য শত অন্যায়কেও ক্ষমা করবেন।

জাকারিয়াস যোসেফ—জন্ম ১৯২৪। মৃত্যু ১৯৫৭। পঞ্চাশের দশকে হাঙ্গেরির সেরা দলের অক্লান্ত ডিফেণ্ডার জাকারিয়া অন্যদের তুলনায় অপেক্ষা-কৃত স্বল্প উজ্জ্বল হলেও, জাতীয় দল থেকে তৎকালে তাঁকে বাদ রাখার কথা কেউ ভাবতে পারতেন না। সাধারণত লেফট হাফে খেলতেন, কিন্তু বয়সের তুলনায় তিনি পরিণত ফুটবলার হন অনেক আগেই। তিন সদস্যের ডিফেন্স লাইনকে সমৃদ্ধ করতেন জাকারিয়া।

জাতীয় দলের পক্ষে জাকারিয়ার প্রথম খেলা ১৯৪৭-এ। হাঙ্গেরি দলে মোট অবতীর্ণ হন ৩৫ বার। কিন্তু ১৯৫৪-য় বিশ্বকাপ ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর কাছে পরাজয়ের পর জাতীয় দলে আর নির্বাচিত হতে পারেননি। অবসরের পর ফুটবল প্রশিক্ষণে আত্মনিয়োগ করেন। দশ বছর ওই কাজে লিপ্ত থাকেন আফ্রিকায় এবং অধিকাংশ কাল কাটান গুয়ানাতে।

জাগালো, মারিও জোর্গে লোবো—জন্ম ১৯৩১। ১৯৫৮ ব্রাজিল যখন বিশ্বকাপ জেতে, জাগালো তখন দলের লেফট হাফ। যখন তারা তৃতীয়বার জিতে জুল রিমে ট্রফি চিরতরের জন্য পেল জাগালো তখন দলের ম্যানেজার। ব্রাজিলকে বিশ্ববিজয়ী করার মূলে তাঁর এই কৃতিত্ব আরও উল্লেখ্য, কেননা ১৯৫৭ এর জুনে হয় বিশ্বকাপ ফাইনাল, আর জাগালো তার চারমাস আগে মার্চেও জানতেন না যে, তিনিই জাতীয় দলের কোচ হবেন মেক্সিকো বিশ্বকাপে।

হাতে সময় অত্যন্ত অল্প। জাগালো তবুও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পিছপা হননি। খেলোয়াড়-জীবনে কঠোর অনুশীলন করে তিনি নিজের দৈহিক ওজন কিছুতেই বাড়তে দিতেন না। হালকা শরীর নিয়ে ভীষণ দ্রুতগতিতে ছুটে বেড়াতেন সারা মাঠ, তাই তাঁর নাম ছিল 'ফরমিঙ্গুইনা' (ক্ষুদে পিঁপড়ে)। তাঁর খেলায় যাদু না থাকলেও কুশলী খেলোয়াড়রূপে জাগালোর পরিচিতি ছিল। ম্যানেজার হয়ে অতীতের সব কৌশল ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে যাঁরা তাঁর আশেপাশে ছিলেন, ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে জাগালো তাঁদের প্রতিভাকে সক্রিয় করে তোলেন এবং প্রয়োগ করেন। অকপটে স্বীকার করতেই হবে জাগালোর উপস্থিতিতে ব্রাজিল দলে সংহতি ফিরে আসে। প্রত্যেকেই প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত হন তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের জন্য। সুতরাং মেক্সিকো রওনা হওয়ার আগে ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা অকারণে বলতেন না তাঁকে 'ও ডিরিজেন্টে' (দ্য ম্যানেজার)। ম্যানেজার হওয়ার সকলই গুণ তাঁর ছিল।

আমেরিকায় জাগালো অপেশাদার খেলোয়াড় ছিলেন। পেশাদার হন ওখান থেকে ফ্লেমেঙ্গোয় গিয়ে। তখন খেলতেন মিড-ফিল্ডে লেফট ইনে। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ব্রাজিলের একজন ইনসাইড ফরওয়ার্ডের বেশ প্রয়োজন দেখা দেয়। জাতীয় দলে প্রবেশের জন্য জাগালো তখন ভীষণ সচেষ্ট, সুযোগ পেয়ে চলে গেলেন লেফট উইং-এ। জাতীয় দলে প্রবেশের জন্য জাগালোকে

বেগ পেতেও হয়। কেননা, পেলে, কানহোটেরিও, মাওরিনো, এসকুরিনো ওই পজিশনে খেলছেন। জাগালোর দল ফ্লেমেঙ্গো উপর্যুপরি তিনবার (১৯৫৩-১৯৫৫) রিও লীগে চ্যাম্পিয়ন হল। এই ক্লাবে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু ব্রাজিল জাতীয় দলে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পেলে। জাতীয় দলে জাগালোকে তাই রিজার্ভ তালিকায় থাকতে হল। জাতীয় দলে প্রথম খেলার সুযোগ পেলেন ১৯৫৮-য় বালগেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে। তারপর বিশ্বকাপ বাহিনীতে নির্বাচিত হলেন।

'ভাগ্যবান' হিসাবেই জাগালো কিংবদন্তী হয়ে আছেন। আর তাঁর ভাগ্য-পরীক্ষা এই শুরু থেকেই। জাতীয় দলে রয়েছেন পেলে ও কানহোটেরিও। অর্থাৎ জাগালোর স্থান তৃতীয়। প্রশিক্ষণের সময় আহত হওয়ায় কানহোটেরিও শুরুতেই বাদ পড়লেন। ইতালিতে ইণ্টারন্যাজোনেলের সঙ্গে ট্রেনিং ম্যাচে পেলে আঘাত পেলেন। তখন জাগালোও ইতালিতে উপস্থিত জাতীয় দলের সঙ্গে। তাঁর ফুটবল-জীবনের মোড় ঘুরল। জাগালোর ফুটবল স্টাইলকে মানিয়ে নিতে ব্রাজিলকে তৈরি হতে হল। জাগালো কখনোই পেলের মত আক্রমণাত্মক ছিলেন না, কিন্তু ব্রাজিল দলে তাঁর গুরুত্ব কম হল না।

জাগালো মাঠে নেমে দুদিকে দুচোখ রাখতেন। খেলতেনও তদনুযায়ী। তাঁর এক চোখ থাকত অ্যাটাকে, বাকিটি ডিফেন্সে। ব্রাজিলের তৎকালীন ম্যানেজার ফিওলা বললেন জাগালো সম্পর্কে: ও আক্রমণ করে ৮০ মাইল বেগে আর রক্ষার কাজে ফেরে ঘণ্টায় ১০০ মাইল গতিতে। ফাইনালে সুইডেনের বিরুদ্ধে ক্ষণে ক্ষণে তিনি এই নজির স্থাপন করেন। সুইডেনে ১৯৫৮-র এই বিশ্বকাপ ফাইনালে প্রথমার্ধে তিনি ক্রসবারের ঠিক নিচ দাঁড়িয়ে হেড করে একটি গোল বাঁচান। দ্বিতীয়ার্ধে দলের চতুর্থ গোলটিও করেন এই জাগালো।

১৯৫৯-এ চলে গেলেন বোটাফোগোয় এবং ওদের জন্য লীগ চ্যাম্পিয়নের পদক আনতে সাহায্য করলেন। এবার আবার লেফট উইং-এ পেলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি। এবং আবার ভাগ্য তাঁকে সাহায্য করল। বিশ্বকাপের আগে রিও ডি জেনিরোতে ওয়েলসের বিপক্ষে খেলার সময় পেলে গুরুতর আহত হলেন। আর তাঁর বদলে জাগালোকে নেওয়া হল। বাষট্টির বিশ্বকাপ অনেকটা রক্ষণাত্মক হলো। তবুও ব্রাজিলের দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ে জাগালোর অবদান অনস্বীকার্য।

জাগালো ফুটবল থেকে অবসর নেন ৩৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ শেষে। তারপর বোটাফোগো জুনিয়র দলের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে ওই কাজে বেশ সফল হলেন। তাঁর দল লীগে রানার্স তে চ্যাম্পিয়ন হয়। এবার তাঁকে সিনিয়র দলের দায়িত্ব দেওয়া হল এবং রিও কাপ জিতলেন। পুনরায় রিও লীগের পদক পেল এবং ১৯৪৬-এ ব্রাজিল জাতীয় দলের দায়িত্ব প্রাপ্তিটা মোটেই উড়ে এসে জুড়ে বসার ব্যাপার নয়।

তাছাড়া এত অল্প সময়ে জাতীয় দলের দায়িত্ব নিয়ে নিজের পদ্ধতি খেলোয়াড়দের উপর চাপিয়ে দিয়ে তা কার্যকর করাও কম দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে ব্রাজিলের প্রতিটি খেলোয়াড় তখন দৈহিক সক্ষমতায় বেশ দড় ছিলেন। তিনি ঝুঁকি নেন টোস্টাওকে দলভুক্ত করে এবং ডিফেন্সকে শক্তিশালী করতে বেশি সময় কাটান। বিপক্ষকে প্রহরা ও প্রতিআক্রমণের ধাঁচও বদলালেন। ফাইনালে ইতালিকে ৪-১ গোলে হারায় ব্রাজিল এবং কর্তৃপক্ষ প্রমাণ করলেন সালধানাকে বাদ দিয়ে জাগালোর নিয়োগ যথার্থ হয়েছে।

অবাক হওয়ার কথা, এই জাগালোকে বোটাফোগো ১৯৪৬-এ বিদায় করে দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাভবান হল ফ্লুমিনেন্স। ১৯৪৬-এর শুরুতে ফ্লুমিনেন্স রিও কাপ জিতল, মরশুমের শেষদিকে দখলে আনল লীগ খেতাব। অবশ্য তিনি গেলেন ফ্লেমেঙ্গোয়। ১৯৪৬-এ পশ্চিম জার্মানীতেও গেলেন ব্রাজিলের ম্যানেজাররূপেই। কিন্তু জাগালো অতীত সাফল্য বা গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে পারেননি।

জাজিক ড্রাগন—জন্ম ১৯৪৬। যুগোশ্লাভিয়ার উদীয়মান লেফট আউট জাজিক যেমন দ্রুত, তেমনি কুশলী। বল পেলেই তাঁর পায়ে মারাত্মক শট দেখা দেয়। অক্টোবরে জাজিকের বয়স যখন ২৬, তখনই ব্রাঙ্কো জেবেকের ৬৫ বার জাতীয় দলের পক্ষে খেলার রেকর্ডটি ম্লান করেন। ওই অক্টোবরে তিনি জাতীয় দলের নেতৃত্বও করেন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ওয়েম্বলিতে।

জাজিক রেড স্টারে যোগ দেন ১৯৪৬-তে। যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষে প্রথম খেলেন জুনিয়র দলে। সপ্তমবার খেলার পর ১৯৪৬-তে রেড স্টারের সিনিয়র দলভুক্ত হন এবং দশটি মরশুমে তাদের পক্ষে ৫৫০টি ম্যাচ খেলেন। গোল দেন ২৩৯টি। জাজিক রেড স্টারে শুরুতে নিজেকে তৈরি করায় দিকে মনোনিবেশ করেন, যদিও কৈশোরেই শেষের দিকে তিনি তারকা বনে যান,

জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং প্রচুর প্রশংসা কুড়োন। কিন্তু কখনও তা নিয়ে অহংকার করতেন না, বরং বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে সকলের কথা মেনে চলতেন। এই দশ বছরে চারটি লীগ পদক ও চারটি কাপ বিজয়ের পদক জেতেন। এছাড়াও জয় করেন একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মান। তিনবার ফিফা ও উয়েফা দলেও নির্বাচিত হন। যুগোশ্লাভ জাতীয় দলে তাঁর প্রথম খেলা ১৯৪৬-তে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বেলগ্রেডে। তখন বয়স সাড়ে আঠার এবং লেফট-উইংই তাঁর পজিশন।

জাজিক বিপক্ষের গোলের কাছেই সর্বাধিক বিপজ্জনক, বিশেষ করে 'ডেড্ বল' পেলে তো কথাই নেই। মরশুমে রটারডামে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ালিফাইং ম্যাচে নেদারল্যাণ্ডসের দেওয়াল ভেদ করে জাজিকের ব্যানানা কিকেই এবং যুগোশ্লাভিয়া মূল্যবান পয়েণ্ট সংগ্রহ করে। এর আগের বারের চ্যাম্পিয়নশিপে ফ্লোরেন্সে তাঁর গোলেই ইংল্যাণ্ড পরাস্ত হয়।

জাজিকের গোল করার গুণাবলীর উন্মেষ ঘটে রেড স্টারে থাকা কালেই। তাঁরই নিখুঁত ক্রসিং-এ সেণ্টার ফরওয়ার্ড লাজারেভিক পাঁচবার লীগে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন। ইউরোপীয়ান কাপে জাজিকের ভাগ্য যেন তেমন সুপ্রসন্ন ছিল না। মরশুমে দ্বিতীয় রাউণ্ডে ভোরওয়ার্টসের বিরুদ্ধে খেলার দিনে বিপক্ষের জনৈকের ফাউলে জাজিক গুরুতর আঘাত পান, তবুও সেদিন খেলা থেকে ওঁকে নিবৃত্ত করা যায়নি। নিজের মাঠে রেড স্টার জিতলেও, ভোরওয়ার্টসের মাঠে বেশি গোলের ব্যবধানে হেরে রেড স্টার বিদায় নেয়। পরের মরশুমে পূর্ব জার্মানীর কার্ল জেইস জেনার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম তিনি মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হলেন রেফারির সঙ্গে তর্কের জন্য। এরপর চারটি ম্যাচে সাসপেণ্ড হওয়ায় সেমিফাইনালে খেলতে পারলেন না পানাথিনাইকোসের বিরুদ্ধে এবং রেড স্টার হারল। সত্যি বলতে কি জাজিক কখনও বিপক্ষের ব্যাকের প্ররোচনায় উত্তেজিত হতেন না। তাঁর চোখে-মুখে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা যেত না।

এর মরশুমে জাজিকের খেলায় কিছুটা ঘাটতি দেখা যায়। সম্ভবত তাঁর পিঠের ব্যথাই এর মূলে। কিন্তু খেলা পড়ে যাওয়ায় তাঁর ক্লাব তাঁর সঙ্গে নতুন চুক্তি করতে গররাজি হয়। অথচ যুগোশ্লাভ ফুটবল আইনের ধারানুযায়ী জাজিকের পক্ষে অন্য দেশে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ক্লাব চুক্তি পুনর্নবীকরণ না

করলেও জাজিক নিজের ব্যবসা থেকে প্রথম শ্রেণীর যে কোনো ফুটবলারের মত অর্থ পেতেন। ব্রাজিলের ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কাপে যুগোশ্লাভিয়ার আটটি ম্যাচেই তিনি খেললেন এবং আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে তাঁর গোলেই যুগোশ্লাভিয়া তৃতীয় স্থান পেল। মিউনিখে ১৯৪৬-এর বিশ্বকাপে জাজিককে বাদ রেখে যুগোশ্লাভ দল গঠিত করা সম্ভব ছিল না এবং প্রতিটি ম্যাচেই তিনি বিপক্ষের ডিফেন্সকে নাস্তানাবুদ করেন।

জাটকো কাজোওস্কি—জন্ম ১৯২৩। ক্ষুদে উইং-হাফ জাটকো ১৯৫০ ও ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে যুগোশ্লাভ জাতীয় দলের নেতৃত্ব করেন। স্বদেশে ও বিদেশে জাটকো অপেক্ষা 'চিক' নামে সমধিক খ্যাত ছিলেন। জাতীয় দলের পক্ষে মোট খেলেছেন ৫৭ বার, পার্টিজানে ছিলেন ১০ বছর। তখন দু'বার লীগ চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৫২-য় ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট ইউরোপ দলে খেলেন, তখন ফুটবল-বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি ছিলেন সেরা লেফট-হাফ।

১৯৫৫-য় অবসর নিয়ে প্রথম ইজরায়েল ও পরে তুরস্কর ট্রেনার নিযুক্ত হন। এছাড়াও নটি মরশুম ছিলেন জার্মানীতে। একাধিক চ্যাম্পিয়ন দল তাঁরই হাতে গড়া। বেয়ার্ন মিউনিখকে তিনি বিশ্বের অন্যতম সেরা দলে পরিণত করেন। মুলার, বেকেনবাউয়ের প্রভৃতি সেরা সেরা খেলোয়াড়ও তাঁরই সৃষ্টি। ১৯৪৬ সালে তাঁর যে আত্মজীবনী বের হয়, তাতে তিনি নিজেকে বিশ্বের সবচেয়ে দামী ট্রেনার বলে দাবি করেন।

ফুটবলের জন্য তিনি সর্বদাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন অত্যন্ত উৎসাহ নিয়েই। কিন্তু একগুয়েমী একাধিকবার তাঁর অমঙ্গল ডেকে এনেছে। আর এই দোষই তাঁকে ১৯৪৬ সালে ডায়নামো জাগরেবের প্রশিক্ষণ দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করে। ওই দলের সমর্থকরা মাঠে এসে বলতে থাকেন, 'হামবড়া লোকটি কোথায়, যিনি কোনো সুফল ফলাতে পারেননি?'
জার্মানীতে ফিরে প্রথম এফ সি নুরেমবার্গের দায়িত্ব নেন।

জামোরা রিকোর্ডো—জন্ম ১৯০১। স্প্যানিশ ফুটবলে এমন আদর্শবান খেলোয়াড় আজও দেখা যায়নি। খেলার গুণেও তিনি সবার উপরে। তাঁর আমলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মত ফুটবল সারা স্পেনে শ্রদ্ধা পেত এবং গড়ে ওঠে জামোরা ঘরাণার ফুটবল। অথচ গোলরক্ষকদের সচরাচর যেমন লম্বা হওয়া প্রয়োজন, জামোরা তেমন ছিলেন না। কখন কীভাবে কোথায় দাঁড়াতে হবে দূর থেকে বলের আনাগোনা দেখেই উপলব্ধি করতেন

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ও আন্দাজে। স্পেনের পক্ষে তাঁর প্রথম খেলা ১৯২০-র ওলিম্পিকসে। ১৯৩০-এ অবসরের আগে পর্যন্ত স্পেন জাতীয় দলে তাঁর স্থান হত সকলের আগে। জাতীয় দলে ৬৯ বার খেলেন, এর মধ্যে ৪৬ বার সিনিয়রে। স্পেনে আজও এটি রেকর্ড। তাঁর অন্যতম সেরা খেলা ১৯৩৪-এর বিশ্বকাপে। দ্বিতীয় রাউণ্ড তথা কোয়ার্টার ফাইনালে ইতালির বিরুদ্ধে স্পেনকে প্রায় জয় এনে দিয়েছিলেন দারুণভাবে উৎসাহ দিয়ে। তিনি শুধু মুষড়ে পড়েন যখন ইতালি ১-১ করল; তারপরই তিনি আহত হলেন বিপক্ষের ফাউলে। রিপ্লেতে তিনি খেলতে পারলেন না, ফলে ইতালির জয় হল। জামোরার সেরা খেলা সম্ভবত ১৯৩১-এ হাইবারিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। তখন তিনি সেখানে নেমেছেন বিশ্বের সেরা গোল-রক্ষকের দম্ভ নিয়ে। কিন্তু ডিক্সি ডিন বাহিনী সাত গোলে পরাস্ত করেন।

জামোরা ১৯১৬ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত এস্পানোলে খেলেন, ১৯২০ ও ১৯২১ সালে যান বার্সিলোনায় এবং ১৯২২-এ আবার ফেরেন এস্পানোলে। ১৯৩০-এ গেলেন রিয়াল মাদ্রিদে রেকর্ড ফি নিয়ে। রিয়াল তখন দু'বার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয় ও দু'বার কাপ জেতে। অবশ্য তাঁর সময়ে বার্সিলোনা ও এস্পানোল একবার করে কাপ জিতেছিল।

১৯৩৯-এ গৃহযুদ্ধ শেষে হলেন আটলেটিকো মাদ্রিদের ম্যানেজার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে একাধিক ক্লাবের ম্যানেজারশিপ নেন। তার অন্যতম এস্পানোল। জামোরা যখন ফুটবল-তুঙ্গে ছিলেন, তারপর প্রায় ৪৫ বছর কেটেছে, কিন্তু স্প্যানিশ ফুটবলে জনপ্রিয়তায় এখনও তিনি শীর্ষস্থান দখল করে রয়েছেন।

জিজিনো—জন্ম ১৯২১। ব্রাজিলের এই রাইট-ইনের পুরোনাম টমাস সোরেস ডা সিলভা। রাইট-ইন ছিলেন ১৯৫০-এর বিশ্বকাপে ব্রাজিলের দীপ্যমান ফরওয়ার্ড লাইনেও। চমৎকার বলপ্লেয়ার, সারামাঠ বিচরণকারী পরিশ্রমী এই খেলোয়াড়কে ১৯৫৬ সালে ৩৫ বছর বয়সেও ব্রাজিল জাতীয় দলে খেলার আহ্বান জানানো হয়।

ফুটবলের শুরুতে অপেশাদার খেলোয়াড় ছিলেন নিতারোই দলে, ১৮ বছর বয়সে যোগ দেন তারকাখচিত ফ্লেমেঙ্গোয়। এই দলে থেকে উপর্যুপরি তিনবার লীগ জিতে হ্যাটট্রিক পদকও পান ১৯৫৭-য়। পরের বছর একটি মরশুমের জন্য গেলেন সাওপাওলোয়। ফুটবলাররূপে জিজিনোর শেষ খেলা

চিলির আউডক্সে। ওখানে খেলার সঙ্গে ম্যানেজারশিপের দায়িত্বও নেন। এর পরে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ভাস্কো-ডা-গামা-র।

জিটো—জন্ম ১৯৩২। মাঝমাঠে ব্রাজিলের অন্যতম এই সেরা খেলোয়াড়ের পুরোনাম জোসে এলি ডে মিরাণ্ডা। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে জিটো শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। আধুনিক ব্রাজিল ফুটবলে মিড-ফিল্ডে ডিডি-জিটোর মত এমন সুন্দর বোঝাপড়ার জুটি আর দেখা যায়নি। নব নব পরিকল্পনা রচনা দ্বারা এঁরা ব্রাজিলকে ১৯৫৮-য় ও১৯৪৬-তে বিশ্বকাপের বিজয়মালা এনে দেন।

জিটোর ফুটবল শুরু স্ট্রাইকাররূপে সাওপাওলোর দ্বিতীয় ডিভিশনে এসপোর্টে ক্লাবে টাউবেটে, ১৯৫২-য় স্যাণ্টোস যখন কিনে নেয় তখন তিনি তাদের রিজার্ভে। ১৯৫৫-য় প্রথম লীগ পদক প্রাপ্তির বছরে খেলতেন বিভিন্ন পজিশনে—কখনও ফুল-ব্যাক, কখনও স্ট্রাইকার এবং কখনও বা মাঝমাঠে। তবে ওইবারই উইং-হাফে, বিশেষ করে বাঁদিকই তাঁর প্রথম পছন্দ ছিল। পরে ওই পজিশনও বদল করেন। দু'বছর বাদে দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম নামলেন ব্রাজিল দলে; জিটো বেশ ভাল খেললেও তাঁর পজিশনে এডসনই ছিলেন তখনকার সেরা।

জাতীয় দলে এরপর তাঁর ডাক পড়ে ১৯৫৮-র বিশ্বকাপের জন্য। সুইডেনগামী ওই দলে অবশ্য জিটোর স্থান আবার রিজার্ভ তালিকায়। কেননা ডিনো তখনও দারুণ খেলছেন। তবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁকে নামানো হল এবং জিটোর চমৎকার খেলা সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিল, আর তাঁকে কেউ হেলাফেলা করার সাহস পেলেন না। প্রতিটি ম্যাচেই জিটোর খেলা উন্নত হতে থাকে। ডিডিকে সকলেই মাঝমাঠের রাজা আখ্যা দিলেও, জিটো তাঁর চাইতে খুব পিছিয়ে ছিলেন না। ১৯৬২-র বিশ্বকাপে জাতীয় দলে আবার সুযোগ পেতেই জিটো দেখালেন, তিনি আরও কুশলী। দ্রুত চলাফেরায় মনে হচ্ছিল তাঁর বয়স যেন কমে গেছে। এই সময়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ফ্লেমেঙ্গোর উদীয়মান ও কুশলী খেলোয়াড় ডিকুইনা। বাষট্টির বিশ্বকাপ দলে কাকে নেওয়া হবে এই প্রসঙ্গে এঁদের দুজনের নৈপুণ্য নিয়ে নির্বাচকদের মধ্যে বেশ সমস্যা দেখা দেয়। ডিডির পছন্দ ছিল জিটোকে। তিনি জানান: আমার কাছে জিটো থাকলে অনেক সুবিধা হবে ব্রাজিলের। চিলিতে জিটো দারুণ খেললেন। মাঝমাঠে সেবারের বিশ্বকাপে নিঃসন্দেহে তিনি সেরা ছিলেন। ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গোলটি তাঁরই।

ব্রাজিল জাতীয় দলে জিটোকে নির্বাচিত করে তাঁর তৎপরতা। বল নিয়ে থামোকা সময় নষ্ট নয়, যা করার নিখুঁতভাবে দ্রুত করাই তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। দলের নেতৃত্ব দেওয়া তাঁর স্বভাবের সঙ্গে মিশে ছিল। অধিনায়ক না হয়েও তিনি সর্বদা সতীর্থদের উৎসাহ দিতেন, মাঠের মধ্যে গোটা দলকে সংগঠন করতেন, বলতেন বিপক্ষের বিরুদ্ধে কী স্ট্রাটেজি নিতে হবে। ইংল্যাণ্ডে
তে জিটো বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাননি মাংসপেশীতে টান ধরায়। তাই তাঁর খেলা ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। কিন্তু এতেও তিনি ভেঙে না পড়ে জাতীয় দলের সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তে তিনি খেলা থেকে অবসর নিলেও খুব কম খেলেননি। স্যাণ্টোসের পক্ষে নেমেছেন ৭০৬টি ম্যাচে, জাতীয় দলে খেলেছেন ৫৩টি ম্যাচে। দু'বার বিশ্বকাপ জয় ছাড়াও স্যাণ্টোসের জন্য নানা সম্মান জিতে ফেরেন। স্যাণ্টোস লীগ চ্যাম্পিয়ন হয় ১৯৫৮, ১৯৬০
। চারবার জেতে ব্রাজিল কাপ। দু'বার জেতে দক্ষিণ আমেরিকান কাপ ও বিশ্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ।

জিনো কলৌসি—জন্ম ১৯১৪। ইতালির ফুটবল দর্শকরা যখন হা-পিত্যেশ করছেন লেফট-উইং-এ রায়মণ্ডো ওরশির উত্তরাধিকারী পেতে, কলৌসি যেন তখন ওঁদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। দ্রুত, বুদ্ধিদীপ্ত ও ডাইরেক্ট ফুটবলে ওস্তাদ কলৌসি ২৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ১৫টি গোল করে নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর শান্ত মেজাজ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলির সংকটক্ষণে সবচেয়ে কার্যকর ছিল। ফ্রান্সে ১৯৩৮-এর বিশ্বকাপে যে তিনটি ম্যাচে খেলেন, তার প্রতিটিতেই গোল করেন। চারটি গোলের দুটিই ফাইনালে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে।

ইতালি জাতীয় দলের ম্যানেজার ভিট্টরিও পোজো এই কলৌসি সম্পর্কে লেখেন: 'কলৌসিকে সুপার-ফাইন শ্রেণীভুক্ত করা যায় না, সে যার উত্তরাধিকারী সেই ওরশির মত বিচক্ষণতাও তার মধ্যে দেখিনি। তবে তার দুরন্ত স্পিড এবং পেনাল্টি-অঞ্চলে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় খেলা অতুলনীয়। সে কখনও সুযোগ নষ্ট করেনি, অন্ধভাবে একটিও শট করেনি গোলে। কলৌসি সর্বদাই এমন জায়গায় বল বসিয়ে গোলে মারত নিখুঁতভাবে যে, কোনো গোলরক্ষকেরই বোঝার সাধ্য ছিল না কোন্ অ্যাঙ্গেল থেকে বল আসছে কীভাবে। এদিক থেকে মিজ্জা ও পিওলার মতই কলৌসি ছিল ম্যাচ-জিতিয়ে।'
এ ব্যাপারে কলৌসি প্রকৃত ট্রিয়েসটিনোস। ম্যাচের শুরুতে কোনো কোনো

বিপক্ষের সঙ্গে তাঁর রাশ টেনে ধরার প্রয়োজন ছিল। পরে দরকার মত কলৌসি তাঁর ড্রাইভ ও অতি উৎসাহকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারতেন খেলার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে।

এমন ফুটবলারও বিশ্বকাপের শুরুতে ইতালি দলে খেলার সুযোগ পাননি। নরওয়ের বিরুদ্ধে উদ্বোধনী ম্যাচে তাঁর জায়গায় নামে ফেরারিস-২। ওই ম্যাচে ইতালি অতিকষ্টে জেতে এবং পরের ম্যাচে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কলৌসিকে সুযোগ দেওয়া হয়। প্রথমে গোল করে তো বটেই, চমৎকার খেলে স্থায়ী হয়ে গেলেন দলে। কলৌসি জাতীয় দলে প্রথম খেলেন ১৯৩৫-এ প্রথমে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে এবং শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ মিলানে ১৯৪০ সালে জার্মানীর সঙ্গে। ইতালি এই ম্যাচে ৩-২ গোলে জেতে। আর কলৌসিও এই শেষ ম্যাচে গোল করে নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন।

জিবর জল্টান—জন্ম ১৯২৯। ১৯৫০-এর দশকে হাঙ্গেরির 'ম্যাজিক ম্যাগিয়াস' দলের লেফট-উইঙ্গার গোলদাতা। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত জাতীয় দলে ৪২টি ম্যাচে নেমেছেন, গোল করেছেন ১৭টি। বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের তালিকায় জিবরের নাম থাকলেও ভীষণ খেয়ালী ছিলেন, আর যখন খুশি আইন ভঙ্গ করতেন।

জিবরের খেলা শুরু পশ্চিম হাঙ্গেরির দানিয়ুবে—কোমারম ক্লাবে। ফেরেঙ্কভারোস ওঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে কোমারমকে খুশি করতে তাদের মাঠের চতুর্দিকে উঁচু বেড়া বানিয়ে দেয়। আজও ওই বেড়া 'জিবর রেলিং' নামে শোভা পাচ্ছে। ১৯৪৯-এ ফেরেঙ্কভারোস দলের সঙ্গে জিবর একটি চ্যাম্পিয়নশিপ পদক জেতেন, গোল করেন ১৮টি এবং এই কৃতিত্ব তাঁকে জাতীয় দলে নির্বাচন এনে দেয়। কিন্তু পরের আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলিতে যখন নামেন, তখন তিনি হনভেড দলে। এই সময়ে তাঁর ফুটবল-প্রতিভা যথার্থ পরিণতি লাভ করে। যেমন স্পীড, তেমনি ড্রিবলিং ও বিপক্ষকে তাচ্ছিল্য করে গোল দেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা। পঞ্চাশের দশকে হাঙ্গেরির শ্রেষ্ঠ দলে তিনি যোগ্য ভূমিকাই নিয়েছিলেন।

জিবর মাঠে নেমে বিদ্যুৎগতিতে জায়গা বদল করতে ভালবাসতেন, আঁকাবাঁকাভাবে ক্রস করতেন বা টাচ-লাইন ধরে ছুটতেন। হাঙ্গেরি যে দুটি ম্যাচে ইংল্যাণ্ডকে ৬-৩ ও ৭-১ গোলে পর্যুদস্ত করেছিল, নিঃসন্দেহে সেই দুটিই জিবরের স্মরণীয় খেলা। ওয়েমব্লির ম্যাচে তাঁকে যে দায়িত্ব দেওয়া

হয়েছিল, কদাচিৎ কোনো উইঙ্গার তা পালন করতে পারেন। তাঁর উপর দায়িত্ব ছিল; যেভাবেই হোক স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুসকে রুখবে। বুদাপেস্টে ফিরতি খেলায় প্রথমার্ধে তিনি বিশেষ কিছু করতে পারেননি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যাণ্ডের পরম পরাক্রমশালী ডিফেন্সকে তছনছ করেন উইং দিয়েই।

কোচ গুস্তাভ সেবেস ভালভাবেই জানতেন, চঞ্চল জিবর সর্বদাই পজিশান বদল করে। তবুও ১৯৫৪-র বিশ্বকাপ ফাইনালে তাঁকে রাইট উইং-এর দায়িত্ব দিলেন। এই পজিশনে জিবর মোটেই উপযুক্ত ছিলেন না। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ফাইনালে জার্মানীর বিরুদ্ধে হাঙ্গেরির পরাজয়ের অন্যতম কারণ এটি। জিবর সেমিফাইনালে উরুগুয়ের বিপক্ষে গোল করেন, ফাইনালেও গোল দিয়েছিলেন। হনভেডের পক্ষে তিনি চারটি লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ পদক জেতেন। ১৯৫৫-য় ২০টি গোল দিয়ে যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ স্কোরার ছিলেন।

১৯৫৬-য় জিবর জাতীয় দলের সঙ্গে যখন বিদেশে সফর করছিলেন, তখনই দেশে বিপ্লবের কথা শুনে বিদেশে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নানা সমস্যা দেখা দেয়। ইতালীর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অসম্মতি জানাল রোমার পক্ষে সই করতে। জিবর তাই বার্সিলোনায় যোগ দিলেন। ১৯৬০-এ বার্সিলোনার সঙ্গে জিতলেন ফেয়ার্স কাপ। দ্বিতীয় দফার খেলায় ফাইনালে বার্মিংহামের বিরুদ্ধে বার্সিলোনা যে ৪-১ গোলে জেতে তার দুটি ছিল জিবরের। ১৯৬১-তে ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনালে বেনফিকার বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে জিতল, এরও একটি গোল জিবরের। ফুটবল-জীবনের অন্তিম পর্বে ছিলেম স্প্যানিশ ক্লাবে। তার আগে অবশ্য স্বল্পকালের জন্য কানাডা যান। তবে সবশেষে পুনরায় বার্সিলোনায় ফেরেন।

জিলমার—জন্ম ১৯৩০। পুরোনাম জিলমার ডস স্যাণ্টোস। ১৯৫৮ ও বিশ্বকাপ ফাইনাল সহ জিলমার অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে ব্রাজিলের গোলরক্ষা করেছেন একশ' বার। সমকালে গ্রসিকস ও লেভ [illegible]াসিন ছাড়া আর কারুর এত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নেই।

জিলমারের অসাধারণ গোলরক্ষা শুরু স্যাণ্টোসের জাবাকুয়ারার বালক সংঘে। ১৯৪৯ পর্যন্ত ওই ক্লাবেই তাঁর বল ধরা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যায়। ১৯৫০-এ সই করলেন সিনিয়র দলে। কৈশোরে অত্যন্ত কৃতিত্ব শুধু নয়, গোল-রক্ষণে যে কত ঠাণ্ডা মাথার দরকার তাও দেখালেন ফুটবল-বিশেষজ্ঞদের, এই

মেজাজই পরবর্তীকালে তাঁকে শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষকে পরিণত করে। একটি বল ধরতে হয়ত ভুল করেছেন, কিংবা অকারণে দূরে এগিয়ে এসেছেন। তবুও পরের মুহূর্তে ওই ভুলের কথা বিস্মৃত হয়ে প্রস্তুত করেছেন নিজেকে। কেননা, পরের বল যে আরও বিপজ্জনক! জিলমার তাঁর এই মানসিকতা দলের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন প্রতিদিন। দলের সকলের উপর তাঁর অসম্ভব প্রভাবও ছিল।

১৯৫১-য় কোরিন্থিয়ান্স তাঁকে জাবাকুয়ারা থেকে নিয়ে যায় ও তারা সেবার সাওপাওলো লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়। পরের বছর আবার ওরা লীগ জিতল। জিলমারের গোলরক্ষা তাঁকে ১৯৫৩-য় পেরুতে দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ব্রাজিল জাতীয় দলে নির্বাচন এনে দেয়। প্রথম খেলায় বলিভিয়ার বিরুদ্ধে ০-১ গোলে পিছিয়ে থেকে ৮-১ জেতে। এই সময়ে ব্রাজিলে ভাল ভাল গোলরক্ষক থাকায় জিলমার কখনও বাদ পড়েছেন, কখনও বা দলে এসেছেন। জাতীয় দলে স্থায়ী স্থান করে নিতে তাঁকে ১৯৫৬ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

১৯৫৪-য় জিলমার কোরিন্থিয়ান্সের পক্ষে তৃতীয় লীগ পদকটি পেলেন। দু'বছর পরে ওয়েমব্লিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য হন দুটি পেনাল্টি আটকে। পেনাল্টি আটকানো জিলমারের বৈশিষ্ট্য ছিল। অবশ্য তাই বলে ১০০ বার জাতীয় দলে নেমে অন্য সব শটেও কদাচিৎ পরাস্ত হয়েছেন। ১৯৫৮-র বিশ্ব-কাপে সারা প্রতিযোগিতা জুড়ে তিনি চমৎকার খেলেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁর সেরা খেলা ছিল উদ্বোধনী ম্যাচে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে। সেমিফাইনালে ফ্রান্সই আগে গোল দেয় ব্রাজিলের বিপক্ষে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তখন বিশ্বের সেরা দুই গোলরক্ষকের অন্যতম এই জিলমার।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা, ১৯৬১-তে কোরিন্থিয়ান্স মাত্র এক হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে তাঁকে স্যাণ্টোসের কাছে বিক্রি করে। ১৯৬০-এর দশকে স্যাণ্টোস বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্লাবে পরিণত করার যে পরিকল্পনা নেয়, জিলমারকে পেয়ে তাদের ওই পরিকল্পনা কার্যকর হল। এই ক্লাবে অবস্থানকালেই তাঁর ফুটবল জীবনের স্মরণীয় মুহূর্তগুলি আসে।

ব্রাজিলে সামান্য ক'জনই একশ'টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেমেছেন, এই কতিপয়দের অন্যতম হয়ে তিনি নিশ্চয়ই দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী। ৩৯ বছর বয়সে ব্রাজিল যে ম্যাচে ২-১ গোলে জেতে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সেটিই জিলমারের শততম ম্যাচ। এরপর জিলমার আর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারেননি। ১৯৩৫ বিশ্বকাপে তাই বাদ পড়েন। কিন্তু ব্রাজিল আজও জিলমারের স্থান দখলের মত কাউকে খুঁজে পায়নি। আন্তর্জাতিক ম্যাচ-গুলিতে সব মিলিয়ে ৯৫টি গোল খেলেও জিলমারের অনন্য কৃতিত্ব, তাঁর কালে ব্রাজিল পরাস্ত হয় মাত্র ১৪টি ম্যাচে।

জিমি আর্মফিল্ড—জন্ম ১৯৩৫। ইংল্যাণ্ডের রাইট-ব্যাক জিমি আর্মফিল্ড ৪৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন, এর ১৫ বার ছিলেন অধিনায়ক। ব্ল্যাকপুলে প্রথম খেলা ১৯৫৪-৫৫ মরশুমে। ক্লাবের পক্ষে লীগে তাঁর ৫৬৬টি ম্যাচ ব্ল্যাকপুলের রেকর্ড। ১৯৩৫-এ বলটনের ম্যানেজারের অবসরের আগে পর্যন্ত ওই একটি ক্লাবেই নিয়মিত খেলতেন। ডিফেণ্ডার আর্মফিল্ডের বড় গুণ ছিল অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলার মেজাজ বোঝা। আর মেজাজ বুঝে মাঝে মাঝে চলে যেতেন অ্যাটাকিং-এ এবং গতি এতই দ্রুত ছিল যে, পরক্ষণেই ফিরতেন নিজের পজিশনে। তাঁর দৌড় দেখে মাঝে মাঝে উইঙ্গার ভেবে ভুলও করেছেন অনেকে। চিলির বিশ্বকাপে সাংবাদিকদের ভোটে জিমি আর্মফিল্ড বিশ্বের এক নম্বর রাইট-ব্যাক নির্বাচিত হন।

জিলার, উয়ে—জন্ম ১৯৩৬। পশ্চিম জার্মানীর অপ্রতিরোধ্য সেণ্টার ফরওয়ার্ড উয়ে জিলার এমনই শক্ত ও সমর্থ এবং অদম্য মনোবলের অধিকারী যে, একবার প্রচণ্ড আঘাত থেকে অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়েই শুধু মাঠে ফেরেননি, বরং তাঁর আগের চাইতে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে ফিরলেন যেন। নেতৃত্ব করলেন ১৯৩৫ ও ১৯৩৬-এর বিশ্বকাপে এবং জার্মান জাতীয় দলের পক্ষে ৭২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে রেকর্ডও করলেন। উচ্চতায় সাড়ে পাঁচ ফুটের সামান্য বেশি হলে কী হবে, যত উঁচু বলই আসুক তিনি স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠে ধরে ফেলতেন। এ মেক্সিকো বিশ্বকাপে নতুন ভূমিকা নিলেন। নিজে চলে গেলেন মিড-ফিল্ডে। কিন্তু ওখান থেকেই আক্রমণ রচনা করে বিপক্ষকে বিপদে ফেলতে থাকেন গার্ড মূলারের সঙ্গে যৌথভাবে। মেক্সিকোর পরেই জিলার আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নেন। মে মাসে ৩৬তম জন্মদিবসে হামবুর্গের পক্ষে শেষ ম্যাচ খেললেন।

এত দ্রুত জার্মানীর একজন চৌখস খেলোয়াড় মাঠ থেকে বিদায় নেবেন এ ধারণা কেউই করেননি। যুবদলে খেলার সময়ই প্রায় ৬০০ গোল করেন। এর মধ্যে ১২টি গোল ১৯৫৩ ও ১৯৫৪-র ১০টি আন্তর্জাতিক যুব ম্যাচে। বয়স যখন ১৭, তখনই সিনিয়র আন্তর্জাতিক ম্যাচে জিলার নামক পরবর্তীকালের অন্যতম বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়টিকে প্রথম দেখা যায়। ১৯৫৪-র অক্টোবরে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বদলী খেলোয়াড় হয়েই তাঁর ওই আবির্ভাব। দু'মাস পরে সিনিয়র আন্তর্জাতিক ম্যাচে পুরো সময় খেললেন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। তাঁর দেওয়া মোট গোল ৭৬০টি, এর ৪৩টি জাতীয় দলের হয়ে। ক্লাবের, হামবুর্গ শহরের ও উত্তর জার্মানীর পক্ষে মোট খেলেছেন ৭১০টি ম্যাচ। ফুটবল-জীবনে বিভিন্ন খেলায় আহত হওয়ায় দেড় বছরেরও বেশি শুয়ে কাটিয়েছেন হাসপাতালে বা বাড়িতে। অবশিষ্ট ইউরোপ দলে খেলেছেন দু'বার, ১৯৬৬-তে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ব-একাদশ দলেও খেলেন। এই ম্যাচে রাইট-আউটে নেমে তিনি তেমন সুবিধা করতে পারেননি। তিনবার পশ্চিম জার্মানীর 'ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছেন ভোটে। আর অবসরের আগে জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক তাঁকে 'গ্রাণ্ড ক্রস অফ দ্য অর্ডার অফ মেরিট'-এ ভূষিত করেছেন। জার্মানীর কোনো ফুটবলার আজও এই সম্মান পাননি।

১৯৫৮-র বিশ্বকাপের আগে এই জিলারের কিন্তু তেমন কদর ছিল না আন্তর্জাতিক ফুটবলে। এই বিশ্বকাপে প্রথম চারটি ম্যাচে তাঁকে নামানো হয়। বাদ পড়েন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায়।
বিশ্বকাপে সব কটি ম্যাচেই খেলেন। চিলির বিরুদ্ধে তাঁর দেওয়া গোল দেখে বিশেষজ্ঞরা উপলব্ধি করলেন, জিলার অন্য ধাতুতে গড়া। অতর্কিতে অভাবনীয় ডাইভিং হেড দিয়ে গোল করলেন।
তাঁর মত সুযোগ-সন্ধানী খেলোয়াড় আর দেখা যায়নি। কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জিলার অপূর্ব ক্রীড়াচাতুর্য দেখালেন। স্লেলিঙ্গারের উঁচু লব লাফিয়ে পিছন দিক থেকে হেড করে গোল শোধ দেন। ইংল্যাণ্ড গোলরক্ষক বুঝতেই পারেননি জিলারের কাছে তিনি এমনভাবে পরাস্ত হবেন।

জিলারের জীবনে একাধিকবার খেলা সাঙ্গ করার ঘণ্টা বেজেছে। ১৯৫৫-র ফেব্রুয়ারিতে ফ্রাঙ্কফুর্টে খেলার সময় এমন আঘাত লাগল যে, চার

ঘণ্টা ধরে তাঁকে অপারেশন করা হয়। ডাঃ কুর্ট ফিশার ওঁর মাংসল পা থেকে ট্যানডনগুলো তুলে ফেললেন। এমন সফল অপারেশন হল যে, ছয় মাস পরে জিলার খেলার সামর্থ্য ফিরে পেলেন। আর অক্টোবরে ১৯৩৬-র বিশ্বকাপে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছতে জিলারই জয়সূচক গোলটি করেন। জার্মানী ওই ম্যাচে ২-১ গোলে হারায় সুইডেনকে।

সারা জীবন জিলার একটি ক্লাবেই ছিলেন। সর্বদাই তিনি দলবদলের বিরোধিতা করে গেছেন। হামবুর্গে তিনি নানা সুযোগ পেলেও সর্বদাই বিভিন্ন ক্লাব থেকে আরও লোভনীয় প্রস্তাব এসেছে। হামবুর্গ যখন সামান্যর জন্য ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনালে উঠতে পারল না, হেলেনিও হেরেরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়। ইণ্টার মিলান থেকেও দু'বার দারুণ দারুণ লোভনীয় চুক্তির প্রস্তাব আসে। জার্মানীর বাইরে না গিয়ে জিলার যে আর্থিক লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তা নয়। বরং জার্মান জাতীয় দলের ম্যানেজার শেপ হারবার্জারের সহযোগিতায় উত্তর জার্মানীতে 'আডিডাস' ক্রীড়া-সরঞ্জাম সংস্থার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পান। জিলারের অসম্ভব খ্যাতিতে আডিডাসের ব্যবসাও প্রসারিত হয়, জিলার তাঁর যথাযথ মর্যাদাও পান ওই সংস্থা থেকে।

প্রধানতঃ জিলারের কৃতিত্বে হামবুর্গ ১৯৫৭, ১৯৫৮ ও ১৯৬০-এর জার্মান লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের প্লে-অফ্ ম্যাচ পর্যন্ত পৌছায়। হামবুর্গ চ্যাম্পিয়ন হয় তৃতীয় প্রচেষ্টায় ১৯৬০-এ। হামবুর্গ ৩-২ গোলে হারায় কলোনকে এবং জিলার দেন দুটি গোল। ইউরোপীয়ান কাপ উইনার্স কাপ ফাইনালে পৌছতে জিলার আটটি গোল করলেন।

জাতীয় দলে যদি কোনোদিন সুযোগ না পেতেন জিলার, তবুও তাঁর জনপ্রিয়তা কমত না। জাতীয় দলে নির্বাচিত হওয়ার আগেও তিনি ছিলেন দর্শকদের মধ্যমণি। যদি কখনও জিলারের অনুপস্থিতিতে পশ্চিম জার্মান দল একটু খারাপ খেলত, সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে চিৎকার উঠত 'উয়ে! উয়ে!' দর্শকরা সবচাইতে সপ্রশংস ছিল জিলারের লড়াকু গুণাবলীতে, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন চমৎকার গোলগুলো দেখে। তাঁর মিড-এয়ার ভলি, অ্যাক্রোবেটিক ওভারহেড ফ্লিক, ফ্লাইং হেডার বহুকাল জার্মান ফুটবলকে মহিমান্বিত করে রাখবে, জার্মানরা গর্ব অনুভব করবেন জিলারের এইসব কৃতিত্ব স্মরণ করে।

লীগে তিনি পাঁচবার সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন। গোল করেন ১৯৫৬-য় ৩২টি, ১৯৫৯-এ ২৯টি, ১৯৬০-এ ৩৬টি করে।

জিলার অবসর নিলেও পশ্চিম জার্মানীর গোলদাতার অভাব দেখা দেয়নি। এদিক থেকে তারা বেশ সৌভাগ্যবানই বটে। জিলারের বদলে পরবর্তীকালে তাঁর ভূমিকায় প্রায় একইভাবে অবতীর্ণ হন গার্ড মূলার। কিন্তু জিলারকে তাঁর দেশবাসী কোনোদিন বিস্মৃত হবেন না। সাহসিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বিপক্ষরা যত শক্তিশালীই হোক তার মোকাবিলা করার জন্য দলকে উৎসাহিত করা—এ সব গুণ আর কার মধ্যে দেখা যাবে? জার্মানীতে এমন ফুটবলার তো একজনই ছিলেন। তিনি উয়ে জিলার।

জুলিনো—জন্ম ১৯৩০। ব্রাজিলের জুলিনোর পুরো নাম জুলিও বটেলো। তাঁকে ১৯৫৪-র বিশ্বকাপের 'গ্যারিঞ্চা' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল ওই প্রতিযোগিতায় চমৎকার খেলার পর। সেবার ব্রাজিলের রাইট-উইং-এ তাঁর অসীম শক্তি, বল কণ্ট্রোল ও দৌড় এবং সর্বোপরি ডান পায়ে বুলেটের মত শটগুলি বিপক্ষকে হতচকিত করে দেয়। কোয়ার্টার ফাইনালে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে বার্ণের যুদ্ধে দূর থেকে তাঁর শটে যে গোল হয়েছিল, সেদিনের দর্শকরা আজও তা ভোলেননি।

জুলিনোর জন্ম সাওপাওলোয়। শুরুতে খেলতেন ওই শহরের পোর্তুগীজা ক্লাবে। পরে ইতালির ফিওরেনটিনা তাঁকে নিয়ে যায় 'ওরিয়োণ্ডো' হিসাবে, তাঁকে বলা হয়, 'তুমি ইতালীয় বংশোদ্ভূত'। ব্যাপারটি কানাঘুষা থেকে সরকারী মহলে চলে গেলে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তের পর দেখা যায় তাঁর 'ইতালীয় ঠাকুরদা' ছিলেন এক ক্যাথলিক ধর্মযাজক। তাঁকে খেলার অনুমতি দেওয়া হল ফিওরেনটিনায়। তবে বিদেশী হিসাবেই প্রথম মরশুমেই তাঁর সহযোগিতায় ওই ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হল। ১৯৫৮-৫৯-এর মরশুমের শেষ অবধি জুলিনো ফ্লোরেন্সে রইলেন। পরের মরশুমে গেলেন পালমিরাসে এবং তখনই সরাসরি ব্রাজিল জাতীয় দলে নির্বাচিত হয়ে রিওতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেললেন। ব্রাজিল ওই ম্যাচে ২-০ গোলে জেতে। ইংল্যাণ্ডের শক্তিশালী ডিফেন্সকে চুরমার করে জুলিনো একটি গোলও করেন। তবে ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে চিলিতে গ্যারিঞ্চা ওঁর জায়গা দখল করলেন।

ফিওরেনটিনা থেকে জুলিনোকে আনতে পালমিরাস ট্রান্সফার ফি দেয়

১ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড। জুলিনো এর মর্যাদা রাখেন ১৯৫৯ ও ১৯৫৮-তে সাওপাওলো চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে।

জুয়ান অ্যান্সেলমো—জন্ম ১৯০২। উরুগুয়ের ফুটবলের স্বর্ণযুগে অ্যান্সেলমো ছিলেন সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিদীপ্ত খেলোয়াড়। বল নিয়ে তিনি যাদু দেখাতেন, যেমন যাদু দেখাতেন হকিতে ভারতের ধ্যানচাঁদ। অ্যান্সেলমো বল নিয়ে বিপক্ষকে সামনে রেখে যা খুশি করতেন, তাদের নাচাতেন। অবশ্য এসব সর্বদাই সাফল্য আনেনি। তাঁর অতি আত্মবিশ্বাস প্রায়শ নিজের কাছে বল রাখার প্রবণতা এনে দেয়। তবে ইনসাইড ফরওয়ার্ড হিসাবে যে দ্রুততার প্রয়োজন ছিল অ্যান্সেলমোর মধ্যে তা কদাচিৎ দেখা যেত। এই দুর্বলতাই তাঁকে জাতীয় দলে বেশি খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। তবুও অন্যান্য গুণই তাঁকে ১৯২৮-এর ওলিম্পিকসে ও ১৯৩০-এর বিশ্বকাপে উরুগুয়ে দলে খেলার সুযোগ করে দিয়েছিল।

জ্যাকব হান্স—জন্ম ১৯০৮। জার্মানীর দুর্ভেদ্য গোলরক্ষক জ্যাকব পেনাল্টি-অঞ্চলে অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়ে গেছেন। ১৯৩৪-এর বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় ক্রেস-এর বদলে তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অপূর্ব নৈপুণ্যে গোলরক্ষা করে জার্মানীকে জেতালেন। জার্মানরা প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল ফুটবলে। জ্যাকব ৩৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। সত্তরের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত তিনিই একমাত্র গোলরক্ষক যাঁকে নিয়ে রিজেন্সবার্গ আজও গর্ব করে। ওই অঞ্চলে আর কেউ এমন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেননি। জ্যাকবের সেরা খেলাগুলির মধ্যে বিশেষ স্থান রয়েছে ১৯৩৬ সালে বার্সিলোনায় স্পেনের বিরুদ্ধের ম্যাচটি। স্প্যানিশ দলে রিকার্ডো জামোরার মত খ্যাতিমান ও কুশলী গোলরক্ষক থাকা সত্ত্বেও জার্মানরা ২-১ গোলে জিতেছিল।

জেন্টো লোপেজ ফ্রান্সিসকো—জন্ম ১৯১৩। বুদ্ধিদীপ্ত, দ্রুতগতি-সম্পন্ন স্পেনের সদা প্রফুল্ল লেফট-আউট। অধিনায়ক নিজ ক্লাব ও দেশের। ফ্রান্সিসকো 'পাকো' জেন্টো সম্ভবত ইউরোপে তাঁর সময়কার সবচেয়ে বেগবান লেফট-আউট। তাঁর মত সক্রিয় ও সফলও কেউ ছিলেন না তৎকালে। রিয়াল মাদ্রিদকে এমনভাবে সেবাও কেউ করেননি। উপর্যুপরি পাঁচ বছর ইউরোপীয়ান কাপ বিজয়ী দলে ছিলেন। ছিলেন যে দুটি ফাইনালে রিয়াল

পরাজিত হয় ইণ্টারন্যাজোনাল ও বেনফিকার কাছে। ষষ্ঠবারের বিজয়ী দলেও জেণ্টো অনুপস্থিত ছিলেন না। এবার রানার্স হয় পার্টিজান। রিয়াল তাঁর কাছে আরও ঋণী ১৯৫৮-এ অ্যাথেন্সে ইউরোপীয়ান কাপ উইনার্স কাপ ফাইনালে উইং-এ পেয়ে।

হ্রস্বকায় ময়লা রং-এর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী জেণ্টোকে ফুটবলারের চাইতে অ্যাথলেটিকসের স্প্রিণ্টার বলাই উচিত। ওই দৌড়কে ফুটবলে কাজে লাগিয়ে তাক লাগাতেন দর্শকদের, বিপক্ষরা হত ঘন ঘন পর্যুদস্ত, আর লাভবান হয়েছে যেমন রিয়াল, তেমনি স্পেন। গোটা স্পেনে আলফ্রেডো ডি স্টিফানো ছাড়া আর কেউ জেণ্টোর সমকক্ষ ছিলেন না। লম্বা লম্বা পা ফেলে কেবল তিনিই মাঝে মাঝে ধরে ফেলতেন জেণ্টোকে। এই স্টিফানো ১৯৬৪-তে যখন রিয়াল মাদ্রিদের নেতৃত্ব ত্যাগ করেন, তখনই ওই গুরুদায়িত্ব আসে জেণ্টোর স্কন্ধে। তিনি অতঃপর স্পেনেরও অধিনায়ক। জাতীয় দলের পক্ষে জেণ্টো ৪৩টি ম্যাচ খেলেছেন, গোল করেছেন ৬টি।

সানটানডারের উপকূলের কাছে কাণ্টাব্রিকের গুয়ারিঙ্গো গ্রামে এই খেলোয়াড়ের জন্ম। উপকূলের চরে ১০ বছর বয়সে যখন ফুটবল শুরু করেন তখন থেকে জেণ্টো লেফট-উইঙ্গার। অ্যাথলেটিকসেও স্প্রিণ্ট ইভেণ্টে চ্যাম্পিয়ন। তখন তিনি নুয়েভা মণ্টেনা ক্লাবের সদস্য। মণ্টেনা থেকে জেণ্টো চলে যান অ্যাস্টিলেরো ক্লাবে। তখন তাঁর দাম ২৫ পেসেতা। এরপর যান রেয়ো ক্যাণ্টাবারিয়ায় এবং ১৯ বছর বয়সে নামমাত্র বদলী ফি দিয়ে রিয়াল স্যানটানডার নিয়ে যায় তাঁকে, তাও আবার পাঁচ বছরের চুক্তি করে। জেণ্টো অবশ্য সেই চুক্তি ভঙ্গ করেন ১৯৫৩-৫৪-য় রিয়াল মাদ্রিদের ডাকে। এই সময় জেণ্টোর খেলা কিন্তু তেমন দর্শনীয় ছিল না। তবে ক্রমশ তাঁর খেলার উন্নতি দেখা যায়। ১৯৫৪-৫৫-র মরশুমে হঠাৎ তাঁর খেলার দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হল। ১৯৫৫-তে জেণ্টো স্পেনের পক্ষে প্রথম ম্যাচ খেললেন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে স্বদেশের মাঠে। লাতিন কাপ ফাইনালে পোর্তুগীজ দলে বেলেনেনেসেস-এর বিরুদ্ধে অভাবনীয় খেললেন জেণ্টো।

ওই বছরই শুরু হয় ইউরোপীয়ান কাপ এবং জেণ্টো নামলেন রিয়াল মাদ্রিদ দলে। তাঁর খেলা সকলের প্রশংসা কুড়োল। মাদ্রিদে ১৯৫৭-র ফাইনালে ফিওরেনটিনার বিরুদ্ধে জেণ্টো রিয়ালের দ্বিতীয় গোলটি করলেন। পরের বছর ব্রাসেলসের ফাইনালে মিলানের বিরুদ্ধে জয়সূচক গোলটিও তাঁরই।

১০৭ মিনিটের সময় গোলটি হয়, এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যেভাবে খেলা চলছিল, তাতে সকলেই ধরে নেন খেলা রিয়ালের মুঠোর বাইরে।

চিলিতে ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে জেন্টো গ্রুপের সবকটি ম্যাচে খেললেন ভিনা ডেল মারে। রিয়াল ১৯৬০-এ প্রথম জিতল বিশ্ব ক্লাব ফুটবলে। কিন্তু মন্টিভিডিওতে পেনারোলের বিপক্ষে ড্র হওয়া প্রথম ম্যাচটিতে তাঁকে নামানো হয়নি। তাঁর বদলে নামানো হয় বুনোকে। মাদ্রিদে ফিরতি খেলায় জেন্টোকে সুযোগ দেওয়া হলে তিনি একটি গোল করলেন। রিয়াল তখন ৫-১ গোলে বিজয়ী হয়।

ষাটের দশকের শুরুতে জেন্টোর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেন জারাগোজার লাপেত্রা। ১৯৫৮-তে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মাদ্রিদে রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্পেনের পক্ষে জেন্টোর বদলে লাপেত্রা নামলেন। স্পেনের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে জেন্টোর ভাগ্য-বিড়ম্বনা শুরু হল। দু'বছর পরে ইংল্যাণ্ডে বিশ্বকাপের খেলায় জেন্টো আর্জেন্টিনা ও সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দুটি ম্যাচ খেললেন, লাপেত্রাকে সুযোগ দেওয়া হয় তৃতীয়টিতে। স্পেন এবার তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

জেন্টো কখনও বিদেশী দলে খেলা পছন্দ করতেন না, তা যত টাকাই মিলুক। অবিবাহিত জেন্টো ফুটবল থেকে অবসর নেন ১৯৫৮-এ চেলসিতে ইউরোপীয়ান কাপ উইনার্স কাপ ফাইনালের পর। কিন্তু যেমন রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়েননি, তেমন ফুটবলকেও বিদায় জানাননি। খেলা ছেড়ে রিয়াল জুনিয়রের ট্রেনারের দায়িত্ব নেন।

জেনো, বুজানস্কি—জন্ম ১৯২৫। হাঙ্গেরির চমৎকার রাইট-ব্যাক বুজানস্কিই একমাত্র খেলোয়াড় যিনি বিখ্যাত 'ম্যাজিক ম্যাগিয়ার্স' দলে এসেছিলেন একটি প্রদেশ-ক্লাব থেকে। বুজানস্কির উপর সর্বদাই আস্থা রাখা যেত। মাঠে নেমে মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হতেন না—এই গুণাবলীই জাতীয় দলে তাঁর নির্বাচন লাভের সোপান। তিনি শুধু যে বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করেই ক্ষান্ত হতেন—তা নয়, প্রতিআক্রমণে বিপর্যস্ত করতেন বিপক্ষের ডিফেন্সকে। উইঙ্গারদের মত ড্রিবল করতেন, এগিয়ে যেতেন ফরওয়ার্ডদের মতই। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত হাঙ্গেরির পক্ষে ৪৮টি ম্যাচে নেমেছেন। খেলেন ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে প্রতিটি ম্যাচেও। ওই বিশ্বকাপের ফাইনালে জার্মানীর কাছে হাঙ্গেরি পরাজিত হয়।

খেলা থেকে অবসরের পর বুজানৎস্কি স্বদেশের বিভিন্ন ক্লাবে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

জেপান ববেক—জন্ম ১৯২৩। ববেক কেবল যুগোশ্লাভিয়ার লেফট-ইন নন, জাতীয় দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা। বল পায়ে পড়লে তিনি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতেন। দল কখন কীভাবে খেলবে সে পরিকল্পনাও তিনি করতেন।

জন্ম জাগরেবে। অথচ সমগ্র খেলোয়াড়-জীবন অতিবাহিত করেছেন বেলগ্রেডে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে পার্টিজান দলের হয়ে ৪৮২টি ম্যাচে ২১৮টি গোল করেছেন। ৬৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৩৮টি গোল দিয়ে রেকর্ড করেন। জেপান ববেকের এই রেকর্ড ম্লান করেন তাঁরই ক্লাব সতীর্থ ব্রাঙ্কো জেবেক।

ববেক যেমন ট্যাকটিক্সে, তেমনি গোলের সুযোগ তৈরিতে সবার উপরে ছিলেন। গোড়ালি অথবা উরু দিয়ে সহজে বল ধরে দ্রুত পাঠাতেন সতীর্থদের কাছে। গোলের কাছে যখন তিনি বল পেতেন, খুব কম গোলরক্ষকই তা আটকাবার চেষ্টা করতেন। ১৯৫০ ও ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে খেলেছেন। পার্টিজানের সঙ্গে দু'বার লীগ জিতেছেন। খেলা থেকে অবসর নিয়ে পার্টিজানের সফলতম কোচ ববেক ষাটের দশকের গোড়ার দিকে চারবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হন। গ্রীসে ওলিম্পিয়াকোস ও পানাথিনাইকোসের ট্রেনার হয়েও লীগ খেতাব এনে দেন। ববেক ১৯৫৮-এ ডায়নামো জাগরেব-এর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন।

জেবেক ব্রাঙ্কো—জন্ম ১৯২৮। যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় দলের উইঙ্গার জেবেক কেবল স্বদেশে নয় বিশ্বের সেরা উইঙ্গারদের পর্যায়ভুক্ত। আবার ওই পজিশন ছেড়ে যখন স্টপার হলেন, তখনও অতুলনীয়। সুইজারল্যাণ্ডে ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে যুগোশ্লাভিয়ার লেফট-আউট জেবেকের গোলেই গ্রুপ ম্যাচে ব্রাজিলের সঙ্গে ড্র হয়। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে সুইডেনে তিনি নামলেন সেণ্টার-হাফে।

অ্যাথলেটিক্সে স্প্রিণ্টার ও লং জাম্পার জেবেকের ফুটবল শুরু জাগরেব-এর বোরাক-এ। ওখানেই তাঁর জন্ম। ১৯৫১ সালে তাঁকে অতর্কিতে বেলগ্রেডে পাচার করা হয় পার্টিজানে খেলার জন্য। ওর একমাস পরে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে নামলেন সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। যুগোশ্লাভিয়ার ৭-৩ গোলে জয়লাভে জেবেক করলেন হ্যাট্ট্রিক। জাতীয় দলের পক্ষে ৬৫টি ম্যাচ খেলা তাঁর দেশের

রেকর্ড। আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোল করেন ১৭টি। ১৯৫০-এ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ফিফা দলে নির্বাচিত হন।

পার্টিজানের সঙ্গে ২৬৩টি ম্যাচে ১১১টি গোল করেছেন। দু'পায়েই সমান খেলতেন, দ্রুতবেগে ছুটতেন, সবচেয়ে চমৎকার ছিলেন শূন্যের বলগুলিতে। ১৯৫৮-য় সই করলেন পার্টিজানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রেড স্টারে। পরদিন এই খবর যুগোশ্লাভিয়ার বড় বড় কাগজের হেডলাইন ছিল। সাধারণত স্টপার হিসাবেই খেলতেন এবং পেনাল্টি-অঞ্চলে বিপক্ষের প্রবেশ নিষেধ করে রাখতেন। তিন বছর জার্মানীতে খেলার পর অবসর নেন। তারপর স্বদেশে ফিরে ডায়নামো জাগরের-এর প্রশিক্ষক হন। তাঁরই প্রশিক্ষণে ডায়নামো ১৯৬৭-তে ফেয়ার্স কাপ বিজয়ী হয়। তবুও স্বদেশে মন টিকল না বেশিদিন। আবার গেলেন জার্মানী এবং কোচ হলেন বেয়ার্ন মিউনিখ ও স্টুটগার্টের। ১৯৭২-এ যোগ দেন হাজডুক-এ।

জেয়ার ডা রোশা পিণ্টো।—জন্ম ১৯২১। ১৯৫০-এর বিশ্বকাপে যাঁরা ব্রাজিলের অন্তত দুটি ম্যাচ দেখেছিলেন সুইডেন (৭-১) ও স্পেনের (৬-১) বিরুদ্ধে, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেন, 'এমন চমৎকার তিন ইনসাইড ইতিপূর্বে দেখিনি।' তিন ইনসাইডের অন্যতম ছিলেন এই জেয়ার। বাকি দুজন আদেমীর ও জিজিনো।

জেয়ার অবশ্য ১৯৫০-এর বিশ্বকাপের আগেই ব্রাজিলে নাম করেন তিন ফরওয়ার্ডের অন্যতম হিসাবে। তখনকার বাকি দুজন লেলে ও ইসাইস। ওঁরা দুজন একসঙ্গে মাদুরিয়ায় যোগ দেন। জেয়ার অন্য কয়েকটি ছোট ক্লাবে কাটিয়ে ওই ক্লাবে যান ১৯৩৮-এ। তারপরই গোটা ব্রাজিলে এই ত্রয়ীকে ঘিরে হৈ-চৈ পড়ে যায়। প্রতিভাবানদের সঙ্গে খেলে জেয়ারেরও প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে এবং ১৯৪০-এ তিনি জাতীয় দলে স্থান পেলেন। তিন বছর পরে ভাস্কো-ডা-গামা ক্লাব এই ত্রয়ীকে একত্রে কেনে এবং ১৯৪৫-এ তারাও ওই ক্লাবকে রিও লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ এনে দেন। তবে লীগ শেষে জেয়ার চলে যান ফ্লেমেঙ্গোয়। জেয়ারের পক্ষে বেশিদিন খেলা সম্ভব হয়নি হাঁটুর আঘাতের জন্য। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি অবসর নেন। ব্রাজিলের নামী ক্লাবগুলোয় খেলার সুযোগ পাওয়ায় জেয়ার আজও গর্বিত। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে তাঁর শেষ খেলা ১৯৫০-এর বিশ্বকাপে। সেবার উরুগুয়ের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তিমূলক খেলায় ব্রাজিলের যে ক'জন পূর্বখ্যাতি বজায় রেখেছিলেন, তাঁদের অন্যতম

এই জেয়ার। সন্দেহ নেই, বাকিরাও অনুরূপ খেললে জুল রিমে ট্রফি হয়ত ব্রাজিলের দখলেই যেত।

মাঝমাঠে বল দেওয়া নেওয়ায় ওই সময়ে তাঁর জুড়ি কমই দেখা গেছে। বাঁ পায়ে তাঁর প্রচণ্ড মার ছিল, সবচেয়ে জোরালো ছিল দূরের শটগুলি। প্রয়োজন মত দৌড়ান, ও যথাযথভাবে পজিশন নেওয়ার সুবাদেই যে কোন বিপক্ষকে সহজে বিপদে ফেলতেন। 'ডেড্' বলে শট নিয়ে গোল করতে পারদর্শী জেয়ার ১৯৪৯-এ ইংল্যাণ্ডে ক্লাবের সফরকালে ৪০ গজ দূর থেকে এমন শক্তি মেশানো শট করেন যে, আর্সেনাল গোলরক্ষক সুইনডিন ধরার চেষ্টাও করতে পারেননি।

জেয়ারজিনো—জন্ম ১৯৪৪। পুরো নাম যাঁর জেয়ার ভেনটুরা ফিলো, কিন্তু ব্রাজিল তথা সারা বিশ্বে যিনি জেয়ারজিনো নামে পরিচিত, ১৯৫৮-এর বিশ্বকাপে মেক্সিকোয় তিনি নজির সৃষ্টি করেন দলের ১৯টি গোলের ৭টি একাকী করে। মেক্সিকো বিশ্বকাপে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা। জেয়ারজিনো ১৯৫৮-এ পশ্চিম জার্মানীতে ব্রাজিলের প্রতিটি ম্যাচে নামলেও মেক্সিকোর দর্শকদের মত মাতিয়ে রাখতে পারেননি। সর্বদা রাইট-ফ্লাঙ্ক উন্মুক্ত রেখে প্রতি মুহূর্তে বিপক্ষের গোলের কাছে এগিয়ে গোলগুলি দিয়ে মেক্সিকোয় থরহরি সৃষ্টি করেন।

অথচ এই জেয়ারজিনোকে ১৫ বছর বয়সে বাজে খেলোয়াড় আখ্যা দিয়ে বিতাড়িত করে। হাসিমুখে সেদিন তিনি অপেশাদার ব্রাসিলিরিনো-য় ফেরেন, সেখান থেকে পরে যান টোরেস হোমেন-এ। জেয়ারজিনোর খেলা বোটা-ফোগোর কর্তাদের চোখে পড়ল। তাঁরা ডেকে বললেন: তুমি একদিন এস, ট্রায়াল নেব। ১৯৫৮-তে জেয়ারজিনো সই করলেন বোটাফোগোর পক্ষে এবং প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ওই ক্লাবের জন্য একের পর এক পদক জিততে লাগলেন। জুনিয়র দলের জন্য জিতলেন লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা। চ্যাম্পিয়ন উপর্যুপরি আরও ১'বছর। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রথম খেলা প্যান আমেরিকান গেমসে ব্রাজিল দলের পক্ষে। তাঁর সতীর্থ ছিলেন কার্লস অ্যালবার্টো ও রবার্টো। ব্রাজিল বিজয়ীর খেতাব পেল।

আর জেয়ারজিনোও অপেশাদার ফুটবল থেকে পেশাদার ফুটবলে চলে এলেন। প্রমোশন হল বোটাফোগো সিনিয়র দলে। তবে শুরুতে নামলেন গ্যারিঞ্চার পরিবর্তরূপে, কখনও বা নামানো হল সেণ্ট্রাল স্ট্রাইকিং পজিশনে।

জেয়ারজিনো এই জায়গায় অল্পদিনের মধ্যে 'দুরন্ত গোলদাতা'-র খ্যাতি অর্জন করলেন। 'লিট্‌ল ওয়ার্ল্ড কাপ'-এ জুলিনো থাকলেও জেয়ারজিনোকে রিজার্ভে রাখা হল এবং তৃতীয় ম্যাচে ৭ নম্বর জার্সি পরে নেমে একটি গোল করলেন। পোর্তুগালের বিরুদ্ধে ব্রাজিল জিতল ৪-১ গোলে। কিন্তু গোটা ব্রাজিলে তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী একই পজিশনে একাধিক। জেয়ারজিনোর মতই খ্যাতি পাওলো বোরজেস, মার্কস ও নাটাল-এর। তাই আগে ব্রাজিল দলে স্থান পাকা করতে পারেননি। মেক্সিকো বিশ্বকাপে সুযোগ পেলেন ভাগ্যের জোরে। রজারিও আহত হওয়ায় জেয়ারজিনোকে ডাকা হল। অবশ্য এর আগে ইংল্যাণ্ডে বিশ্বকাপে ব্রাজিলের লেফট-উইং-এ তাঁকে দুটি ম্যাচে নামানো হয়। কিন্তু তেমন কার্যকর মনে হয়নি। গোটা ব্রাজিল দলই খারাপ খেলে ছেষট্টির বিশ্বকাপে।

জেয়ারজিনো যত মন্দই খেলুন এবং ব্রাজিল জাতীয় দলে তাঁর সুযোগ প্রাপ্তি যত অনিশ্চিতই হোক, বোটাফোগোয় তাঁর স্থান প্রাপ্তি নিয়ে কোনো সংশয়ই ছিল না। গার্সন বোটাফোগোর আসায় তাঁর সুবিধাও হল। গ্যারিঞ্চা অবসর নেওয়ায় জেয়ারজিনোর দায়িত্ব বাড়ে এবং রাইট-উইং-এ তিনি অদ্বিতীয় হয়ে ওঠেন। বোটাফোগো রিও লীগ চ্যাম্পিয়ন হল, কাপ প্রতিযোগিতায় জিতল অর্থাৎ ডাবলস পেল।

জেয়ারজিনোকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে অন্যান্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে, আবার আঘাতও তাঁকে যেমন বেগ দিয়েছে পর্যন্ত, তেমনি তাঁর খিট্‌খিটে মেজাজও। মুখ থুবড়ে পড়ে একবার বেশ কয়েক মাসের জন্য প্লাস্টার করে রাখা হয়। একবার অন্য একটি আঘাত দেখে শল্য-চিকিৎসকরা বলেন, জোয়ারজিনোর পক্ষে আর কখনও খেলা সম্ভব হবে না। আর একবার তাঁর ডান পায়ের একটি হাড় জোড়ার চেষ্টা হয়, কিন্তু প্রথমবার চিকিৎসকরা সফল হননি। কিছুদিন পরে তিনি মাঠে নামলেন বুটে অতিরিক্ত স্টাড্‌ লাগিয়ে এবং সকলকে অবাক করে আগের চাইতেও ভাল খেলতে থাকেন। জেয়ারজিনোর হঠাৎ উত্তেজিত হওয়ার স্বভাব নিরসন করা হয় অনেক সাবধানবাণী ও সতর্কতার দ্বারা। এজন্য সি বি ডি-র (কনফেডারেকো ব্রাজিলিরা ডেস্পোর্টোস) অবদানই সর্বদাই সর্বাধিক। জাগালো একবার একটি প্র্যাকটিস ম্যাচ মাঝপথে বন্ধ করে জেয়ারজিনোকে রক্তচক্ষু দেখান।

এক মেক্সিকান খেলোয়াড়ের উপর জেয়ারজিনো বদলা নিতেও উদ্যত হয়েছিলেন।

মিউনিখে জেয়ারজিনো যথাসাধ্য খেলেছেন, মেক্সিকোয় উরুগুয়ে ও ইতালির সঙ্গে খেলার দিনে বিপক্ষের বিপজ্জনক ট্যাক্‌লিং এর মুখে পড়েও তিনি কাবু হননি। এবার তাঁকে মেজাজ হারাতে দেখা গেল না। বরং ঠাণ্ডা মাথায় সব ট্যাক্‌লিং-এর মোকাবিলা করে বল নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। লম্বা লম্বা পা ফেলে বিপক্ষকে কাটিয়ে যান অপূর্ব বল কণ্ট্রোল দ্বারা। তাঁর নিখুঁত ও সময়োচিত ক্রস, চমৎকার প্লেসিং ও অপূর্ব দক্ষতায় গোলে শট সকলকে মুগ্ধ করে।

ব্রাজিল জাতীয় দলে অতঃপর জেয়ারজিনোর নির্বাচন নিয়ে আর কোনো দ্বিমত রইল না। কিন্তু ১৯৫৮-এ পা ভেঙে যাওয়ায় চার মাসের জন্য তাকে ফুটবলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়। অথচ ব্রাজিল তখন একের পর এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলে বেড়াচ্ছে। এবারও তিনি সুস্থ হয়ে আগের অবস্থা ফিরে পেয়ে চমৎকার খেলতে লাগলেন।

জোর্গে রাফেল আলব্রেশ্‌ট—জন্ম ১৯৪২। আর্জেন্টিনার চৌখস মিড-ফিল্ড খেলোয়াড় আলব্রেশ্‌ট আক্রমণকালে যেমন অপ্রতিরোধ্য, তেমনি ডিফেন্সে দাঁড়ালে দুর্ভেদ্য হবেন। আর্জেন্টিনার টুকুম্যান শহরে আটলেটিকো টুকুম্যান স্টেডিয়ামের প্রায় বিপরীত দিকেই আলব্রেশ্‌ট-এর জন্ম। শৈশবে বাড়িতে শুয়ে শুয়ে স্টেডিয়ামে হাজার হাজার ফুটবল-দর্শকের আনন্দধ্বনি শুনতেন। তখনই তিনি ভবিষ্যতে বড় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন কিনা কে জানে। তবে চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। ওই ধ্বনিই বোধ হয় অতিকালের মধ্যে তাঁকে টেনে নিয়ে যায় টুকুম্যান ক্লাবে। বড় বড় ক্লাবগুলোর সঙ্গে মাঝে মাঝে টুকুম্যানের খেলা পড়ত আর তখনই আলব্রেশ্‌টের খেলায় নানান স্বাভাবিক গুণ পরিলক্ষিত হতে থাকে। বিভিন্ন ক্লাবের নজরও ছিল তখন থেকে তাঁর উপর। আলব্রেশ্‌ট অবশ্য সাড়া দেন ১৯৬০ সালে এ· টুডিয়ান্‌টেস-এর ডাকে। এক বছর পরে ১৯ বছর বয়সে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে নামলেন। দু'বছর বাদে সই করলেন আর্জেন্টিনার 'পাঁচ প্রধানের' অন্যতম সান লোরেঞ্জোয়। আর তখন তিনি খেলার এত তুঙ্গে যে, তাঁকে দেশের একমাত্র 'কমপ্লিট প্লেয়ার' আখ্যাত করা হল।

সাধারণত লেফট-হাফে খেললেও, মাঝে মাঝে যেতেন সেণ্টার-হাফে।

আবার কখনও বা আক্রমণভাগে। আর সব পজিশনেই তিনি সমান দাপটে খেলতেন।

তিনি ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে খেললেও আর্জেন্টিনা সেবার অত্যন্ত বদনাম কেনে। জার্মানীর বিরুদ্ধে দারুণ ট্যাক্‌লিং-এর জন্য তাঁকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়। শুরুতে আলব্রেশ্‌ট অবশ্য বাইরে যেতে অস্বীকার করেন। কিন্তু পরে তিনি রাজি হন। তাঁর ফুটবল-জীবনে এধরনের ঘটনা এই প্রথম। আর এই কারণেই রীতি অনুযায়ী পরের ম্যাচে খেলতে পারলেন না। আসলে আলব্রেশ্‌ট পরাজিত দলে থাকাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। আর সেই পরাজয় এড়াতে জীবন-পণ করে খেলতেন। সুতরাং মাঝে মাঝে অতি উৎসাহে ফাউল করে ফেলতেন। আবার দলে নিজের গুরুত্ব কতখানি সে সম্পর্কে সর্বদা অবহিত ছিলেন। সান লোরেঞ্জোয় থাকাকালে বেশি টাকার দাবিতে চার মাসের জন্য একাকী ধর্মঘট করেন। চারমাস পরে ক্লাব দাবি পূরণ করতে বাধ্য হয়। আলব্রেশ্‌ট অবশ্য পরের মরশুমে আরও বেশি অর্থের বিনিময়ে মেক্সিকোর লিয়ঁ ক্লাবে চলে যান।

জোসে অগাস্টো—জন্ম ১৯৩৭। পোর্তুগালের কৃতী সেণ্টার ফরওয়ার্ড অগাস্টো দুই উইং ও মিড-ফিল্ডে দক্ষতার সঙ্গে খেলতেন। বেনফিকা ও পোর্তুগালের পক্ষে অসংখ্য বিজয়মালা এনেছেন। অগাস্টো যেমন খেলোয়াড়-জীবনে, তেমনি পরবর্তীকালে ম্যানেজার হয়েও যোগ্যতা দেখান।

জুলাইয়ে পোর্তুগীজ জাতীয় দলের ম্যানেজারশিপের দায়িত্ব পেলেন যখন, তখন ফুটবল মরশুম প্রায় শেষ, কিন্তু রিও ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ট্রফির ফাইনালে সামান্যর জন্য হারে পোর্তুগাল। একদার কৃতী আন্তর্জাতিক মানের ফরওয়ার্ড এত দ্রুত ম্যানেজারশিপেও সফল হবেন, বোঝা যায়নি। আবার এরই কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি বেনফিকার সহকারী ম্যানেজার পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

লিসবনের কাছে ব্যারিরোতে অগাস্টোর জন্ম। বেশ শক্ত, লড়িয়ে ও দ্রুততার জন্য স্থানীয় জারিরেন্স ক্লাবে খেলার সময় তাঁর খ্যাতি ছড়ায়। ১৯৫৯ সালে বেনফিকায় সই করার পর পোর্তুগাল জাতীয় দলে নির্বাচিত হলেন; বেলা গুটম্যান তখনই তাঁকে রাইট-উইঙ্গার বানালেন। অবশ্য অগাস্টো সম্পর্কে আগাম কিছু বলার উপায় ছিল না। তাঁর তো তখন স্ফুরণের সময়। কিছুদিনের মধ্যে আবার পজিশন বদল হল, এবার লেফট-ইন।

যখন রাইট-আউট, অগাস্টো তখন ভীষণ দ্রুতগামী, বেশ শক্তিমান ও

সবচেয়ে সুযোগসন্ধানী। বেনফিকা দলে পাঁচবার ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনাল খেলেছেন। বেনফিকা জেতে ১৯৫৮-তে বার্সিলোনার বিরুদ্ধে ও ইণ্টার ও ১৯৫৮-তে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে।

বিশ্বকাপে পোর্তুগালকে সেমিফাইনালে নিতে তাঁর অবদান অপরিসীম। পোর্তুগাল তৃতীয় স্থান দখল করে প্রধানত অগাস্টোর কৃতিত্বে। ৪-৩-৪ প্রথায় লেফট-ইনে তাঁর দক্ষতা আজও গল্পকথা। গ্রাবা বেনফিকায় আসায় অগাস্টোর অনেক সুবিধাও গোল করায়। তবে এতদিন গোল দিতে তেমন সফল হননি, তা নয়। ওপেনিং ম্যাচে পোর্তুগালে তিনটি গোলের দুটিই অগাস্টোর। ওল্ড ট্রাফোর্ডে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে তাঁরা জেতেন ৩-১ গোলে।

পোর্তুগালের পক্ষে ৪৫টি ম্যাচ খেলেছেন। ওয়ার্ল্ড ক্লাব ম্যাচে বেনফিকার পাঁচটি ম্যাচেই নামেন।

বেনফিকার সহকারী ম্যানেজার অগাস্টো মরশুমে বেনফিকাকে পোর্তুগীজ চ্যাম্পিয়নশিপ এনে দেন। এরই কয়েকদিন পরে পোর্তুগীজ জাতীয় দলকে ব্রাজিল নিয়ে যান। বিশ্বকাপে অগাস্টো কৃতিত্ব দেখালেও ওর পর থেকেই পোর্তুগালের ফুটবলে ঢিলেমী দেখা গেল। তারপর ওরা প্রাণ ফিরে পায় অগাস্টোর হাতে দায়িত্ব দিয়ে।

জোসে কার্লস বাউয়ের—জন্ম ১৯২৫। ১৯৫০ ও ১৯৫৪-র বিশ্ব-কাপে ব্রাজিলের নির্ভরযোগ্য উইং-হাফ বাউয়ের ২৫ বার জাতীয় দলের পক্ষে খেলেছেন। সাওপাওলো দলের জন্য চারবার লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন। খেলা থেকে অবসরের পর ম্যানেজার হন। ইউসেবিও তাঁরই আবিষ্কার, কিন্তু বেনফিকায় টাকার অঙ্ক বেশি থাকায় বাউয়েরের সুপারিশেই ইউসেবিও বেনফিকায় চলে যান।

জোসে লিনান্দ্রো আন্দ্রাদে—জন্ম ১৯০১; মৃত্যু ১৯৫৭। বিশের দশকে উরুগুয়েয়ান ফুটবলে অন্যতম আদর্শ-পুরুষ। মন্টিভিডিওর সেণ্টেনারিও স্টেডিয়ামস্থ ন্যাশিওনাল ক্লাবেই প্রধানতঃ খেলতেন।

ময়লা, অ্যাথলীট চেহারার রাইট-হাফ আন্দ্রাদেকে যেমন তাঁর সতীর্থরা, তেমনি বিপক্ষের খেলোয়াড়রা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ১৯২৪ ও ১৯২৮-এ উরুগুয়ে ওলিম্পিক ফুটবলে জিতলে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায়। তারপর আর কখনও জাতীয় দল থেকে আন্দ্রাদে বাদ পড়েননি।

বয়স যখন ২৯, আন্দ্রাদে আঘাত পেয়ে ফুটবল থেকে অবসরের কথা ভাবছিলেন, কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতাই জাতীয় ফুটবল নির্বাচন কমিটিকে ১৯৩০-এর প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য ডাকতে বাধ্য করে। মন্টিভিডিও বিশ্বকাপে উরুগুয়ে বিজয়ী হল। ১৯৩৩ সালে তিনি ফুটবল থেকে অবসর নিলেও ফুটবলের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ বহুদিন এই খেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে।

টার্সিশিও বার্গনিশ—জন্ম ১৯৩৯। ইতালির এই খেলোয়াড় রাইট-ব্যাকরূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করলেও স্টপার ও সুইপার হিসাবে একই রকম দাপটে খেলতেন। খেলার মাঠে যেমন টাফ্, তেমনি কখনও বিপক্ষের সঙ্গে আপোষ তাঁর চরিত্রে ছিল না। তাঁর এই খেলা সর্বদাই পরিপূরকও ছিল ইণ্টারন্যাজোনেল-এর লেফট-ব্যাক গিয়াসিণ্টো ফ্যাচেত্তির খেলার। এই জুড়ির খেলা ইতালীর চ্যাম্পিয়নশিপে ন্যাজোনেলকে বিজয়ীর সম্মান এনে দেয়

কাপ ও ওয়ার্ল্ড ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপেও সফল হয় ওদের ক্লাব।

বার্গনিশের সিনিয়র গ্রুপে খেলা শুরু স্থানীয় ক্লাব উদিনীজে ১৯৫৯-এ। তবে শুরুটা তাঁর শুভ ছিল না। উদিনীজ সেবার ৭-০ গোলে হারে এ সি মিলানের কাছে। পরের বছর গেলেন জুভেণ্টাসে এবং ১৯৬০-এর ওলিম্পিক ফুটবলে ইতালি দলে নির্বাচিত হলেন। তুরিণে বার্গনিশ নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। জুভেণ্টাসের হয়ে ১৩টি লীগ ম্যাচ খেলার পর চলে যান পালেরমোতে। ইণ্টারের দৃষ্টি পড়ল তাঁর চমৎকার খেলায়। গেলেন মিলানে। ওখানেও বেশ খেললেন এবং ১৯৫৯-র নভেম্বরে রোমে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলার সুযোগ পেলেন।

ইংল্যাণ্ডে ১৯৫৯-র বিশ্বকাপে বার্গনিশ প্রথম দুটি ম্যাচে নামলেন। উত্তর কোরিয়ার কাছে বিপর্যস্ত হওয়া ম্যাচে খেলেননি। কিন্তু চারবছর পর মেক্সিকো বিশ্বকাপে ফাইনাল পর্যন্ত কোনো ম্যাচই ইতালি বার্গনিশকে বাদ দিয়ে খেলেনি। সেমি-ফাইনালে সেণ্টার-হাফে গিয়ে বার্গনিশ পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষে ইতালির চার গোলের একটি করেন। ইতালিতে ফিরে হলেন সুইপার। এর লীগে ইণ্টারের চ্যাম্পিয়নশিপ প্রাপ্তিতে তিনি অসাধারণ খেললেন।

টিটকস, পল—জন্ম ১৯০৮। দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে হাঙ্গেরির খ্যাতনামা

লেফট-উইঙ্গার। স্বাস্থ্যবান টিটকস যখনই বল নিয়ে এগোতেন তখনই বিপক্ষের কাছে বিপজ্জনক হতেন। বিপক্ষরা তাই সর্বদা তাঁর কাছে প্রহরী নিযুক্ত করতেন, যাতে টিটকস নিজে তাঁদের গোলমুখে না এগোতে পারেন বা সতীর্থদের পাস না দেন। জাতীয় দলের ৪৭টি ম্যাচে নেমে ১৩টি গোল করেছেন, খেলেন ১৯৩৮-এর বিশ্বকাপ ফাইনালেও। এম টিকে-র জন্য তিনটি চ্যাম্পিয়নশিপ পদক জেতেন। পরবর্তীকালে কোচ হন হাঙ্গেরিতেই। পঞ্চাশের দশকের বিখ্যাত হাঙ্গেরি দলের দায়িত্ব ছিল টিটকসের উপরেই।

টিম—জন্ম ১৯১৬। ব্রাজিলের এই খেলোয়াড়ের পুরোনাম এলবা ডে পাডুয়া লিমা। তবে ক্রীড়া-জগতে 'এল পিত্তন' (অর্থাৎ সবার উপরে) নামেই খ্যাত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপসে আঁকাবাঁকা দৌড়ের জন্যই টিম ওই নামে পরিচিত হন। মাত্র ১২ বছর বয়সে দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলা শুরু করেন এবং ১৬ বছরের সময় বোটাফোগোর প্রথম দলের সুযোগ পান অপূর্ব বল কন্ট্রোল ও ড্রিবলিং দক্ষতার জন্য। ১৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। তবে বিশ্বকাপে মাত্র একবার খেলেন, ১৯৩৮ সালে।

টিল্কেয়োস্কি, হান্স—জন্ম ১৯৩৫। পশ্চিম জার্মানীর অসীমসাহসী গোলরক্ষক টিল্কেয়োস্কি গোললাইনের উপর চমৎকার খেললেও তাঁর গোটা অঞ্চলে অমন ছিলেন না। ওই এলাকায় সর্বদাই কেমন যেন নার্ভাস মনে হত। বিপক্ষের কেউ বল নিয়ে এলেই টিল্কেয়োস্কিকে চিন্তিত দেখাত। বিশ্বকাপ ফাইনালে গোললাইন ছেড়ে সরে যাওয়ায় তিনি তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন। অথচ তার আগে গোল রক্ষা করতে গিয়ে তিনি হার্স্টের সঙ্গে সংঘর্ষে পড়েছিলেন।

অত্যন্ত শক্ত এই টিল্কেয়োস্কি ১৯৫৭ থেকে জার্মানার সেরা গোলরক্ষকরূপে পরিচিত। তবে ফারিয়ান থাকায় চিলি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাননি। তবুও ৩৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেমে রেকর্ড করেন। টিল্কেয়োস্কির এই রেকর্ড ম্লান করেন শেপ মেয়ার। টিল্কেয়োস্কি ইউরোপীয়ান কাপ উইনার্স কাপ জিতে আসেন বোরাশিয়া ডর্টমুণ্ড-এর জন্য।

টিশি লাজোস—জন্ম ১৯৩৫। হাঙ্গেরির দুর্দান্ত গোল-স্কোরিং ইনসাইড ফরওয়ার্ড। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি হাঙ্গেরির বিশ্বখ্যাত জাতীয় দল ভেঙে

গেলে টিশি জাতীয় দলে নির্বাচিত হন এবং ফ্লোরিয়ান আলবার্টের সহযোগিতায় তিনি বিপক্ষের গোলমুখে বিস্ফোরণ ঘটাতেন। টিশির যদি ফুটবল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর না হত, তা হলে ১৯৫৫ থেকে শেষ পর্যন্ত ৭০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলার সুযোগ পেতেন। জাতীয় দলের পক্ষে টিশি ৪৯টি গোল করেছেন এবং এর অধিকাংশই চমৎকার ড্রাইভে। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে হাঙ্গেরির সাত গোলের চারটিই তাঁর। করেন তিনটি।

হনভেড দলে তাঁর প্রথম খেলা ১৮ বছর বয়সে। ১৯৫৩-য় ব্রাসেলসে 'উয়েফা' যুব ফুটবলে হাঙ্গেরির বিজয়ের পরই ওরা তাঁকে নিয়ে যায়। হনভেডে বড় বড় খেলোয়াড়ের পাশে টিশি নিজেকে মানিয়ে নেন নিখুঁত খেলে। বুদ্ধি, স্কিম ও নব নব ক্রীড়াধারার দ্বারা বিপক্ষের কাছে বিপজ্জনক স্ট্রাইকার হয়ে ওঠেন। তবে তিনি পূর্বসূরীদের মত সুপার-খেলোয়াড় হতে পারেননি। তবুও তাঁদের মতই সুযোগ-সুবিধা দাবি করতে থাকেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর এই সব দাবি না মানায় টিশিও জাতীয় দলের খেলায় আগ্রহ দেখাননি এবং ১৯৬৪ থেকে আর তাঁকে জাতীয় দলে ডাকা হয়নি। অবশ্য একবার পাঁচ মিনিটের জন্য জাতীয় দলে খেলে আন্তর্জাতিক ম্যাচের সংখ্যা ৭১-এ এগিয়ে নেন।

তবে হনভেডের জন্য পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম অব্যাহত রেখেছিলেন। তিন শতাধিক লীগ ম্যাচে পাঁচবার সর্বোচ্চ গোল দাতা ছিলেন।

টোস্টাও—জন্ম ১৯৪৭। পুরোনাম এডুয়ার্ডো গনসালভেস আন্দ্রাদে। চোখে গুরুতর অস্ত্রোপচারের পরও বিশ্বকাপে টোস্টাও ব্রাজিলের তৃতীয়বার জুল রিমে ট্রফি জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। টোস্টাও-এর সর্বদা প্রবণতা ব্যাকপাসে। কিন্তু যতক্ষণ সতীর্থরা ফাঁকা জমিতে না দাঁড়ান, ততক্ষণ বল নিজের দখলেই রাখতেন। তারপর সুযোগ বুঝে নিখুঁত পাস। আর সুযোগ না মিললে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে সোজা গোলে মারতেন। দর্শকরা তাঁকে 'শ্বেতকায় পেলে' আখ্যা দিয়েছিলেন। মেক্সিকো বিশ্বকাপে পেলে ও টোস্টাওর মধ্যে বেশ মিল পাওয়া যায়।

টোস্টাওর খেলার অধিকাংশ ছিল প্রখর বিচক্ষণতায় ভরা। আর এই বুদ্ধিদীপ্ত খেলাই তাঁর শারীরিক দুর্বলতাকে ঢেকে রেখেছিল। বল নিয়ে

ছুটতে বা যথাসময়ে যথার্থ পজিশনে চলে যেতে তাঁর জুড়ি কমই মেলে। খেলার গতিবিধি উপলব্ধিতে তাঁর তুলনা হয় না। বল পায়ে রেখে তিনি যেন পরম স্নেহে আদর করতেন। কিন্তু তাঁর শুটিং যেমন তীব্র, তেমনি তীক্ষ্ণ। নিজের খেলার উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন। বিশ্বকাপের পর দেখা যায় দীর্ঘদিন শুধু দুর্বল ডান পায়েই অনুশীলন করছেন। অবশেষে দেখা গেল তাঁর ডান পা কোনো অংশেই তাঁর বিখ্যাত বাঁ পায়ের চেয়ে কম নয়।

টোস্টাও এই ডান পায়ে তাঁর বাবাকে বিস্মিত করেছিলেন। কৈশোর থেকেই তাঁর ভীষণ আশা ছিল টোস্টাও রাইট-ইন হবে, লেফট-ইন নয়। টোস্টাও পর্যন্ত বেলো হরিজণ্টে জুনিয়র দলে ছিলেন। তারপর আমেরিকা ক্লাবের জুনিয়রে। এই ক্লাবের সাফল্য ক্রুজিরো-কে আকৃষ্ট করে এবং তাঁরা ওঁকে এক হাজার পাউণ্ডে কিনে আনলেন। কিন্তু আলাপ-আলোচনার পর ক্লাব বদল করলেন। সিনিয়র দলে প্রথম মরশুমে লীগে ১৩টি গোল করেন। দর্শকদের পক্ষে সেই থেকে কড়া নজর ওঁর দিকে। ১৮ বছরে যখন ক্রুজিরোর পক্ষে ১৪টি গোল করে তাদের লীগ চ্যাম্পিয়নে সহায়তা করেন, তাঁর জনপ্রিয়তাও বাড়ে। ক্রুজিরোর উপর্যুপরি পাঁচবার লীগ জয়ের এটি উদ্বোধনী বছর।

সারা ব্রাজিলে টোস্টাও-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। রিও চ্যাম্পিয়ন ফ্লেমেঙ্গোকে ৬-২ গোলে হারাল ক্রুজিরো। এর তিনটি টোস্টাও-এর। মে মাসে চিলির বিরুদ্ধে ব্রাজিল দলে নির্বাচিত হলেন তিনি। প্রথম খেলায় টোস্টাও গোল করতে না পারলেও কয়েক সপ্তাহ পরে পেরুর বিরুদ্ধে গোল দিলেন। ইংল্যাণ্ডে বিশ্বকাপে যাওয়ার পথে সুইডেনের বিরুদ্ধে দুটি এবং বিশ্বকাপে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ব্রাজিলের একমাত্র গোলটি তাঁরই।

চোখ পরীক্ষার পর দেখা গেল রেটিনা বিচ্ছিন্ন। টোস্টাও টেক্সাসের হিউসটনের হাসপাতালে চলে গেলেন অপারেশনের জন্য। শল্য-চিকিৎসক যদিও আশ্বাস দিলেন ১২০ দিন পরে টোস্টাও খেলার মাঠে ফিরতে পারবেন, তবুও কোনো গ্যারান্টি ছিল না—আবার তিনি আগের অবস্থায় ফিরবেন।

টোস্টাও সব সংশয়ের অবসান ঘটান মেক্সিকোয় চমকপ্রদ খেলার দ্বারা। প্রতিটি ম্যাচে গোলের সুযোগ করে দেন পেলে, রিভেলিনো ও জেয়ারজিনোর জন্য। কোয়ার্টার ফাইনালে তো পেরুর বিরুদ্ধে নিজেও দুটি গোল করলেন। মেক্সিকোয় তাঁর খেলা দেখে সারা বিশ্ব স্বীকৃতি দিল এমন চমৎকার, বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসিকতাপূর্ণ ফুটবল কদাচিৎ দেখা যায়। এরই ফলশ্রুতি টোস্টাওর ভাস্কো-ডা-গামা ক্লাবে ট্রান্সফার। ওরা ওঁকে রেকর্ড ফি—২,২০,০০০ পাউণ্ড দিয়ে নিয়ে গেল। এতদিন পর টোস্টাও ভাবলেন, 'যোগ্য মর্যাদা পাওয়া গেল।' কিন্তু তখনও তাঁর চোখ মাঝে মাঝে কষ্ট দিচ্ছিল।

ড্যানি ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার—জন্ম ১৯২৬। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বিতর্কিত উইং-হাফ ড্যানি ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার পেশাদারী ফুটবলারদের সমাজের উঁচুস্তরে পাংক্তেয় করে তোলেন, প্রমাণ করেন ফুটবল খেলতে শুধু পা নয়, মস্তিষ্কেরও প্রয়োজন। অন্যান্যদের তুলনায় ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার পরিণত ফুটবলার হন অনেক দেরিতে, কিন্তু ত্রিশের কাছে পৌঁছেও খেলার গতি অব্যাহত রাখেন নিখুঁত-ভাবে। খেলার সময়ে তাঁর বিপুল উদ্দীপনা, ট্রেনিং-এর সময় কঠোর পরিশ্রম আজও যে কোনো খেলোয়াড়ের সঙ্গে তুলনীয়।

কিন্তু মাঠের বাইরে তিনি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। অধিকাংশ আইরিশম্যানের মত সর্বদাই তিনি নানা প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সব সময়েই খটাখটি লেগে থাকত। আবার সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রশ্নের সমাধানও করতেন। ১৯৪৯-এ গ্লেনটোরান থেকে ব্রানসলিতে যেতেই কর্তৃপক্ষ তাঁকে সহজে মেনে নিতে পারেননি কম বয়সী বলে। তাছাড়া ড্যানিকে বয়সের তুলনায়, অভিজ্ঞতার তুলনায় একটু বেশি প্রগতিবাদী মনে হয়েছিল ওদের কাছে। মতান্তরের জন্য ড্যানি চলে গেলেন অ্যাস্টন ভিলায় ১৯৫১ সালে মাত্র ১৫ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে। একদার বিখ্যাত ক্লাব হলে কী হবে—তাদের পড়তি অবস্থা চলছিল তখন। তবুও খেলার তেমন সুযোগ মিলল না ড্যানির। ১৯৫৪-য় তাই গেলেন টটেনহামে। তাঁকে দেওয়া হল ৩০ হাজার পাউণ্ড। ড্যানি ওই অর্থের দামও দিলেন চমৎকার খেলে। কিন্তু ব্লাঞ্চ-

ফ্লাওয়ারের খেলার পদ্ধতি অধিকাংশেরই অপছন্দ। গ্যালারিতে বসে কর্তৃপক্ষ ভাবতেন, ব্লাঙ্কফ্লাওয়ারের ট্যাকটিক্‌স এমন কিছু আহামরি নয়। পরে ম্যানেজার বিল নিকলসন কর্তৃপক্ষকে বোঝালেন: আপনাদের ধারণা যথার্থ নয়। ওঁদেরই কাছে অতঃপর ব্লাঙ্কফ্লাওয়ার হিরো হয়ে গেলেন।

১৯৫৮-র বিশ্বকাপ ব্লাঙ্কফ্লাওয়ারকে আরও বেশি সম্মান দিতে পারত। সন্দেহ নেই আহত খেলোয়াড়দের নিয়ে তাঁর নেতৃত্ব ও পিটার ডোহার্টির ম্যানেজারশিপেই উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে দেয়। ড্যানির বয়স তখন ৩২। তবুও তরুণরা তাঁর সঙ্গে পেরে উঠত না। প্রথম ডিভিশনেও তরুণদের হিমসিম খাওয়াতেন। বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতা তো তাঁকে আরও উৎসাহিত করে এবং ক্লাবের ম্যাচে তিনি অসাধারণ খেলতে থাকেন।

প্রথমে টমি হার্মার ও পরে জন হোয়াইটের সঙ্গে তিনি স্পার্সকে ইংল্যাণ্ডের সেরা দলে পরিণত করেন। লীগ ও কাপ জিতে ডাবল পেল। লীগের ৪২টি ম্যাচেই খেলেন। নামেন এফ এ কাপের সাতটি ম্যাচেই। ড্যানির অক্লান্ত পরিশ্রম, বুদ্ধির প্রয়োগ ও নিখুঁত বল বণ্টন ইত্যাদি তাঁকে 'ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' করল। ড্যানি ১৯৫৮-তেও ওই সম্মান পেয়েছিলেন। সত্তরের দশকে স্পার্সের গোলের সংখ্যা কমে গেলে সমালোচকেরা বললেন: ব্লাঙ্কফ্লাওয়ারের ট্যাক্‌লিং-এ সেই শক্তি আর নেই। তাঁর এই দুর্বলতা ঢেকে দেন 'ষষ্ঠ' ফরওয়ার্ড ম্যাকে।

স্পার্সের নানা সাফল্যের নেপথ্য নায়ক এই ব্লাঙ্কফ্লাওয়ার। পায়ের আঘাত তাঁর খেলায় যে ঘাটতি এনেছিল, তা পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়নি। তবুও ফুটবল থেকে সঙ্গে সঙ্গেই অবসর নেননি। ৬০০টি ক্লাব ম্যাচ খেলেছেন এবং আয়ারল্যাণ্ডের পক্ষে মোট ৫৩টি। তাঁর এই রেকর্ডের সমকক্ষ হন বিলি বিংহাম।

খেলা থেকে অবসর নিয়ে সাংবাদিকতার পেশায় চলে আসেন পুরোপুরি। খেলার মাঠে পায়ের কাজের মতোই কলমও তাঁর চমৎকার। 'সানডে এক্সপ্রেস'-এ নিয়মিত লেখা ছাড়াও ওদের প্রতিনিধিরূপে দেশে দেশে ভ্রমণেরও সুযোগ পান। লেখা শুরু করলেন 'নিউ স্টেটসম্যান'-এ। টেলিভিশনেও যোগ দেন ভাষ্যকাররূপে। কিন্তু ফুটবলের মত এখানেও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর দেখা দিল।

ডিডি—জন্ম ১৯২৮। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে ব্রাজিলের মিড-ফিল্ডের এই দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়ের পুরোনাম ভালডির পেরিরা। বিশ্বখ্যাত এই খেলোয়াড় ম্যানেজার হয়েও দারুণ সাফল্য অর্জন করেন। ১৯৫৮-এর বিশ্বকাপে পেরু দর্শনীয় ও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে ডিডিরই নেপথ্য ভূমিকায় তথা ম্যানেজারশিপে।

ডিডির জীবন কিন্তু অন্যখাতে বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল সমধিক। ১৪ বছর বয়সে এক অ্যামেচার দলে খেলার কালে ডান হাঁটুতে বিপক্ষের এক প্রচণ্ড শট ধরেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বড় একটি ফোঁড়া হয়। আর সেই ফোঁড়া এমন হল যে, চিকিৎসকরা বললেন, হাঁটু কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সুচিকিৎসা ও সেবার দ্বারা ডিডি হাঁটু কেটে ফেলা থেকে অব্যাহতি পান। ছয় মাস তিনি হুইলচেয়ারে কাটালেন। এর পরও দেখা গেল ডান পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। ১৯৪৬-এর মধ্যে মোটামুটি সুস্থ হয়ে আমেরিকানো ক্যাম্পোসে যোগ দিলেন। ১৯৪৯-এ গেলেন রিও ও মাদুরিরায়। ওখানে বেশ তাড়াতাড়িই রিও ডি জেনিরোর প্রথম ডিভিশনে সুনাম পেলেন। ১৯৫০-এ ফ্লুমিনেন্স তাঁকে কিনে নিল। এবার ডিডি আরও খ্যাতি অর্জন করলেন এবং সেরা লিংকিং ইনসাইড ফরওয়ার্ড পরিগণিত হলেন।

ফ্লুমিনেন্সে থাকাকালেই ডিডি 'ডেড্-বলে' 'কার্ভিং কিক্' করতেন। আর এই শটের পথিকৃৎ তিনিই। ব্রাজিলে তাঁর এই শট 'ফোলা সেকা' (শুকনো পাতা) নামে পরিচিত হয়। এই স্কিলই তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে তোলে। অনেকের ধারণা জন্মে, ডিডি ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলেই ওই 'ফোলা সেকা'-য় কুশলী, কিন্তু ডিডি পরিষ্কার জানান, 'প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা নয়—বছরের পর বছর কঠোর অনুশীলন দ্বারাই ফোলা সেকা রপ্ত করেছি।' প্রতিদিন তো তিনি অন্তত চার ঘণ্টা প্রাকটিস করতেন শুধু শুটিং ও ক্রস-ফিল্ড পাস।

১৯৫০-এ ডিডি রিও ডি জেনিরোর যুবকদের পেশাদার দলভুক্ত হয়ে নতুন মারাকানা স্টেডিয়ামে নেমে প্রথম গোল করলেন, পরের বছর ফ্লুমিনেন্স লীগ চ্যাম্পিয়ন হল। ডিডির পাসিং স্কিল ও অন্যান্য নৈপুণ্য ব্রাজিলের ম্যানেজার জেজে মরিরার দৃষ্টি এড়াল না। তিনি ডিডিকে চিলিতে ১৯৫২-র প্যান আমেরিকান গেমসের অন্তর্ভুক্ত করলেন। ব্রাজিল জাতীয় দলের পক্ষে ৭২টি ম্যাচের উদ্বোধনী খেলাটিতে নামলেন এপ্রিলে এবং ব্রাজিল ২-০ গোলে

মেক্সিকোকে হারাল। ডিডিকে তারপর আর ব্রাজিল দল থেকে বাদ দেওয়া যায়নি। গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে খেলতে। ১৯৫৬-য় বোটাফোগোয় যেতেই সংবাদপত্রের সমালোচকরা বিরূপ মন্তব্য শুরু করলেন: ডিডি 'ফোলা সেকা' মারতে পারছেন না। আসলে বোটাফোগো তাঁকে ওই অনুশীলনের সুযোগ দিত না। তবুও ১৯৫৭-র মরশুমে তিনি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ২১টি গোল করলেন। পেরুর বিরুদ্ধে তাঁর 'ফোলা সেকা'-ই সুইডেনের বিশ্বকাপে ফাইনাল রাউণ্ডের জন্য নির্বাচিত করল। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সাফল্যের প্রধান স্তম্ভ হলেন ডিডি। সব ম্যাচেই জয়ের উৎসরূপে দেখা দেন। বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়ের শিরোপাও পেলেন তিনি।

১৯৫৮-য় রিয়াল মাদ্রিদ তাঁকে কিনল বোটাফোগোর কাছ থেকে। ডিডি চামার্টিনে অবতরণ করলেন 'ওয়ার্লডস্ গ্রেটেস্ট' ও একজন 'ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ন' হিসাবে। ডি স্টিফানো কিন্তু বিশেষণ দুটিতে খুব খুশি ছিলেন না। কেননা, তিনি নিজেকে সবার সেরা বলেই জানতেন। আর রিয়াল মাদ্রিদ তো তাঁরই দল। কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিনি সহ্য করতেন না। আর তাই ডিডির বিরুদ্ধে নানা ধরনের প্রচার শুরু হল। তাঁকে একঘরে করে রাখা হল। অপ্রীতিকর ব্যাপার দেখে রিয়াল মাদ্রিদ সাময়িকের জন্য ডিডিকে ধার দিল ভ্যালেন্সিয়া দলে। ডিডি এসব নিয়ে বেশ অসন্তুষ্ট। তিনি অনুরোধ করলেন রিয়ালকে: অপনারা আমার চুক্তি বাতিল করুন। ডিডি ১৯৬০-তে বোটাফোগোয় ফিরলেন।

তখন আর তিনি আগের ডিডি নন, অনেকটা বুড়িয়ে গেছেন।

লীগ খেতাব এনে দিলেন। আবার ব্রাজিল দলে ডাক পড়ল চিলির বিশ্বকাপে খেলার জন্য। ডিডির গতি তখন সামান্য শিথিল, তবু ছটি ম্যাচেই বেশ খেলেন ও ব্রাজিল আবার বিশ্বকাপ জিতল। শেষ দিকে ডিডি পেরুর স্পোর্টিং ক্রিস্টাল থেকে ম্যানেজারশিপের আমন্ত্রণ পেলেন এবং তা গ্রহণও করলেন। বিশ্বকাপে পেলেন পেরু জাতীয় দলের দায়িত্ব। তাঁর ম্যানেজারশিপে পেরু প্রতিটি ম্যাচে বিপক্ষদের কাঁপিয়ে দিল। আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে তারা মেক্সিকোয় গেল ফাইনাল রাউণ্ডের জন্য। একসময় ডিডি বলেন, তাঁর দল ভাল খেলবে ব্রাজিলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরে। ডিডি-র ধারণা অসত্য ছিল না। কিন্তু পেরু ২-৪ গোলে হেরে যায় ব্রাজিলের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে। সন্দেহ নেই মেক্সিকো বিশ্বকাপে এটাই ছিল

সেরা ম্যাচ। ডিডির আমন্ত্রণ আসে আর্জেন্টিনা থেকে রিভার প্লেট দলের ম্যানেজারশিপের জন্য।

ডি স্টিফানো, আলফ্রেডো—জন্ম ১৯২৬। পঞ্চাশের দশকের অন্যতম সেরা সেণ্টার ফরওয়ার্ড আর্জেন্টিনার ডি ষ্টিফানো। এমন সেণ্টার ফরওয়ার্ড যে, তখন রিয়াল মাদ্রিদের গোটা দলের খেলা হত তাঁকে কেন্দ্র করেই। 'আমিই সবার সেরা' ডি ষ্টিফানোর এই দাবি নিছক অযৌক্তিক ছিল না। অমন চৌখস ও গোটা দলের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা তখন যেমন কারুর ছিল না, আজও কারুর নেই। নিশ্চিতই রিয়াল মাদ্রিদ তাঁর কাছে অনেক ঋণী। ডি ষ্টিফানোকে বাদ দিয়ে পরপর পাঁচবার ইউরোপীয়ান কাপ জয় রিয়ালের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। সেণ্টার ফরওয়ার্ড হিসাবে হিদেকুটির চাইতে দশগুণ কুশলী ও ক্ষমতাবান ছিলেন। কী তাঁর স্ট্যামিনা! একই মিনিটে গোলে শট আবার নিজেদের পেনাণ্টি-এলাকায় ছুটে এসে বিপক্ষকে ট্যাকল করা—এমন ঘটনা আজকাল কমই দৃষ্ট হয়।

স্ট্যামিনা বাড়াতে ডি ষ্টিফানো বুয়েনস আয়ার্সের রাজপথে কিশোরদের মত নিয়মিত দৌড়তেন। ওই শহরেই এক ব্যারাকে ১৯৪২-র ৪ জুলাই তাঁর জন্ম। বাবা প্রাক্তন ফুটবলার, তাই ছেলেবেলা থেকেই ডি ষ্টিফানো খেলার জন্য উৎসাহ পান। খেলা শুরু করেন রিভার প্লেটের চতুর্থ অ্যামেচার দলে। পেশাদার খেলোয়াড় হন ১৯৪২-এ। সিনিয়র দলে সুযোগ পেলেন পরের বছর। কিন্তু ১৯৪৫-এ ধারে গেলেন হারাকান-এ। একবছর না কাটতেই রিভার প্লেট আবার ওকে ফেরত আনল। ১৯৪৫-এর মরশুমে তাঁর চমকপ্রদ খেলা 'দ্য ব্লণ্ড অ্যারো' আখ্যা দিল। ১৯৪৭ সালেই পুরো মরশুমটা খেলেন এবং রিভারের জন্য লীগ জয় করলেন, ২৭টি গোল দিয়ে হলেন টপ-স্কোরার। দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপসের সাতটি ম্যাচেই সুযোগ পেলেন এই মরশুমেই, আর্জেন্টিনা বিজয়ীও হল।

এর পরেই আর্জেন্টিনা থেকে প্রথম শ্রেণীর পেশাদাররা বগোটায় চলে যান মোটা টাকার বিনিময়ে। কলোম্বিয়ান এফ এ ও ফিফা বিরোধী লীগ চালু হওয়ায় খেলোয়াড়রা ওই সুযোগ নেন। ডি ষ্টিফানো ১৯৫৩ পর্যন্ত মিলিও-নারিওসে রইলেন। এর মাঝে ১৯৫০ ও ১৯৫২-য় চ্যাম্পিয়নশিপ পদক জেতে ওই ক্লাব।

১৯৫৩-য় কলোম্বিয়ায় খেলোয়াড় সমাবেশের অবসান ঘটে। ডি ষ্টিফানোর

ডাক পড়ল রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সিলোনা থেকে। এই নিয়ে প্রচুর তিক্ততা দেখা দেয়। সলোমন রায় দিলেন ও স্প্যানিশ ফেডারেশন ডিক্রি পেল। নির্দেশ এল ডি স্টিফানো দুই দলেই খেলবেন পালা করে। কিন্তু রিয়াল নিজের স্বার্থে বার্সিলোনার সঙ্গে আপোষ করে ডি স্টিফানোকে পুরোপুরি নিজেদের দলে রাখলেন।

সোনালী চুলের এই আর্জেন্টেনীয় পরে স্পেনের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খেলারও যেন আমূল পরিবর্তন ঘটল। তাঁর চমৎকার পাস, গোলমুখে মারাত্মক শট গোটা দলের খেলোরও আদল পাল্টে দিল। ১৯৫৫-৫৬-য় যখন ইউরোপীয়ান কাপ প্রবর্তিত হয়, রিয়াল তখন স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়ন, ইউরোপীয়ান কাপও জিতল তারা প্যারিসে ফাইনালে ৪-৩ গোলে রিমসকে হারিয়ে। পরবর্তী চার বছর ওই কাপ জয়ের মূলে ডি স্টিফানোর অবদানই সর্বাধিক ছিল।

সত্যি বলতে কী ডি স্টিফানো কখনও সানন্দে কারুর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে পারতেন না। তাই একটি মরশুম প্রায় না খেলেই কাটাতে হয় মাদ্রিদে। ফ্রান্সের রেমণ্ড কোপা রাইট-উইং-এ খেলেন বিকল্প পজিশনেই। ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু ফেরেঙ্ক পুসকাস। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুসকাস ১৯৫৬-য় হাঙ্গেরিতে বিপ্লবের সময় দেশ ছেড়ে ইতালীর হয়ে খেলতে আসেন এবং ডি স্টিফানো একই দলে তাঁর সঙ্গে মানিয়েও নেন অত্যন্ত সহজে। ১৯৬০-এর ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনালে হ্যামডেন পার্কে আইনট্রাশট ফ্রাঙ্কফুর্টের বিরুদ্ধে রিয়ালের সাত গোলে তিনটি ছিল ডি স্টিফানোর ও চারটি পুসকাসের। পুসকাস বেশি গোল করলেও ডি স্টিফানো কিন্তু অখুশি ছিলেন না।

ওই বছরের শেষের দিকে পেনারোলকে হারিয়ে রিয়াল ওয়ার্ল্ড ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী হয় ডি স্টিফানোর নেতৃত্বেই। তিনি রিয়ালে আরও চার বছর রইলেন এবং ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনালে রানার্স হল ইন্টারের কাছে হেরে। বয়স তখন ৩৮। এই বয়সে বার্সিলোনার প্রথম ডিভিশনের নীচের দিকের ক্লাব এসপানোলে চলে গেলেন, আর তাই নিয়ে দারুণ সাড়া পড়ল। বস্তুতঃ তাঁর মত খেলোয়াড়ের এই 'অবনতি' কেউ মেনে নিতে পারছিলেন না।

৪০ বছর বয়সে ডি স্টিফানো ফুটবল থেকে অবসর নিলেন। এর ১১ বছরই কাটিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদে এবং জিতেছেন একবার ওয়ার্ল্ড ক্লাব চ্যাম্পিয়ানশিপ

পদক, পাঁচবার ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ পদক ও আটটি অন্যান্য চ্যাম্পিয়নশিপ পদক। নিজের ৫৮টি ইউরোপীয়ান কাপ ম্যাচে ৪৯টি গোল করেছেন। স্প্যানিশ লীগে পাঁচবার সর্বোচ্চ গোলদাতা। এই লীগে সর্বোচ্চ খেলার সংখ্যা ৩০। ডি ষ্টিফানো গোল দিলেন ১৯৫৪-য় ৩০টি,
১৯৫৭-য় ৩১টি, ১৯৫৮-য় ১৯টি এবং ১৯৫৯-এ ২৩টি।

স্পেনে ১৩ বছর থাকাকালে ৬০০ ম্যাচ খেলেছেন, গোল করেছেন সাড়ে চারশ'। এর মধ্যে কিন্তু প্রীতি ম্যাচ, ট্যুর গেম ও অন্যান্য খেলার চারশ' গোল ধরা হয়নি। দু'বার পেয়েছেন ফরাসীদের নির্বাচিত 'ইউরোপীয়ান ফুটবল অফ দ্য ইয়ারের' সম্মান ১৯৫৭ ও ১৯৫৯-এ।

ডি ষ্টিফানোর কেবল বলার মত রেকর্ড নেই বিশ্বকাপ ফুটবলে। আসলে একবারও তিনি বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল রাউণ্ডে খেলার সুযোগ পাননি। কুবালা, সুয়ারেজ, জেন্টো ও ডি ষ্টিফানো থাকা সত্ত্বেও স্পেন ১৯৫৮-র বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে আসতে পারেনি। ১৯৪২-তে ডি ষ্টিফানো চিলির বিশ্বকাপে যেতে পারেননি আহত থাকায়। তবে স্পেনে জাতীয় দলে মোট ২৩টি গোলের রেকর্ড আছে। ১৯৫৬-য় নেদারল্যাণ্ডসের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় করেছিলেন হ্যাটট্রিক।

খেলোয়াড়-জীবনের শেষদিকে তিনি শপথ নেন, 'আর যাই হই, ম্যানেজার কখনও নয়।' কিন্তু পরে তিনি এই সিদ্ধান্ত বদলান। কিছুদিন স্পেনে ম্যানেজারশিপের 'শিক্ষানবিশী' করেন, ১৯৪২-তে স্বদেশে ফেরেন। আর্জেন্টিনায় গিয়ে বোকা জুনিয়র দলের ম্যানেজার হন। আর্জেন্টিনার জনসাধারণ ও সংবাদপত্র ডি ষ্টিফানোর কড়া সমালোচনা করলেন। কিন্তু ডি ষ্টিফানো ওসবের তোয়াক্কা না করে গভীর মনোযোগে খেলোয়াড় তৈরির কাজে ব্যাপৃত রইলেন—ঠিক যেমন সাধনা ও অধ্যবসায়ে নিজে বড় হয়েছিলেন। সারা দেশ থেকে খুঁজে আনলেন তরুণ প্রতিভাবানদের। ওদের শারীরিক সক্ষমতার দিকে নজর দিলেন বেশি মাত্রায়। ৪-৩-৩ প্রথা বন্ধ করে দুই উইঙ্গার প্রথা চালু করলেন। বাদ দিলেন জনপ্রিয় খেলোয়াড় উবাল্ডো, অ্যার্টনিও র‍্যাটিনকে। ক্লাব ও জাতীয় দলের অধিনায়ক র‍্যাটিন অবশ্য সসম্মানে অবসর নেন। ডি ষ্টিফানো আর্জেন্টিনার ফুটবল-পাগলদের বিক্ষুব্ধ করে তুললেন। কিন্তু ঝড় থামল, বোকা মরশুম শেষে যখন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হল।

ডি ষ্টিফানো আবার স্পেনে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা, এর আগে তিনি ওখানে বাড়িও তৈরি করেছিলেন নিজের বসবাসের জন্য। ১৯৭০-এ তিনি ভ্যালেনসিয়ার ম্যানেজারের দায়িত্ব নিলেন এবং ২৪ বছরের মধ্যে তাদের জন্য প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের পদকটি এনে দিলেন। ডি ষ্টিফানো প্রমাণ করলেন আবার—আমিই শ্রেষ্ঠ।

ডিক্সি ডিন—জন্ম ১৯০৭। বিশেষজ্ঞদের মতে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইংল্যাণ্ডের ডিক্সি ডিনের মত সেণ্টার ফরওয়ার্ড আজও জন্মগ্রহণ করেননি। তবে নিঃসন্দেহে তিনি সবচাইতে সক্রিয় ছিলেন তাঁর আমলে। ১৯২৪ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে ৪৩৭টি লীগের খেলায় ৩৭৯টি গোল করেন। আর্থার রাউলে ছাড়া আর কেউ ওই রেকর্ড ম্লান করতে পারেননি। ডিক্সির ৩৭৯টি গোলের ৩১০টি প্রথম ডিভিশন লীগে—এ রেকর্ড ভেঙেছেন একমাত্র জিমি গ্রিভস। এভার্টনের পক্ষে গোল করেন ৩৪৯টি। একটি ক্লাবে কারুর এই রেকর্ড নেই, ওখানে ১৯২৭-২৮ মরশুমেই গোল ৬০টি। প্রথম ডিভিশনে দ্বিতীয় টপ-স্কোরারের গোল ৪৯টি।

ডিন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ১৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ১৮টি গোল করেন। ডিক্সি ডিনের ক্লাব ও জাতীয় দলে গোলের সংখ্যা আরও বাড়ত, যদি না তিনি ঘন ঘন আহত হয়ে বসে থাকতেন। ১২ বার তো তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। আর এজন্য ১০০টি ম্যাচে নামতেই পারেননি।

তবুও ডিক্সি ডিনকে খেলার মাঠে পাওয়া গিয়েছিল এই-ই বোধহয় যথেষ্ট। কৈশোরে জন্মস্থান বার্কেনহেড-এর ট্রানমার রোভার্সে খেলার সময় বিপক্ষের এক খেলোয়াড় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর তলপেটে এমন লাথি মেরেছিল যে, ডিক্সি ডিন মারাই যেতেন। ১৯২৫ সালে তিন হাজার পাউণ্ড চুক্তিতে এভার্টনে আসার কিছুদিনের মধ্যে পথ-দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে এলেও তাঁর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে।

ডিক্সি ডিনকে বিশ্ব ফুটবল-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় আখ্যা কেবল কলমে দেওয়া হয়নি। শটে যেমন শক্তি, দৌড়ে তেমনি গতি। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল তাঁর পদক্ষেপ। দুই পায়েও ওঁর সমান শক্তি। তদুপরি অসীম সাহস ও একাগ্রতা, আর সর্বোপরি চমৎকার হেড—সব মিলিয়েই ডিক্সি ডিন 'শ্রেষ্ঠ' খেলোয়াড়ের আখ্যা পেয়েছেন। শূন্যের বলে তাঁর অপূর্ব ক্রীড়া-নৈপুণ্যই দর্শকদের হৃদয় জয় করে। ডিক্সি ডিন সংবাদপত্রের শিরোনাম

হন এক মরশুমে ৬০ গোলের রেকর্ড করে। তার আগের মরশুমে দ্বিতীয় ডিভিশনে মিডলবরোর জর্জ ক্যামসেল ৫৯ গোল দিয়ে রেকর্ড করেন। ডিক্সি ডিন ৬০তম গোলটি দিলেন পরের বছরের মরশুমের শেষ ম্যাচে কর্ণার থেকে আসা বলে অভাবনীয় হেড দ্বারা সমাপ্তির মাত্র তিন মিনিট আগে। ওই শেষ ম্যাচটি সম্পর্কে অনেকেরই জানা, ডিক্সি ডিন সেদিন হ্যাটট্রিক করেছিলেন। কিন্তু খুব কম লোকই জানেন, ৬০ গোলের কোটা পূর্ণ করতে শেষ তিনটি ম্যাচে তাঁর প্রয়োজন ছিল ৯টি গোলের। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তিনি গোল পান যথাক্রমে ২, ৪ ও ৩টি। আরও বড় কথা ৬০টি গোল হয় ২৯টি খেলা থেকে। কেননা ১০টি ম্যাচে তিনি একটিও স্কোর করতে পারেননি এবং আহত থাকায় ৩টি ম্যাচে মাঠে নামেননি। এই মরশুমে এভার্টন চ্যাম্পিয়ন হল, অথচ ১৯৩০-এ তারা দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমেছিল। ডিক্সি ডিনের তৎপরতায় ১৯৩১-এ হল দ্বিতীয় ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন। ১৯৩২-এ আবার উঠল প্রথম ডিভিশনে। ১৯৩৩-এ এফ এ কাপের খেলায় দ্বিতীয় গোলটি করলেন ওয়েমব্লিতে। এমন জোরালো শট মারলেন যে, ম্যাঞ্চেস্টার সিটির গোলরক্ষকও তখন যেন বলের সঙ্গে গোল হয়ে গেলেন।

একই মরসুমে ৬০ গোলের রেকর্ডের আগে ডিক্সি ইংল্যাণ্ডের হয়ে পাঁচটি ম্যাচে ১২টি গোল করেন। গোল হল যথাক্রমে ২, ৩, ২, ২ ও ৩। অথচ বয়স তখন মাত্র ২০। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এমন নজির ক'টি আছে? আরও একবারের গোলের হিসাব দিই। লীগ ও কাপের উপর্যুপরি ৯টি ম্যাচে ২০ গোল করলেন এইভাবে: ৪, ১, ২, ১, ৪, ১, ২, ১, ও ৪। তাঁর মোট হ্যাটট্রিক ২৭টি।

এভার্টন ছেড়ে কিছুদিনের জন্য নটস কাউন্টিতে গেলেন। বয়স তখন ৩২। কিন্তু শারীরিক কারণে খেলতে পারলেন না বেশিদিন। যুদ্ধের আগে আয়ারল্যাণ্ডেও খেলেন সামান্য কালের জন্য। ১৯৬৫-তে এভার্টন তাঁর কৃতিত্বের স্মরণে ক্লাবের প্রতি অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর সম্মানে একটি প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করে। ২৫ বছর আগে যিনি এভার্টনের পক্ষে, ইংল্যাণ্ডের হয়ে দর্শকেদের মাতিয়ে রাখতেন, দেখা গেল তাঁকে, সেদিনকার সেই ফুটবল-নায়ককে ইংল্যাণ্ডের দর্শকরা ভুলে যাননি। কাতারে কাতারে এলেন দর্শকরা তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের ম্যাচ দেখতে। ৩৭ হাজার দর্শকে কানায় কানায় পূর্ণ হল স্টেডিয়াম।

নাসাজ্জি জোসে—জন্ম ১৯০৫, মৃত্যু ১৯৬৮। নাসাজির নেতৃত্বে উরুগুয়ে ১৯২৪ ও ১৯২৮-এর ওলিম্পিক ফুটবল এবং ১৯৩০-এর প্রথম বিশ্বকাপ জেতে। অত্যন্ত দক্ষ রাইট-ব্যাক নাসাজির টেকনিক, কঠোর পরিশ্রম ও অকুতোভয় তাঁকে 'মার্শাল' আখ্যা দিয়েছিল। প্রয়োজনে তিনি ফরওয়ার্ডে ও সেণ্টার-হাফেও খেলতেন।

একনাগাড়ে ১৪ বছর আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। ১৯২৩, ১৯২৪, ১৯২৬ ও ১৯৩৫-এ উরুগুয়ে দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী হয় প্রধানত নাসাজির নেতৃত্বে। উরুগুয়ের ওই স্বর্ণযুগে নাসাজি ছিলেন স্বদেশের ন্যাশিওনালে। উরুগুয়ের ওই সেরা ক্লাবকে তাদের কৃতিত্বের জন্য বলা হত 'দ্য মেশিন'।

৩১ বছরে নাসাজি অবসর নেন খ্যাতির শীর্ষে থাকাকালেই ১৯৪৫-এ অবশ্য উরুগুয়ে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের অনুরোধে তিনি জাতীয় দলের কোচিং-এর দায়িত্ব নেন। তবে তা কেবল দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্যই। নাসাজির কোচিং-এর ব্যাপারে কখনও আস্থা ছিল না। তার ধারণা, খেলোয়াড় হয় প্রত্যেকে জন্মসূত্রেই। ঘষে মেজে খেলোয়াড় তৈরি করা যায় না।

নেটো ইগোর—জন্ম ১৯৩০। রাশিয়া ও স্পার্টাক মস্কো ক্লাবের অধিনায়ক ও উইং-হাফ। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৫৪-র পর রাশিয়া ইউরোপের সেরা দলে পরিণত হয়। ৪-২-৪ প্রথায় খেলা শুরু করেন নেটো ক্লাব সতীর্থ আলেক্সি পারামোনোভকে মিড-ফিল্ডে এনে। ১৯৪২ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত জাতীয় অধিনায়ক নেটো ৮৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন, গোল করেন ৪টি। তাঁরই নেতৃত্বে রাশিয়া ১৯৫৬-য় মেলবোর্ণে ওলিম্পিক ফুটবলে সোনা পায়। এর আগে অর্থাৎ ১৯৫২-র হেলসিংকি-র সময় থেকেই নেটো মেলবোর্ণে জয়লাভের জন্য দলকে কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত করেন।

১৯৫৮-র বিশ্বকাপে নেটোর খেলায় বাধা আসে ব্রাজিলের ম্যাচে হাঁটুতে আঘাত লাগায়। কিন্তু ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে সব কটি ম্যাচেই খেলেন এবং রাশিয়া সেবার কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছয়। তাঁরই নেতৃত্বে রাশিয়া নেশনস কাপ বিজয়ী হয়।

খেলায় দল বদলের ভীষণ বিরোধী, তাই ১৯৪৮ সালে যে স্পার্টাকে খেলা শুরু, সেখানেই ১৯৫৪-তে অবসরের আগে পর্যন্ত ছিলেন। ৩৬৭টি লীগ ম্যাচ

খেলেছেন, গোল ৩৭টি। তাঁর সঞ্চয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের পদক আছে ৫টি।

বিশ্বকাপের পর চমৎকার বল নিয়ন্ত্রক। রুশ ফুটবলের সেরা 'ব্রেন' পরে মিড-ফিল্ড থেকে সেণ্টার-ব্যাকে চলে যান।

অবসরের পর ফুটবল নিয়ে বই লেখেন 'দিস ইজ ফুটবল'। তিনি ওতে লিখলেন, ফুটবলে কখনও ট্যাকটিক্সের লড়াই হওয়া উচিত নয়। বরং দরকার অ্যাটাকিং মুভমেণ্ট, আর তার সঙ্গে রাখতে হবে স্কিল। উল্লেখ্য, মাঠে ও লেখনীতে স্পষ্টবাদিতার জন্যই নেটো কখনও ফুটবল ম্যানেজার হতে পারেননি।

নেৎসার গুন্‌টার—জন্ম ১৯৪৪। পশ্চিম জার্মানীর দারুণ প্রতিভাধর লেফটইন নেৎসার স্পিড, টেক্‌নিক্যাল জ্ঞান এবং খেলার মেজাজ উপলব্ধির অপূর্ব ক্ষমতা দ্বারা জাতীয় দলে স্থায়ী আসন করে নেন। মিড-ফিল্ডে যখন ওভারাথকে পাওয়া গেল না, নেৎসার গুনটার তখনই ম্যানেজার হেলমুট শ্যোনের অ্যাটাকিং নীতিকে কার্যকর করতে প্রয়াসী হন। সামান্য কুঁজো, ভাইকিং চেহারার নেৎসার ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে পশ্চিম জার্মানীর প্রধান হাতিয়ার রূপে দেখা দেন। বল নিয়ে দ্রুত এগোতে তাঁর গোড়ালিই যথেষ্ট ছিল। গোড়ালি দিয়েই ৫০ গজ বা তারও বেশি দূরে নিখুঁত পাস দিতে পারতেন। ওয়েমব্লিতে কোয়ার্টার ফাইন্যালে অন্য যে কোনো খেলোয়াড়ের চাইতে তিনিই ইংল্যাণ্ডের আশাকে নির্মূল করতে থাকেন ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায়।

যেমন লম্বা চুল, তেমনি লম্বাটে চেহারা। নেৎসারের বৈশিষ্ট্য সর্বদা নানান ফ্যাশনের পোশাক পরা, আর গাড়িতে চড়লে তা দ্রুত চালাতেই হবে—বাইরের জগতে তিনি যত কিছু নিয়েই ব্যস্ত থাকুন, ফুটবল মাঠে একটুও গাছাড়া খেলা নয়। সব নৈপুণ্য, সব দক্ষতা তাঁর আয়ত্তে। ফুটবল নিয়ে কোনোরকম শিথিলতা নয়।

মনচেংলাডবাশ-এর ম্যানেজার হেনেস উইজউইলার-এর সহযোগিতায় নেৎসার ওই ক্লাবকে জার্মানীর ফুটবলে অত্যন্ত শক্তিমান করে তোলেন। তারা জার্মান লীগ জিতল, ইউরোপীয়ান কাপে ৭-১ গোলে হারাল ইণ্টার মিলানকে । কিন্তু এক দর্শক ইণ্টারের এক খেলোয়াড়ের মাথায় একটি টিনের পাত্র ছুঁড়ে মারায় প্রথম লেগে ৭-১ জয় সত্ত্বেও ওই ম্যাচটি আবার খেলার সিদ্ধান্ত হয় এবং ফল থাকে ০-০। এদিকে দ্বিতীয় লেগে ইণ্টার জেতে ৪-২ গোলে। তাই নেৎসারের মনচেংলাডবাশ-এর

কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া হল না। নেৎসারের ফুটবল-জীবনে একটি বড় বাধা এল।

অমিত ফুটবল-প্রতিভার অধিকারী হয়েও নেৎসার ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ১৪টির বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলার সুযোগ পাননি। আহত থাকায় মেক্সিকো বিশ্বকাপে তাঁর যাওয়া বন্ধ হয়। মিউনিখে ওভারাথের বদলে হেলমুট শোন তাঁকে সুযোগ দিলেও নেৎসার উজ্জ্বল হতে পারেননি। অথচ দু'বছর আগে ওয়েম্বলিতে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে জার্মানী যখন ৩-১ গোলে ইংল্যাণ্ডকে হারায় তখন মনে হয়েছিল বিশ্বকাপে নেৎসারই হবেন জার্মান আক্রমণের পথিকৃৎ।

সন্দেহ নেই নেৎসার অনেক উঁচুদরের খেলোয়াড়। কিন্তু বেকেনবাউয়ের ও ওভারাথ থাকাতে আগে তাঁর প্রয়োজন দেখা যায়নি। নেৎসারের পথ উন্মুক্ত করেন বেকেনবাউয়ের সুইপার হওয়ায়। মনচেংলাডবাশ-এ তাঁর চমকপ্রদ খেলাই জাতীয় দলে নির্বাচনের দাবি জানায়। অবশ্য বেকেনবাউয়ের ও ওভারাথের মেজাজের সঙ্গে নেৎসারের মেজাজে মিল ছিল কমই। নেৎসার জার্মানী ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে চলে যাওয়ায় তাঁর আন্তর্জাতিক খেলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। নেৎসার প্রকৃতই হেলমুট শোনের চোখের আড়ালে চলে গেলেন। আর তার খেসারৎ—মিউনিখের বিশ্বকাপে জার্মান দলে প্রথম এগারজনের মধ্যে না থাকা।

নোভাক লাডিস্লাভ—জন্ম ১৯৩১। চেকোশ্লাভাকিয়ার লেফট-ব্যাক নোভাক লাডিস্লাভ শুধু ডুকলা প্রাগের নয়, জাতীয় দলেরও নেতৃত্ব করেন। দীর্ঘ ১৫ বছর ডুকলায় থাকাকালে বছরের পর বছর তাদের জন্য নানা ট্রফি ও চ্যাম্পিয়নশিপ পদক এনে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য তাঁরা নোভাককে দলে নেন কৈশোরেই। তখন তাঁর খেলায় নানা দুর্বলতা। ভুল পদক্ষেপ, পজিশন জ্ঞান নেই। কিন্তু চমৎকার ট্যাক্লিং এবং দ্রুত বল ক্লিয়ারে সক্ষম ছিলেন সেরা খেলোয়াড়দের মতই। অল্পদিনের মধ্যেই নোভাক তাঁর সব দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠেন এবং যুদ্ধপরবর্তীকালের অন্যতম সেরা ডিফেণ্ডারে পরিণত হন। জাতীয় দলে প্রথম নির্বাচিত হন ১৯৫২-য়। তারপর ১৯৫৪, ১৯৫৮ ও ১৯৬৪-র বিশ্বকাপ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সহ ৭৫ বার জাতীয় দলের পক্ষে খেলে রেকর্ড করেন। জাতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন ৬ বছর। ক্লাব ও জাতীয় দলের জন্য তাঁর স্মরণীয় অবদান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চেকোশ্লোভা-

কিয়াকে পাংক্তেয় করায়। চেকোশ্লোভাকিয়ার সর্বাধিক কৃতিত্ব ১৯৬২-র বিশ্বকাপে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হাঙ্গেরিকে কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁর দল ১-০ গোলে পরাস্ত করে।

নোভাক ১৯৫৪-তে দ্বিতীয় ডিভিশনের জাব্রোনেকে চলে গেলে, ডুকলা আর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারেনি। তাঁদের অধিকাংশই তখন প্রবীণের দলে। তবুও নোভাকের নেতৃত্বেই জাব্রোনেক সামান্যের জন্য পর পর দুই মরসুম সিনিয়র ডিভিশনে ওঠা থেকে বঞ্চিত হয়। ১৯৬৮-তে অবসরের পর তিনি ওই ক্লাবের ম্যানেজারশিপ পান। ১৯৭০-এ হতাশ চেক জাতীয় ফুটবল সংস্থা তাঁকে জাতীয় দলের দায়িত্ব দেয় স্বদেশে ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে ড্র করলে। জাতীয় দলের দায়িত্ব নিয়ে ওয়েলসে ফিরতি খেলায় চেকরা ৩-১ গোলে জিতল। অথচ ওই ম্যাচের আগে তখনকার সেরাদের অনেকেই দল থেকে বাদ পড়ে অশোভন আচরণের জন্য।

পপলাহার, জান—জন্ম ১৯৩৫। চেকোশ্লোভাকিয়ার পপলাহার রক্ষণভাগে শুধু দুর্ভেদ্য নন, অত্যন্ত সক্রিয় সেণ্টার-হাফেও। শুরুতে ছিলেন ফুল-ব্যাক, কিন্তু শ্লোভান দলে গিয়ে এই স্টপার সেণ্টার-হাফে উঠে আসেন। ১৯৫৮-র সুইডেনের বিশ্বকাপে গিয়েছিলেন রিজার্ভ হয়েই। কিন্তু সেখানে জরুরী পরিস্থিতিতে সেই যে জাতীয় দলে এলেন, আর খেললেন প্রায় এক-নাগাড়েই ৬৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে। স্বাস্থ্যবান, দশাসই চেহারার পপলাহার শূন্যের বল চমৎকার খেলতেন। তাঁর মত স্টপার বিশ্বে আজ কমই আছেন। অথচ তাঁর খেলা দেখে কেউ শুরুতে অমনটি ঠাহর করতে পারতেন না। কিন্তু খানিকক্ষণ পপলাহারকে নিরীক্ষণ করলে বোঝা যেত—এ যে-সে খেলোয়াড় নয়। আর কেউ না হোন, পপলাহার থাকলে চেকদের বিপদের কারণ থাকত না। বিপক্ষের ফরওয়ার্ডরাও শুধু ভাবতেন—আহা, পপলাহার যদি না খেলত! যে কোনো শক্তিধর দল ঘায়েল হত তাঁর সদা জাগ্রত প্রহরার কাছে।

৩৬, তখন প্রবীণের দলে চলে গেলেও ফ্রান্সের লিয়ঁতে সই করলেন পেশাদার খেলোয়াড়রূপে। ১৯৫৪-এ স্বদেশে ফিরে ব্রণোতে যোগ দিয়ে তাদের অবনমন থেকে বাঁচালেন। ৩৭ বছর বয়সেও তাঁর খেলায় ঘাটতি দেখা যায়নি।

পারফুমো রবার্টো আলফ্রেডো—জন্ম ১৯৪২। আর্জেন্টিনার ফুটবলে এমন সুন্দর সেন্টার-ব্যাক আজও দেখা যায়নি। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম। কিন্তু ফুটবল তাঁর পরিবারের পরিবর্তন আনে। তবে শুরুতে তাঁকে অনেক বাধা পেতে হয়। রিভার প্লেট জুনিয়র দলে নাম লেখালেও সেখানে স্থান হয়নি। কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানান, 'তোমার দেহে শক্তি নেই।' চলে গেলেন রেসিং ক্লাবের তিন নম্বর দলে। প্রথম দলে সুযোগ পেলেন খেলার গুণে। রেসিং-এর চ্যাম্পিয়নের মূলে পারফুমোর অবদানই সর্বাধিক। ওয়ার্ল্ড ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপেও জিতল রেসিং ১৯৫৪-তে গ্লাসগোয় সেলটিককে হারিয়ে। অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি ১৯৫৪-তে ইংল্যাণ্ডে বিশ্বকাপ খেলে এসেছেন জাতীয় দলের পক্ষে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ফুটবলে অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন পারফুমো যতদিন রেসিং ক্লাবে ছিলেন, ততদিন প্রতিটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়ও খেলেছেন। কিন্তু রেসিং আর্থিক সংকটে পড়লে তাঁকে ব্রাজিলের ক্রুজিরোর কাছে বিক্রি করা হয়।

পিওলা, সিলভিও—জন্ম ১৯১৩। ইতালির পিওলা ১৯৩৮এর বিশ্বকাপে সেরা সেন্টার ফরওয়ার্ডের মধ্যেও বিশিষ্ট স্থান পেয়েছিলেন জুল রিমে ট্রফি ইতালির দখলে রেখে। লম্বা সুদেহী এবং বলবান। শূন্যের বলগুলিকে কাজে লাগাতে তৎকালে তাঁর মত কুশলী খেলোয়াড় কমই ছিলেন। মিজ্জা অপেক্ষাও কুশলী। কেউ কেউ বলতেন, মিজ্জার পরিচয় ছিল শুধু শহরে, আর পিওলার সুনাম শহর ছাড়িয়ে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল।

পিওলার ফুটবল-জীবন বৈচিত্র্যে ভরা। ১৯৩৮-এ বিশ্বকাপ জয়ের চোদ্দ বছর পরে তিনি যখন সেদিন শেষ ম্যাচটিতে ফ্লোরেন্সে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নামলেন, তখনও অ্যাটাকিং থেকে দূরে সরে যাননি। ইতালীর জাতীয় দলের পক্ষে তাঁর ৩৯টি গোলের মধ্যে একটিই ছিল বিতর্কমূলক। এটি ১৯৩৯-এ মিলানে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। পিওলা বলটি ঘুষি মেরেই ভিতরে ঢুকিয়ে দেন।

পিওলার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে প্রো ভার্সেলিতেই। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত এই ক্লাবের লীগে গোল করেন ৫১টি। তারপর রোমে গিয়ে লাজিওর পক্ষে নটি ফুটবল মরশুমে দারুণ খেলে ১৪৩টি গোল করেন। এই সংখ্যা

চিরঞ্জীব

বিশ্বকাপ ফুটবল

